

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

যেমন ছিলেন তিনি ﷺ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ




RUHAMA
PUBLICATION

যেমন ছিলেন তিনি ﷺ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ



RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

বই
মূল
অনুবাদ
সম্পাদনা
প্রকাশক

যেমন ছিলেন তিনি ﷺ -১ম খণ্ড
শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
আব্দুল্লাহ ইউসুফ
মুফতি তারেকুজ্জামান
রফিকুল ইসলাম

বই
মূল
অনুবাদ
সম্পাদনা
প্রকাশক

যেমন ছিলেন তিনি ﷺ -১ম খণ্ড
শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
আব্দুল্লাহ ইউসুফ
মুফতি তারেকুজ্জামান
রফিকুল ইসলাম

যেমন ছিলেন তিনি ﷺ

প্রথম খণ্ড

যেমন ছিলেন তিনি ﴿-১ম খণ্ড
শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আওয়াল ১৪৪১ হিজরি / নভেম্বর ২০১৯ ইসাযি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৮০০ টাকা



রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

মস্সাদকের কথা

আরবের প্রখ্যাত যশা আলিমে দ্বীন ও প্রখ্যাত দায়ি শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ (ফাঙ্কাল্লাহু আসরাহু)-এর এক অপূর্ব সিরাত সংকলন— (كَيْفَ عَامَلْنَاهُ) ‘যেমন ছিলেন তিনি’। এটিকে ঠিক সিরাত বললেও ভুল হবে। সিরাতের বিন্যাসের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। কারণ ইতিহাস বর্ণনা, আবহ নির্মাণ, ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির আলোচনা ইত্যাদি করতে গিয়ে সিরাতগ্রন্থের সর্বত্র সরাসরি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর আলোকপাত করা হয় না। তাই সিরাত খুললেই আপনি দেখবেন, সমসাময়িক আরবের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র, কুরাইশ বংশের ইতিহাস, সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন ঘটনা, হিজরতে হাবশা, বিভিন্ন লড়াইয়ের ঘটনা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ‘যেমন ছিলেন তিনি’ গ্রন্থে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি দেখবেন, কেবল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনা। সর্বত্র কেবল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপরই সরাসরি আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি কী বলছেন, কীভাবে বলছেন, কেন বলছেন, কী করছেন, কীভাবে করছেন, কেন করছেন, কার সঙ্গে কেমন আচরণ করছেন, কোন পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিচ্ছেন ইত্যাদির মতো মূল্যবান ও জীবনঘনিষ্ঠ উপাদান নিয়ে ধাপে ধাপে নির্মাণ করা হয়েছে পুরো বইটি। প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি পরিচ্ছেদ, প্রতিটি পৃষ্ঠায় আপনি দেখবেন, রাসুলুল্লাহময় একটি আবহ ছড়িয়ে আছে। অন্য কোনো কথা নেই, ভিন্ন কোনো আলোচনা নেই—কেবল রাসুলুল্লাহ ﷺ ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ ও তাঁর আদর্শ।

বিশুদ্ধতার বিচারে প্রচলিত সিরাত থেকে ‘যেমন ছিলেন তিনি’ গ্রন্থটি অনেক উর্ধ্বে। আমরা জানি, রিওয়ায়াত যাচাই ও গ্রহণের ক্ষেত্রে আহলুল হাদিস ও মুহাদ্দিসিনের মাপকাঠি অনেক কঠিন, উন্নত ও নিখুঁত। পক্ষান্তরে আরবাবুস সিয়্যার ও সিরাত সংকলকগণের মাপকাঠি তুলনামূলক শিথিল। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর অন্য যেকোনো ইতিহাস বিশুদ্ধতার বিচারে সিরাতের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-

মুনাজ্জিদ তাঁর (كَيْفَ عَامَلَهُمْ) গ্রন্থটি কেবল বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকেই সংকলন করেছেন। তাই এটিকে সিরাতুন্নব্বী না বলে অনায়াসে ‘হাদিস সংকলন’ বলা যায়। সবচেয়ে ভালো হয়, ‘সুন্নাহ সংকলন’ বললে।

শাইখের মুহাদ্দিসসুলভ প্রজ্ঞা ও প্রতিভার পূর্ণ স্ফূরণ ঘটেছে ‘কাইফা আমালাহুম ﷺ’ গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনকে চমৎকার এক বিন্যাসে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। হাদিসগুলোর তাখরিজ ও তাহকিক উল্লেখ করা হয়েছে পাদটীকায়। নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংযোজন করে তিনি হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিয়েছেন হাদিসগুলোর মর্ম—দেখিয়ে দিয়েছেন আমল করার নিয়মনীতি। সব মিলিয়ে গ্রন্থটি এক বিশুদ্ধ, প্রামাণ্য ও সহজবোধ্য সুন্নাহ সংকলনে রূপ নিয়েছে। যারা প্রিয় নবি ﷺ-কে কাছ থেকে দেখতে চান, সুন্নাহর আলোয় নিজেদের জীবনকে উদ্ভাসিত করতে চান, তাদের জন্য এর চেয়ে উত্তম হাদিয়া আর হতেই পারে না।

(মূল) সাড়ে আটশ-র অধিক পৃষ্ঠার বিশাল কলেবরের এই গ্রন্থটিকে আমরা দুই ভলিউমে মলাটবদ্ধ করেছি ‘যেমন ছিলেন তিনি’ নামে। প্রথম ভলিউমে এসেছে তিনটি অধ্যায় :

১. জগৎবাসীর আদর্শ।
২. পরিবার, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি।
৩. সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি।

দ্বিতীয় ভলিউমে এসেছে বাকি তিনটি অধ্যায় :

১. দাওয়াতের আওতাভুক্ত বিশেষ বিশেষ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি।
২. সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি।
৩. মানুষ ভিন্ন অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি।

অনেক দিন ধরে পাঠক ভাইয়েরা বইটি দ্রুত প্রকাশের জোর আবেদন জানিয়ে আসছিলেন। অনিবার্য কারণবশত প্রকাশনার কাজ দেরি হওয়ায় আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। বহু প্রতীক্ষিত সুন্নাহ সংকলনটি প্রকাশের এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কৃতজ্ঞতা আদায় করছি সেই সব ভাইদের, যাদের নিরলস পরিশ্রমের হাত ধরে বইটি আলোর মুখ দেখেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের আমলে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। এই মুবারক বইটিকে আমাদের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। (আমিন)

- তারেকুজ্জামান তারেক



সূচিপত্র

প্রবেশিকা : ২৭

প্রথম ভাষ্য : জগৎব্যাপী আদর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাসুলুল্লাহ ﷺ : এক অনুদম জীবনাদর্শ

আদর্শ মানে কী? : ৩৩

তাঁদের পথে চলুন... : ৩৪

নবি-রাসুলের অনুসরণের নির্দেশ এসেছে যেসব বিষয়ে : ৩৫

রাসুল ﷺ-এর অনুসরণ কেন করব? : ৪২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের বিভিন্ন দিক

সচ্চরিত্রের আদর্শ নমুনা : ৪৫

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতায় তিনি আদর্শ : ৪৭

হায়া ও লজ্জায় তিনি আদর্শ : ৪৭

দয়া ও স্নেহে তিনি আদর্শ : ৪৮

বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তিনি আদর্শ : ৪৯

বিনয় ও নম্রতায় তিনি আদর্শ : ৪৯

বীরত্বে তিনি আদর্শ : ৫০

দান ও মহানুভবতায় তিনি আদর্শ : ৫১

আল্লাহভীতিতে তিনি আদর্শ : ৫২

দুনিয়াবিমুখতায় তিনি আদর্শ : ৫২

আল্লাহর ওয়াদার ওপর অবিচলতায় তিনি আদর্শ : ৫৩

সবর ও ক্ষমায় তিনি আদর্শ : ৫৩

তাওবা ও ইসতিগফারে আদর্শ তিনি : ৫৪

ইবাদতে তিনি আদর্শ : ৫৪

নফল আমল : ৫৫

কুরআন তিলাওয়াত : ৫৫

আল্লাহর জিকিরে তিনি আদর্শ : ৫৬

সালাত, সাওম ও বিবাহে রাসুল ﷺ-এর অনুসরণের আহ্বান : ৫৬

হজের ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ : ৫৭

শয়নে ও জাগরণে তিনি আদর্শ : ৫৯

উচ্চারণে, মৌনতায়, হাসি-কান্নায় তিনি আদর্শ : ৫৯

বক্তৃতায় তিনি আদর্শ : ৬১

লেনদেনে তিনি আদর্শ : ৬১

রোগীর সেবায় তিনি আদর্শ : ৬৩

স্বভাবজাত রীতিনীতিতেও তিনি আদর্শ : ৬৪

নবিজি ﷺ-এর আমল চারটি ভাগে বিভক্ত : ৬৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিবার, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ : স্ত্রীগণের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

প্রথম পর্ব : খণ্ডচিত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন

স্ত্রীদের সঙ্গে প্রতিদিন অন্তরঙ্গ সময় কাটাতে পছন্দ করতেন : ৭৪

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীগণের প্রাপ্য জৈবিক চাহিদা পূরণের

ইক আদায় করতেন : ৭৮

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের প্রতি বিশ্বস্ত, অধিকার-সচেতন এবং কৃতজ্ঞ ছিলেন : ৮০

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রীদের চুমু খেতেন : ৮৭

পানপাত্রের যে স্থানে মুখ লাগিয়ে স্ত্রী পান করেছে, সেখানে মুখ

দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও পান করতেন : ৮৭

স্ত্রীর মাজা মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজতেন : ৮৮

স্ত্রীর রানের ওপর মাথা রেখে ঘুমোতেন : ৮৮

ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে একই চাদরের নিচে শুতেন : ৮৯

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন স্ত্রী আয়িশা ؓ-এর কোলে : ৯০
 স্ত্রীর সাথে গোসল করতেন : ৯০
 আদর করে স্ত্রীর নামকে ছোট করে ডাকতেন : ৯১
 স্ত্রীদের নিয়ে দাওয়াত খেতে যেতেন : ৯২
 কোনো স্ত্রী সাক্ষাতে এলে ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন : ৯৩
 স্ত্রীদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিতেন : ৯৭
 স্ত্রীর অনুভূতির প্রতি সচেতন ছিলেন : ৯৭
 অসুস্থ ও বিষণ্ণ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতেন : ৯৯
 স্ত্রী অসুস্থ হলে তিনি রুকইয়া করতেন : ১০০
 স্ত্রীর প্রতি রাসুলুল্লাহ ؐ-এর সহমর্মিতা : ১০১
 স্ত্রীদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন : ১০২
 বাড়ির কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন : ১০৩
 স্ত্রীকে বাহনে চড়তে সাহায্য করতেন : ১০৪
 রাসুল ؐ স্ত্রীদের জন্য নিজেকে পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত রাখতেন : ১০৪
 তাঁর শরীর থেকে কেবলই সুঘ্রাণই বের হতো : ১০৫
 স্ত্রীদের জন্য নিজেকে পরিপাটি রাখতেন : ১০৬
 স্ত্রীর বৈধ ইচ্ছে পূরণ করতেন : ১০৭
 স্ত্রীদের বৈধ খেলাধুলো দেখতে দিতেন : ১০৮
 ইদের সময় বৈধ কবিতা-গান শুনতে স্ত্রীদের নিষেধ করতেন না : ১০৯
 স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন : ১১৩
 নৈশভ্রমণে স্ত্রীদের সঙ্গে গল্প করতেন : ১১৪
 সফরে ধীরে উট চালানোর নির্দেশ দিতেন : ১১৫
 স্ত্রীদের পরস্পরের ঠাট্টার অনুমোদন দিতেন : ১১৫
 রাসুল ؐ স্ত্রীদের কৌতুক শুনতেন : ১১৭

দ্বিতীয় পর্ব : তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে মুমিন নারীদের
 আদর্শ হিসেবে বিনির্মাণ

রাসুলুল্লাহ ؐ স্ত্রীদের ইবাদত ও নফল আদায়ের শিক্ষা দিতেন : ১২০
 রমাজানের শেষ দশ রাতে কিয়ামুল লাইল ও অন্যান্য
 ইবাদতের জন্য স্ত্রীদের জাগিয়ে দিতেন : ১২০

স্ত্রীদের ইখলাসের শিক্ষা দিতেন : ১২১

স্ত্রীদেরকে অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিতেন : ১২২

স্ত্রীদের উপকারী জিকির শেখাতেন : ১২৩

সহজে আদায়যোগ্য উত্তম ইবাদতের নির্দেশনা দিতেন : ১২৩

ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের আদেশ দিতেন : ১২৪

সারা রাত নিঘুম ইবাদতের কথা শুনে অপছন্দ করলেন : ১২৪

আমল কম হলেও নিয়মিত করার প্রতি উৎসাহ দিতেন : ১২৫

সাদাকা ও কল্যাণের পথে ব্যয় করার প্রতি স্ত্রীদের উৎসাহ দিতেন : ১২৫

স্ত্রীদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সাদাকা করবে, সে সবার

আগে রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হবে : ১২৭

স্ত্রীদের নেক কাজ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দিতেন : ১২৮

না জেনে কথা বলতে স্ত্রীদের নিষেধ করতেন : ১২৮

স্ত্রীদের মুত্তাকি ও চরিত্রবান হতে আদেশ দিতেন : ১২৯

স্ত্রীদের দয়াদ্রু ও সংযমী হওয়ার শিক্ষা দিতেন : ১২৯

স্ত্রীদের সুন্দর কথা বলার শিক্ষা দিতেন : ১২৯

বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষা দিতেন : ১৩০

ঘরে কোনো মন্দ কাজ হলে চুপ থাকতেন না : ১৩১

মানুষকে তুচ্ছ করে কিছু বলার ব্যাপারে সতর্ক করতেন : ১৩১

বড় গুনাহের মতো ছোট ছোট গুনাহ থেকেও বেঁচে

থাকার তাকিদ দিতেন : ১৩২

মাসআলা দুর্বোধ্য মনে হলে স্ত্রীগণ বারবার জিজ্ঞেস

করে স্পষ্ট হয়ে নিতেন : ১৩২

স্ত্রীদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন গায়রতের অধিকারী : ১৩২

রাসুল ﷺ নিজ স্ত্রীদের ব্যাপারে সুধারণা রাখতেন : ১৩৩

স্ত্রীদের ঈর্ষার বিষয়টি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সামাল দিতেন : ১৩৫

স্ত্রীরা পরস্পরের ব্যাপারে অযাচিত শব্দ ব্যবহার করলে শুধরে দিতেন : ১৩৯

স্ত্রীদের পরস্পরের কাছ থেকে সমান বদলা নেওয়ার অনুমতি দিতেন : ১৪০

তৃতীয় পর্ব : নবি-পরিবারে উদ্ভূত সমস্যাগুলি ও তার সমাধান

► ইফকের ঘটনা : ১৪৪

ইফকের ঘটনায় স্ত্রীর প্রতি রাসুল ﷺ-এর আচরণনীতি থেকে শিক্ষা : ১৫০

► ভরণপোষণ চাওয়ার ঘটনা : ১৫৫

ঘটনা বিশ্লেষণ ও শিক্ষা : ১৫৭

নারীদের প্রতি একটি পরামর্শ : ১৫৮

► রাসুল ﷺ-এর কয়েকজন স্ত্রীর কটকৌশল : ১৬০

রাসুল ﷺ-এর গৃহীত পদক্ষেপ : ১৬২

এ সমস্যায় রাসুল ﷺ-এর গৃহীত পদক্ষেপ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা : ১৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সন্তানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসুল ﷺ-এর সন্তানসন্ততি : ১৬৯

সন্তানদের সুন্দর নাম রাখতেন : ১৭১

ছেলে-মেয়েদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর আচরণনীতি

কন্যাদের বিয়ে দিয়েছেন উত্তম পুরুষদের সাথে : ১৭২

বিয়ের ব্যাপারে কন্যাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন : ১৭৪

কন্যাদের অত্যধিক মোহর নির্ধারণ করতেন না : ১৭৪

কন্যার সংসারের আসবাবপত্র : ১৭৫

অলিমা ছিল সাধারণ : ১৭৬

বিয়ের সময় ফাতিমা ও আলি ﷺ-এর জন্য দোয়া : ১৭৬

বিয়ের পরও মেয়ের দেখাশোনা : ১৭৭

কন্যা ও স্বামীর ছোটখাটো মান-অভিमानে হস্তক্ষেপ করতেন না : ১৭৭

কন্যা পিত্রালয়ে ফিরলে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন এবং আগ

বেড়ে এগিয়ে নিতেন : ১৮০

দুনিয়াবিমুখতা ও সাদাকা প্রদানের প্রতি সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করতেন : ১৮১

দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণময় কাজের নির্দেশনা দিতেন : ১৮২

সন্তানদের দায়িত্বশীলতা শেখাতেন : ১৮৪

কন্যাদের তাহাজ্জুদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন : ১৮৪
 সন্তানদের আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারে সচেতন ছিলেন : ১৮৬
 সন্তানদের হাসি-খুশি ও প্রফুল্ল রাখতে পছন্দ করতেন : ১৮৮
 সন্তানদের জিকির ও দোয়ার প্রতি উৎসাহ দিতেন : ১৮৯
 সন্তানদের হাদিয়া ও তুহফা পাঠাতেন : ১৮৯
 বিপদের সময় সন্তানদের সবরের উপদেশ দিতেন : ১৮৯
 ছেলে-মেয়েদের মৃত্যুতে তিনি শোকাহত হতেন : ১৯১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নাতিদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

জন্মের পর নাতিদের কানে আজান দিতেন : ১৯৯
 আজানের পর নবজাতক নাতির তাহনিক করতেন তিনি : ২০০
 শিশু নাতিদের আকিকা দিতেন : ২০১
 শিশু জন্মের পর সপ্তম দিন পর্যন্ত আকিকা বিলম্বিত করতেন : ২০২
 শিশুর মাথা কামিয়ে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা দান
 করার নির্দেশ দিতেন : ২০৩
 শিশুর জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করতেন : ২০৪
 নাতিরা কোলে পেশাব করলেও রাগতেন না : ২০৪
 নাতিদের জন্য দোয়া করতেন : ২০৫
 রাসুল ﷺ তাঁর নাতিদের দোয়া শেখাতেন : ২০৬
 নাতিদের মসজিদে নিয়ে আসতেন : ২০৭
 নামাজের সময় তাদের কাউকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন : ২০৮
 নামাজের মাঝে নাতিদের শিশুসুলভ আচরণ সহ্য করতেন : ২০৯
 শিশুদের দুষ্টমিতে বিরক্ত হতেন না : ২০৯
 নাতিদের অনেক ভালোবাসতেন : ২১০
 রাসুল ﷺ-এর দুই নাতি হাসান-হুসাইন ছিলেন
 তাঁর জন্য বিশেষ উপহার : ২১১
 রাসুল ﷺ তাঁর নাতিদের বুকে জড়িয়ে চুমু খেতেন : ২১২
 নাতিদের কাঁধে চড়াতেন : ২১২
 নাতির মুখ থেকে লাল ঝরলে অস্বস্তি বোধ করতেন না : ২১৩
 নাতি হাসান ﷺ-এর ঠোঁটে চুমু খেতেন : ২১৩

নাতিদের নিয়ে বাহনে চড়তেন : ২১৩

শিশুদের সাথে হাসাহাসি ও খেলাধুলা করতেন : ২১৪

তাদের জন্য রহমতের দোয়া করতেন : ২১৪

উপহারের একটি অংশ নাতিরাও পেত : ২১৫

ছোটবেলা থেকেই নাতিদের হারাম বর্জনের শিক্ষা দিতেন : ২১৫

সন্তান কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ : ২১৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা : ২১৭

চাচাদের ইসলাম গ্রহণ : ২১৭

রাসুল ﷺ-এর ফুফু : ২১৮

রাসুল ﷺ-এর চাচাতো ভাই : ২১৮

চাচাতো বোন : ২১৮

ফুফুদের সন্তান : ২১৮

রাসুল ﷺ-এর দুধ ভাই-বোন : ২১৯

আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনদের সাথে উত্তম

আচরণের নির্দেশ দিতেন : ২১৯

মায়ের কবর জিয়ারত করতে গিয়ে : ২২০

আত্মীয়দের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ছিলেন : ২২১

আত্মীয়দের দাওয়াত প্রদান : ২২২

চাচা আবু তালিবের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বেশ সচেষ্টি ছিলেন : ২২২

রাসুল ﷺ তাঁর আত্মীয়তার প্রশংসা ও মূল্যায়ন করতেন : ২২৪

চাচা আব্বাস ﷺ-এর উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন : ২২৫

পরিবার-পরিজনদের ইবাদতের ভুল শুধরে দিতেন : ২২৫

আত্মীয়দের মন্দ কাজে বাধা দিতেন : ২২৫

বিশেষ মুহূর্তে আপন আত্মীয়দের সাহায্য চাইতেন : ২২৬

আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করতেন : ২২৭

বদরের বন্দী চাচা আব্বাসের প্রতি অনুগ্রহ : ২২৯

বাহরাইনের জিজিয়া থেকে চাচা আব্বাসকে দান করেছিলেন : ২২৯

আত্মীয়দের ইবাদতের প্রতি উৎসাহ দিতেন : ২৩১

আত্মীয়দের শারীরিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ রাখতেন : ২৩১
 আত্মীয়দের সহযোগিতা নিতেন এবং তাদের দায়িত্ব দিতেন : ২৩২
 হাবশা থেকে জাফর ﷺ-এর প্রত্যাগমনে আনন্দিত হন : ২৩৩
 শিশুদের বাহনে তুলে নিতেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন : ২৩৫
 আত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার কতিপয় নিদর্শন : ২৩৫
 আত্মীয়দের জন্য বেশি বেশি দোয়া করতেন : ২৩৬
 তাদের উপকারী দোয়া শেখাতেন : ২৩৮
 অসুস্থ আত্মীয়দের দেখতে যেতেন : ২৩৯
 কল্যাণময় কাজে তাদের উৎসাহিত করতেন : ২৩৯
 আত্মীয় হলেও দ্বীনের হুকুম পালনে তাদের এতটুকু ছাড়ও দিতেন না : ২৪০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

কথায় ও কর্মে রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন আদর্শ প্রতিবেশী : ২৪৩
 রাসুল ﷺ-এর প্রতিবেশী : ২৪৪
 আনসার প্রতিবেশী : ২৪৪
 নাজ্জার গোত্র রাসুল ﷺ-এর প্রতিবেশী হওয়ার
 সৌভাগ্যে গৌরববোধ করত : ২৪৫
 মুহাজির প্রতিবেশী : ২৪৬
 মক্কার প্রতিবেশীরা রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দিত : ২৪৬
 প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে সচেতন করতেন : ২৪৬
 প্রতিবেশীর সম্মান করা ইমানের নিদর্শন আখ্যা দিয়েছেন : ২৪৭
 যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী অনিরাপদ তার
 ইমানের ব্যাপারে আশঙ্কা করেছেন : ২৪৮
 প্রতিবেশীকে কষ্টদাতা জান্নাতে প্রবেশ করবে না : ২৪৯
 প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়া নিকৃষ্ট কাজ : ২৪৯
 প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহর অভিশাপ ও
 মানুষের অভিশাপের কারণ : ২৫০
 প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারীর আমল তার কাজে আসবে না : ২৫১
 মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই প্রতিবেশীর অধিকার পাবে : ২৫১
 সৎ প্রতিবেশী লাভকে মানুষের সৌভাগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন : ২৫২

উত্তম প্রতিবেশী সে-ই, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম : ২৫৩
 প্রতিবেশী যত কাছের হবে হকও তত গুরুত্বপূর্ণ হবে : ২৫৪
 প্রতিবেশীর সংজ্ঞায়নে আলিমদের বিভিন্ন মত : ২৫৪
 অল্প হলেও হাদিয়া দিতে উৎসাহিত করেছেন : ২৫৫
 প্রতিবেশীকে খাবার পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করতেন তিনি : ২৫৬
 স্ত্রীকে নিয়ে প্রতিবেশীর দাওয়াতে যেতেন : ২৫৮
 প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন : ২৫৮
 প্রতিবেশীর মূল্যায়নেই চেনা যায় সৎ মানুষ : ২৫৯
 প্রতিবেশীর প্রয়োজনে কখনো না বোলো না : ২৫৯
 প্রতিবেশীকে শুফআর হক দিয়েছেন : ২৬০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মেহমান ও মেজবানের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

মেজবান হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ : ২৬১
 আল্লাহ তাআলা মহানুভব এবং তিনি মহানুভবতা ভালোবাসেন : ২৬২
 অতিথিপরায়ণতাকে ইমানের আলামত বলেছেন : ২৬৩
 অতিথিপরায়ণ ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন : ২৬৩
 প্রত্যেক মুসলমান মেহমানদারি পাওয়ার হক রাখে : ২৬৩
 মেহমানদারির সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন : ১৬৪
 দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর অতিথিপরায়ণতার ব্যাপ্তি বোঝা যেত : ২৬৬
 মেহমানের সাথে বসে খোশগল্প করতেন : ২৬৮
 মেহমানদারির সামর্থ্য না থাকলে মেহমানকে
 অন্যের হাতে তুলে দিতেন : ২৭০
 মেহমান কাফির হলেও সম্মান প্রদর্শন করতেন : ২৭২
 অতিথিদের সেবা করতেন : ২৭৩
 মেহমানদের আচরণে কষ্ট হলেও তাদের
 বিদায় করতে লজ্জা পেতেন : ২৭৪
 মেহমান হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ : ২৭৬
 দাওয়াত কবুল করতেন, যদিও দাওয়াতদাতা গোলাম হোক : ২৭৭

ইহুদিদের মন আকৃষ্ট করার জন্য তাদের দাওয়াতও কবুল করতেন : ২৭৮
দাওয়াতে অনিমন্ত্রিত কাউকে সঙ্গে নিতে চাইলে অনুমতি নিতেন : ২৭৮
কখনো দাওয়াত ছাড়াই মেহমান হতেন : ২৭৯
আতিথেয়তায় ইবরাহিম ؑ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন : ২৮২

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বিশিষ্ট সাহাবিদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

নবিজি ﷺ-এর বিশেষ দুই সাহাবি আবু বকর ও উমর : ২৮৫
মানুষের সামনে তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করতেন : ২৮৫
তাদের ব্যপারে কেউ অসংলগ্ন কথা বললে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন : ২৮৬
বিশেষ সাহাবিদের মর্যাদা মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিতেন : ২৮৯
অনেক বিষয় কেবল তাদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখতেন : ২৯৩
তাদের এমন অনেক আচরণ সহ্য করতেন,
যা অন্যদের ক্ষেত্রে করতেন না : ২৯৫
বিশেষ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে
তাদের ওপর বেশি ভরসা করতেন : ২৯৮
বিশেষ সাহাবিদের মধ্য থেকে কাউকে
দেখতে না পেলে তার খোঁজ করতেন : ৩০১
যুদ্ধ চলাকালীন তাদের ব্যাপারে একটু বেশিই খোঁজখবর নিতেন : ৩০৩
তাদের কারও কারও জন্য নিজের
পিতামাতাকে উৎসর্গ করার কথা বলতেন : ৩০৪
সাহাবিদের মৃত্যুতে তিনি মর্মান্বিত ও অশ্রুসিক্ত হতেন : ৩০৫
তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন : ৩০৮
তাদের রায় ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন : ৩০৯
বদর যুদ্ধে জনৈক সাহাবির পরামর্শে ছাউনি স্থাপন করেছিলেন : ৩১৩
উহুদ যুদ্ধে নিজের রায় থেকে সরে সাহাবিদের রায় গ্রহণ করেছিলেন : ৩১৪
সাহাবিদের দুঃখ-কষ্টের খেয়াল রাখতেন : ৩১৫
বিশেষ কারণে অনুদান না দিলে অন্য
উপায়ে তাদের মন জয় করে নিতেন : ৩১৭
তিনি সাহাবিদের বিশেষ গুণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন : ৩১৯
তিনি প্রত্যেক সাহাবির বিশেষ গুণের মূল্যায়ন করতেন : ৩২০

তাদের উত্তম পরিণামের সুসংবাদ দিতেন : ৩২২

তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন : ৩২৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ : দাস-দাসী ও চাকর-বাকরদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ

ﷺ-এর আচরণ

খাদিম ও দাসদের সাথে তাঁর আচরণবিধি : ৩২৮

খাদিম অথবা দাসীর সাথে কোথাও যেতে কুণ্ঠিত হতেন না : ৩৩১

খাদিমদের সঙ্গে খাবার খেতে কুণ্ঠিত হতেন না : ৩৩২

খাদ্য ও বস্ত্রে খাদিম ও মালিকের মাঝে সমতা রক্ষার কথা বলেছেন : ৩৩৩

সামর্থ্যের অধিক কাজ চাপিয়ে দিতে নিষেধ করতেন : ৩৩৫

অসুস্থ কাফির খাদিমকেও দেখতে যেতেন : ৩৩৬

খাদিমের জানাজা পড়তে না পারলে কবর জিয়ারত করতেন : ৩৩৬

খাদিমের জন্য দোয়া করতেন : ৩৩৮

তাঁর খাদিমদের খোঁজখবর নিতেন : ৩৩৮

খাদিমের সব ইচ্ছা পূরণ করতেন : ৩৩৯

চাকর-মজুরদের পারিশ্রমিক দ্রুত দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন : ৩৪০

শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে সতর্ক করতেন : ৩৪১

কিয়ামতের দিন খাদিমদের ওপর কৃত জুলুমের বদলা নেওয়া হবে : ৩৪১

তাদের ছোটখাটো অপরাধ ক্ষমা করার পরামর্শ দিতেন : ৩৪৩

খাদিমকে সম্বোধনে সম্মানজনক শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন : ৩৪৪

খাদিম কাজে দেরি করলে শাস্তি দিতেন না : ৩৪৫

খাদিমের প্রতি খুবই উদার ছিলেন : ৩৪৫

খাদিম ভুল করলে কাউকে ধমকাতেও দিতেন না : ৩৪৬

খাদিম অপছন্দ হলে জুলুম হওয়ার ভয়ে তাকে ছেড়ে দিতে বলতেন : ৩৪৭

খাদিমকে কখনো মারধর করেননি : ৩৪৭

অন্যদেরকেও মারধর করতে নিষেধ করতেন : ৩৪৭

গোলামকে প্রহার করার কাফফারা নির্ধারণ

করেছেন তাকে স্বাধীন করে দেওয়া : ৩৪৯

মৃত্যুশয্যা নামাজ ও দাস-দাসীদের ব্যাপারে নসিহত করেছেন : ৩৫১

তৃতীয় অধ্যায় : সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

- তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন : ৩৫৬
- তাদের জন্য দোয়া করতেন : ৩৫৯
- তাদের অনুভূতির মূল্যায়ন করতেন এবং
সুন্দর শব্দে সম্বোধন করতেন : ৩৬৩
- তাদের মনঃকষ্ট দূর করতে সচেষ্ট থাকতেন : ৩৬৪
- তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের আবদার রক্ষা করতেন : ৩৬৭
- তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক দেখিয়ে দিতেন : ৩৭১
- তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন : ৩৭৩
- অন্ধ ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের কারণে
আল্লাহ তাআলা তাঁকে সতর্ক করেন : ৩৭৪
- তাদের জন্য সব বিষয় সহজ করে দিতেন : ৩৭৬
- তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতেন : ৩৭৯
- রমাজান মাসে আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমকে
দ্বিতীয় আজানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন : ৩৮০
- তাদের কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করতেন : ৩৮১
- প্রতিবন্ধীদের অসিলায় আল্লাহর সাহায্য আসে : ৩৮১
- বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বোকামি ক্ষমা করতেন : ৩৮২
- প্রতিবন্ধীদের দেখে শিক্ষাগ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন : ৩৮২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিপদগ্রস্তদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

- আল্লাহ তাআলা কারও কল্যাণ চাইলে তাকে বিপদে ফেলেন : ৩৮৭
- বিপদাপন্ন ব্যক্তির সহমর্মী হতেন এবং সবরের উপদেশ দিতেন : ৩৮৮
- তাদের সবরের পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন : ৩৯১
- বিপদগ্রস্তকে সবরের পুরস্কারের কথা জানিয়ে দিতেন : ৩৯৩
- তাদের গুনাহ মাক্ফের সুসংবাদ দিতেন : ৩৯৫

তাদের পুরস্কারের সুসংবাদ শোনাতেন : ৩৯৬
বিপদে সবরের বিনিময়ে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিতেন : ৩৯৭
পুরস্কারের সুসংবাদ শুনিয়া সান্ত্বনা দান করতেন : ৩৯৮
বিপদগ্রস্তকে অপেক্ষাকৃত কঠিন বিপদের কথা বলে সান্ত্বনা দিতেন : ৪০০
বিপদের সময় কী পড়তে হবে, তা শিক্ষা দিতেন : ৪০১
বিপদের সময় নিজের ওপর বদদোয়া করতে নিষেধ করতেন : ৪০২
বিলাপ করা এবং তাকদিরের প্রতি
অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে নিষেধ করতেন : ৪০৪
রোগের সময় অস্থিরতা প্রকাশ করতে
এবং গালমন্দ করতে নিষেধ করতেন : ৪০৫
বিপদগ্রস্তকে মৃত্যুর কামনা করতে নিষেধ করতেন : ৪০৮
মুসলমানকে জানিয়ে দিতেন, অসুস্থতায় কাটলেও দীর্ঘ জীবন নিয়ামত : ৪১০
অস্থির হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে মৃত
স্বজনের চেহারা না দেখতে বলেছেন : ৪১১
সান্ত্বনা দিয়ে বিপদগ্রস্তের কষ্ট সহনীয় করে তুলতেন : ৪১৩
অনেক সময় বিপদগ্রস্তের দায়িত্ব ও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতেন : ৪১৪
বিধবা ও এতিমদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন : ৪১৬
কষ্ট লাঘব করতে বিপদগ্রস্তকে অর্থ-সম্পদ দান করতেন : ৪১৬
আল্লাহর রাস্তায় সমুদয় সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেছে—এমন লোককে সান্ত্বনা
দিতেন : ৪১৭
আর্থিকভাবে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাদাকা দিতে নির্দেশ করতেন : ৪১৮
সুসংবাদ শুনিয়া তাদের বিপদ সহনীয় করে তুলতেন : ৪১৯
দুঃখবোধ শিথিলকারী খাবার দেখিয়ে দিতেন : ৪২১
বিপদগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন : ৪২২
বিপদে পরস্পরকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং সহমর্মিতার শিক্ষা দিয়েছেন : ৪২৪
সান্ত্বনা দেওয়ার সময় কী বলবে, তা শিখিয়ে দিয়েছেন : ৪২৪
সাহাবিগণের কেউ রোগাক্রান্ত হলে বা ব্যথা
পেলে তাকে ঝাড়ফুক করতেন : ৪২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : গরিবদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

- রাসুল ﷺ অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্র ও নিঃস্বদের দিয়ে দিতেন : ৪২৭
- চেহারা ও বেশভূষায় অভাবের ছাপ দেখলে ব্যথিত হতেন : ৪২৮
- অভাবগ্রস্তদের প্রতি অনুগ্রহ ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতেন : ৪৩১
- সচ্ছল সাহাবিদেরকে নিঃস্বদের সাহায্য করার নির্দেশ দিতেন : ৪৩৬
- অভাবগ্রস্তদের দান করতে সাহাবিগণকে উৎসাহিত করতেন : ৪৩৭
- দরিদ্রদের মাঝে নিজের খাবার ভাগ করে দিতেন : ৪৪১
- নিজে সাহায্য করতে না পারলে অন্যের কাছে পাঠাতেন : ৪৪৩
- তাদের কষ্ট ভাগ করে নিতেন : ৪৪৫
- গরিবদের সাথে মিলেমিশে থাকতে নির্দেশ দিতেন : ৪৪৮
- আল্লাহর কাছে গরিব ও নিঃস্বদের ভালোবাসা কামনা করতেন : ৪৫৫
- নিঃস্বদের ভালোবাসতে ও তাদের পাশে রাখতে নির্দেশ দিতেন : ৪৫৫
- গরিবদের স্মরণ করতেন এবং খোঁজখবর নিতেন : ৪৫৬
- একেবারে রিক্তহস্ত গরিব যারা, তাদের গুরুত্ব দিতেন : ৪৫৭
- তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন : ৪৫৮
- তাদের জিজ্ঞেস করতেন কোনো প্রয়োজন আছে কি না : ৪৫৮
- গরিবদের মর্যাদার কথা বলতেন : ৪৬০
- আখিরাতে ফজিলতের কথা বলে তাদের মনোবল বাড়াতেন : ৪৬৩
- ধনীদের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দিতেন : ৪৬৪
- তাদের বলতেন, জান্নাতিদের মধ্যে গরিবরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ : ৪৬৯
- তিনি তাদের উপস্থিতি কামনা করতেন : ৪৭১
- তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দিতেন : ৪৭২
- বিয়ে-শাদির দাওয়াতে তাদের উপেক্ষা করতে নিষেধ করতেন : ৪৭৪
- তাদের ভিক্ষা না করতে উদ্বুদ্ধ করতেন : ৪৭৪
- দান করার সামর্থ্য না থাকলে সুন্দর ভাষায় অপারগতা প্রকাশ করতেন : ৪৭৭
- নিজের পরিবারের চাহিদার ওপর গরিবদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতেন : ৪৮০
- ভিক্ষা করতে নিষেধ করতেন : ৪৮১
- বিভিন্ন সম্মানজনক পেশা দেখিয়ে দিতেন : ৪৮২
- ভিক্ষুকদের অল্পকিছু হলেও দান করার নির্দেশ দিতেন : ৪৮৮

গরিবদের শাদি করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন : ৪৯০

পরস্পরের আর্থিক বিষয়টি দেখাশোনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন : ৪৯৭

দারিদ্র্যের মাঝেও সুন্দরভাবে বাঁচার শিক্ষা দিতেন : ৪৯৯

উম্মাহর ব্যাপারে দারিদ্র্যের চেয়ে ধনাঢ্যতাকে বেশি ভয় করতেন : ৫০৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ধনীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

দ্বীন ইসলামের সেবায় তাদের ভূমিকার সাক্ষ্য দিয়েছেন : ৫০৭

নেক কাজে নিজের বিশেষ সম্পদ থেকে খরচ করতে ভালোবাসতেন : ৫০৯

ধনীদের সাদাকার উপযুক্ত খাত দেখিয়ে দিতেন : ৫১০

সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সাদাকা করার পরামর্শ দিতেন : ৫১৩

সন্তানদের দান করার ব্যাপারে সমতা বিধানের নির্দেশ দিতেন : ৫১৫

আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা সম্পদই আসল সম্পদ : ৫১৬

কেউ সমুদয় সম্পত্তি সাদাকা করতে চাইলে তা কবুল করতেন না : ৫১৯

অনেকের কাছ থেকে সমুদয় সম্পত্তি গ্রহণ করতেন : ৫২০

তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করার নির্দেশ দিতেন : ৫২১

কল্যাণকর কাজে তাদের উৎসাহ দিতেন : ৫২৩

আল্লাহর সাথে সওদা করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন : ৫২৬

ধনবান ব্যবসায়ীদের সাদাকা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন : ৫২৮

তাদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতেন : ৫২৯

বেচাকেনার সময় প্রতারণা করতে নিষেধ করতেন : ৫৩০

তাদের কেউ উপকার করলে তার প্রতিদান দিতেন : ৫৩১

তাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন : ৫৩৩

বেচাকেনার ক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শনকারীদের জন্য দোয়া করতেন : ৫৩৫

সাদাকা ও জাকাত আদায়কারীদের জন্য দোয়া করতেন : ৫৩৬

অহংকারের ভাব দেখতে পেলে খুব রাগান্বিত হতেন : ৫৩৬

জাকাত দিতে অস্বীকার করলে তিনি রাগান্বিত হতেন : ৫৩৮

রাসুল ﷺ ধনাঢ্যতার ফিতনা থেকে পানাহ চাইতেন : ৫৩৯

তিনি বলতেন, প্রকৃত ধনাঢ্যতা হলো অন্তরের ধনাঢ্যতা : ৫৪১

তাদের বলতেন, ধনাঢ্যতার সাথে অবশ্যই তাকওয়া থাকতে হবে : ৫৪২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সম্রাট ও মর্যাদাবানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

তাদের মর্যাদা ও সম্মান বহাল রাখতেন : ৫৪৪

সম্রাট লোকদের দ্বীনের পথে আনার খুব চেষ্টা করতেন : ৫৪৮

উমর রাঃ ও আবু জাহেলের হিদায়াতের প্রতি আগ্রহ : ৫৪৯

তায়িফের সম্রাট লোকদের উদ্দেশে দাওয়াত : ৫৫০

দাওস গোত্রের নেতা তুফাইল বিন আমরকে দাওয়াত : ৫৫১

বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের উদ্দেশে দাওয়াত : ৫৫৫

তাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে খুব আনন্দিত হতেন : ৫৫৭

তাদের প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব প্রদর্শন করতেন : ৫৬৩

মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনতেন : ৫৬৪

তাদের অজুহাত মেনে নিতেন : ৫৬৮

তাদের সম্মান করতেন এবং সম্মান করার নির্দেশ দিতেন : ৫৭২

তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করতেন : ৫৭৩

তাদের দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ দিতেন : ৫৭৬

তাদের উত্তম গুণাবলির প্রশংসা করতেন : ৫৭৭

অনেক সময় তাদের সাহায্য ও আশ্রয় গ্রহণ করতেন : ৫৭৯

তাদের খানার দাওয়াত কবুল করতেন : ৫৮১

তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের বাড়িতে খানা খেতেন : ৫৮২

তাদের সাথে রসিকতা করতেন : ৫৮৩

তাদের সম্ভ্রষ্ট রাখার প্রতি গুরুত্ব দিতেন : ৫৮৪

খাজরাজের সর্দার সাদ বিন উবাদা রাঃ-এর

সাথেও অনুরূপ আচরণ করেছিলেন : ৫৮৫

তাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন : ৫৮৬

তাদের উপকারের কথা স্মরণ রাখতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন : ৫৯২

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সহযোগিতা করতেন : ৫৯৪

তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করতেন : ৫৯৫

নেতৃস্থানীয় লোক অপরাধ করলে অন্যদের তুলনায় কঠোর হতেন : ৬০০

অনেক সময় তাদের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলতেন : ৬০২

তাদের দয়া-মায়া শিক্ষা দিতেন : ৬০৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মেধাবী ও প্রতিভাবানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

হাসসান বিন সাবিত ﷺ-কে কবিতার

মাধ্যমে জবাব দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন : ৬০৭

জাইদ বিন সাবিতকে ইহুদিদের ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন : ৬১১

মুআজ বিন জাবালকে ইয়ামানের বিচারপতি নিয়োগ করেছিলেন : ৬১৫

মুসআব বিন উমাইর ﷺ-কে দ্বীন

প্রচারের উদ্দেশ্যে মদিনায় পাঠিয়েছিলেন : ৬১৬

কঠিন দায়িত্বসমূহ উচ্চ ও অভিজাত

বংশীয় লোকদের কাঁধে ন্যস্ত করতেন : ৬১৭

সাহাবিদের মাঝে তাঁদের অবস্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট করে দিতেন : ৬২১

তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে তাদের প্রশংসা করতেন : ৬২২

তারা সুন্দর কিছু উদ্ভাবন করলে তার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করতেন : ৬৩৩

রাসুল ﷺ তাকে (ইবনে আব্বাস ﷺ) আপন

সওয়ারির ওপর নিজের পেছনে বসাতেন : ৬৩৭

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর প্রতিভার মূল্যায়ন করতেন : ৬৪০

অলৌকিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী আবু হুরাইরা : ৬৪৩

আরেক প্রতিভাবান সাহাবি উবাই বিন কাব : ৬৪৫

উমর ﷺ উবাই বিন কাবকে তারাবির ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন : ৬৪৫

সমরবিশারদ খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ : ৬৪৭

চরম বাহাদুর ও অকুতোভয় বীর মুআজ বিন

আমর বিন জামুহ ও মুআজ বিন আফরা : ৬৪৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বিবাদকারীদের মাঝে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালার পদ্ধতি

আপস করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন : ৬৫৩

ঋণ ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করতেন : ৬৫৪

মীমাংসা করা সম্ভব না হলে ফয়সালা করে দিতেন : ৬৫৫

মিথ্যা শপথ করার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করতেন : ৬৫৭

প্রকাশ্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ফয়সালা করতেন : ৬৫৯

বাহ্যিক দলিলের কারণে কারও হক কারও জন্য হালাল হয় না : ৬৬০

স্বীকারোক্তি বা প্রমাণ ব্যতীত বিবাদীর বিরুদ্ধে ফয়সালা করতেন না : ৬৬২
শরিয়তবিরোধী ফয়সালা বাতিল করে দিতেন : ৬৬৩
মিথ্যা মামলা দায়ের করার ব্যাপারে সতর্ক করতেন : ৬৬৫
বিবাদ নিরসনে নিজের পক্ষ থেকে অর্থ ব্যয় করতেন : ৬৬৬
ফয়সালা হকের পক্ষে দিলেও
পাশাপাশি অন্য সবার মনও রক্ষা করতেন : ৬৬৮
বিচারপ্রার্থী থেকে অদ্ভুত কিছু শুনলে মুচকি হাসতেন : ৬৭০
উভয়পক্ষের কথা মন দিয়ে শুনতেন, যদিও একপক্ষ কাফির হোক : ৬৭২
রাসুল ﷺ-এর কতিপয় ফয়সালা : ৬৭৩



প্রবেশিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সিরাত মানবজীবনের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা—অনুকরণীয় জীবনাদর্শ। আল্লাহ রাসুল আলামিন তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছেন সুমহান চরিত্রে। অনুপম শিষ্টাচারে সাজিয়েছেন তাঁর পবিত্র জীবনকে। তাঁর দেখানো পথেই রয়েছে জীবনের পরম সফলতা। যারা আল্লাহকে পেতে চায় আর সাফল্যের প্রত্যাশা রাখে অনন্ত জীবনে, তিনিই তাদের অদ্বিতীয় পথপ্রদর্শক—আসমানি রাহবার।

তাই বিস্তৃত পরিসরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তাঁর আচরণবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন আমাদের জন্য আবশ্যিক; যাতে সঠিকভাবে আমরা তাঁর অনুসরণ করতে পারি।

মুমিন মাত্রই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসৃত পথে চলতে চায়। কিন্তু সঠিক জ্ঞান ও দিকনির্দেশনার অভাবে অনেকেই বিভ্রান্তির শিকার হয়। তাই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি কেমন ছিল—তার ওপর প্রামাণ্য আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। পুরো বিষয়টিকে আমরা উপস্থাপন করেছি হাদিসের আলোকে, যাতে রাহে সুন্নাহর পথিকরা এটিকে গ্রহণ করতে পারে জীবনপথের দিশারিরূপে এবং আপন আমলসমূহকে বিন্যস্ত করতে পারে দলিলের আলোকে।

পুরো গ্রন্থটিকে আমরা ভাগ করেছি ছয়টি অধ্যায়ে—

প্রথম অধ্যায় : জগৎবাসীর আদর্শ

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ‘আদর্শ’ শব্দটির মর্ম ও ব্যাপ্তি, নবি-রাসুলগণের অনুসরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং তাঁদের অনুকরণীয় দিকসমূহ। বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণের ওপর।

এই অধ্যায়কে আমরা বিন্যস্ত করেছি দুটি পরিচ্ছেদে—

১. রাসুলুল্লাহ ﷺ : এক অনুপম জীবনাদর্শ ।
২. রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের বিভিন্ন দিক ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিবার, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

পরিবার-পরিজন তথা আপন স্ত্রী, সন্তান ও নাতিদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপড়শিদের সঙ্গে তাঁর আচরণ কেমন ছিল, তা নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা পেশ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে ।

এই অধ্যায়কে আমরা সাজিয়েছি আটটি পরিচ্ছেদে—

প্রথম পরিচ্ছেদ : স্ত্রীগণের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

এই পরিচ্ছেদটি বিন্যস্ত হয়েছে তিনটি পর্বে—

১. স্ত্রীগণের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহার ।
২. তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে তাঁদেরকে মুমিন নারীদের আদর্শ হিসেবে বিনির্মাণ ।
৩. নবি-পরিবারে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সন্তানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নাতিদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মেহমান ও মেজবানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বিশিষ্ট সাহাবিদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : দাস-দাসী ও চাকর-বাকরদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ।

তৃতীয় অধ্যায় : সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির কারণে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সমুচিত আচরণ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

এটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে আটটি পরিচ্ছেদে—

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিপদগ্রস্তদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : গরিবদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ধনীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মেধাবী ও প্রতিভাবানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বিবাদকারীদের মাঝে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালার পদ্ধতি।

চতুর্থ অধ্যায় : দাওয়াতের আওতাভুক্ত বিশেষ বিশেষ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

যেসব লোক দাওয়াতের মুখাপেক্ষী ও সৌহার্দ্য লাভের অধিক উপযোগী, তাদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ প্রসঙ্গে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

এটি বিন্যস্ত করা হয়েছে পাঁচটি পরিচ্ছেদে—

প্রথম পরিচ্ছেদ : নওমুসলিমদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রশ্নকারীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : গ্রাম্য বেদুইনদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পাপী ও অপরাধীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুনাফিকদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

পঞ্চম অধ্যায় : সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ প্রসঙ্গে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

বিষয়টিকে সাজানো হয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদে—

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাধারণ নারীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বয়স্কদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ছোটদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : মানুষ ভিন্ন অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

এই অধ্যায়ে আলোচনা পেশ করা হয়েছে দুটি পরিচ্ছেদে—

প্রথম পরিচ্ছেদ : জিনদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পশুপাখির সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ।

আল্লাহ তাআলা তাওফিক দিন এবং আমাদের আমলসমূহকে কবুল করুন।



—...◉ প্রথম অধ্যায় ◉—

জগৎবাসীর আদর্শ



✽ [প্রথম পরিচ্ছেদ] ✽

রাসুলুল্লাহ ﷺ : এক অনুপম জীবনাদর্শ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

‘তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য তো রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’^১

ইবনে কাসির رحمه বুলেন, ‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম ও আদর্শের অনুসরণ প্রসঙ্গে এই আয়াতটি একটি মূলনীতির পর্যায়ে পড়ে।’^২

আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন পুরো জগৎবাসীর জন্য রহমত ও হিদায়াতরূপে। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং পৃথিবীতে অশান্তি চায় না, তাদের জন্য তিনি অনুপম জীবনাদর্শ।

আদর্শ মানে কী?

মানুষ যার কথা ও কর্মের অনুসরণ করে, তাকে আদর্শ বলে।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শের অনুসরণ করা অতীব জরুরি। মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরানোর ঘৃণ্য মানসে আল্লাহর শত্রুদের সৃষ্ট নানান সংশয় ও সন্দেহ বর্তমানে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ ব্যতীত এসব ফিতনা থেকে

১. সূরা আল-আহজাব, ৩৩ : ২১

২. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৬/৩৯১।

বাঁচার বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনাদর্শের ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস পাব। কেমন ছিলেন তিনি একজন নেতা হিসেবে, একজন শাসক হিসেবে, একজন বিচারক হিসেবে, একজন সংস্কারক হিসেবে, একজন শিক্ষক হিসেবে, একজন মুরব্বি হিসেবে, একজন স্বামী হিসেবে—এককথায় তাঁর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের অনুসরণীয় দিকগুলোর একটি প্রামাণ্য মানচিত্র আমরা এঁকে দেখাব। আর সবগুলো আলোচনা আমরা উপস্থাপন করব বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে।

তাঁদের পথে চলুন...

আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণের পথে চলার আদেশ দিয়েছেন—

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِ

‘তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাঁদের পথের অনুসরণ করো।’^৩

ইবনে কাসির رحمه বুলেন, ‘(فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِ)-এর অর্থ হলো, তুমি তাঁদের পথে চলো এবং তাঁদের অনুসরণ করো। নির্দেশটি প্রত্যক্ষভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য হলেও পরোক্ষভাবে তাঁর উম্মতও এর আওতাভুক্ত।’^৪

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمه বুলেন, ‘পূর্ববর্তী নবিগণের ইতিহাস মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। তারা আগের যুগের নবিদের চেয়েও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবুও তারা নিরাশ হবে না। কেননা, তারা জানে তাদের চেয়ে উত্তম লোকেরাও পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন। আর দিন শেষে মুমিনদের পরিণাম সর্বদা কল্যাণকরই হয়। তাই সন্দিগ্ধ লোকেরা যেন নিশ্চিত হয়, গুনাহগারেরা যেন তাওবা করে নেয় আর মুমিনদের ইমান যেন সুদৃঢ় হয়। এই অর্থে পূর্ববর্তী নবিগণের অনুসরণ সঠিক।’^৫

৩. সূরা আল-আনআম, ৬ : ৯০।

৪. তাফসিরু ইবনি কাসির : ২/১৯০।

৫. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৫/১৭৮।

নবি-রাসুলের অনুসরণের নির্দেশ এসেছে যেসব বিষয়ে

❖ আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য

আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য নবি-রাসুলগণের জীবনের সবচেয়ে আলোকিত বৈশিষ্ট্য। মানুষের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন সর্বাধিক ইবাদতগুজার, সবচেয়ে বেশি সালাত আদায়কারী এবং আল্লাহর সামনে সর্বোচ্চ বিনয়ী। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

‘স্মরণ করো, আমার বান্দা ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা; তাঁরা ছিল শক্তিশালী ও দূরদর্শী।’^৬

আতা আল-খুরাসানি رحمته বলেন, ‘(أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ)-এর অর্থ হলো, আল্লাহর ইবাদতে সামর্থ্যবান এবং আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত।’

কাতাদা رحمته বলেন, ‘তাদেরকে ইবাদতের শক্তি ও দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করা হয়েছিল।’^৭

নবি-রাসুলগণের ইবাদতের দৃষ্টান্ত অগণিত। ইবরাহিম عليه السلام (আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে) বলেন :

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

‘হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়মকারী করো এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের রব, আমার দোয়া কবুল করো।’^৮

ইসমাইল عليه السلام-এর প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

৬. সূরা সাদ, ৩৮ : ৪৫।

৭. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৯/১৭০।

৮. সূরা ইবরাহিম, ১৪ : ৪০।

‘তিনি তাঁর পরিজনবর্গকে সালাত ও জাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর রবের সন্তোষভাজন।’^৯

ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব ﷺ-এর প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

‘আর তাঁদের করেছিলাম নেতা; তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত; তাঁদের প্রতি ওহি প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়িম করতে এবং জাকাত প্রদান করতে; তাঁরা আমারই ইবাদত করত।’^{১০}

প্রিয় নবি ﷺ-এর পুরো জীবনটাই রচিত হয়েছে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যে। তাঁর পূর্বাপর সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

‘আর রাত্রির কিয়দাংশ তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।’^{১১}

অন্য আয়াতে বলেন :

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

‘সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাকো। তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জানো?’^{১২}

৯. সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৫।

১০. সূরা আল-আশ্বিয়া, ২১ : ৭৩।

১১. সূরা আল-ইনসান, ৭৬ : ২৬।

১২. সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৬৫।

অন্যত্র বলেন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

‘আর রাত্রির কিছু অংশ তাহাজ্জুদ কায়েম করবে—এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত কৰ্তব্য। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।’^{১৩}

❖ আল্লাহর জিকির, অত্যধিক বিনয় ও দোয়া

ইবাদতের পাশাপাশি নবি-রাসুলগণ অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করতেন। মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে বিনয়াবনত হতেন। কায়মনোবাক্যে দোয়া করতেন।

স্বীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁরা কীভাবে আল্লাহর দরবারে কাকুতিমিনতি করতেন, কীভাবে তাঁরা ভয় ও আশা নিয়ে রবের দরবারে হাত তুলতেন তার বর্ণনা কুরআনে এসেছে—

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا عِنْدَنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ

‘আর স্মরণ করো, আইয়ুবের কথা, সে তাঁর রবকে আহ্বান করে বলেছিল, “আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু!” তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম, তাঁর দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরও দিলাম আমার রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশরূপে।’^{১৪}

১৩. সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ৭৯।

১৪. সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮৩-৮৪।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ . وَزَكْرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

‘আর স্মরণ করো ইউনুসের কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তাঁর জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না। অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল, “আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; আপনি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী।” তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করে থাকি। আর স্মরণ করো জাকারিয়ার কথা, যখন সে তাঁর রবকে আহ্বান করে বলেছিল, “হে আমার রব, আমাকে একা রাখবেন না, আপনি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।” অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। তাঁরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তাঁরা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতিসঙ্গে এবং তাঁরা ছিলেন আমার নিকট বিনীত।”^{১৫}

প্রিয় নবি ﷺ সর্বদা আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতেন। বিনয়াবনত হয়ে কায়মনোবাক্যে দোয়া করতেন মহান রবের দরবারে। বিশেষ করে যখন কোনো বিপদের সম্মুখীন হতেন, অতিশয় কাকুতিমিনতি সহকারে আল্লাহর দরবারে হাত পাততেন।

বদর যুদ্ধের দিন তিনি প্রাণভরে মুনাজাত করেছিলেন মহান রবের সমীপে। দেহ-মন উজাড় করে তিনি নিজের জন্য এবং মুমিনদের জন্য সাহায্যের নিবেদন করেছিলেন। উমর বিন খাত্তাব রাঃ বলেন, ‘বদর যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ সঃ কিবলামুখী হয়ে দুহাত প্রসারিত করে মহান আল্লাহর দরবারে উচ্চস্বরে দোয়া করেন—

اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ
الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ

‘হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়ন করুন। হে আল্লাহ, আপনি আপনার ওয়াদা পূর্ণ করুন। হে আল্লাহ, আপনি যদি ইসলামের ছোট্ট এই কাফেলাটিকে ধ্বংস করে দেন, পৃথিবীতে আর আপনার ইবাদত করা হবে না।’

তিনি কিবলামুখী হয়ে দুহাত প্রসারিত করে এভাবে উচ্চস্বরে দোয়া করতে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায়। আবু বকর রাঃ এসে চাদরটি নিয়ে তাঁর কাঁধে তুলে দেন। তারপর পেছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ‘হে আল্লাহর নবি, রবের সমীপে আপনার এতটুকু দোয়াই যথেষ্ট। তিনি নিশ্চয় আপনার সঙ্গে তাঁর কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবেন।’^{১৬}

❖ আল্লাহর স্মরণে ভয়, কান্না ও রোনাজারি

আল্লাহ তাআলা নবিদের প্রশংসা করে বলেন :

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا
مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى
عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا^{১৭}

‘এঁরাই তাঁরা, নবিদের মধ্যে যাঁদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আদমের বংশ হতে ও যাঁদের আমি নুহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ

১৬. সহিহ মুসলিম : ১৭৬৩।

১৭. এটি আয়াতে সিজদা। তিলাওয়াতকারীর ওপর সিজদা করা ওয়াজিব।

করিয়েছিলাম এবং ইবরাহিম ও ইসরাইলের বংশোদ্ভূত ও যাদের আমি পথনির্দেশ করেছিলাম আর মনোনীত করেছিলাম; যাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত তিলাওয়াত করা হলে তাঁরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ত্রন্দন করতে করতে।^{১৮}

মানুষের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলতেন :

وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي

‘আল্লাহ কসম, আশা করি, তোমাদের মধ্যে আমিই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং বর্জনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে সবার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখি।’^{১৯}

প্রিয় নবি ﷺ প্রায়ই দোয়ায় বলতেন :

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

‘হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন।’^{২০}

❖ আল্লাহর মারিফাত অর্জনে নবিদের অনুসৃত পন্থার অনুসরণ

আল্লাহ তাআলা নবি-রাসুলগণকে স্বীয় মারিফাত দ্বারা ধন্য করেছেন। দান করেছেন পরিপূর্ণ ইমান ও অবিচল বিশ্বাস। মানুষের মধ্যে তাঁরাই আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী।

বান্দা যত বেশি আল্লাহকে জানবে, তত বেশি তাঁকে ভয় পাবে, ভালোবাসবে, সম্মান করবে, তাঁর সামনে বিনয়াবনত হবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ইবাদত করবে।

১৮. সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৮।

১৯. সহিহুল বুখারি : ২০, সহিহ মুসলিম : ১১১০। বর্ণনাটি আয়িশা র.এর সূত্রে মুসলিম থেকে উদ্ধৃত।

২০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫২২। উম্মে সালামাহ র.এ থেকে বর্ণিত। ইমাম তিরমিজি র.এ হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন।

ইবনুল কাইয়িম رحمہ اللہ বলেন, ‘দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য ও সাফল্যের অধিকারী হতে হলে নবিদের অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। তাঁদের কথা ও কর্মই ভালো ও মন্দ নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি। তাঁদের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কোনো উপায় নেই।’

বিশুদ্ধ জ্ঞান, সঠিক কর্ম ও উত্তম চরিত্রের একমাত্র উৎস নবিদের সিরাত এবং তাঁদের ওপর অবতীর্ণ ওহি। তাঁদের কথা, কর্ম ও চরিত্রের কষ্টিপাথরে বিচার করা হবে পৃথিবীর যাবতীয় কথা, কর্ম ও চরিত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি। তাঁদের অনুসরণের মাপকাঠিতেই নির্ণয় করা হবে কারা সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং কারা পথভ্রষ্ট।

জীবের জন্য জীবনের, রুহের জন্য হায়াতের কিংবা চোখের জন্য দৃষ্টির যতটা না প্রয়োজন, মানুষের মুক্তির জন্য নবিদের তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন। যত প্রয়োজনই আপনি কল্পনা করুন না কেন, বান্দার নাজাতের জন্য রাসুলের প্রয়োজন তার চেয়ে সর্বদা অধিক হবে।

ওই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কী ধারণা, জীবনপথে চলতে গিয়ে যার পদচিহ্ন আপনার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেলে কিংবা যার নির্দেশনা ও কর্মপন্থা এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হলে আপনার অন্তর সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, ডাঙায় তোলা মাছের ন্যায় ছটফট করে কিংবা গনগনে উনুনে বসানো কড়াইয়ে রাখা জীবন্ত মাছের ন্যায় তড়পাতে থাকে!

বান্দার হৃদয় যখন রাসুলের আনীত শরিয়ত থেকে বিচ্যুত হয়, তার অবস্থা ওই মাছের চেয়েও বহুগুণে খারাপ হয়। তবে জীবন্ত অন্তরই কেবল তা উপলব্ধি করতে পারে। মৃত মানুষ কি আঘাতের ব্যথা অনুভব করতে পারে?

যেহেতু বান্দার উভয় জাহানের সাফল্য নির্ভর করে রাসুল ﷺ-এর অনুসরণের ওপর, তাই যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ চায়, সৌভাগ্যবান হতে ভালোবাসে এবং আখিরাতে নাজাত কামনা করে—তার জন্য রাসুল ﷺ-এর সিরাত জানা এবং তাঁর আনীত শরিয়তের জ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য; যাতে সে মূর্খ ও অজ্ঞদের ভিড় থেকে বের হয়ে রাসুল ﷺ-এর অনুসারীদের দলে शामिल হতে পারে।

মানুষের মধ্যে কেউ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করে, কেউ অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করে, আবার কেউ অনুসরণের নিয়ামত থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়। এটি আল্লাহরই অনুগ্রহ—যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।’^{২১}

রাসুল ﷺ-এর অনুসরণ কেন করব?

❖ পরিপূর্ণ মানুষের আদর্শ নমুনা

আল্লাহ তাআলা আপন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে তাঁকে নির্বাচন করেছেন এবং আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন মানবজাতির সামনে। আল্লাহ তাআলার নিখুঁত তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে তাঁর পূত-পবিত্র জীবন। তাই তাঁর মুবারক সিরাত সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অতীব জরুরি। কেননা, তাঁর জীবনাদর্শের অনুসরণই মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়।

❖ আল্লাহ তাআলার নির্দেশ

নবি-রাসুলের অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

‘তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’^{২২}

অন্য আয়াতে বলেন :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

২১. জাদুল মাআদ : ১/৬৯।

২২. সূরা আল-আহজাব, ৩৩ : ২১।

‘সুতরাং যারা রাসুলের আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের ওপর নেমে আসবে বিপর্যয় অথবা আপত্তিত হবে মর্মভ্রদ শাস্তি।’^{২৩}

❖ নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ জীবনের অধিকারী

আল্লাহ তাআলা তাঁকে সব ধরনের পাপ ও পদস্ফালন থেকে হিফাজত করেছেন। সামান্য অসংগতির ওপরও তিনি কখনো স্থির থাকেননি। এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সত্তাই অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্য।

❖ শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে ভরপুর

মানবজীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্দেশনা ছড়িয়ে আছে সিরাতুন্নবির পরতে পরতে। ইমান ও তাওহিদ, সততা ও সচ্চরিত্র, আদব ও শিষ্টাচার, সবর ও শোকর, দাওয়াত ও জিহাদ—এককথায় দীন ও দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ে আপনি পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন তাঁর জীবনে।

❖ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ সাফল্য ও বিজয়ের পূর্বশর্ত

আমরা যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম ও শিষ্টাচারের অনুসরণ না করি, তবে কখনো বিজয় ও সাফল্য লাভ করতে পারব না।

❖ নবিজীবনের প্রতিটি দিকই অনুকরণীয়

রাসুলুল্লাহ ﷺ কি সন্তানের জনক ছিলেন না? তাঁর কি স্ত্রী ছিল না? তাঁর কি ভাই ছিল না? তাঁর কি বন্ধু ছিল না? তিনি কি শাসক ছিলেন না? তিনি কি নেতা ছিলেন না? আল্লাহ তাআলা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবি-ব্যক্তিত্বকে কি আমাদের জন্য আদর্শ বানাননি?

❖ অনুসরণের তাগিদেই সিরাত অধ্যয়ন

রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করতে হলে প্রথমে আপনাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে—

- কীভাবে আপনি তাঁর নির্দেশিত পথে চলবেন?
- তাঁর সুন্নাহর অনুসরণের রূপরেখা কী?
- রাসুলুল্লাহ ﷺ মানবজাতির জীবনাদর্শ হওয়ার তাৎপর্য কী?

আর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হলে আপনাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে আর একাত্ম হতে হবে তাঁর চিন্তা-চেতনার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে। সর্বোপরি ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনে বিভিন্ন শ্রেণির, পেশার, অঞ্চলের ও বৈশিষ্ট্যের মানুষের সঙ্গে তাঁর আচরণবিধি কেমন ছিল, তা জানতে হবে।





❦ [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ] ❦

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণের বিভিন্ন দিক

সিরাতুন্নবির গবেষকমাত্রই এ কথা উপলব্ধি করতে পারেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন যাবতীয় সৎ গুণ ও শিষ্টাচারের আধার। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবানরা যেসব মানবিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, তার সবগুলো পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল রাসুল ﷺ-এর চরিত্রে।

সচরিত্রের আদর্শ নমুনা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

‘নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।’^{২৪}

কুরআনই ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র।^{২৫} যে বিষয়ে কুরআন সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, তিনিও করতেন আর যে বিষয়ে কুরআন কঠোর হয়েছে, তিনিও হতেন। তিনি স্বভাবগতভাবেই অশালীন ছিলেন না; আবার স্বেচ্ছায়ও অশালীন কথা ও কর্মে লিপ্ত হতেন না।^{২৬} হাটবাজারে গিয়ে তিনি কখনো হট্টগোল করতেন না। তিনি অনিষ্টের বদলা অনিষ্ট দিয়ে দিতেন না; বরং অনিষ্টকারীকে অন্তর থেকে মাফ করে দিতেন এবং প্রকাশ্যেও তার প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করতেন।^{২৭}

২৪. সূরা আল-কলাম, ৬৮ : ৪।

২৫. সহিহ মুসলিম : ৭৪৬। আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত।

২৬. সহিহুল বুখারি : ৩৫৫৯, সহিহ মুসলিম : ২৩২১। আব্দুল্লাহ বিন আমর ؓ থেকে বর্ণিত।

২৭. সুনানুত তিরমিজি : ২০১৬। আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত। ইমাম তিরমিজি ؒ বলেছেন, ‘হাদিসটি হাসান সহিহ।’

উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই   বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ  -এর চেয়ে উত্তম চরিত্রের কাউকে দেখিনি।’^{২৮}

আনাস   বলেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি নয় বছর রাসুলুল্লাহ  -এর খিদমত করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে কোনো দিন এমন হয়নি—আমি কোনো কাজ করেছি আর তিনি আমাকে বলেছেন, “এই কাজ কেন করেছ?” কিংবা আমি কোনো কাজ করিনি আর তিনি বলেছেন, “এই কাজ কেন করোনি?”’^{২৯}

আনাস   আরেক হাদিসে বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ   সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি আমাকে একটি কাজে পাঠান। আমি বলি, আল্লাহর কসম, আমি যাব না।^{৩০} কিন্তু আমার অন্তরে ছিল, রাসুলুল্লাহ   যে কাজে আমাকে পাঠাচ্ছেন আমি যাব। তারপর আমি বের হয়ে হাঁটতে থাকি। একসময় বাজারে খেলাধুলারত কিছু ছেলেদের পাশ দিয়ে যাই। হঠাৎ রাসুলুল্লাহ   পেছন থেকে আমার ঘাড় ধরেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি হাসছেন। তিনি বলেন :

يَا أُنَيْسُ أَذْهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟

“আদরের আনাস, আমি যেখানে যেতে বলেছিলাম, তুমি কি সেখানে গিয়েছ?”

আমি বলি, “হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি হে আল্লাহর রাসুল!”^{৩১}

২৮. আল-মুজাম্মুল আওসাত লিত তাবারানি : ২৫৭৮। ইবনে হাজার   বলেন, ‘হাদিসটির সনদ হাসান।’ (ফাতহুল বারি : ৫৭৫/৬)

২৯. সহিহুল বুখারি : ২৭৬৮, সহিহ মুসলিম : ২৩১০।

৩০. এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, আনাস   কীভাবে প্রকাশ্যে রাসুলুল্লাহ  -এর হুকুম অমান্য করলেন এবং মিথ্যা কসম খেলেন? আবার রাসুলুল্লাহ  -ই-বা কেন কসম করার পরও তাঁকে ওই কাজে পাঠালেন? এর উত্তরে বলা হবে, তিনি তখন ছোট ছিলেন। শরিয়তের আহকাম তার ওপর প্রযোজ্য ছিল না। (আওনুল মাবুদ)—অনুবাদক।

৩১. সহিহ মুসলিম : ২৩১০।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

‘আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি রুঢ় ও কঠিনচিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত।’^{৩২}

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বলেন, ‘একবার আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যাচ্ছিলাম। তখন তাঁর গায়ে মোটা পাড়ের একটি নাজরানি^{৩৩} চাদর ছিল। এক বেদুইন তাঁর কাছে এসে চাদর ধরে হেঁচকা টান দেয়। আমি দেখি, এই প্রচণ্ড টানের ফলে তাঁর কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে চাদরের পাড়ের দাগ বসে যায়। তারপর সে বলে, “তোমার কাছে আল্লাহর যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলো।” রাসুলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং তাকে কিছু দেওয়ার আদেশ দেন।’^{৩৪}

হায়া ও লজ্জায় তিনি আদর্শ

আবু সাইদ খুদরি رضي الله عنه বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ ﷺ অন্তঃপুরের কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। কোনো অপছন্দনীয় জিনিস তাঁর চোখে পড়লে ব্যাপারটি আমরা তাঁর চেহারা দেখেই^{৩৫} বুঝতে পারতাম।’^{৩৬}

৩২. সূরা আলি-ইমরান, ৩ : ১৫৯।

৩৩. ‘নাজরান’ সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ইয়ামানের সীমান্তবর্তী একটি প্রদেশ।—
অনুবাদক।

৩৪. সহিহুল বুখারি : ৩১৪৯, সহিহ মুসলিম : ১০৫৭।

৩৫. অর্থাৎ অপছন্দনীয় জিনিস দেখলে অত্যধিক হায়া ও শরমের কারণে তিনি মুখে বলতেন না। বরং তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত। এতেই আমরা তাঁর অপছন্দের বিষয়টি বুঝতে পারতাম। (আল-মিনহাজ শারহ সহিহ মুসলিম ইবনি হাজ্জাজ)—অনুবাদক।

৩৬. সহিহুল বুখারি : ৬১০২, সহিহ মুসলিম : ২৩২০।

দয়া ও স্নেহে তিনি আদর্শ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

‘আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।’^{৩৭}

আবু জার রাঃ বলেন, ‘একবার রাসুলুল্লাহ সঃ রাতে সালাত আদায় করেন। একটি আয়াত পড়ে পড়ে সুদীর্ঘ রুকু এবং সিজদা করেন। এভাবে সকাল হয়ে যায়। আয়াতটি হলো—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।”^{৩৮}

সকাল হলে আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তো এই আয়াত পড়ে পড়ে রুকু ও সিজদা করে সকাল করে ফেললেন! তিনি বলেন :

إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ لَأُمَّتِي، وَهِيَ نَائِلَةٌ لِّمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

“আমার উম্মতের জন্য আমার রবের কাছে আমি শাফাআত প্রার্থনা করেছি। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে এই শাফাআতের অধিকারী হবে।”^{৩৯}

মালিক বিন হুওয়াইরিস রাঃ বলেন, ‘একবার আমার গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে আমি রাসুলুল্লাহ সঃ-এর কাছে আসি। আমরা বিশ রাত তাঁর সাহচর্যে থাকি। তিনি খুবই দয়ালু ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। আমাদের মধ্যে তিনি যখন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার আশ্রয় দেখেন, তখন তিনি বলেন :

৩৭. সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১০৭।

৩৮. সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৮।

৩৯. মুসনাদু আহমাদ : ২০৮২১। শাইখ ওআইব আরনাউত রাঃ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ

“তোমরা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। তাদের দ্বীন শেখাও। সালাত আদায় কোরো। যখন সালাতের ওয়াক্ত হবে একজন আজান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়সে যে বড়^{৪০} সে ইমামতি করবে।”^{৪১}

বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তিনি আদর্শ

আয়িশা রা বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ স-এর কোনো সহধর্মিণীর প্রতি আমি অতটা ঈর্ষা বোধ করিনি, যতটা খাদিজার প্রতি করেছি; অথচ তাঁকে আমি দেখিনি। কিন্তু রাসুলুল্লাহ স তাঁর কথা প্রায়শ বলতেন। কখনো বকরি জবাই করে বিভিন্ন অংশে ভাগ করতেন। তারপর খাদিজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। আমি প্রায়ই বলতাম, দুনিয়াতে খাদিজা ছাড়া আর কোনো মেয়ে নেই বুঝি! তিনি খাদিজার প্রশংসা করে বলতেন :

إِنَّهَا كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ

“ও এমন ছিল... এমন ছিল... ওর গর্ভেই আমার সন্তান হয়েছে।”^{৪২}

বিনয় ও নম্রতায় তিনি আদর্শ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

৪০. যখন অন্য সব বৈশিষ্ট্যে সবাই সমান হবে, তখন যে বড় সে-ই ইমাম হবে। ওই দলের সবাই যেহেতু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে সমান, তাই রাসুলুল্লাহ স বয়সের কথা বলেছেন। কারণ, তাঁরা একসঙ্গে হিজরত করেছে, ইসলাম গ্রহণ করেছে, রাসুলুল্লাহ স-এর সান্নিধ্য লাভ করেছে এবং বিশ রাত তাঁর সাহচর্যে কাটিয়েছে। সুতরাং তাঁর থেকে ইলম অর্জনে সবাই সমান। এখন বয়স ব্যতীত প্রাধান্য দেওয়ার উপযোগী আর কোনো বৈশিষ্ট্য রইল না।—অনুবাদক

৪১. সহিহুল বুখারি : ৬২৮, সহিহ মুসলিম : ৬৭৪।

৪২. সহিহুল বুখারি : ৩৮১৮, সহিহ মুসলিম : ২৪৩৫।

‘আর যেসব মুমিন তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি বিনয়ী হও।’^{৪৩}

অর্থাৎ তাদের প্রতি অমায়িক আচরণ করুন এবং নম্রতা প্রদর্শন করুন। আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-কে গরিব মুমিন ও অন্যদের সঙ্গে বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাদের সালাম দিতেন।^{৪৪} একজন সামান্য দাসীও তাঁর হাত ধরে^{৪৫} তাঁকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত।^{৪৬} তিনি নিজ হাতে জুতো সেলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন।^{৪৭} ছাগলের দুধ দোহন করতেন।^{৪৮} ফকির-মিসকিনদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন।^{৪৯} গরিব ও এতিমদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে চলাফেরা করতেন।^{৫০} কেউ তাঁকে ডাকলে নির্দিধায় সাড়া দিতেন—তা যত তুচ্ছ কাজে হোক না কেন। তিনি অসুস্থদের খোঁজখবর করতেন। জানাজায় হাজির হতেন। গাধায় সওয়ার হতেন। গোলামের ডাকেও সাড়া দিতেন।^{৫১}

বীরত্বে তিনি আদর্শ

আলি ﷺ বলেন, ‘বদরের দিন যখন যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করল, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আশ্রয় নিলাম। সেদিন তিনিই ছিলেন আমাদের মাঝে সবচেয়ে তীব্র আক্রমণকারী এবং তিনিই ছিলেন মুশরিকদের সবচেয়ে নিকটে।’^{৫২}

৪৩. সূরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২১৫।

৪৪. সহিহুল বুখারি : ৬২৪৭, সহিহ মুসলিম : ২১৬৮। আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত।

৪৫. হাত ধরা থেকে এখানে উদ্দেশ্য হলো নম্রতা ও আনুগত্য। অর্থাৎ দাসী তাঁকে যেখানেই নিয়ে যেতে চাইত, তিনি তাকে অনুসরণ করে সেখানে চলে যেতেন। (ফাতহুল বারি)—অনুবাদক।

৪৬. মুসনাদু আহমাদ : ১১৫৩০। বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ইমাম বুখারি ﷺ কিতাবুল আদাবে এই হাদিসটি তালিকান উল্লেখ করেছেন।

৪৭. মুসনাদু আহমাদ : ২৪২২৮। আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৮. মুসনাদু আহমাদ : ২৫৬৬২। আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৯. দেখুন, সহিহ মুসলিম : ২৪১৩।

৫০. সুনানুন নাসায়ি : ১৪১৪। আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা ﷺ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : সহিহ।

৫১. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৩২৮।

৫২. মুসনাদু আহমাদ : ১০৪৫। হাদিসের মান : সহিহ।

বারা বিন আজিব ؓ বলেন, ‘যখন যুদ্ধের প্রচণ্ডতা চলে আসত, আমরা রাসুল ﷺ-এর পেছনে আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মাঝে তারাই ছিল বীর, যারা তাঁর সাথে সামনে এগিয়ে যেতেন।’^{৫৩}

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর। সবচেয়ে বেশি মহানুভব। সবার চেয়ে বেশি বীরত্বের অধিকারী। একরাতে মদীনাবাসী বিকট একটি আওয়াজ শুনল। সবাই আওয়াজের উৎসের দিকে দৌড়াতে লাগল। পথেই রাসুল ﷺ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি তখন ওদিক থেকে ফিরছিলেন, সবার আগেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তখন তিনি আবু তালহার পালানবিহীন একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর ঘাড়ে তলোয়ার। তিনি বলছিলেন, “ভয়ের কিছু নেই। তোমরা নির্ভয় হও।” এরপর বললেন, “এ ঘোড়াটিকে আমি সাগরের (শ্রোতের) মতো গতিশীল পেয়েছি।” অথচ স্বাভাবিকভাবে ঘোড়াটির গতি ছিল ধীর।’^{৫৪}

এটি নবিজি ﷺ-এর একটি মুজিজা। স্বাভাবিকভাবে ঘোড়াটি ধীরগতির হলেও তিনি চড়ার পর সেটি দ্রুতগামী হয়ে গেল। এমনকি সমুদ্রের শ্রোতের চেয়েও দ্রুত চলতে লাগল। যে ঘোড়াটি সবার পেছনে থাকত, সে ঘোড়ায় চড়েই রাসুল ﷺ সবার আগে, সবার অগোচরে সবকিছু যাচাই করলেন—আবার ফিরেও এলেন।

দান ও মহানুভবতায় তিনি আদর্শ

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বাধিক দানশীল। রমাজান মাসে তাঁর দানশীলতা অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেড়ে যেত। তখন জিবরাইল ؑ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর জিবরাইল ؑ রমাজান মাসের প্রত্যেক রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁরা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতে। রাসুল ﷺ ছিলেন প্রবহমান বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল।’^{৫৫}

৫৩. সহিহ মুসলিম : ১৭৭৬।

৫৪. সহিহল বুখারি : ২৯০৮, সহিহ মুসলিম : ২৩০৭।

৫৫. সহিহল বুখারি : ৬, সহিহ মুসলিম : ২৩০৮।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ   বলেন, ‘নবিজি  -এর কাছে কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো না বলতেন না।’^{৫৬}

আনাস বিন মালিক   বলেন, ‘ইসলামের নাম করে রাসুল  -এর নিকট কিছু চাওয়া হলেই তিনি দিয়ে দিতেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসলো। দুপাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান ভরে যায়—এ পরিমাণ ছাগল তিনি তাকে দান করলেন। সে তার কওমের নিকট ফিরে গিয়ে বলল, “হে আমার গোত্র, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। মুহাম্মাদ এত বেশি দান করেন যে, তাঁর অভাবের কোনো ভয় নেই।”’^{৫৭}

আল্লাহ্‌ভীতিতে তিনি আদর্শ

মুতাররিফ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘আমি রাসুল  -কে দেখলাম, তিনি নামাজ পড়ছেন আর তাঁর সিনা থেকে জাঁতা পেষার শব্দের মতো কান্নার আওয়াজ আসছে।’^{৫৮}

ইবনে আব্বাস   বর্ণনা করেন, ‘আবু বকর   বলেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন!” রাসুল   উত্তর দিলেন, “আমাকে হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতা সা-আলুন এবং ইযাশ শামছু কুওয়িরাত বুড়ো বানিয়ে ফেলেছে।”’^{৫৯} (অর্থাৎ এসব সুরায় বর্ণিত কিয়ামত ও আজাবের আলোচনা আমাকে বুড়ো বানিয়ে ফেলেছে।)

দুনিয়াবিমুখতায় তিনি আদর্শ

একবার উমর   রাসুল  -এর নিকট আসেন। তিনি তখন চাটাইয়ের ওপর শায়িত। তাঁর শরীর ও চাটাইয়ের মাঝখানে কিছুই ছিল না। মাথার নিচে আঁশভর্তি চামড়ার একটি বালিশ। মাথার কাছে ঝুলছে কয়েকটি কাঁচা চামড়া। উমর   বলেন, ‘আমি দেখলাম, তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে।

৫৬. সহিহুল বুখারি : ৬০৩৪, সহিহ মুসলিম : ২৩১১।

৫৭. সহিহ মুসলিম : ৩৩১২।

৫৮. সুনানু আবি দাউদ : ৯০৪। হাদিসের মান : সহিহ।

৫৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩২১৯। হাদিসের মান : সহিহ।

এ অবস্থা দেখে আমি কেঁদে ফেললাম।’ রাসুল ﷺ বলেন, ‘কাঁদছ কেন?’ আমি বলি, ‘হে আল্লাহর রাসুল, কাইসার ও কিসরা কত আরামে আছে! অথচ আপনি আল্লাহর রাসুল।’ তিনি বললেন, ‘তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখিরাত!’^{৬০}

যখন তিনি সাহাবিদের দুনিয়া ত্যাগের প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং আখিরাতের সাথে সম্পর্ক গড়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করছেন, তখনও তিনি হজ করছিলেন (উটের পিঠে) একটি পুরাতন জিন ও পালানে বসে; পশমি একটি চাদর ছিল তাঁর গায়ে, যার মূল্য চার দিরহামের মতো।^{৬১}

আল্লাহর ওয়াদার ওপর অবিচলতায় তিনি আদর্শ

ইসহাক ﷺ বর্ণনা করেন, বারা ﷺ-কে জনৈক ব্যক্তি বলে, ‘হে আবু আম্মারাহ, আপনারা হুнайনের দিন পলায়ন করেছিলেন!’ বারা ﷺ উত্তর দেন, ‘না। আল্লাহর শপথ, নবিজি ﷺ পলায়ন করেননি। বরং প্রথম সারির লোকেরা পলায়ন করেছিল। হাওয়াজিনের তিরসমূহ পাকড়াও করেছিল তাদের। রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর সাদা খচ্চরের ওপরে ছিলেন, যার লাগাম ছিল আবু সুফইয়ান বিন হারিস ﷺ-এর হাতে। নবিজি ﷺ আবৃত্তি করছিলেন :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

“নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর নবি। আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান আমি।”^{৬২}

সবর ও ক্ষমায় তিনি আদর্শ

তাওরাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, ‘তিনি রুঢ় নন—কঠোর নন। তিনি বাজারে বাজারে উচ্চস্বরে হইচইকারী নন। তিনি মন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিহত করেন না। বরং ক্ষমা ও মার্জনা করেন।’^{৬৩}

৬০. সহিহুল বুখারি : ৪৯১৩, ৫৮৪৩; সহিহ মুসলিম : ১৪৭৯।

৬১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৮৯০। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : সহিহ।

৬২. সহিহুল বুখারি : ২৮৬৪, সহিহ মুসলিম : ১৭৭৬।

৬৩. সহিহুল বুখারি : ২১২৫। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﷺ থেকে বর্ণিত।

তাওবা ও ইসতিগফারে আদর্শ তিনি

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ বলেছেন, “আল্লাহর শপথ, আমি দিনে সত্তরবারেরও অধিক তাওবা করে থাকি।”^{৬৪}

ইবাদতে তিনি আদর্শ

আয়িশা রাঃ বলেন, ‘নবিজি সঃ রাত জেগে এত বেশি নামাজ পড়তেন যে তাঁর পা ফুলে যেত।’ আয়িশা রাঃ তাঁকে বলতেন, ‘আপনি কেন এমন করেন হে আল্লাহর রাসুল? আপনার তো আগে-পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।’ তিনি বলতেন, ‘আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাইব না!’^{৬৫}

উবাইদ বিন উমাইর রাঃ হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি আয়িশা রাঃ-কে বলেন, ‘রাসুল সঃ-এর কোন বিষয়টি আপনার সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লেগেছে?’ এই প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, ‘এক রাতে তিনি আমাকে বললেন, “হে আয়িশা, আমাকে ছাড়া। এ রাতে আমি আল্লাহর ইবাদত করব।” আমি বললাম, “আল্লাহর শপথ, আমি আপনার নৈকট্য ভালোবাসি এবং ওই জিনিসকেও ভালোবাসি, যা আপনাকে আনন্দিত করে।” তারপর তিনি উঠে পবিত্র হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাজে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চিবুক ভিজে গেল। তিনি কাঁদতে থাকলেন। একসময় তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তিনি আরও কাঁদতে লাগলেন। এমনকি একসময় মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। তারপর বিলাল রাঃ ফজরের আজান দিতে এলেন। রাসুল সঃ-কে কাঁদতে দেখে বিলাল রাঃ বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার তো আগে-পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।” তিনি বললেন, “আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? আজ রাতে আমার ওপর একটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যে এ আয়াত তিলাওয়াত করল, কিন্তু এর মর্ম নিয়ে চিন্তা করল না, তার জন্য ধ্বংস।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

৬৪. সহিহুল বুখারি : ৬৩০৭।

৬৫. সহিহুল বুখারি : ৪৮৩৭, সহিহ মুসলিম : ২৮২০।

“নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। (সূরা আলি ইমরান : ১৯০)”^{৬৬}

রমাজান এলে তাঁর নিয়ম ছিল ইবাদতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। এই মাসে তিনি অধিক পরিমাণে সাদাকা করতেন। অধিক তিলাওয়াত, সালাত, জিকির ও ইতিকাফ করতেন।

নফল আমল

কখনো তিনি এত অধিক পরিমাণে নফল সাওম পালন করতে থাকতেন যে, সাহাবিরা বলাবলি করতেন, তিনি মনে হয় আর কোনো দিন সাওম ছাড়বেন না। আবার কখনো তিনি এত দীর্ঘ সময় ধরে নফল সাওম তরক করতেন যে, বলা হতো, তিনি মনে হয় আর নফল সাওম পালন করবেন না। রমাজান ব্যতীত কখনো পূর্ণ মাস রোজা রাখতেন না তিনি। অন্য মাসগুলোর তুলনায় শাবান মাসে বেশি রোজা রাখতেন।^{৬৭} সর্বদা সোমবার ও বৃহস্পতিবারে নফল সাওম পালন করতেন।^{৬৮}

কুরআন তিলাওয়াত

তারতিলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তিনি। বেশি জোরেও নয় আবার একেবারে ধীরেও নয়। বরং প্রতিটি অক্ষর স্পষ্ট করে পড়তেন। প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক করে তিলাওয়াত করতেন। মাদের হরফ টেনে পড়তেন। (الرَّحْمَنُ) আর-রাহমান টান দিয়ে পড়তেন। (الرَّحِيمُ) আর-রাহীম টান দিয়ে পড়তেন।^{৬৯} তিলাওয়াত শুরু করার আগে তিনি (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ) (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ) পাঠ করতেন। কখনো

৬৬. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৬২০। হাদিসের মান : হাসান।

৬৭. সহিহল বুখারি : ১৬৬৯, সহিহ মুসলিম : ১১৫৬।

৬৮. সুনানুত তিরমিজি : ৭৪৫, সুনানুন নাসায়ি : ২৩৬১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৭৩৯। আয়িশা রা থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : সহিহ।

৬৯. সহিহল বুখারি : ৫০৪৬।

(وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) পাঠ করতেন।^{৭০} তাঁর নির্দিষ্ট একটি হিজব^{৭১} ছিল। যা তিনি নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন।

দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, অজু অবস্থায় এমনকি অজু না থাকা অবস্থায়ও তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কেবল গোসল ফরজ হলেই কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকতেন।^{৭২}

আল্লাহর জিকিরে তিনি আদর্শ

সৃষ্টিজগতের মধ্যে তিনিই পূর্ণাঙ্গ জিকিরকারী ছিলেন। সর্বদা তিনি আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন। বসে, দাঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতে, আরোহী অবস্থায়, ভ্রমণকালে, যাত্রাবিরতিতে—এককথায় তাঁর কোনো সময়ই জিকির ছাড়া কাটত না।

সালাত, সাওম ও বিবাহে রাসুল ﷺ-এর অনুসরণের আহ্বান

আনাস বিন মালিক রাঃ বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সঃ-এর ইবাদত সম্পর্কে জানতে তিনজন সাহাবি তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে এলেন। তাদের যখন এ বিষয়ে জানানো হলো, তারা এটিকে কেমন যেন কম মনে করলেন। তারা বললেন, “কোথায় নবি আর কোথায় আমরা! তাঁর তো পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।”

তাদের একজন বললেন, “আমি এখন থেকে নিয়মিত সারা রাত নামাজ পড়ব।” আরেকজন বললেন, “আমি এখন থেকে টানা রোজা রাখব, কখনো রোজা ছাড়ব না।” তৃতীয় জন বললেন, “আমি নারী থেকে দূরে থাকব। কখনো বিবাহ করব না।”

তারপর রাসুল সঃ তাদের কাছে এলেন। তাদের বললেন, “তোমরাই কি এমন এমন কথা বলেছিলে? আরে তোমাদের চেয়ে তো আমিই আল্লাহকে

৭০. সুনানু আবি দাউদ : ৭৭৫, সুনানুত তিরমিজি : ২৪২, সুনানুন নাসায়ি : ৮৯৯। আবু সাইদ আল-খুদরি রাঃ। হাদিসের মান : সহিহ।

৭১. হিজব মানে কুরআনের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ, যা প্রতিদিন তিলাওয়াত করা হয়।

৭২. জাদুল মাআদ : ১/৪৮২।

বেশি ভয় করি। তোমাদের তুলনায় আমি অনেক বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু তবুও আমি কখনো রোজা রাখি, কখনো ছাড়ি। কখনো নামাজ পড়ি, কখনো বিশ্রাম নিই। নারীদের বিবাহও করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।”^{৭৩}

ইবনে হাজার رحمہ اللہ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘যে আমার (রাসুল ﷺ-এর) পথ পরিত্যাগ করে অন্যের পথ অবলম্বন করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নবিজি ﷺ-এর সুন্নাহ উদার ও ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি সাওম না রেখে শক্তি সঞ্চয় করতেন, যেন পরে সাওম পালন করতে সক্ষম হন। তিনি ঘুমোতেন, যেন কিয়ামুল লাইল আদায় করতে সক্ষম হন। কামনা দমন, আত্মার পরিশুদ্ধি এবং বংশবৃদ্ধির জন্য তিনি বিয়ে করতেন।

এই হাদিস থেকে আমরা দুটি শিক্ষা পাই। প্রথমটি হলো, বড়দের অনুসরণ করার আগে তাঁদের অবস্থান যাচাই করা উচিত। আর অপরটি হলো, কেউ যদি কোনো নেক কাজের প্রতিজ্ঞা করে, তবে রিয়ার আশঙ্কা না থাকলে প্রয়োজনে তা প্রকাশ করা যায়।^{৭৪}

হজের ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ

যেসব ইবাদতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য ও অনুসরণের ছাপ সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, সেগুলোর অন্যতম হলো হজ। হজের ব্যাপারে নবিজি ﷺ তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়ে বলেন, ‘তোমরা (আমাকে দেখে) হজের নিয়মকানুন শিখে নাও। জানি না, এই হজের পরে আমি আর হজ করতে পারব কি না।’^{৭৫}

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কেবল অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করলেই যথেষ্ট হবে না; বরং তাঁর আনুগত্যের পরিধি আরও ব্যাপক—যা তাঁর জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে ধারণ করে। এ ব্যাপারে তাঁর অনুসৃত জীবনপদ্ধতিই মুমিনের জন্য অনুসরণীয়, যা বিশুদ্ধতায় পরিপূর্ণতাকে স্পর্শ করতে পেরেছে।

৭৩. সহিহুল বুখারি : ৫০৬৩, সহিহ মুসলিম : ১৪০১।

৭৪. ফাতহুল বারি : ৯/১০৬।

৭৫. সহিহ মুসলিম : ১২৯৭।

খাবার ও পানীয়ের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিল, তিনি উপস্থিত খাবার ফিরিয়ে দিতেন না। অন্য খাবার আনতে বলতেন না। কোনো হালাল খাদ্য পেশ করা হলেই খেয়ে নিতেন। কখনো খাবারের দোষত্রুটি বের করতেন না। মন চাইলে খেতেন, নইলে বিরত থাকতেন।^{৭৬}

এক চাঁদ গিয়ে আরেক চাঁদ আসে। সেটি চলে গিয়ে তৃতীয় চাঁদও উদিত হয় আকাশে। অথচ তাঁর ঘরে চুলোয় আগুন জ্বলে না। খাবার রান্নার কোনো আয়োজন হয় না।^{৭৭}

যখন তাঁর সামনে খাবার পরিবেশন করা হতো, বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতেন। খাওয়া শেষে বলতেন :

اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ، وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ، وَأَخْيَيْتَ، فَلَكَ
الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ

‘হে আল্লাহ, আপনি (আমাকে) আহার করালেন, আপনি পান করালেন, আপনি অভাবমুক্ত করেছেন, আপনি সম্পদশালী করেছেন, আপনি পথ দেখালেন, আপনি জীবন দান করেছেন। আপনি যা দান করেছেন, তার জন্য আপনারই প্রশংসা (আদায় করছি)।’^{৭৮}

‘কারও বাড়িতে মেহমান হলে পানাহার শেষে মেজবানের জন্য দোয়া না করে সেখান থেকে বের হতেন না।’^{৭৯}

যখন যা মিলত, তা-ই খেতেন। খাবারের ব্যবস্থা না থাকলে, সবর করতেন। কখনো ক্ষুধার তীব্রতায় পেটে পাথর বাঁধতেন। ছোট হোক বা বড়, আজাদ হোক বা গোলাম, মুহাজির হোক বা গৈয়ো—কেউ খাওয়াতে চাইলে তিনি অবজ্ঞা করতেন না।^{৮০}

৭৬. দেখুন, সহিহুল বুখারি : ৩৫৬৩, সহিহ মুসলিম : ২০৬৪।

৭৭. দেখুন, সহিহুল বুখারি : ২৫৬৭, সহিহ মুসলিম : ২৯৭২।

৭৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৬১৫৯। হাদিসের মান : সহিহ।

৭৯. সহিহ মুসলিম : ২০৪২। আব্দুল্লাহ বিন বুসর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

৮০. দেখুন, জাদুল মাআদ : ১/১৪৭।

শয়নে ও জাগরণে তিনি আদর্শ

ঘুমের প্রয়োজন হলে তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। ভরপেটে তিনি শুতেন না। যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, ডান হাত মাথার নিচে রেখে বলতেন :

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

‘হে আল্লাহ, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনর্জীবিত করবে, সেদিন আমাকে তোমার আজাব থেকে রক্ষা করো।’^{৮১}

ভোর রাতে মোরগ ডাকার আওয়াজের সঙ্গে তিনি জেগে উঠতেন। আল্লাহর প্রশংসা করতেন, তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা করতেন। কালিমা পড়তেন এবং দোয়া করতেন। তারপর মিসওয়াক করে অজু সেরে রবের সামনে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। ভয় ও আশা নিয়ে মগ্ন হতেন প্রভুর সঙ্গে নিবিড় আলাপে। প্রশংসা করতেন গভীর মনোযোগে।

কখনো ঘুমাতে বিছানায়, কখনো চাটাইয়ে, কখনো-বা মাটিতে। আবার কখনো খাটে।^{৮২}

উচ্চারণে, মৌনতায়, হাসি-কান্নায় তিনি আদর্শ

কথা বলতেন সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায়। কেউ চাইলে শব্দগুলো অনায়াসে গুনে ফেলতে পারবে। এত দ্রুত বলতেন না, যাতে শ্রোতার মনে রাখতে কষ্ট হয়। আবার এত আন্তেও বলতেন না, যাতে কথার মাঝে অসংখ্য বিরক্তিকর ছেদ পড়ে। বরং তাঁর বাকরীতি ছিল পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

বোঝার সুবিধার্থে তিনি একই কথা তিনবার বলতেন। সালাম করলেও তিনবার করতেন।^{৮৩}

তিনি দীর্ঘ সময় ধরে মৌনতা অবলম্বন করতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। কথা বলতেন জাওয়ামিউল কালিম তথা সর্বমর্মী ও সারগর্ভ ভাষায়।

৮১. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৯৮। হুজাইফা বিন ইয়ামান রাঃ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : সহিহ।

৮২. দেখুন, জাদুল মাআদ : ১/১৫৫ ও ৪/২৪৬।

৮৩. সহিহুল বুখারি : ৯৪। আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত।

পরিমিত বাক্যে—বেশিও নয়, আবার কমও নয়। অর্থহীন কোনো বিষয়ে তিনি মুখ খুলতেন না। কেবল তা-ই বলতেন, যার দ্বারা তিনি সাওয়াবের আশা করতেন। যখন কোনো কিছু তাঁর অপছন্দ হতো, তাঁর চেহারা দেখেই তা বোঝা যেত।

তাঁর অধিকাংশ হাসিই ছিল মুচকি হাসি। বরং কেবল মুচকি হাসিই তিনি হাসতেন। সর্বোচ্চ এতটুকু হাসতেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা যেত।

হাসির কথায় কিংবা অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনক কথায় তিনি হাসতেন।^{৮৪}

তাঁর কান্না ছিল হাসির মতোই মৌন। শব্দ নেই, আওয়াজ নেই। অট্টহাসি কিংবা ফুঁপিয়ে কান্না দুটো থেকেই তিনি ছিলেন অনেক দূরে। তবে তাঁর চোখের ধারা বেয়ে অশ্রু গড়াত। সিনা থেকে জাঁতা পেষার শব্দের মতো মৃদু কান্নার আওয়াজ পাওয়া যেত।

কখনো তিনি কাঁদতেন মৃতের প্রতি অন্তহীন করুণায়। কখনো উম্মতের কল্যাণচিন্তায় কিংবা সুগভীর মায়ায়। কখনো কাঁদতেন আল্লাহর ভয়ে। কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময়ও কাঁদতেন তিনি। শঙ্কা ও ভয়ের পাশাপাশি কালামুল্লাহর প্রতি অত্যধিক অনুরাগ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের কারণে তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারতেন না।

আদরের সন্তান ইবরাহিমের মৃত্যুতে তিনি জারজার কেঁদেছিলেন। এটি ছিল পুত্রের প্রতি হৃদয়ে সঞ্চিত রহমতের বহিঃপ্রকাশ। আপন এক নাতনির মুমূর্ষু অবস্থা দেখেও তাঁর চোখে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল।^{৮৫}

ইবনে মাসউদ রাঃ-এর সুরা নিসার তিলাওয়াত শুনে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়েছিলেন।^{৮৬} উসমান বিন মাজউন রাঃ-এর মৃত্যুতে তিনি কেঁদেছিলেন। একবার সূর্যগ্রহণ হলে তিনি কান্না করেছিলেন। সালাতুল কুসুফ পড়াতে গিয়ে তিনি ফুলে ফুলে কেঁদেছিলেন।

৮৪. জাদুল মাআদ : ১/১৮২।

৮৫. মুসনাদু আহমাদ : ২১২৭২। সে নাতনি ছিলেন উমামা বা উমাইমা বিনতে জাইনাব রাঃ।

৮৬. সহিহুল বুখারি : ৪৫৮৭২, মুসলিম : ৮০০। ইবনে মাসউদ রাঃ বর্ণিত।

একবার তাঁর জনৈক মেয়ের কবরে বসেও তিনি কাঁদেন। কখনো কখনো রাতের নামাজেও তিনি কাঁদতেন।^{৮৭}

বক্তৃতায় তিনি আদর্শ

যখন তিনি বক্তৃতা দিতেন, তাঁর চোখদুটি লাল হয়ে উঠত। স্বর উঁচু হয়ে যেত। তাঁর ক্রোধ প্রবল আকার ধারণ করত। অবস্থা এমন হতো যেন তিনি কোনো সৈন্যদলকে হুঁশিয়ার করছেন। তিনি আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা না করে বক্তৃতা শুরু করতেন না।

তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু ছিল আল্লাহর হামদ, নিয়ামতের প্রশংসা, আল্লাহর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য, ইসলামের আহকাম, আখিরাতের কথা, জান্নাত-জাহান্নাম, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণ ইত্যাদি।

শ্রোতাদের কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই তিনি বক্তব্য রাখতেন। মানুষের অবস্থার দিকে লক্ষ করে কখনো বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতেন—কখনো দীর্ঘ করতেন।^{৮৮}

লেনদেনে তিনি আদর্শ

লেনদেনের বিচারে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর মানুষ।

তিনি বেচাকেনা করেছেন, সরঞ্জাম ভাড়া নিয়েছেন, ভাড়ায় খাটিয়েছেন, অন্যের ব্যবসায় অংশীদারও হয়েছেন।

পূর্বের কোনো ব্যবসার অংশীদার তাঁর কাছে এলে তিনি বলতেন, ‘আপনি আমাকে চেনেন না?’ অংশীদার লোকটি বলত, ‘আপনি আমার ব্যবসার অংশীদার ছিলেন না? কত উত্তম অংশীদার ছিলেন আপনি! আমাকে না কখনো ঠকাতেন, না বিবাদ করতেন!’^{৮৯}

৮৭. জাদুল মাআদ : ১/১৮৩।

৮৮. জাদুল মাআদ : ১/১৯১।

৮৯. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৩৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৮৭। হাদিসের মান : সহিহ।

তিনি হাদিয়া দিতেন। হাদিয়া কবুল করতেন। হাদিয়ার প্রতিদান দিতেন। কোনো কিছু বন্ধক রেখে ধার নিতেন। আবার বন্ধক না রেখেও ধার নিতেন। অন্যের কাছে সরঞ্জাম ধার চাইতেন। নগদে ও বাকিতে ক্রয় করতেন।

যখন কেউ তাঁর কাছ থেকে ধার চাইতেন, তাকে তার চাওয়া থেকে উত্তম কিছু দিতেন। যখন তিনি কারও কাছ থেকে ধার নিতেন, ঠিকমতো পরিশোধ করতেন এবং তার জন্য এই বলে দোয়া করতেন—

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ

‘আল্লাহ তোমার পরিবার-পরিজনে এবং সম্পদে বরকত দান করুন। কর্জের বিনিময় তো এই যে, কর্জদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কর্জ আদায় করা।’^{৯০}

রাসুল ﷺ নিজের মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থান করতেন। তিনি তা আল্লাহর রাস্তায় সাদাকা করে দিয়েছিলেন।

তিনি অপরের জন্য সুপারিশ করতেন। তাঁর কাছেও সুপারিশ করা হতো। রাসুলুল্লাহ ﷺ মহিলা সাহাবি বারিরা ﷺ-কে সুপারিশ করেছিলেন, তিনি যেন মুগিস ﷺ-কে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। বারিরা ﷺ তাঁর সুপারিশ গ্রহণ না করে মুগিস ﷺ-কে ফিরিয়ে দেন। এতে তিনি বারিরার প্রতি মোটেও রাগান্বিত হননি। তাকে তিরস্কারও করেননি। রাসুল ﷺ হলেন আদর্শ ও দৃষ্টান্ত।

রাসুল ﷺ ৮০টিরও অধিক বিষয়ে কসম খেয়েছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে ৩টি বিষয়ে কসম করার আদেশ দিয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় ইনশাআল্লাহ-সহযোগে কসম করতেন। তিনি কসম পূর্ণ করতেন। কসমের কাফফারা দিতেন।

তিনি মজা করতেন। তবে মজা করতে গিয়ে মিথ্যা বলতেন না। তিনি তাওরিয়া বা দ্ব্যর্থবোধক বাক্য বলে কৌতুক করতেন। তবে মিথ্যা বলতেন না।

দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। কুস্তি লড়তেন।

৯০. সুনানুন নাসায়ি : ৪৬৮৩, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৪২। হাদিসের মান : সহিহ।

নিজ হাতে জুতো সেলাই করতেন। নিজ হাতে জামার তালি লাগাতেন। নিজ হাতেই চামড়ার বালতি মেরামত করতেন। ছাগলের দুধ দোহন করতেন, কাপড় কাচতেন, পরিবারের সেবা করতেন। মসজিদ নির্মাণের সময় সাহাবিদের সঙ্গে ইট বহন করতেন। তিনি মেহমান হতেন। মেজবানও হতেন।

রোগীদের সেবা করতেন। জানাজায় উপস্থিত হতেন। খাওয়ার দাওয়াতে যেতেন। বিধবা, মিসকিন ও দুর্বলদের অভাব মোচন করতেন। কবিদের প্রশংসাব্যঞ্জক কবিতা শুনতেন এবং তাদের পুরস্কৃত করতেন।

রোগীর সেবায় তিনি আদর্শ

সাহাবিদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি দেখতে যেতেন। সেবা করতেন। জনৈক ইহুদি গোলাম তাঁর সেবা করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার সেবা করতেন। চাচা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি চাচারও সেবা করতেন, অথচ তিনি ছিলেন মুশরিক। উভয়ের নিকট তিনি ইসলাম পেশ করেন। ইহুদি গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু চাচা ইসলাম কবুল করেননি।

তিনি রোগীর কাছে যেতেন। মাথার পাশে বসতেন। অবস্থা জানতে চাইতেন। বলতেন, ‘কেমন বোধ করছ?’ ডান হাতখানি শরীরে বুলিয়ে দিতেন এবং বলতেন :

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ وَاشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا
شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

‘হে আল্লাহ, মানুষের প্রভু, কষ্ট দূর করুন, সুস্থ করে দিন। আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনি ছাড়া কেউই রোগমুক্ত করতে পারে না। এমনভাবে আরোগ্য দান করুন, যার পরে কোনো রোগ অবশিষ্ট থাকে না।’^{৯১}

স্বভাবজাত রীতিনীতিতেও তিনি আদর্শ

জুতো পরা, চুল আঁচড়ানো, পবিত্র হওয়া, গ্রহণ করা, প্রদান করা ইত্যাদি কাজে তিনি ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। খাওয়া, পান করা, পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে ডান হাতকে প্রাধান্য দিতেন। আর শৌচকার্যে এবং বিভিন্ন কষ্টদায়ক বস্তু সরাতে তিনি বাম হাত ব্যবহার করতেন।

মাথা কামানোর ক্ষেত্রে তাঁর নিয়ম ছিল, হয় মাথার সবগুলো চুল রাখতেন নতুবা পুরোটা কামাতেন বা ছাঁটতেন। কিছু অংশ কামিয়ে বাকিটা ছেড়ে দেওয়া কিংবা কোথাও ছেঁটে ছোট করে, কোথাও বড় করে রাখা—এমনটা করতেন না।

মিসওয়াক করতে ভালোবাসতেন তিনি। সাওম অবস্থায় মিসওয়াক করতেন। সাওম না থাকা অবস্থায়ও মিসওয়াক করতেন। ঘুম থেকে জাগার পর মিসওয়াক করতেন। অজু করার সময় মিসওয়াক করতেন। নামাজের সময় মিসওয়াক করতেন। এমনকি বাড়িতে প্রবেশ করার সময়ও মিসওয়াক করতেন।

তিনি অধিক সুগন্ধি লাগাতেন। সুগন্ধি ভালোবাসতেন। সুগন্ধি হাদিয়া এলে ফিরিয়ে দিতেন না।

তিনি চুল পরিপাটি রাখতে পছন্দ করতেন। কখনো নিজে চুল আঁচড়াতেন। কখনো আম্মাজান আয়িশা ﷺ আঁচড়ে দিতেন।

মুসলিমদের আপন আপন অবস্থার প্রতি নজর দেওয়া উচিত। তারা যেন রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিদের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তথাকথিত কোনো তারকা, অভিনেতা, অভিনেত্রী কিংবা পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের মডেল হিসেবে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ মুসলমানদের নেই।

মাসআলা

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার ব্যাপারে কথা বলা আবশ্যিক। নবিজি ﷺ-এর কোন আমলগুলোর অনুসরণ করতে হবে?

নবিজি ﷺ-এর আমল চারটি ভাগে বিভক্ত

❖ প্রথম প্রকার : স্বভাবজাত কাজ

মানবজাতির একজন সদস্য হিসেবে যেসব কাজ রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তা স্বভাবজাত কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : ওঠাবসা, নড়াচড়া, হাঁটা-চলা, আহার-নিদ্রা ইত্যাদি। এসবের সঙ্গে তাঁর রিসালাত কিংবা শরিয়াহর আদেশ বা নিষেধের কোনো সম্পর্ক নেই।

তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি স্বভাবজাত কোনো কাজকে বিশেষ কোনো আঙ্গিকে নিয়মিত সম্পাদন করেন, তবে তা মুবাহ^{৯২} থেকে মুসতাহাবের পর্যায়ে উন্নীত হবে। যেমন : ডান কাত হয়ে ঘুমানো।

অনুরূপভাবে কোনো স্বভাবজাত কাজকে যদি তিনি বিশেষ কোনো পদ্ধতিতে করার প্রতি উৎসাহিত করেন, তবে সেটাও মুসতাহাব পর্যায়ে উন্নীত হবে। যেমন : তিন শ্বাসে পান করা এবং ডান হাতে খাওয়া।

❖ দ্বিতীয় প্রকার : সমাজ ও গোত্রে প্রচলিত কাজ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোত্রে এবং সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও কাজকর্ম যেগুলোর সঙ্গে শরিয়তের সম্পর্ক থাকার ব্যাপারে কোনো দলিল পাওয়া যায় না—এই ধরনের কাজগুলো এই প্রকারের অন্তর্গত। যেমন : পোশাকের সাথে জড়িত বিষয়গুলো। কেননা, পোশাকের বিষয়টি নগরবাসীর চর্চিত অভ্যাস ও প্রচলিত রীতিনীতির ওপর নির্ভর করে। নবুওয়াতের পূর্বে তিনি যে পোশাক পরতেন, নবি হওয়ার পর তা পাল্টাননি। অবশ্য পুরুষ ও মহিলাদের বেশভূষার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত ও নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁর লম্বা চুল রাখার

৯২. 'মুবাহ'-এর অর্থ হলো, কোনো কাজ করা ও না করা উভয়ই বৈধ হওয়া।

বিষয়টিও প্রচলিত সংস্কৃতির অংশ ছিল। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করাকে সুন্নাত বলা হবে না। কেননা, এসব কাজ শরিয়তভুক্ত করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না এবং এসব আমলকে তিনি ইবাদতের অন্তর্ভুক্তও করেননি।

তবে এই প্রকারের কোনো কাজের ব্যাপারে যদি তাঁর আদেশ কিংবা উৎসাহ পাওয়া যায় অথবা অভ্যাসগত আমলটির সঙ্গে শরিয়াহর সম্পৃক্ততার ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তবে তা আর এই প্রকারে থাকবে না। যেমন : সাদা পোশাক পরা, লুঙ্গিকে নিসফে সাক বা অর্ধজজ্বা^{৯৩} পর্যন্ত উঠিয়ে পরিধান করা ইত্যাদি।

❖ তৃতীয় প্রকার : নবিসত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র কাজ

নবিসত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন স্বতন্ত্র আমল, যা উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়। যেমন : সাওমে বিসাল বা টানা সাওম পালন, একসঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা, বিনা মোহরে বিবাহ করা ইত্যাদি।

❖ চতুর্থ প্রকার : ইবাদতসংক্রান্ত কাজ

যে কাজগুলো রাসুল ﷺ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদত হিসেবে সম্পাদন করেছেন। এসব কাজই উম্মতের জন্য অনুসরণীয়। এই ধরনের কাজ কখনো মুসতাহাব হয়, কখনো সুন্নাত হয়, কখনো-বা ফরজ হয়।

রাসুল ﷺ-এর বর্জিত কাজসমূহ বর্জন করাও অনুসরণের আওতায় পড়ে। কোন কাজগুলো তিনি বর্জন করেছেন, তা জানার পদ্ধতি দুটি :

১. কোনো কাজ বর্জনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যাওয়া—তিনি এই এই কাজ করেননি। যেমন ইদের নামাজের ক্ষেত্রে এক সাহাবির বর্ণনা : রাসুল ﷺ ইদের নামাজ আদায় করতেন আজান ও ইকামত ব্যতীত।^{৯৪}

৯৩. হাঁটু থেকে পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত অংশকে জজ্বা বলে। জজ্বার মাঝামাঝি অংশকে অর্ধজজ্বা বলা হয়েছে। আরবিতে বলা হয় : নিসফুস সাক।

৯৪. সহিহুল বুখারি : ৯৫৯, সহিহ মুসলিম : ৮৮৬, সুনানু আবি দাউদ : ১১৪৭। শব্দউৎস : সুনানু আবি দাউদ।

২. রাসুল ﷺ-এর এমন কোনো কাজ সম্পাদন করার ব্যাপারে বর্ণনা পাওয়া না যাওয়া, যদি তিনি তা করতেন, তবে সাহাবিরা অবশ্যই তা উম্মতের জন্য বর্ণনা করতেন—সাহাবিদের হিম্মত ও প্রকৃতির দাবি এটিই।

যেহেতু বিষয়টি তাঁদের কেউই বর্ণনা করেননি; এমনকি কোনো বৈঠকেও কেউ এ নিয়ে আলোচনা করেননি—সেহেতু বোঝা গেল, কাজটি রাসুলুল্লাহ ﷺ করেননি। যেমন : নামাজ শুরু করার সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ নিয়ত মুখে উচ্চারণ করতেন না। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ যদি কোনো কাজ বর্জন করেন, তবে তা আমাদের জন্য দলিল হয়ে যায়; আমাদেরকেও তা বর্জন করতে হবে। তবে যদি কোনো কাজ বর্জন করার মধ্যে এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে, যার সাথে স্বয়ং তিনি সংশ্লিষ্ট—সে ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। যেমন : তিনি জামাআতে তারাবিহ পড়া বর্জন করেছিলেন। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন এতে তারাবিহ উম্মতের ওপর ফরজ করে দেওয়া হতে পারে। এই ধরনের বিষয়ে কোনো আমল বর্জনের প্রশ্নে তিনি অনুসরণীয় নন। অর্থাৎ কোনো আমল তিনি পরিত্যাগ করেছেন বলে আমরাও পরিত্যাগ করব, বিষয়টা এমন নয়। বরং যে প্রতিবন্ধকতার কারণে তিনি আমলটি করেননি, সেটি যেহেতু এখন বিদ্যমান নেই, তাই আমাদের আমল করতে হবে।



—...◉ দ্বিতীয় অধ্যায় ◉—

পরিবার, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সঙ্গে
রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি



প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বীগণের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি

রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

‘তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’^{৯৫}

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আপন আপন অবস্থানের বিচারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানা সবার জন্য অতীব জরুরি, যাতে তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব হয়।

অতএব, একজন স্বামীর জন্য জানা জরুরি—স্বামী হিসেবে কেমন ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। একজন বিচারকের জন্য জানা জরুরি—ন্যায়বিচারক হিসেবে কেমন ছিলেন তিনি। আর একজন নেতাকে জানতে হবে—নেতা হিসেবে কেমন ছিলেন তিনি।

স্ত্রীদের সাথে আচার-ব্যবহারের বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মতের জন্য প্রোজ্জ্বল নমুনা। দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে একজন স্বামী তাঁর ঘরনির সঙ্গে কীভাবে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিকারী আচরণ করবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় নবিজি ﷺ-এর জীবনে।

পুরো বিষয়টির ওপর আমরা বেশ কয়েকটি দিক থেকে আলোকপাত করব ।
আলোচনাটিকে আমরা ভাগ করেছি তিনটি আলাদা পর্বে :

- ❖ খণ্ডচিত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন ।
- ❖ তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে মুমিন নারীদের আদর্শ হিসেবে
বিনির্মাণ ।
- ❖ নবি-পরিবারে উদ্ভূত সমস্যাবলি ও তার সমাধান ।



প্রথম পর্ব

খণ্ডচিত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন

নবিজি ﷺ-এর মোট স্ত্রী ছিলেন এগারো জন—

১. খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ । ২. আয়িশা বিনতে আবু বকর । ৩. হাফসা বিনতে উমর । ৪. সাওদা বিনতে জামআ আমিরিয়া । ৫. জাইনাব বিনতে জাহাশ আসাদিয়া । ৬. জাইনাব বিনতে খুজাইমা হিলালিয়া । ৭. উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া মাখজুমিয়া । ৮. উম্মে হাবিবা রামলা বিনতে আবু সুফইয়ান উমাবিয়া । ৯. মাইমুনা বিনতে হারিস হিলালিয়া । ১০. জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস মুসতালাকিয়া ও ১১. সাফিয়া বিনতে হুয়াই নাজিরিয়া । رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ ।

মৃত্যুর সময় রাসুল ﷺ নয় স্ত্রী জীবিত রেখে যান । খাদিজা ও জাইনাব বিনতে খুজাইমা ﷺ রাসুল ﷺ-এর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন ।

পূত-পবিত্র স্ত্রীদের নিয়ে এক অনুপম শান্তিময় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন রাসুল ﷺ । এক কথায় তাঁর দাম্পত্য জীবনের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে হলে কুরআনের এ আয়াতটিই যথার্থ— وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ — ‘স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।’^{৯৬} আরবি الْمَعْرُوفِ শব্দটি সব ধরনের ভালো কথা, সুন্দর কাজ ও উত্তম আচরণ ধারণ করে ।

নিঃসন্দেহে স্ত্রীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে রাসুলই হলেন সর্বোত্তম মানুষ । আর কেনই-বা হবেন না; তাঁর মুবারক জবানেই তো উচ্চারিত হয়েছিল—

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

‘তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর স্ত্রীর কাছে উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে আমিই সর্বোত্তম।’^{৯৭}

স্ত্রীদের তিনি মিষ্টি আচরণে আগলে রাখতেন। সুন্দর ব্যবহার ছিল তাঁর সংসার-জীবনের ভূষণ। রাসুল ﷺ-এর সিরাত অধ্যয়নে বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেউ যদি দাম্পত্য জীবনে রাসুল ﷺ-এর অনুসরণ করেন, তবে আজকাল দাম্পত্য জীবনের যে সমস্যাগুলোর কথা শোনা যায়, তার সমাধান হয়ে যাবে সহজেই।

ইদানীং যে ব্যাপক হারে দাম্পত্য জীবনের নানান সমস্যা ও বিপর্যয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা রীতিমতো আশ্চর্যজনক। সাম্প্রতিক জরিপগুলো বলছে, মুসলিম-বিশ্বে তালাকের হার আশঙ্কাজনক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন দিন এই হার বেড়েই চলেছে। ১৪৩০ হিজরিতে সৌদি মন্ত্রণালয়ের চালানো এক জরিপে দেখা যায়, বিয়ের চেয়ে তালাকের হার ২১% বেড়েছে। আর এই তালিকায় রিয়াদের অবস্থান সবার শীর্ষে।^{৯৮}

দাম্পত্য জীবনের এই বিপর্যস্ত অবস্থায় এবং তালাকের হার বৃদ্ধির এই যুগে আমাদের পর্যালোচনা করে দেখতে হবে—কেমন ছিল রাসুল ﷺ-এর পরিবার, স্ত্রীদের প্রতি কেমন ছিল তাঁর আচরণ, তাঁদের অসংলগ্ন আচরণে কীভাবে ধৈর্যধারণ করতেন তিনি এবং কীভাবে এড়িয়ে যেতেন তাঁদের ছোট ছোট ভুলগুলো। বস্তুত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

স্ত্রীদের সঙ্গে প্রতিদিন অন্তরঙ্গ সময় কাটাতে পছন্দ করতেন

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, ‘ফজরের সালাত আদায়ের পর রাসুলুল্লাহ সঃ নামাজের স্থানেই বসতেন। তাঁকে ঘিরে বসত সাহাবিদের জটলা। সূর্য ওঠা অবধি ওখানেই বসে থাকতেন তাঁরা। তারপর একে একে সব কজন স্ত্রীর কাছে যেতেন। তাদের সালাম করতেন। তাদের জন্য দোয়া করতেন। তারপর সেদিন যার পালা হতো তার কাছে চলে যেতেন।’^{৯৯}

৯৭. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫। আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : সহিহ।

৯৮. আল-ওয়াতান অনলাইন : ২০-৩-২০১২।

৯৯. তাবারানি কৃত আল-মুজামুল আওসাত : ৮৭৬৪।

প্রতিদিন দিবসের প্রথম প্রহরে স্ত্রীদের একজনের সঙ্গে সময় কাটাতেন তিনি।
তাকে সালাম করতেন। তার জন্য দোয়া করতেন।

দিনের শেষ প্রহরেও তার কাছে যেতেন। অন্তরঙ্গ হয়ে বসে গল্প করতেন।

আয়িশা রা বলেন, ‘আসরের পর রাসূল স স্ত্রীদের কাছে আসতেন। সবার
সাথে দেখা করে একজনের সাথে একান্তে কাটাতেন।’^{১০০}

একান্তে সময় কাটানো অর্থ হলো, তার সাথে সহবাস করতেন না; তবে আদর
করতেন, চুমু খেতেন।^{১০১}

ইবনে হাজার রা বলেন, ‘সকালবেলা এসে কেবল সালাম দিয়ে ও দোয়া করে
যেতেন। আর বিকেলে এসে বসতেন, আদর করতেন এবং গল্প করতেন।’^{১০২}

আয়িশা রা বলেন, ‘এমন দিন খুব কমই যেত, যেদিন তিনি আমাদের সবার
কাছে আসতেন না। সকল স্ত্রীর সঙ্গেই তিনি অন্তরঙ্গ হতেন। তবে সহবাস
করতেন না। পরিশেষে সেই দিনটি যে স্ত্রীর সাথে কাটাবার পালা থাকত, সে
স্ত্রীর কাছে গিয়ে রাত যাপন করতেন।’^{১০৩}

‘স্ত্রীদের সাথে রাসূল স-এর এ সময় কাটানো ছিল তাদের অন্তর প্রশান্তকারী।
এ সময়টাতে আদর-সোহাগে তাদের মন ভরে দিতেন। শেষমেশ যার
কাছে দিনটা কাটিয়ে দেবেন, তার কাছে গেলেও বাকিদের অন্তর থাকত
প্রশান্তিময়।’^{১০৪} রাসূলুল্লাহ স-এর স্ত্রীগণ কখনো স্বামী থেকে দূরে থাকতেন
না। বরং প্রতিদিন স্বামীর দেখা পেতেন। আর আমাদের অনেকেই তো দিনের
পর দিন স্ত্রীর সাথে দেখা করে না। এমনকি অনেক সময় মাস গড়িয়ে যায়।

অনেককে দেখা যায় প্রতিদিন বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘ আড্ডা দেয়। গভীর রাত
পর্যন্ত গল্পগুজবে মত্ত থাকে। অবশেষে যখন বাড়ি ফেরে, তখন সে ক্লান্ত-

১০০. সহিহুল বুখারি : ৫২১৬, সহিহ মুসলিম : ১৪৭৪।

১০১. উমদাতুল কারি : ৩০/৯২।

১০২. ফাতহুল বারি : ৯/৩৭৯।

১০৩. সুনানু আবি দাউদ : ২১৩৫। হাদিসের মান : সহিহ।

১০৪. কুরতুবি রা কৃত আল-মুফহিম : ১৩/৯০।

শ্রান্ত । ততক্ষণে স্ত্রীও ঘুমিয়ে পড়ে । যথারীতি সে নিজেকেও বিছানায় ছুড়ে দেয় আর তলিয়ে যায় গভীর ঘুমে ।

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো, একাধিক স্ত্রী থাকলে পালা না থাকলেও যেকোনো স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারবে, তাকে স্পর্শ করতে পারবে এবং চুমু খেতে পারবে ।

উক্ত হাদিস থেকে আরও বোঝা গেল, রাসুল ﷺ হলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী । স্ত্রীদের সঙ্গে সুন্দর আচরণেও তিনি ছিলেন সর্বোত্তম ।^{১০৫}

রাতের বেলায় কখনো কখনো স্ত্রীগণ এক ঘরে সমবেত হতেন । রাসুল ﷺ তাদের কাছে এসে একত্রে সময় কাটাতেন । কথা বলতেন ।

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর নয় জন স্ত্রী ছিল । সবার পালা ভাগ করা ছিল । নয় দিন শেষ হওয়ার পূর্বে প্রথম স্ত্রীর পালা আসত না । যেদিন যে স্ত্রীর পালা থাকত, সেদিন রাতে অন্য সকল স্ত্রী তার ঘরে এসে সমবেত হতেন ।’^{১০৬}

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, মুসতাহাব হলো, স্বামী নিজে স্ত্রীদের ঘরে যাবে, নিজের ঘরে তাদের ডেকে পাঠাবে না ।^{১০৭}

হাজারো ব্যস্ততা ও দায়িত্বের বিশাল বোঝা থাকা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের সঙ্গে বিন্দ্র রজনী যাপন করেছেন । তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছেন । তাদের সাথে খোশগল্প করেছেন ।

আয়িশা ؓ একবার উম্মে জার’-এর গল্পটি পাড়লেন রাসুল ﷺ-এর কাছে । গল্পটি হলো, ‘এগারো জন মহিলা একজায়গায় আসর জমাল । তারা সবাই মিলে ঠিক করল, তারা আপন আপন স্বামীর সব বৈশিষ্ট্যের কথা খুলে বলবে—কিছুই গোপন করবে না । যথারীতি তারা নিজ নিজ স্বামীর গুণাগুণ

১০৫. আওনুল মাবুদ : ৬/১২২ ।

১০৬. সহিহ মুসলিম : ১৪৬২ ।

১০৭. ইমাম নববি ؒ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১০/৪৭ ।

বলা শুরু করল। এগারো জনের মধ্যে স্বামীর সবচেয়ে সুন্দর গুণ বর্ণনা করেছিল এবং বেশি সংখ্যক অবদানের কথা বলেছেন উম্মু জার’।

আয়িশা   বলেন, ‘রাসুল   তার কথা শুনে উত্তর দিলেন, “আমি তোমার জন্য তেমন, যেমন উম্মু জার’র জন্য তার স্বামী আবু জার’।”^{১০৮}

স্বামীকে অবশ্যই একটা সময় নির্দিষ্ট করতে হবে স্ত্রীকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য, তার কথা শোনার জন্য। বর্তমানে অধিকাংশ স্ত্রীই অভিযোগ করেন, স্বামীরা তাদের সময় দেয় না।

অনেক স্বামী তো এমন আছে, সারা দিন অফিসে কাজ করে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। একটু ফ্রেশ হয়েই রিমোট নিয়ে বসে টিভি দেখতে। এই অবস্থায় কেটে যায় অর্ধ রাত। এদিকে বিছানায় স্ত্রী অপেক্ষার গ্রহণ গুনে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সে নিজেকে বিছানায় ছুড়ে দেয়। তারপর লাশের মতো বেঘোরে ঘুমায়। কখনো তো এমন হয় যে, রিমোট হাতেই সে ঢলে পড়ে ঘুমের কোলে। বেচারি স্ত্রীর আবেগ-অনুভূতির কোনো পরোয়াই সে করে না।

এমনও কিছু মানুষ আছে, যারা অফিসের ফাইল বাড়িতে নিয়ে আসে। বাড়িতে এসেও ফাইল ঘাঁটতে থাকে। এভাবে তারা বাড়িটাকে অফিস বানিয়ে ফেলে। দিনের বেলা অফিসে এক শিফট। আর রাতের বেলা বাড়ি নামক অফিসে আরেক শিফট। ওদিকে তার জন্য স্ত্রী অপেক্ষা করছে অধীর হয়ে, তার কোনো ভাবান্তর নেই!

আজকাল সবার কাছেই মোবাইল আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ এখন। চাইলেই একজন স্বামী কাজের ফাঁকেই স্ত্রীর কাছে একটা কল দিয়ে একটু সময়ের জন্য হলেও কথা বলে নিতে পারে। কথা না হোক, অন্তত একটা মেসেজ করলেও তো অনেক। স্বামীর একটা কল বা মেসেজ স্ত্রীর পুরো দিনকে সুশোভিত করে তোলে। একটা কল বা মেসেজ করতে আর কতক্ষণ লাগে! এক মিনিটের ভেতরেই তো সেরে ফেলা যায়। এই একটি মিনিটের যোগাযোগ স্ত্রীর জন্য অনেক কিছু—অনেক কিছু।

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীগণের প্রাপ্য জৈবিক চাহিদা পূরণের হক আদায় করতেন

আনাস রূ-বলেন, ‘নবিজি ﷺ একই রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে যেতেন এবং সবার সঙ্গে মিলিত হতেন। তখন রাসুল ﷺ-এর নয় স্ত্রী ছিল।’ কাতাদা রূ-আনাস রূ-কে জিজ্ঞেস করেন, ‘একই রাতে নয় স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সক্ষমতা তিনি রাখতেন?’ আনাস রূ-উত্তর দিলেন, ‘আমরা আলোচনা করতাম, রাসুল ﷺ-এর শরীরে ত্রিশজন যুবকের শক্তি ছিল।’^{১০৯}

ইবনে হাজার রূ-বলেন, ‘রাসুল ﷺ মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর অধিক বিয়ের কারণ ছিল, নারীসংক্রান্ত বিধানগুলো প্রচারে সহায়ক হওয়া। কারণ, নারীর অনেক সমস্যা পুরুষের আড়ালে থেকে যায়। নারীরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিধিবিধান যত সহজে পৌঁছে দিতে পারবে, পুরুষদের জন্য তা সম্ভব ছিল না। রাসুল ﷺ-এর একাধিক বিবাহের এটি অন্যতম কারণ।

এ ছাড়া বহুবিবাহের মাধ্যমে তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মুজিজার প্রকাশ ঘটে। তৃপ্তিভরে খাওয়ার মতো খাবার তাঁর জুটত না। অতিরিক্ত খাবার পেলে বেশির ভাগই তিনি দান করে দিতেন। তিনি বেশি বেশি সাওম পালন করতেন। এমনকি কখনো সাওমে বিসাল বা টানা রোজা রাখতেন। এত কিছু সত্ত্বেও তিনি একই রাতে নয় স্ত্রীর সঙ্গেই মিলিত হতে পারতেন। শারীরিক শক্তির প্রাচুর্য ছাড়া এটি সম্ভব নয়। বহু বিবাহ আরবে বেশ প্রশংসনীয় ছিল। বেশি স্ত্রী পৌরুষের পরিচয় বলে মনে করা হতো। এত স্ত্রী থাকার পরও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদতে কোনো প্রভাব পড়ত না।’^{১১০}

স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, কথাবার্তা কিংবা নৈশগল্পের পথে ইবাদত বাধা হয়ে দাঁড়াত না। আয়িশা রূ-বলেন, ‘নবিজি ﷺ রাতে যখন নামাজ পড়তেন, আমি জেগে থাকলে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন। আর যদি আমি না জেগে থাকি, তাহলে কিয়ামুল লাইল শেষ করে ফজরের আজান পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।’^{১১১}

১০৯. সহিহুল বুখারি : ২৬৮, সহিহ মুসলিম : ৩০৯। শব্দউৎস : সহিহুল বুখারি।

১১০. ফাতহুল বারি : ৯/১১৫।

১১১. সহিহুল বুখারি : ১১৬১।

এমনকি সফরে গেলেও স্ত্রীকে নিয়ে তিনি হাঁটাচলা করতেন, তার সাথে কথা বলতেন। আয়িশা   বলেন, ‘নবিজি   সফরে বের হওয়ার সময় স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন।’^{১১২} একবার আয়িশা ও হাফসার পালা এল সফরে যাওয়ার জন্য। রাতের বেলা নবিজি   আয়িশার সাথে ঘুরে বেড়াতেন। তার সাথে কথা বলতেন।

স্ত্রীদের সঙ্গে মধুর অন্তরঙ্গতাপূর্ণ এ আচরণে কখনো ছেদ পড়েনি—এমনকি যেদিন রাসুল   নতুন কোনো স্ত্রীকে ঘরে তুলে আনতেন, সেদিনও নয়। আনাস   বলেন, ‘নবিজি  -এর সাথে জাইনাব বিনতে জাহাশের বিয়ে হলো। অলিমা হিসেবে রুটি ও গোশত তৈরি করা হলো। আমাকে পাঠানো হলো খাবারের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। আমি মানুষদের দাওয়াত করে আনলাম। একদল আসত, তারা খেয়ে বের হয়ে গেলে অপর দল আসত খাওয়ার জন্য। এভাবে সবাই খেয়ে বের হয়ে গেল। আমি আর ডাকার মতো কাউকে পেলাম না। তখন নবিজি  -কে বললাম, “আল্লাহর নবি, ডাকার মতো আর কেউই বাকি নেই।” তিনি বললেন, “তাহলে তোমাদের বাকি খাবারটা নিয়ে যাও।”...এরপর নবিজি   নতুন স্ত্রীর ঘর থেকে বের হয়ে আয়িশার ঘরে এলেন। তার উদ্দেশ্যে বললেন : ‘السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ’ “ঘরের অধিবাসীর ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।”

আয়িশা   জবাব দিলেন, ‘وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ’—(আপনার প্রতিও আল্লাহ-প্রদত্ত শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।) আপনার নতুন স্ত্রীকে কেমন পেলেন? আল্লাহ আপনার জন্য বরকত দান করুন।”

এভাবে রাসুল   একে একে তাঁর সকল স্ত্রীর ঘরে যান। আয়িশাকে যেমন বলেছিলেন, অন্য সবাইকেও সালাম দিয়ে তা-ই বলেন। আর তারাও আয়িশার মতো উত্তর দেন।^{১১৩}

‘স্ত্রীদের অবস্থা জানার জন্য, তাদের অন্তরকে শীতল করার জন্য, তাঁর নতুন বিয়ে নিয়ে তাদের অন্তরের কেমন অবস্থা বিরাজ করছে, তা জানার রাসুল  

১১২. সহিহুল বুখারি : ৫২১১, সহিহ মুসলিম : ২৪৪৫।

১১৩. সহিহুল বুখারি : ৪৭৯২, সহিহ মুসলিম : ১৪২৮।

তাদের সকলের কাছে গেলেন একে একে। তারাও “আপনার নতুন স্ত্রীকে কেমন পেলেন?” বলে সুন্দর করে জবাব দিলেন।

রাসুল ﷺ-এর নতুন বিয়ে সত্ত্বেও স্ত্রীদের থেকে এমন সুন্দর আচরণ প্রকাশ পাওয়া তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রগাঢ়তা, তাদের সবর, উত্তম আচার-আচরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যথা স্বামীর নতুন বিয়ে তো পূর্বের স্ত্রীর অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে সতিনের প্রতি তুচ্ছ মনোভাব প্রকাশ করে। কিন্তু রাসুল ﷺ ও তাঁর স্ত্রীগণ হলেন উত্তম পুরুষের জন্য উত্তম স্ত্রীর অনুপম উদাহরণ।^{১১৪}

হাদিসটি অন্য এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে, আনাস রাসুল ﷺ বলেন, ‘এরপর রাসুল ﷺ এক এক করে সকল স্ত্রীর কাছে এলেন। তাদের সালাম জানিয়ে বললেন, “সালামুন আলাইকুম। কেমন আছেন?” তারা উত্তর দিলেন, “ভালো, আল্লাহর রাসুল। আপনার স্ত্রীকে কেমন পেলেন?” অতঃপর রাসুল ﷺ জবাব দিলেন, “ভালো...”^{১১৫}

ইমাম নববি রহিম বলেন, ‘এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, যখন কেউ বাড়িতে ফিরে আসে, তখন স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের সালাম দেওয়া মুসতাহাব। কিন্তু অনেক মূর্থ দাষ্টিক অহংকারবশত এ বিধান পালন করে না।

সালাম দেওয়ার সাথে স্ত্রীর কুশলাদি জানতে চাইবে। তার কোনো কিছু প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞেস করবে। কারণ, কখনো কখনো স্ত্রীর কোনো প্রয়োজন থাকলেও মুখ ফুটে বলতে লজ্জা পায়। তাই তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। যাতে স্ত্রী অনায়াসে তার প্রয়োজনের কথা বলতে পারে।^{১১৬}

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের প্রতি বিশ্বস্ত, অধিকার-সচেতন এবং কৃতজ্ঞ ছিলেন

রাসুল ﷺ খাদিজা রহিম-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রশংসা করতেন। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরও তিনি বরাবরই তাঁকে স্মরণ করতেন। তাঁর গুণের কথা বলতেন।

১১৪. কুরতুবি রহিম কৃত আল-মুফহিম : ১৩/১৫।

১১৫. সহিহ মুসলিম : ১৪২৮।

১১৬. ইমাম নববি রহিম কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৯/২২৫।

তাঁর মর্যাদার কথা তুলে ধরতেন। তাঁর হৃদয়ে খাদিজার যে ভালোবাসা ছিল, তা অকপটে প্রকাশ করতেন।

আয়িশা ؓ বলেন, ‘আমি নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে আর কারও প্রতি এতটা ঈর্ষাবোধ করিনি, যতটা করেছি খাদিজা ؓ-এর বেলায়। অথচ তাঁকে আমি দেখিনি পর্যন্ত। রাসুলুল্লাহ ﷺ খুব বেশি তাঁর কথা স্মরণ করতেন। মাঝে মাঝে ছাগল জবাই করে গোশতের কয়েকটি ভাগ করতেন। তারপর সেগুলো খাদিজার বান্ধবীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কখনো আমি (ঈর্ষাবশত) বলতাম, “খাদিজা ছাড়া তো দুনিয়ায় আর কোনো নারীই নেই!” তখন রাসুল ﷺ বলতেন, “খাদিজা এমন ছিল। এমন গুণবতী ছিল.... তাঁর গর্ভেই আমার সন্তান হয়েছে।”^{১১৭}

বস্তুত, মৃত্যুর পর দাম্পত্য বন্ধন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি প্রিয়তমা খাদিজাকে স্মরণ করতে ভুলেননি। তাঁর প্রশংসা করতে ভুলেননি। তিনি বলতেন, আমার খাদিজা এমন গুণবতী ছিল। এমন জ্ঞানী ছিল। এভাবে প্রশংসা করতেই থাকতেন।

রাসুল ﷺ-এর সকল সন্তানের জন্ম খাদিজা ؓ-এর গর্ভেই। কেবল ইবরাহিমের জন্ম হয়েছিল রাসুল ﷺ-এর দাসী মারিয়ার গর্ভে।

সর্বসম্মত মতানুযায়ী খাদিজা ؓ-এর গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানগণ হচ্ছেন, পুত্র কাসিম। চার কন্যা—জাইনাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা ؓ। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর জন্ম লাভ করেন আব্দুল্লাহ নামের আরও এক সন্তান। তাকে তাহির ও তাইয়িব নামে ডাকা হতো।^{১১৮}

খাদিজা ؓ-এর কথা এলেই তিনি তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর জন্য ইসতিগফার করতেন। আয়িশা ؓ বলেন, ‘খাদিজা ؓ-এর আলোচনা আসলে রাসুল ﷺ তাঁর প্রশংসা করতে থাকতেন এবং তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তাঁর প্রশংসা করতে করতে কখনো তিনি বিতৃষ্ণ হননি।’^{১১৯}

১১৭. সহিহুল বুখারি : ৩৮১৮, সহিহ মুসলিম : ২৪৩৫।

১১৮. ফাতহুল বারি : ৭/১৩৭।

১১৯. তাবারানি ؒ কৃত আল-মুজাম্মল কাবির : ১৬/৩১৯। খাদিসের মান : হাসান।

অথচ বর্তমান সময়ের মানুষের দিকে তাকান। তাদের অবস্থা আজ আশ্চর্য সীমারও বাইরে চলে গেছে। কারও স্ত্রী মারা গেলে সে বিয়ে করে নতুন স্ত্রীর সামনে আগের স্ত্রীর নিন্দার পর নিন্দা করতে থাকে। এতটুকু প্রশংসাও করে না। অথবা স্ত্রীর সাথে তালাক হলে নিন্দা করতে কোনো জায়গা বাদ রাখে না। বলে, ‘আমি বেশ ধৈর্য ধরে ছিলাম। কিন্তু আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল তার কুআচরণের কারণে। তাই তালাক দিতে বাধ্য হয়েছি আমি।’

আবার এমন লোকও আছে, যারা কখনো স্ত্রীর প্রশংসা করতে জানে না। অথচ তার স্ত্রী অনেক প্রশংসার উপযুক্ত। স্বামীর ওপর তার অনেক অবদান আছে।

খাদিজা ؓ-এর কথা মনে পড়ে এমন কোনো বস্তু দেখলে কিংবা এমন কোনো আওয়াজ শুনলে রাসুলুল্লাহ ؐ আবেগাপ্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর চেহারায় ফুটে উঠত উজ্জ্বল হাসির নির্মল দীপ্তি।

আয়িশা ؓ বলেন, ‘একবার খাদিজার বোন হালাহ রাসুলুল্লাহ ؐ-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। রাসুলুল্লাহ ؐ-এর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন খাদিজাই অনুমতি চাইছেন। দুবোনের কণ্ঠস্বর একই রকমের হওয়ার কারণে রাসুলুল্লাহ ؐ-এর মনে খাদিজার কথা উদিত হলো। তিনি বলে উঠলেন, “ইয়া আল্লাহ, এ যেন হালাহ হয়!” আয়িশা ؓ বলেন, “তখন আমার ঈর্ষা জেগে উঠল। আমি বললাম, “কুরাইশের দাঁত পড়া এক বৃদ্ধ মহিলা, সময়ের আবর্তে যে হারিয়ে গেছে (তার স্মরণেই আপনি পড়ে আছেন!) আল্লাহ তো আপনাকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দিয়েছেন।” এ কথা শুনে রাসুল ؐ-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তা এমন চেহারা, যা আমি কেবল দেখেছি, যখন তাঁর ওপর ওহি নাজিল হতো কিংবা আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যেত। তিনি বললেন, “আল্লাহ তাআলা খাদিজার চাইতে উত্তম কাউকে দেননি আমায়। যখন মানুষ আমার সাথে কুফরি করেছে, তখন খাদিজাই আমার প্রতি ইমান এনেছিল। যখন মানুষ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তখন খাদিজাই আমাকে সত্যায়ন করেছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে, খাদিজাই আমাকে তাঁর সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছে। অন্য সব স্ত্রীর মাধ্যমে যেখানে সন্তান পাওয়া থেকে আমি বঞ্চিত; আল্লাহ খাদিজার মাধ্যমে আমাকে সন্তান দান করেছেন।” এরপর আয়িশা ؓ বললেন, “সে সত্তার শপথ—

যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আর কখনো তাঁর সম্পর্কে মন্দ কিছু বলব না, সব সময় তাঁর প্রশংসাই করব।”^{১২০}

‘এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, কেউ কাউকে ভালোবাসলে ভালোবাসার মানুষের প্রিয় জিনিসগুলোও সে ভালোবাসে। ভালোবাসে প্রিয়তমের সাথে সাদৃশ্য রাখে—এমন সবকিছুকে। ভালোবাসে তার কথা মনে করিয়ে দেয়—এমন সব বস্তুকে।’^{১২১}

‘আয়িশা রাঃ এমন এক নারীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছেন, যিনি কিনা তাদের বিয়ের আগেই এ ধরা থেকে বিদায় নিয়ে পরপারে চলে গেছেন। বিষয়টা বেশ আশ্চর্যকর।’^{১২২}

দুনিয়াতে খাদিজা রাঃ-কে দেওয়া পুরস্কারটি ছিল, তাঁর জীবদশায় রাসুল সঃ দ্বিতীয় কাউকে বিয়ে করেননি। আয়িশা রাঃ বলেন, ‘খাদিজার মৃত্যু পর্যন্ত নবিজি সঃ অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করেননি।’^{১২৩}

ইবনে হাজার রাঃ বলেন, ‘এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই যে, রাসুল সঃ খাদিজা রাঃ-এর জীবদশায় অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করেননি।

এটি প্রমাণ করে, রাসুল সঃ-এর অন্তরে খাদিজা রাঃ ছিলেন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর মনে খাদিজা রাঃ-এর জন্য সম্মান ও ভালোবাসা ছিল অন্য সকল স্ত্রীর চাইতে বেশি। রাসুলুল্লাহ সঃ-এর হৃদয়জুড়ে ছিল তার একচ্ছত্র রাজত্ব। অন্য স্ত্রীদের সাথে জীবনের যতটা সময় কাটিয়েছেন তিনি, তার চাইতে দ্বিগুণ সময় কাটিয়েছেন কেবল খাদিজা রাঃ-এর সাথে। রাসুল সঃ-এর দাম্পত্য জীবন মোট ৩৮ বছর। যার মধ্যে ২৫ বছর কাটিয়েছেন খাদিজা রাঃ-এর সাথে। সে হিসেবে দাম্পত্য জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন শুধু খাদিজা রাঃ-এর সাথে।

১২০. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৩৪৩, তাবারানি রাঃ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ২৩/১৪। হাদিসটির সনদ সহিহ।

১২১. ফাতহুল বারি : ৭/১৪০।

১২২. সিয়াকু আলামিন নুবালা : ২/১১২।

১২৩. সহিহ মুসলিম : ২৪৩৬।

দীর্ঘ সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাম্পত্য বন্ধনে থাকা সত্ত্বেও তাকে কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতে হয়নি, সতিনের কারণে তাকে একটুও ভাবিত হতে হয়নি। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যে তিনি অন্য সকল স্ত্রীর চেয়ে স্বতন্ত্র।^{১২৪}

খাদিজা ﷺ-এর প্রতি রাসুল ﷺ-এর ভালোবাসার আরেকটি বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে, তার মৃত্যুর পরও রাসুল ﷺ তার বান্ধবী ও প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। আয়িশা ﷺ বলেন, ‘নবিজি ﷺ অধিক হারে তাকে স্মরণ করতেন। কখনো তিনি ছাগল জবাই করে গোশতের কয়েকটি ভাগ করতেন। তারপর সেগুলো খাদিজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন।’^{১২৫}

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘রাসুল ﷺ ছাগল জবাই করলে তার গোশত খাদিজার প্রিয়জনদের কাছে তাদের প্রয়োজনমতো পাঠিয়ে দিতেন।’^{১২৬}

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘রাসুল ﷺ ছাগল জবাই করলে খাদিজার বান্ধবীদের খোঁজ করতেন। এরপর তাদের জন্য গোশত হাদিয়া পাঠাতেন।’^{১২৭}

‘এ হাদিসগুলো প্রমাণ করে স্ত্রীদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর আচরণ ছিল মায়া ও আদরে ভরা, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। স্ত্রীর জীবদ্দশায় তার প্রতি যেমন ভালোবাসা রাখতেন, তেমনই তার মৃত্যুর পরও ভালোবাসার দাবি আদায় করে যেতেন স্ত্রীর বান্ধবী ও প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে।’^{১২৮}

আনাস ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর কাছে কোনো হাদিয়া আসলে তিনি বলতেন, “এটি নিয়ে অমুক নারীর কাছে যাও—সে খাদিজার বান্ধবী ছিল। এটি নিয়ে অমুক নারীর বাড়িতে যাও—সে খাদিজাকে ভালোবাসত।”’^{১২৯}

রাসুল ﷺ খাদিজা ﷺ-এর বান্ধবী ও প্রিয়জনদের বিশেষ সমাদর করতেন। আয়িশা ﷺ বলেন, ‘একদা এক বৃদ্ধা নবিজি ﷺ-এর কাছে আসলো। তিনি

১২৪. ফাতহুল বারি : ৭/১৩৭।

১২৫. সহিহুল বুখারি : ৩৫৩৪, সহিহ মুসলিম : ২৪৩৫।

১২৬. সহিহুল বুখারি : ৩৮১৬।

১২৭. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৪০।

১২৮. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহ মুসলিম আলা সহিহ মুসলিম : ১৫/২০২।

১২৯. বুখারি ﷺ কৃত আদাবুল মুফরাদ : ২৩২। হাদিসের মান : হাসান।

তখন আমার ঘরে ছিলেন। রাসুল ﷺ তাকে বললেন, “কে তুমি?” মহিলা বলল, “আমি জাসসামা আল-মুজানিয়্যাহ।”

রাসুল ﷺ বললেন, “বরং তুমি হাসসানা আল-মুজানিয়্যাহ। তোমাদের কী খবর? কেমন আছ তোমরা? আমরা চলে আসার পর তোমরা কেমন কাটালে দিনগুলো?”

মহিলাটি বলল, “ভালো। আল্লাহর রাসুল, আপনার প্রতি আমার বাবা-মা উৎসর্গ হন।”

মহিলাটি চলে গেলে আমি রাসুল ﷺ-কে বললাম, “আল্লাহর রাসুল, আপনি এ বৃদ্ধ মহিলার প্রতি এত সুন্দর আচরণ করলেন কেন?”

রাসুল ﷺ বললেন, “আয়িশা, খাদিজা যখন বেঁচে ছিল, তখন এ নারী আমাদের কাছে আসত। আর পুরোনো বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ করা ইমানের অংশ।”^{১৩০}

► হাদিস থেকে শিক্ষা

মহিলা বৃদ্ধ হলেও রাসুল ﷺ জাসসামা নামটি পাণ্টে সুন্দর একটি নাম রাখলেন তার। নির্বোধ, অলস ও অকর্মণ্যকে জাসসামা বলা হয়। অন্যদিকে হাসসানা শব্দটি সৌন্দর্যের অর্থ দেয়। হাসনা শব্দের চেয়েও হাসসানা শব্দটিতে ভাবের আধিক্য রয়েছে। হাসসানা একটি সুন্দর নাম। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ নামটির প্রচলন কমে গেছে।^{১৩১}

সুন্দর ব্যবহার, বিশ্বস্ততা ও কৃতজ্ঞতা মুমিন-চরিত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই অনুপম আচরণ মূলত খাদিজার প্রতি তাঁর উৎকৃষ্ট প্রতিদান, সদ্যবহার, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ—যিনি দুর্দিনে তাঁর হাত ধরেছিলেন, তাঁর কষ্ট লাঘব করেছিলেন এবং তাঁর সুখ-দুঃখের একান্ত ভাগীদার হয়েছিলেন।

১৩০. মুস্তাদরাকুল হাকিম : ১/১৭। হাদিসের মান : সহিহ।

১৩১. শাইখ আলবানি ﷺ এ হাদিসের অনুসরণ করে তার এক মেয়ের নাম ‘হাসসানাহ’ রেখেছিলেন। দেখুন, সিলসিলাতুস সহিহাহ : ১/২১৫।

বর্তমান যুগে স্বামীদের দেখা যায়, তারা শেষ বয়সে স্ত্রীদের অবহেলা করে। যে স্ত্রী জীবনের ঝলমলে সময়গুলো তার জন্য ব্যয় করেছিল, তার হাতে হাত রেখেছিল, তার সংসার বিনির্মাণে সহায়তা করেছিল—তাকে কীভাবে অবজ্ঞা করা যায়! এটি কখনো ওয়াফাদারি হতে পারে না।

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে রাসুল ﷺ কখনো অস্বস্তিতে ভুগতেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাঁর আবেগ প্রকাশ করতেন। খাদিজা ﷺ সম্পর্কে তিনি বলতেন, ‘আমার অন্তরে তার ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে।’^{১৩২}

এখান থেকে বোঝা যায়, খাদিজার ভালোবাসা একটি মর্যাদা, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অর্জিত হয়েছে।^{১৩৩}

আয়িশা সিদ্দিকা ﷺ-এর প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসার কথা এতটাই প্রসিদ্ধ যে, তা আর খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। রাসুল ﷺ আয়িশা ﷺ-কে যতটা ভালোবেসেছেন অন্য কাউকে বাসেননি। রাসুল ﷺ-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী আয়িশা ﷺ। তাকে ছাড়া অন্য কোনো কুমারী নারীকে তিনি বিয়ে করেননি।

আয়িশা ﷺ-এর প্রতি তাঁর এই অনুরাগের কথা তিনি গোপন করতেন না। বরং সবার সামনে বলতেন, তিনি আয়িশা ﷺ-কে ভালোবাসেন। একবার আমর বিন আস ﷺ রাসুল ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?’ রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, ‘আয়িশা।’ আমর ﷺ এরপর জানতে চাইলেন, ‘পুরুষদের মধ্য থেকে?’ রাসুল উত্তর দিলেন, ‘আয়িশার বাবা।’^{১৩৪}

বলা বাহুল্য, বর্তমানে স্বামীদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি একেবারে নেই বললেই চলে। আপনার আশপাশে চোখ ফেরালেই অসংখ্য নজির পাবেন। জীবনের দীর্ঘ একটা সময় যে স্ত্রীর সাথে কাটিয়ে এসেছে, তাকে কখনো বলা হয়নি—‘আমি তোমাকে ভালোবাসি।’ এভাবে স্পষ্ট ভাষায় স্ত্রীর ভালোবাসা প্রকাশ করাকে তারা ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী মনে করে। অনেকেই আবার বলতে পারে না লজ্জায়।

১৩২. সহিহ মুসলিম : ২৪৩৫। আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত।

১৩৩. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৫/২০১।

১৩৪. সহিহল বুখারি : ৩৬৬২, সহিহ মুসলিম : ২৩৮৪।

অনেকে তো জানেই না, স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা প্রকাশ করলে উভয়ের দাম্পত্য বন্ধন মজবুত হয়। জীবনটা আগের চেয়ে সুখকর হয়। উভয়ের মাঝে বিশ্বস্ততা বেড়ে যায় বহুগুণে। স্ত্রীরা চায়, স্বামীর ভালোবাসা সে উপলব্ধি করতে পারুক। স্বামী মুখ ফুটে ভালোবাসার কথা বলুক। কিন্তু স্বামী তো গোবেচারা। এতটুকু জ্ঞান তার থাকলে তো!

স্বামীর কাছে ভালোবাসার কথাটা গুনতে পায় না। কিন্তু একই নারী যখন পরপুরুষের কাছে মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে, স্বাভাবিকভাবেই সে গলে যায়। বিভ্রান্ত হয়ে লিপ্ত হয় পরকীয়ায়।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রীদের চুমু খেতেন

উরওয়া রা থেকে বর্ণিত, ‘আয়িশা রা বলেন, “রাসুল সা তাঁর জনৈক স্ত্রীকে চুমু খেয়ে অজু না করেই বের হলেন নামাজের উদ্দেশ্যে।” উরওয়া বলেন, “সে স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কে!” আয়িশা রা আমার কথা শুনে হেসে দিলেন।”^{১৩৫}

রোজা অবস্থায়ও রাসুল সা স্ত্রীদের চুমু খেতেন। আয়িশা রা বলেন, ‘রোজা অবস্থায়ও রাসুল সা স্ত্রীদের চুমু খেতেন। তাদের আলিঙ্গন করতেন। প্রবৃত্তির ওপর তিনি তোমাদের চেয়ে বেশি সংযমী ছিলেন।”^{১৩৬}

পানপাত্রের যে স্থানে মুখ লাগিয়ে স্ত্রী পান করেছে, সেখানে মুখ দিয়ে রাসুলুল্লাহ সা-ও পান করতেন

আয়িশা রা বলেন, ‘ঋতুবতী অবস্থায়ও আমি পান করে রাসুলুল্লাহ সা-কে দিতাম। তিনি ঠিক সেই জায়গায় মুখ লাগিয়ে পান করতেন, যেখানে মুখ লাগিয়ে আমি পান করেছি। ঋতুবতী অবস্থায় আমি গোশতযুক্ত হাড় খেয়ে রাসুলুল্লাহ সা-কে দিতাম। তিনি ঠিক সেই জায়গায় মুখ লাগাতেন, যেখানে মুখ লাগিয়ে আমি খেয়েছি।”^{১৩৭}

১৩৫. সুনানুত তিরমিজি : ৭৯, সুনানু আবি দাউদ : ১৭৮, সুনানুন নাসায়ি : ১৭০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৫০২। হাদিসের মান : সহিহ।

১৩৬. সহিহুল বুখারি : ১৯২৭, সহিহ মুসলিম : ১১০৬।

১৩৭. সহিহ মুসলিম : ৩০০।

শব্দান্তরে হাদিসটি এভাবেও বর্ণিত হয়েছে, ‘পানপাত্রের যে অংশে মুখ রেখে আমি পান করতাম, রাসুল ﷺ ও ঠিক সে অংশে মুখ রেখে পান করতেন। আমার পান করার উচ্ছিষ্ট পানিও তিনি পান করতেন। যদিও আমি তখন ঋতুবতী অবস্থায় থাকি।’^{১৩৮}

এটা আয়িশা রা.এর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।^{১৩৯} এই ছোট কাজটি কত বেশি প্রভাব ফেলে স্ত্রীর উর্বর হৃদয়ে। একজন রাসুল স্ত্রীর মুখ দেওয়া জায়গায় মুখ রেখে হাড় চিবুচ্ছেন, স্ত্রীর জায়গায় মুখ রেখে পান করছেন; অথচ স্ত্রী তখন ঋতুবতী—নিঃসন্দেহে এটি পরম ভালোবাসার পরিচয়।

স্ত্রীর মাজা মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজতেন

আয়িশা রা. বলেন, ‘আমার ওপর আল্লাহর অন্যতম মেহেরবানি হচ্ছে, রাসুল ﷺ আমার ঘরেই মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনটি আমার পালায় ছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর ও আমার মুখের লালার একত্রিত হয়েছিল। (সেদিন) আব্দুর রহমান আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তার হাতে ছিল একটি মিসওয়াক। রাসুল ﷺ আমার গায়ে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি আব্দুর রহমানের হাতের মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি জানতাম, তিনি মিসওয়াক করতে পছন্দ করেন। রাসুল ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলাম, আমি কি মিসওয়াকটা নেব? মাথা নেড়ে তিনি সাই দিলেন। মিসওয়াক নিয়ে বললাম, “নরম করে দিই?” রাসুল ﷺ আবারও মাথা নেড়ে সাই জানালেন। আমি দাঁত দিয়ে মিসওয়াকের আগা কেটে নিলাম, এরপর চিবিয়ে নরম করে রাসুল ﷺ-কে দিলাম। তিনি আমার বুকের ওপর ভর দেওয়া অবস্থায় মিসওয়াক করলেন।’^{১৪০}

স্ত্রীর রানের ওপর মাথা রেখে ঘুমোতেন

‘এক সফরে আয়িশা রা. রাসুল ﷺ-এর সাথে ছিলেন। ঘটনাক্রমে এক জায়গায় আয়িশা রা.এর হার হারিয়ে যায়। সাহাবিরা সবাই হার খুঁজতে লেগে গেলেন। হারের জন্য কাফেলাকে এমন জায়গায় দাঁড়াতে হলো,

১৩৮. সুনানুন নাসায়ি : ৩৮৭।

১৩৯. মিরকাতুল মাফাতিহ : ২/৪৮৭।

১৪০. সহিহুল বুখারি : ৪৪৩৮।

যেখানে পানি নেই। আবু বকর   এসে আয়িশা  -কে তিরস্কার করলেন (তার কারণে পুরো কাফেলা কষ্টে পড়ল)। আয়িশা   বলেন, “আবু বকর আমাকে ভৎসনা করলেন। তিনি আঙুল দিয়ে আমার কোমরে ধাক্কা দিতে লাগলেন। রাসুল   তখন আমার উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন। রাসুল   আমার কোলে ঘুমিয়ে থাকার কারণে আমি এতটুকুও নড়িনি।”^{১৪১}

আয়িশা   আরও বলেন, ‘আমি ঋতুবতী অবস্থায় থাকলেও নবিজি   আমার কোলে ঠেস দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।’^{১৪২}

এটি স্ত্রীদের প্রতি রাসুলুল্লাহ  -এর অন্তরঙ্গ আচরণের অংশ।

এ হাদিস থেকে আমরা শিখলাম : মহিলাদের হায়িজ হলেও তাদের প্রতি নাক সিটকানো আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। এমনটা ইহুদিরা করে থাকে। তারা ঋতুবতী মহিলার সাথে একত্রে খায় না; এমনকি একসঙ্গে বসেও না।

ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে একই চাদরের নিচে শুতেন

উম্মে সালামা   বলেন, ‘একবার রাসুল  -এর সাথে একই চাদরের নিচে শুয়েছিলাম আমি। হঠাৎ আমার হায়িজ শুরু হলে আমি চাদর থেকে সরে এসে হায়িজের কাপড় পরে নিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি হায়িজ হচ্ছে?” আমি বললাম, “হ্যাঁ।” তারপর তিনি আমায় ডাকলে তাঁর সাথে একই চাদরে শুয়ে পড়লাম।’^{১৪৩}

এ হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে, স্ত্রী হায়িজ অবস্থায় থাকলেও তার সাথে একই চাদরে বা লেপের নিচে শোয়া জায়েজ।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ তো ঋতুবতী স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতে বলেছেন : **فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ** (হায়িজ অবস্থায় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো। -সূরা আল-বাকারা, ২ : ২২২)। এখানে দূরে থাকার অর্থ সহবাস থেকে দূরে থাকা।^{১৪৪}

১৪১. সহিহুল বুখারি : ৪৬০৭, সহিহ মুসলিম : ৫৫০।

১৪২. সহিহুল বুখারি : ৩৬৭২, সহিহ মুসলিম : ২৬৭।

১৪৩. সহিহুল বুখারি : ২৯৮, সহিহ মুসলিম : ২৯৬।

১৪৪. ইমাম নববি   কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৩/২০৭।

রাসুল ﷺ-এর আরেক স্ত্রী মাইমুনা ﷺ বলেন, ‘আমি হায়িজ অবস্থায় থাকলেও রাসুল ﷺ আমার সাথে গুতেন। তাঁর ও আমার মাঝে কেবল একটি কাপড় থাকত।’^{১৪৫}

অনেক স্বামীই তাদের ঋতুবতী স্ত্রীদের দূরে ঢেলে দেয়। তাদের বিছানাও পৃথক করে দেয়। এটি রাসুল ﷺ-এর আদর্শের একদম বিপরীত। স্ত্রীদের জন্যও ক্ষতিকর। কেননা, তারা এ সময় নানান মানসিক অস্থিরতায় ভোগে— যা তাদের মন-মেজাজে বিকল্প প্রভাব ফেলে। এমনিতেই ওই সময় তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, তার ওপর যদি স্বামীও তাকে বিছানা থেকে দূরে ঠেলে দেয়, তবে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়।

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন স্ত্রী আয়িশা ﷺ-এর কোলে

আয়িশা ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ আমার ঘরে মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনটি আমার পালায় ছিল। যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি আমার বুকে ঠেস দিয়ে ছিলেন।’^{১৪৬}

স্ত্রীর সাথে গোসল করতেন

আয়িশা ﷺ বলেন, ‘আমি ও রাসুল ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। পাত্রটি আমার ও তাঁর মাঝে থাকত। কখনো তিনি আমার আগে পানি নিয়ে নিতেন। কখনো আমি তাঁর আগে পানি নিতাম। এমনকি তিনি বলতেন, “আমার জন্য রাখো।” আমিও তাকে বলতাম, “আমাকে নিতে দিন।”’^{১৪৭}

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ‘নবিজি ﷺ এবং তাঁর স্ত্রী মাইমুনা ﷺ একই বালতি থেকে পানি নিয়ে একসঙ্গে গোসল করতেন।’^{১৪৮}

১৪৫. সহিহ মুসলিম : ২৯৫।

১৪৬. সহিহুল বুখারি : ৩১০০, সহিহ মুসলিম : ৪৪৭৪।

১৪৭. সহিহুল বুখারি : ২৫০, সহিহ মুসলিম : ৩২১।

১৪৮. সহিহুল বুখারি : ২৫৩, সহিহ মুসলিম : ৩২২।

উম্মে সালামা ؓ বলেন, ‘আমি ও নবিজি ؐ একই বালতি থেকে পানি নিয়ে একসঙ্গে ফরজ গোসল করতাম।’^{১৪৯}

আমাদের এ যুগের ভদ্রলোকেরা (!) স্ত্রীর সাথে এক লেপের নিচে শোয় না। একসঙ্গে খায় না। মিরাসসূত্রেই তারা এই অভ্যাস পেয়ে থাকে।

আদর করে স্ত্রীর নামকে ছোট করে ডাকতেন

আয়িশা ؓ বলেন, ‘রাসূল ﷺ একদিন আমাকে বললেন, “হে আয়িশা, জিবরাইল তোমাকে সালাম দিচ্ছেন।” তখন আয়িশা ؓ বললেন, ‘তঁার ওপরও আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।’^{১৫০}

রাসূল ﷺ আয়িশা ؓ-কে হুমাইরা^{১৫১} নামেও ডাকতেন। আয়িশা ؓ বলেন, ‘কিছু হাবশি বালক মসজিদে খেলাধুলা করছিল। নবিজি ﷺ আমাকে ডেকে বললেন, “হুমাইরা, তুমি কি তাদের খেলাধুলো দেখতে চাও?” আমি উত্তর দিলাম, “হ্যাঁ।”’^{১৫২}

কাজি ইয়াজ বলেন, ‘আদর-সোহাগ ও ভালোবাসা প্রকাশে তিনি হুমাইরা নামে ডেকেছিলেন তাকে।’^{১৫৩}

রাসূল ﷺ আয়িশা ؓ-কে উম্মে আব্দুল্লাহ উপনামেও ডাকতেন। আয়িশা ؓ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরের জন্মের পর তাকে নিয়ে আমি নবিজি ﷺ-এর কাছে আসলাম। আব্দুল্লাহর মুখের ভেতর তিনি নিজের লালা দিলেন। আব্দুল্লাহর পেটে ঢোকা দুনিয়ার প্রথম জিনিস ছিল রাসূল ﷺ-এর মুখের লালা। তিনি বললেন, “এ হলো আব্দুল্লাহ। আর তুমি উম্মে আব্দুল্লাহ।”

১৪৯. সহিহুল বুখারি : ৩২২, সহিহ মুসলিম : ৩২২।

১৫০. সহিহুল বুখারি : ৩২১৭, সহিহ মুসলিম : ২৪৪৭।

১৫১. হুমাইরা আরবি হামরা শব্দের তাসগির। এর অর্থ হলো, গুদ্র বা সাদা, ফরসা। আরবির সাদা রং বোঝাতে আহমার শব্দ ব্যবহার করে থাকে। (আন-নিহায়াহ)—অনুবাদক।

১৫২. নাসায়ি কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ৮৯৫১; হাদিসের মান : সহিহ। হাফিজ ইবনে হাজার ؒ বলেন, ‘এ হাদিসটি সহিহ। তবে এ হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো সহিহ হাদিসে “হুমাইরা” নামের উল্লেখ পাইনি আমি।’ দেখুন, ফাতহুল বারি : ২/৪৪৪।

১৫৩. মাশারিকুল আনওয়ার : ১/৭০২।

এরপর থেকে আমাকে এ উপনামেই ডাকা হয়। যদিও কখনো আমার সন্তান হয়নি।’^{১৫৪}

রাসুল ﷺ স্ত্রীদের জন্য সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো নির্বাচন করতেন। কিন্তু আজকাল কিছু মানুষকে দেখা যায়, মোবাইলে তারা স্ত্রীর নাম্বার সেইভ করে বিভিন্ন কুৎসিত নামে। কেউ নাম দেয় ‘আপদ’, কেউ দেয় ‘বালাই’, কেউ ‘জিন্দেগির ভুল’ আবার কেউ এক ধাপ এগিয়ে নাম দেয় শয়তানা! অন্যদিকে কিছু মানুষ আছে, যারা স্ত্রীর নাম সেইভ করে সুন্দর সুন্দর নামে। যেমন : প্রিয়, জান, প্রাণ, জীবনসাথি, আকাশের চাঁদ, অমুকের মা ইত্যাদি। বস্তুত আল্লাহ তাআলা রিজিকের মতো সচ্চরিত্রও বণ্টন করেছেন।

স্ত্রীদের নিয়ে দাওয়াত খেতে যেতেন

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর এক ফারসি (বর্তমান ইরানি) প্রতিবেশী ছিল। ভালো স্যুপ রান্না করতে পারত সে। একদিন স্যুপ রান্না করে সে রাসুল ﷺ-কে দাওয়াত দিতে আসলো। রাসুল ﷺ তখন বললেন, “আয়িশাও?” সে জবাব দিল, “না।” রাসুল ﷺ বললেন, “তাহলে আমিও না।” লোকটি আবারও দাওয়াত দিল। রাসুল ﷺ আবারও বললেন, “আয়িশাও?” লোকটি উত্তর দিল, “না।” রাসুল ﷺ বললেন, “তবে আমিও না।” তৃতীয়বার দাওয়াত দিলে রাসুল ﷺ একই কথা বললেন। এবার লোকটি “হাঁ” বলল। এরপর তাঁরা দুজন হুড়মুড় করে উঠলেন। পরস্পরকে অনুসরণ করে চলতে চলতে উপস্থিত হলেন সে ফারসির বাড়িতে।’^{১৫৫}

ইমাম নববি ؒ বলেন, ‘রাসুল ﷺ আয়িশা ؓ-কে রেখে একা দাওয়াতে যেতে অপছন্দ করলেন। স্ত্রীর প্রতি সুন্দর আচরণের এক চমৎকার নিদর্শন এটি। দাম্পত্য জীবনের হক আদায় ও অন্তরঙ্গতারও একটি যথার্থ উদাহরণ এ হাদিসটি।’^{১৫৬}

১৫৪. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৭১১৭। ওআইব আরনাউত বলেন, ‘এ হাদিসের সনদ শক্তিশালী।’

১৫৫. সহিহ মুসলিম : ২০৩৭।

১৫৬. ইমাম নববি ؒ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৩/২০৯।

কোনো স্ত্রী সাক্ষাতে এলে ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন

সাফিয়া   বলেন, ‘একবার রাসুলুল্লাহ   ইতিকাফে ছিলেন। রাতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলাম। দুজনে কথাবার্তা বললাম। এরপর যাওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন আমাকে দিয়ে আসার জন্য। পথে দুজন আনসারী আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন। তারা দুজন নবিজি  -কে দেখে দ্রুত পদে হাঁটতে লাগল। রাসুল   তাদের বললেন, “থামো—জলদি করো না। ও হলো সাফিয়া বিনতে হুয়াই।” তারা বলল, “সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসুলান্নাহ! (আমরা আপনার ব্যাপারে কীভাবে অমন বাজে ধারণা করব!) রাসুল   বললেন, “শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় দৌড়ায়। আমি ভয় পাচ্ছি, শয়তান তোমাদের অন্তরে খারাপ কোনো চিন্তা ঢুকিয়ে দেবে।””^{১৫৭}

ইতিকাফকারী জরুরি কাজ ছাড়া ইতিকাফের স্থান থেকে উঠতে পারে না। স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ কতটা গুরুত্ববহ তা এ হাদিস থেকেই প্রমাণ পাই আমরা। ইতিকাফ অবস্থায় থাকলেও রাসুল   স্ত্রীকে ঘর পর্যন্ত দিয়ে আসলেন নিজ তত্ত্বাবধানে।

أَبْيَأْتُنَا بِالْحُبِّ نَبْنِيهَا *** زَوْجَاتُنَا قَدْ نَوَّرَتْ فِيهَا
بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى نَعْمُرُهَا *** وَبِسُنَّةِ الْمُخْتَارِ نُحْيِيهَا
هَذَا رَسُولُ اللَّهِ قُدُّوْنَا *** تَكْفِيكَ سُنَّتُهُ وَتَكْفِيهَا
يُبْدِي مَحَبَّتَهُ لِرِزْوَجَتِهِ *** وَسِوَاهُ يَسْتَعْلِي فَيُخْفِيهَا
بِدُعَايَةٍ مِّنْهُ يُضَاحِكُهَا *** وَبِأَجْمَلِ الْأَسْمَاءِ يُنَادِيهَا
مَا مَدَّ يَوْمًا كَفَّهُ بِأَذَى *** بَلْ تِلْكَ نَبْعُ الْخَيْرِ يَجْرِيهَا

‘ভালোবাসার মজবুত ভিতের ওপর আমরা নির্মাণ করি আমাদের পরিবার। প্রিয়তমা স্ত্রীদের সুমধুর বিচরণে ঝলমল করে আমাদের অন্তরমহল। ঘরে ঘরে আমরা আবাদ করি তাকওয়া আর নেক আমলের সোনালি ফসল। প্রিয় নবির সুন্নাতই আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রাণপ্রবাহ। আমাদের রাসুল

আমাদের জীবনাদর্শ। মুমিন স্বামী ও স্ত্রীর সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্য তো তাঁর সুল্লাতই যথেষ্ট। তিনি স্ত্রীদের প্রতি হৃদয়ে লালিত ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতেন। অনেকেই তো নিজেকে বড় মনে করে। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কথা লুকিয়ে রাখে। তিনি রসিকতার ছলে হাসি ফুটাতেন প্রিয়তমার মুখে—সম্বোধন করতেন মিষ্টি মিষ্টি নামে। কখনো তাদের দিকে প্রসারিত করতেন না অনিষ্টের হাত। বরং এই হাত তো কল্যাণের ঝরনা, যা সিক্ত করে তাদের জীবন।’

রাসুলুল্লাহ ﷺ পূত-পবিত্র স্ত্রীদের সঙ্গে কল্যাণময় এক দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। কেননা, তাঁর সুখময় এই জীবন ছিল মূলত আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশের নিখুঁত প্রায়োগিক রূপ—

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

‘স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।’^{১৫৮}

বস্তুত এখানে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, তিনি যখন আপন দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করেন—

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

‘তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর স্ত্রীর কাছে উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে আমিই সর্বোত্তম।’^{১৫৯}

স্ত্রীর প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুল ﷺ বলেন, ‘ইমানের বিচারে সেই পরিপূর্ণ মুমিন, যার চরিত্র সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে-ই, যে চরিত্রের বিচারে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।’^{১৬০}

এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, রাসুল ﷺ কখনো তাঁর স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছেন বা কোনো স্ত্রীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। আয়িশা ؓ বলেন,

১৫৮. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৯।

১৫৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫; আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : সহিহ।

১৬০. সুনানুত তিরমিজি : ১০৮২; আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : সহিহ।

‘আল্লাহর পথে জিহাদ ব্যতীত রাসুল ﷺ কখনো কোনো কিছুকে নিজ হাতে প্রহার করেননি। না কোনো স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছেন আর না কোনো খাদিমের।’^{১৬১}

এবার সেসব স্বামীর কথা একটু চিন্তা করুন, যারা তুচ্ছ কারণে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে। মুখে, মাথায় কিংবা পিঠে আঘাত করে। এমনকি কখনো লাঠি কিংবা জুতোর মতো বস্তুও ব্যবহার করে বসে!

অথচ রাসুল ﷺ বলেন, ‘তোমরা আল্লাহর বান্দীদের প্রহার কোরো না।’ এরপর উমর রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এসে রাসুল ﷺ-কে জানালেন, ‘মহিলারা স্বামীর অবাধ্য হয়।’ অতঃপর রাসুল ﷺ মহিলাদের মৃদু প্রহারের অনুমতি দেন।

এরপর রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে মহিলারা এসে তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে লাগল। তখন নবিজি ﷺ বললেন, ‘মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে। ওই সব স্বামী ভালো মানুষ নয়।’^{১৬২} ‘অর্থাৎ যারা স্ত্রীদের প্রহার করে, তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম নয়। বরং যারা স্ত্রীর দেওয়া কষ্টে সহ্য করে এবং স্ত্রীদের প্রহার করে না, তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ।’^{১৬৩}

আরবদের মাঝে একটি প্রবাদ আছে—‘মর্যাদাবানরাই স্ত্রীদের সম্মান করে। ইতর শ্রেণির লোকেরাই স্ত্রীদের অসম্মান করে। সম্মানিত লোকদেরকে স্ত্রীরা জয় করে নেয়। আর ছোট লোকেরা স্ত্রীদের ছোট করে রাখে।’

স্ত্রীদের প্রতি কোমল আচরণ করতে রাসুল ﷺ আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘তোমরা স্ত্রীদের কল্যাণ কামনা করো—তাদের সদুপদেশ দাও। কেননা, তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের সবচেয়ে বাঁকা হাড় হলো ওপরের হাড়টি। তুমি যদি তাদের সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙে ফেলবে। আর যদি সোজা না করে ফেলে রাখো, তবে তা বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তোমরা স্ত্রীদের সদুপদেশ দিতে থাকো।’^{১৬৪}

১৬১. সহিহ মুসলিম : ২৩২৮।

১৬২. সুনানু আবি দাউদ : ২১৪৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৮৫। হাদিসের মান : সহিহ।

১৬৩. আওনুল মাবুদ : ৬/১৩০।

১৬৪. সহিহুল বুখারি : ৩৩৩১, সহিহ মুসলিম : ১৪৬৮।

ইমাম নববি رحمہ বলেন, ‘এই হাদিসে স্ত্রীর প্রতি কোমল আচরণ করা, তাদের দেওয়া কষ্টে সবার করা, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা, তাদের বক্র চরিত্রে ধৈর্যধারণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।’^{১৬৫}

রাসুল ﷺ আরও বলেন, ‘নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে বাঁকা হাড় থেকে। এ হাড় সোজা করতে গেলে তুমি ভেঙে ফেলবে। তাই দাম্পত্য জীবনে তাদের প্রতি কোমল আচরণ করো।’^{১৬৬}

বিদায় হজের মতো গুরুত্ববহ খুতবার একটি স্বতন্ত্র অংশজুড়ে আছে নারীদের অধিকারসম্পর্কিত আলোচনা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘সাবধান, তোমরা নারীদের (প্রতি সদাচরণের) ক্ষেত্রে উত্তম উপদেশ গ্রহণ করো। তারা তোমাদের অধীনস্থ। এ ছাড়া তাদের ওপর তোমাদের কোনো অধিকার নেই...’^{১৬৭}

রাসুল ﷺ প্রায়ই এই নির্দেশনা দিতেন সাহাবিদের। কেননা, তিনি ভালো করে জানতেন নারীদের স্বভাব ও প্রকৃতি—যা অনেক সময় পুরুষরা সহ্য করতে পারে না। নারীদের অসংলগ্ন কর্মকাণ্ডে অনেক সময় পুরুষরা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাদের তালাক দিয়ে বসে। চোখের পলকে ভেঙে যায় কত বৈবাহিক বন্ধন, টুকরো টুকরো হয়ে যায় কত পরিবার।

তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মতের স্বামীদের দাম্পত্য জীবনের সমস্যাগুলি এড়ানোর পথ বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘মুমিন স্বামী তার স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পারে না। কেননা, একজন মুমিনার চারিত্রিক কোনো দিক যদি তার অপছন্দ হয়ও; অন্য আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে সন্তুষ্ট করবেই।’^{১৬৮}

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি رحمہ বলেন, ‘মুমিন স্ত্রীকে ঘৃণা করা স্বামীর উচিত নয়। কেননা, তার কোনো চরিত্র যদি স্বামীর অপছন্দও হয়, তবু অন্য কোনো সুন্দর বৈশিষ্ট্য তাকে সন্তুষ্ট করবেই। যেমন : কোনো নারী

১৬৫. ইমাম নববি رحمہ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১০/৫৭। ঈমৎ পরিমার্জিত।

১৬৬. মুসনাদু আহমাদ : ১৯৫৮৯। হাদিসের মান : সহিহ।

১৬৭. সুনানুত তিরমিদ্ধি : ১০৮৩, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫১। হাদিসের মান : সহিহ।

১৬৮. সহিহ মুসলিম : ২৬৭২।

যদি বদমেজাজিও হয়, তবুও তার মাঝে আমানতদারি, সৌন্দর্য, পবিত্রতা, বন্ধুবাৎসল্যের মতো উৎকৃষ্ট গুণ থাকতে পারে।”^{১৬৯}

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীগণের সঙ্গে বড়ই সুন্দর ব্যবহার করতেন। সব সময় হাসিমুখে থাকতেন। স্ত্রীদের খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। তাদের সঙ্গে বসতেন, একসাথে খেতেন, গল্প করতেন, রসিকতা করতেন, পরামর্শ করতেন, তাদের কথা শুনতেন, সান্ত্বনা দিতেন, তাদের ওপর আস্থা রাখতেন, তাদের ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দেখেও না দেখার ভান করতেন।

স্ত্রীদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিতেন

আবু জার গিফারি রা বর্ণনা করেন, ‘রাসুল ﷺ বলেছেন, “অচিরেই তোমরা মিসর জয় করবে। এটি এমন একটি দেশ যেখানে “কিরাত” মুদ্রার প্রচলন আছে। তোমরা সেই ভূমি জয় করলে তার অধিবাসীদের সাথে সদাচরণ করবে। কারণ, তারা দায়বদ্ধতা ও আত্মীয়তার হকদার।” অথবা বলেছেন, “কারণ, তাদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।””^{১৭০}

ইমাম নববি রা বলেন, ‘এখানে দায়বদ্ধতা মানে হলো মর্যাদা ও অধিকার। আত্মীয়তার কারণ হলো, ইসমাইল রা-এর মা হাজিরা মিসরের মেয়ে ছিলেন। আর বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্র হলো, রাসুল রা-এর সাহেবজাদা ইবরাহিমের মা মারিয়া কিবতিয়া মিসরের মেয়ে ছিলেন।’^{১৭১}

স্ত্রীর অনুভূতির প্রতি সচেতন ছিলেন

রাসুল রা জানতেন তাঁর স্ত্রী কখন অসন্তুষ্ট আর কখন সন্তুষ্ট থাকতেন। একবার তিনি আয়িশা রা-কে বলেন, ‘আয়িশা, তুমি কখন আমার ওপর খুশি থাকো, আর কখন রেগে থাকো—আমি কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারি।’ আয়িশা রা জানতে চান, ‘কীভাবে আপনি তা টের পান?’ রাসুল রা বলেন, ‘যখন তুমি আমার ওপর খুশি থাকো, তখন বলো, না, মুহাম্মাদের রবের কসম।

১৬৯. ইমাম নববি রা কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১০/৫৮।

১৭০. সহিহ মুসলিম : ২৫৪৩।

১৭১. ইমাম নববি রা কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১৬/৯৭।

আর যখন তুমি রেগে থাকো, তখন বলো, না, ইবরাহিমের রবের কসম।’
আয়িশা   বললেন, ‘হাঁ, হে আল্লাহর রাসুল, আমি কেবল আপনার নামটাই
মুখে আনি না। (তবে আপনার প্রতি আমার ভালোবাসায় কমতি আসে না)।’^{১৭২}

সুতরাং ওই লোকদের দলভুক্ত হওয়া সমীচীন নয়, যারা স্ত্রীর রাগ-অভিমানের
কোনো পরোয়াই করে না।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, জিহাদ পরিচালনা, সৈন্যবাহিনী গঠন, পৃথিবীর বিভিন্ন
প্রান্তে দাওয়াতের প্রসার করা, কিসরা-কাইসারের মতো বহু রাজা-বাদশাহর
কাছে দাওয়াতি পত্র প্রেরণ করাসহ বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকতেন
রাসুলুল্লাহ  । এত এত গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীদের অনুভূতি,
তাদের মান-অভিমানের প্রতি যত্নবান থাকতেন তিনি। বর্তমান যুগের
মুমিন-মুসলিমদের মাঝেই এমন স্বামীর অভাব নেই, যারা স্ত্রীর অনুভূতিকে
থোড়াই কেয়ার করে। স্ত্রী রুষ্ট না সন্তুষ্ট; স্ত্রী চিন্তিত না প্রফুল্ল—এগুলোর
প্রতি ভ্রক্ষেপই নেই তাদের! অথচ স্বয়ং রাসুল   শত ব্যস্ততার মাঝেও স্ত্রীর
অনুভূতির প্রতি সচেতন ছিলেন।

স্ত্রীদের অনুভূতির প্রতি সচেতন থাকার অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো, সাফিয়্যা  -এর
ঘটনা। হাফসা   যখন ইহুদির মেয়ে বলে তার নিন্দা করলেন, রাসুলুল্লাহ  
তার পক্ষ হয়ে উত্তর দিলেন। এমন উৎকৃষ্ট কথা বলে তাকে সন্তুষ্ট করলেন,
যা হৃদয়কে আনন্দ ও প্রশান্তিতে ভরে দেয়।

আনাস   বলেন, ‘একদিন সাফিয়্যা   জানতে পারলেন, হাফসা   তাকে
ইহুদির মেয়ে বলেছেন। এ খবর শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। নবিজি   তার
কাছে এসে তাকে কাঁদো কাঁদো অবস্থায় দেখে বললেন :

- কী হয়েছে? তুমি কাঁদছ যে?

- হাফসা আমাকে বলেছে, আমি নাকি ইহুদির মেয়ে।

রাসুল ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “তুমি একজন নবির^{১৭৩} মেয়ে। একজন নবি তোমার চাচা^{১৭৪}। তুমি একজন নবির স্ত্রী। সে কীভাবে তোমার ওপর গৌরব বোধ করে?”^{১৭৫}

অসুস্থ ও বিষণ্ণ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতেন

‘হজের সময় আয়িশা ﷺ-এর হায়িজ শুরু হলো। এ কারণে তিনি কাঁদছিলেন। নবিজি ﷺ এসে দেখলেন, আয়িশা ﷺ কেঁদে চলেছেন। জিজ্ঞেস করলেন :

- কী হয়েছে? তোমার কি হায়িজ শুরু হয়েছে?
- জি।
- এতে কাঁদার তো কোনো কারণ নেই। আল্লাহ এটি প্রত্যেক আদম-কন্যার জন্য নির্ধারণ করেছেন। তুমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজের বাকি আমলগুলো করতে থাকো।

আয়িশা ﷺ বলেন, “হজ আদায়ের পর তিনি আব্দুর রহমানকে আদেশ দিলেন আমাকে তানয়িম থেকে উমরা করিয়ে আনতে—যেখান থেকে আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম।”^{১৭৬}

স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের প্রতি খেয়াল রাখা। তাদের অবস্থাদি বোঝার চেষ্টা করা। নারীরা কখনো চিন্তিত থাকে। কখনো হায়িজ, নিফাস, জন্মদানের কারণে অসুস্থতা বোধ করে। এ সময়টাতে স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর পাশে থাকা। তার কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করা।

স্বামী যখন স্ত্রীর কষ্টগুলো উপলব্ধি করে এবং তা দূর করতে সচেষ্ট হয়, স্ত্রী কখনো এই অনুপম আচরণ ভুলতে পারে না। সে সারা জীবনের জন্য নিজেকে স্বামীর কাছে ঋণী মনে করে।

১৭৩. হারুন বিন ইমরান ﷺ।—তুহফাতুল আহওয়াজি : ১০/২৬৮।

১৭৪. মুসা বিন ইমরান ﷺ।—তুহফাতুল আহওয়াজি : ১০/২৬৮।

১৭৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮২৯। হাদিসের মান : সহিহ।

১৭৬. সহিহুল বুখারি : ৩১৬, সহিহ মুসলিম : ১২১১।

স্ত্রী অসুস্থ হলে তিনি রুকইয়া করতেন

আয়িশা   বলেন, ‘নবিজি   সুরা ফালাক ও নাস পড়ে জনৈক অসুস্থ স্ত্রীর গায়ে ডান হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন—

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا
شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

“হে আল্লাহ, মানুষের প্রভু, কষ্ট দূর করুন, সুস্থ করে দিন। আপনিই আরোগ্যদানকারী। আপনি ছাড়া কেউই রোগমুক্ত করতে পারে না। এমনভাবে আরোগ্য দান করুন, যার পরে কোনো রোগ অবশিষ্ট থাকে না।”^{১৭৭}

স্বামী যখন স্ত্রীর গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, স্ত্রীর ব্যথার জায়গাতে স্বামীর স্নেহের পরশ লাগে—তখন স্পর্শের এক বিরাট প্রভাব পড়ে। যদিও এতে শরীরের রোগ সেরে না যায়। তবুও অন্তরের বিরাট একটি বোঝা যেন নেমে যায় রুগ্ণ স্ত্রীর। স্বামীর স্নেহের পরশ পেয়ে প্রশান্ত হয় তার মন। কেননা, সে বুঝতে পারে তার প্রিয়তম স্বামী তার কষ্টটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

উম্মে জার’-এর হাদিসে এসেছে, ‘এগারো জনের একজন নারী তার স্বামীর দোষ বর্ণনা করে এভাবে—সে দুঃখ বোঝার জন্য হাতটাও প্রসারিত করে না।’^{১৭৮}

‘অর্থাৎ স্ত্রী কোনো চিন্তায় আছে কি না, তা বোঝার ও দূর করার চেষ্টা করে না। হাদিসে ব্যবহৃত (بَتَّ) শব্দটির অর্থ পেরেশানি। অভিযোগ ও অসুস্থতা বোঝানোর জন্যও এটি ব্যবহৃত হয়। “দুঃখ বোঝার জন্য হাতটিও প্রসারিত করে না”—এই বাক্য বলে মহিলা বোঝাতে চাইছে, স্ত্রীর কাছে যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, সেসব বিষয় নিয়ে তার স্বামী মাথা ঘামায় না। এটিকে সে ভালোবাসার শৈথিল্য বলে অভিহিত করেছে।’^{১৭৯}

১৭৭. সহিহুল বুখারি : ৫৭৪৩, সহিহ মুসলিম : ২১৯১।

১৭৮. সহিহুল বুখারি : ৫১৮৯, সহিহ মুসলিম : ২৪৪৮।

১৭৯. ফাতহুল বারি : ৯/২৬৩।

দুঃখ-কষ্টে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের হাত ধরবে, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনেক স্বামী আছে, স্ত্রীর অসুস্থতাকে মোটেও পাত্তা দেয় না। তারা চায় স্ত্রী সব সময় সুস্থ ও সবল থাকুক। একটু অসুস্থ হলেই স্ত্রীকে বাপের বাড়ি রেখে আসে। যতদিন সুস্থ না হয় বাসায় আনে না। তার কাছে অসুস্থ স্ত্রী হচ্ছে বোঝা—একটা উটকো ঝামেলা।

স্ত্রীর প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সহমর্মিতা

সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, ‘একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের নিয়ে হজের সফরে রওনা হন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি বাহন থেকে নেমে উটগুলো হাঁকিয়ে চলল। উটগুলো দ্রুত চলতে শুরু করল। রাসুল ﷺ তখন বললেন, “মহিলাদের নিয়ে সাবধানে চলো।” এভাবে তারা সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে সাফিয়্যা ﷺ-এর উট হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সাফিয়্যা ﷺ-এর উটটি সবচেয়ে সুন্দর ছিল। উটকে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখে তিনি কেঁদে উঠলেন। রাসুল ﷺ-কে জানালে তিনি এগিয়ে এলেন সাফিয়্যা ﷺ-এর দিকে। সাফিয়্যা ﷺ-এর অশ্রু মুছে দিলেন নিজ হাতে।’^{১৮০}

নিজ হাত দিয়ে স্ত্রীর চোখের জল মুছে দেওয়া স্ত্রীর প্রতি যথার্থ সমবেদনা। এ সমবেদনার মাঝে লুকিয়ে থাকে স্ত্রীর প্রতি নিখাদ আদর ও ভালোবাসা। সাফিয়্যা ﷺ-এর কান্নার কারণ যদিও তেমন গুরুতর ছিল না। তার সুন্দর উটটি বসে পড়েছিল বলে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। তবুও রাসুল ﷺ এসে তার সহমর্মী হলেন চোখের জল মুছে। তিনি তার অনুভূতিকে তুচ্ছ মনে করলেন না।

সময়ের আবর্তে নারীরা বিভিন্ন বিপদ ও সমস্যার মধ্য দিয়ে যায়। এ সময়ে তাদের প্রবোধ দিতে হয়, তাদের অন্তর প্রশান্ত করতে হয়। এ জন্য স্বামীকে এগিয়ে আসতে হয়। স্ত্রীকে সমবেদনা জানাতে হয়। যেন স্ত্রী বুঝতে পারে যে, সে একা নয়। তার সাথে তার স্বামী আছে।

মা, বাবা, ভাই, বোন সবাইকে ছেড়ে স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে পাড়ি জমায়। এখানে বড়ই একা সে। কষ্টের সময় তার এমন কাউকে দরকার যে তাকে ধৈর্যধারণ

করতে সহায়তা করবে, সবরের ফজিলত স্মরণ করিয়ে দেবে। অনেক লোক এমন আছে, যাদের চরিত্রে এই গুণ নেই। স্ত্রীর বিপদাপদের কোনো পরোয়াই তাদের কাছে নেই। কিছু জঘন্য লোক তো এমন আছে, যারা স্ত্রীর বিপদকে পাত্তাই দেয় না: বরং স্ত্রীর মুসিবত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ বলেছেন, “হে আল্লাহ, এতিম ও নারী— এই দুই দুর্বলের অধিকার হরণ করা আমি হারাম ঘোষণা করছি।”^{১৮১}

স্ত্রীদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন

‘একবার আবু বকর রাঃ এসে রাসুলুল্লাহ সঃ-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তখন আয়িশা রাঃ-কে নবিজি রাঃ-এর সাথে জোর গলায় কথা বলতে শুনলেন। অনুমতি পেয়ে আবু বকর রাঃ প্রবেশ করলেন। তারপর আয়িশা রাঃ-কে “হে উম্মে রুমানের মেয়ে” বলে সম্বোধন করলেন এবং তাকে ধরে বললেন, “তুমি রাসুলুল্লাহ সঃ-এর সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলছ!” তখন নবিজি রাঃ তাদের বাপ-মেয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আবু বকরকে থামালেন। আবু বকর রাঃ বের হয়ে গেলে নবিজি রাঃ আয়িশা রাঃ-কে সম্ভ্রষ্ট করতে গিয়ে বললেন, “দেখলে কীভাবে তোমাকে ওই লোকের হাত থেকে বাঁচালাম?” কিছুক্ষণ পর আবু বকর রাঃ আবার এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ভেতরে এসে তিনি তাঁদের দুজনকে হাসতে দেখলেন। তাঁদের বললেন, “আল্লাহ রাসুল, আপনারা যুদ্ধের সময় আমাকে যেভাবে দলে নিয়েছিলেন, সন্ধির সময়ও দলে নিয়ে নিন!”^{১৮২}

কখনো কখনো তো রাসুল সঃ-এর কোনো স্ত্রী রাগ করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর সাথে কথা বলতেন না। রাসুল সঃ ধৈর্যের সাথে তাদের রাগের মোকাবেলা করতেন। উমর বিন খাত্তাব রাঃ বলেন, ‘আমরা কুরাইশরা যখন মক্কায় ছিলাম, তখন আমরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব চালাতাম। কিন্তু মদিনায় এসে দেখলাম, আনসারি নারীরা পুরুষদের ওপর ছড়ি ঘোরায়। আনসারি নারীদের দেখাদেখি আমাদের নারীরাও দেখি এখন পুরুষদের ওপর ছড়ি

১৮১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৬৭৮। হাদিসের মান : সহিহ।

১৮২. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৯২৭। মুহাম্মাদ বিন বশির রাঃ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : সহিহ।

ঘোরাতে শুরু করেছে। একবার আমি কোনো ব্যাপারে আমার স্ত্রীর ওপর একটু গলা চড়িয়ে কথা বলি। তখন আমার স্ত্রীও আমাকে অনুরূপ ফিরিয়ে দেয় এবং আমার সাথে বিতর্ক করে। এটা আমার কাছে অপছন্দনীয় মনে হলো। তখন তিনি বললেন, “আপনি আমার আচরণে অবাক হচ্ছেন? আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে রাগ করে কথা বলেন। তাদের কেউ কেউ তো রাগ করে পুরো দিন রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলেন না।” তার কথায় আশ্চর্য হলাম আমি। আমি হাফসার কাছে গেলাম। তাকে বললাম, “হাফসা, তোমাদের কেউ কি সকাল হতে রাত পর্যন্ত নবিজি ﷺ-এর সাথে রাগ করে কথা বন্ধ করে রাখে?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” আমি বললাম, “তাহলে সে তো ধ্বংস! রাসুল ﷺ-কে রাগানোর কারণে তুমি কি আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে? তুমি তো ধ্বংস হয়ে যাবে!...”^{১৮৩}

► হাদিস থেকে শিক্ষা

- ‘নারীদের সাথে কঠোর আচরণ করা, তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা নিন্দনীয়। কেননা, নবিজি ﷺ নিজ গোত্র কুরাইশের আচরণ ছেড়ে আনসারদের আচরণ গ্রহণ করেছেন এ ক্ষেত্রে।
- স্ত্রীদের মন্দ আচরণে সবর করা, তাদের ছোটখাটো ভুল এড়িয়ে যাওয়া, স্বামীর অধিকার আদায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তাদের ক্ষমা করে দেওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায় হাদিসটিতে। তবে কখনো আল্লাহর অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের শিথিলতা গ্রহণীয় নয়।’^{১৮৪}

বাড়ির কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন

আসওয়াদ রা. বলেন, ‘আমি আয়িশা রা.এর কাছে জানতে চাইলাম, “রাসুল ﷺ ঘরে এসে কী করতেন?” তিনি উত্তর দিলেন, “ঘরে এসে তিনি ঘরের কাজ করতেন। যখন নামাজের সময় হতো, নামাজের জন্য বের হয়ে যেতেন।”’^{১৮৫}

১৮৩. সহিহুল বুখারি : ৮৯, সহিহ মুসলিম : ১৪৭৯।

১৮৪. ফাতহুল বারি : ৯/২৯১।

১৮৫. সহিহুল বুখারি : ৬৭৬।

প্রশ্ন হতে পারে, তিনি ঘরের কোন কাজটি করতেন? এ প্রশ্নের উত্তর আরেকটি হাদিসে এসেছে এভাবে, ‘রাসুল ﷺ-ও আর দশজন মানুষের মতো ঘরে এসে কাপড় কাচতেন। ছাগলের দুধ ধুতেন। নিজের কাজ করতেন।’^{১৮৬}

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘ঘরে তিনি নিজের কাপড় সেলাই করতেন। জুতো মেরামত করতেন। পুরুষরা ঘরের যে কাজগুলো করে, তিনিও তা-ই করতেন।’^{১৮৭}

অথচ এ সময়ের মানুষগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা স্ত্রীদের ওপর অসহ্য বোঝা দিয়ে রাখে। স্ত্রী কখনো অসুস্থ থাকে, শারীরিকভাবে দুর্বল থাকে। এ সময়ে বাড়ির কাজে তাদের একটু সাহায্য করলেই চলে। কিন্তু নবাবজাদা তা করবে কেন!

স্ত্রীকে বাহনে চড়তে সাহায্য করতেন

রাসুল ﷺ-এর খাদিম আনাস রাদি আল্লাহু আলাইহি বলেন, ‘আমি দেখলাম, সাফিয়্যা রা. উটে আরোহণের সময় রাসুলুল্লাহ তাকে কাপড়ে ঢেকে দিচ্ছেন। এরপর উটের কাছে বসে হাঁটু উঁচু করে রাখছেন। সাফিয়্যা রা. রাসুল ﷺ-এর হাঁটুর ওপর পা রেখে বাহনে চড়ছেন।’^{১৮৮}

রাসুল ﷺ তাঁর হাঁটু দাঁড় করে রাখছেন আর সাফিয়্যা রা. রাসুল ﷺ-এর হাঁটুর ওপর পা রেখে বাহনে চড়ছেন। এটা রাসুল ﷺ-এর বিনম্রতা, স্ত্রীর প্রতি প্রেম-ভালোবাসার এক আশ্চর্য বহিঃপ্রকাশ।

রাসুল ﷺ স্ত্রীদের জন্য নিজেকে পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত রাখতেন

রাসুল ﷺ যখনই ঘরে আসতেন, মিসওয়াক করতেন প্রথমে। যাতে কোনো মতেই স্ত্রী তাঁর মুখ থেকে গন্ধ না পান। গুরাইহ রা. বলেন, ‘আমি আয়িশা রা. -এর কাছে জানতে চাইলাম, “রাসুল ﷺ ঘরে ঢুকে প্রথমে কী করতেন?”

১৮৬. আদাবুল মুফরাদ : ৫৪১, শামায়িল : ৩৪৩। হাদিসের মান : সহিহ।

১৮৭. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৩৮২। হাদিসের মান : সহিহ।

১৮৮. সহিহুল বুখারি : ২৮৯৩, সহিহ মুসলিম : ১৩৬৫।

উত্তরে আয়িশা   বলেন, “প্রথমে এসে তিনি মিসওয়াক করতেন।”^{১৮৯}

‘ঘরে এসে প্রথমেই মিসওয়াক করার রহস্য হচ্ছে, অনেক সময় মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে মুখের ঘ্রাণ পাল্টে যায়। তাই বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই মুখের গন্ধ দূর করাই উত্তম আচরণের অংশ।’^{১৯০}

যখনই ঘুম থেকে জাগতেন, মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করে নিতেন তিনি। আয়িশা   বলেন, ‘রাতে দিনে যখনই রাসুল   ঘুম থেকে জাগতেন, তখনই অজুর আগে মিসওয়াক করে নিতেন।’^{১৯১}

‘এ থেকে বোঝা যায়, মুখে যখন দুর্গন্ধ আসে, খাবারের পরে বা অন্য সময়ে মুখের ঘ্রাণ পাল্টে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে তখন মিসওয়াক করে নেওয়া মুসতাহাব।’^{১৯২}

ইবনুল কাইয়িম   বলেন, ‘রাসুল   মিসওয়াক পছন্দ করতেন। রোজাহীন অবস্থায় যেমন রোজা অবস্থায়ও তিনি মিসওয়াক করতেন। ঘুম থেকে উঠলে মিসওয়াক করতেন। মিসওয়াক করতেন অজুর সময়, নামাজের সময়, বাড়িতে প্রবেশের সময়। ব্যবহার করতেন আরাক গাছের মিসওয়াক।’^{১৯৩}

স্ত্রী স্বামীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবে। তেমনই স্বামীও স্ত্রীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবে। এ বিষয়টি ছোটখাটো মনে হলেও আদতে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অপরিষ্কার চালচলনের কারণে বিবাহ বন্ধনে চিড় ধরতে পারে। এমনকি তালাকও হতে পারে।

ভাঁর শরীর থেকে কেবলই সুঘ্রাণই বের হতো

আয়িশা   বলেন, ‘রাসুল   নিজ শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়া খুবই অপছন্দ ও গুরুতর মনে করতেন।’^{১৯৪}

“

১৮৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৩।

১৯০. হাশিয়াতুস সুয়ুতি আলা সুনানিন নাসায়ি : ১/১০।

১৯১. সুনানু আবি দাউদ : ৫৭। হাদিসের মান : হাসান।

১৯২. আল-মুফহিম : ৩/১৩৬।

১৯৩. জাদুল মাআদ : ১/১৬৭।

১৯৪. সহিহুল বুখারি : ৬৯৭২, সহিহ মুসলিম : ১৪৭৪।

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ নিজ শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়াকে খুবই ঘৃণা করতেন।’^{১৯৫}

সুগন্ধি ব্যবহার করা রাসুল ﷺ-এর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি সুগন্ধি ভালোবাসতেন। বেশি বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। দুনিয়াতে তাঁর প্রিয় জিনিসগুলোর একটি ছিল সুগন্ধি। তিনি বলেন, ‘দুনিয়াতে তিনটি বস্তুর প্রতি আমার হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে : স্ত্রী, সুগন্ধি এবং নামাজে আমার চক্ষুর শীতলতা রাখা হয়েছে।’^{১৯৬}

কিছু বস্তু আছে হালাল। কিন্তু এগুলোর কারণে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। এ জন্য রাসুল ﷺ পেঁয়াজ ও রসুনের মতো জিনিস খাওয়া পরিত্যাগ করেছিলেন।

আজকালকার স্বামীদের মধ্যে কোথায় রাসুল ﷺ-এর আদর্শ! তারা বাড়ির বাইর থেকে আসে ঘামের দুর্গন্ধ নিয়ে। বাড়িতে এসে পরিষ্কার হবে কিন্তু সে চিন্তা তাদের নেই। বিড়ি ফুঁকে, সিগারেট টেনে তাদের দিন গুজরান হয়। তাদের শরীরের বোটকা দুর্গন্ধে ঘর ভরে যায়। এদিকে স্ত্রী কী সুন্দর সুগন্ধি মেখে তার জন্য অপেক্ষা করে।

স্ত্রীদের জন্য নিজেকে পরিপাটি রাখতেন

পুরুষরা যেমন চায়, তাদের স্ত্রী তাদের সামনে সেজেগুজে থাকবে। তেমনই নারীদের মনোবাঞ্ছা একই হয়ে থাকে। রাসুল ﷺ চুল আঁচড়াতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেকে, সাজসজ্জা করে পরিপাটি থাকতেন। নিজ সাহাবিদেরও আদেশ দিতেন। তিনি বলেন, ‘যার মাথায় চুল আছে, সে যেন তা পরিপাটি রাখে।’^{১৯৭}

‘অর্থাৎ যার মাথায় চুল আছে; সে যেন তা সুন্দর করে পরিষ্কার করে। মাথার চুল ঠিকমতো ধোয়, তেল দেয়, আঁচড়ে নেয়। চুলের যত্নে যেন অবহেলা না করে। কেননা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি থাকা শরিয়তের পছন্দনীয় একটি বিষয়।...’^{১৯৮}

১৯৫. আল-মুজামুল আওসাত : ৮৭৬৪।

১৯৬. সুনানুন নাসায়ি : ৩৯৩৯। হাদিসের মান : সহিহ।

১৯৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪১৬৩। হাদিসের মান : সহিহ।

১৯৮. আওনুল মাবুদ : ৯/১১৮৩।

তাই পুরুষদের উচিত নিজের স্ত্রীর জন্য নিজেকে পরিষ্কার রাখা, সাজসজ্জা করে পরিপাটি থাকা। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, ‘আমি যেমনি চাই, স্ত্রী আমার জন্য সেজেগুজে থাকবে। আমিও তেমনি তার জন্য সাজতে পছন্দ করি। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [স্ত্রীদেরও তাদের স্বামীর ওপর অনুরূপ ন্যায়সংগত অধিকার আছে]^{১৯৯-২০০}

সাহল বিন সাদ রাঃ বলেন, ‘একবার একটি লোক দরোজার ফাঁক দিয়ে রাসুল সাঃ-এর ঘরের ভেতর উঁকি দিল। তখন সে দেখল, রাসুল সাঃ চিরুনি হাতে চুল আঁচড়াচ্ছেন।’^{২০১}

কখনো তাঁর স্ত্রী তাঁর চুল আঁচড়ে দিতেন। আয়িশা রাঃ বলেন, ‘নবিজি সাঃ যখন ইতিকাফ করতেন, মসজিদ থেকে আমার কক্ষের দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন। আমি তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম।’^{২০২}

তাঁর স্ত্রী তাঁর মাথাও ধুয়ে দিতেন। আয়িশা রাঃ বলেন, ‘হায়িজ অবস্থায়ও আমি রাসুল সাঃ-এর মাথা ধুয়ে দিতাম।’^{২০৩}

পরিষ্কার-পরিপাটি থাকার গুরুত্ব রাসুল সাঃ-এর সিরাত থেকে স্পষ্ট জানতে পারি আমরা। তিনি উৎসাহ দিতেন মানুষ যেন পরিচ্ছন্নতার সুন্নাহগুলো যথাযথভাবে আদায় করে। যেন মানুষ তার সবচেয়ে সুন্দর রূপ ও আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়।

স্ত্রীর বৈধ ইচ্ছে পূরণ করতেন

জাবির রাঃ রাসুল সাঃ-এর হজের বর্ণনায় বলেন, ‘আয়িশা রাঃ রাসুল সাঃ-কে বলেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আমার অবস্থা এই যে, হজ না করা পর্যন্ত আমি (উমরার জন্য) বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারিনি। কিন্তু হজ আদায় করে নিয়েছি। রাসুল সাঃ তখন আব্দুর রহমানকে ডেকে আয়িশাকে নিয়ে উমরা

১৯৯. সূরা আল-বাকারা : ২২৮।

২০০. ইবনে জারির আত-তাবারি রাঃ কৃত তাফসিরুত তাবারি : ৪/৫৩২।

২০১. সহিহুল বুখারি : ৫৯২৪, সহিহ মুসলিম : ২১৫৬।

২০২. সহিহুল বুখারি : ২০২৯, সহিহ মুসলিম : ২৯৭।

২০৩. সহিহুল বুখারি : ৩০১, সহিহ মুসলিম : ২৯৭।

করিয়ে আনার আদেশ দিলেন।’ জাবির রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ ছিলেন সহজ একজন মানুষ। স্ত্রীর বৈধ ইচ্ছে পূরণ করতেন তিনি।’^{২০৪}

‘অর্থাৎ রাসুল সঃ ছিলেন সহজ চরিত্রের অধিকারী, উন্নত গুণের অধিকারী একজন মানুষ। যার মাঝে আদর ও ভালোবাসা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন : **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** ‘নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।’^{২০৫}

অথচ আজকাল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল ঝগড়া, ফাসাদ ও বাড়াবাড়িই দেখা যায়।

স্ত্রীদের বৈধ খেলাধুলো দেখতে দিতেন

আয়িশা রাঃ বলেন, ‘একবার রাসুল সঃ ঘরের ভেতর বসে ছিলেন। এমন সময় বাইরে শিশুদের কণ্ঠ ও কোলাহল শুনতে পেলাম আমরা। রাসুল সঃ উঠে গিয়ে দেখলেন, কিছু হাবশি তাদের বল্লম নিয়ে খেলছে। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, “আয়িশা, এদিকে আসো। দেখে যাও।” আমি এগিয়ে আসলাম। রাসুল সঃ-এর কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ নিয়ে আমি বালকদের খেলা দেখতে লাগলাম। একটু পর তিনি বললেন, “খেলা দেখা হয়েছে? তুষ্ট হয়েছে?” আমি রাসুল সঃ-এর কাছে আমার মর্যাদা কতটুকু তা জানতে চাইলাম, তাই বললাম, “না।”^{২০৬}

ইবনে বাত্তাল রাঃ বলেন, ‘এ হাদিসে রাসুল সঃ-এর অনুপম চরিত্রের অন্যতম একটি দিক বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি পুরুষের উচিত তার স্ত্রীকে এমন ভালোবাসায় আগলে রাখা। স্ত্রীর আনন্দের জন্য বৈধতার সীমানায় বিনোদনের ব্যবস্থা করে দেওয়া।’^{২০৭}

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়িশা রাঃ বলেন, ‘আমি যেন তাদের খেলা দেখতে পারি, সে জন্য তিনি আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তিনি আমার

২০৪. সহিহ মুসলিম : ১২১৩।

২০৫. সূরা আল-কলাম, ৬৮ : ৪।

২০৬. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৯১। হাদিসের মান : সহিহ।

২০৭. শারহ সহিহিল বুখারি : ২/৫৪৮।

জন্য সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত আমিই সেখান থেকে সরে আসি।’^{২০৮}

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আয়িশা রাঃ বলেন, ‘আমি খেলারত বালকদের দেখছিলাম আর রাসুল সঃ-এর উদ্দেশে একটু পর পর বলছিলাম, “আল্লাহর রাসুল, তাড়াহুড়ো করবেন না।” তিনি আমার কথামতো দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পর বললেন, “হয়েছে?” আমি আবারও বললাম, “তাড়াহুড়ো করবেন না।” আয়িশা রাঃ বলেন, ‘খেলা দেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমি চাচ্ছিলাম, রাসুল সঃ-এর মনে আমার কতটুকু সমাদর ও সম্মান রয়েছে, সে কথা অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে পৌঁছাক।’^{২০৯}

‘এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, স্ত্রীর বৈধ ইচ্ছার প্রতিপালন করা। সদাচরণের আরেকটি অংশ হচ্ছে, স্ত্রী হালাল বিনোদনে আগ্রহী হলে সে সুযোগ করে দেওয়া। যদিও স্বামীর জন্য কষ্টকর হয়—এ ক্ষেত্রে সবর করাই তার কর্তব্য।’^{২১০}

ইদের সময় বৈধ কবিতা-গান শুনতে স্ত্রীদের নিষেধ করতেন না

আয়িশা রাঃ বলেন, ‘একবার রাসুল সঃ আমার ঘরে এলেন। তখন দুজন বালিকা আমার পাশে বসে বুআসের দিনের গান গাইছিল। (যেদিন আওস ও খাজরাজের মাঝে যুদ্ধ হয়েছিল, সেদিনটি হচ্ছে বুআসের দিন)। রাসুল সঃ ঘরে এলেন। মুখ ঘুরিয়ে বিছানায় গুয়ে পড়লেন। তখন আবু বকর রাঃ ঘরে এলেন। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, “রাসুল সঃ-এর ঘরে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র!” আবু বকর রাঃ-এর কথা শুনে রাসুল সঃ তাঁর দিকে ফিরে বললেন, “তাদের কিছু বোলো না।” আবু বকর অন্যদিকে মনোযোগ ফেরালে আমি বালিকা-দুটোকে ইশারা করলাম। তারা বের হয়ে গেল। আর সেদিন ছিল ইদের দিন।’^{২১১}

২০৮. সহিহ মুসলিম : ৮৯২।

২০৯. নাসায়ি রাঃ কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ৮৯৫১। হাদিসের মান : সহিহ।

২১০. ইবনে বাত্তাল রাঃ কৃত শারহ সহিহিল বুখারি : ৭/২৯৮।

২১১. সহিহুল বুখারি : ৯৫০, সহিহ মুসলিম : ৮৯২।

ইবনে হাজার   বলেন, 'এ হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইদের দিন বিভিন্নভাবে পরিবারের মনোরঞ্জন ও বিনোদনের ব্যবস্থা করে দেওয়া, দীর্ঘ দিন ইবাদতের কষ্ট করার পর শারীরিক আরামের ব্যবস্থা করার বৈধতা সাব্যস্ত আছে।...এ হাদিসে নারীদের প্রতি কোমল আচরণ করা এবং তাদের আদর-সোহাগে আগলে রাখার বিষয়টিও বিবৃত হয়েছে।'^{২১২}

রাসুলুল্লাহ   ইদ ও বিবাহের ন্যায় আনন্দের দিনগুলোতে দফ বাজিয়ে ওই ধরনের বা সমার্থক গান করার অনুমতি দিয়েছেন।

রাসুল  -এর যুগের পর বিজিত হলো পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য। সাহাবিরা দেখলেন, পারস্য ও রোমানদের গান বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশিত হয়। তাদের গীতিকথায় মদ ও নারীদের নিয়ে উত্তেজনামূলক কথাবার্তার মতো হারাম বর্ণনা থাকে।

এসব গান মানুষের মনের ভেতরের কামনাকে জাগ্রত করে। সাহাবিগণ এসব গান নিষিদ্ধ করেন শক্তভাবে।

সাহাবিদের এ নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ করে, রাসুল   সাহাবিদেরকে যে গানের বৈধতা দিয়েছিলেন, তা এসব গান ছিল না। রাসুল   যে বাদ্যযন্ত্রের বৈধতা দিয়েছিলেন, সে বাদ্যযন্ত্র এমন ছিল না। রাসুল   কেবল আরবে প্রচলিত এক ধরনের বাদ্যযন্ত্রের অনুমতি দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে বাদ্যযন্ত্রসহ অনারবদের যে গান প্রচলিত আছে, সে গানের অনুমতি নেই শরিয়তে। যদিও হাদিসে গান শব্দটি এসেছে আর এগুলোকেও গান বলা হয়, তবুও তা নিষিদ্ধ। হাদিসে বর্ণিত গান শব্দটি যে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে আর অনারবদের মাঝে গান শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়—উভয়ের মাঝে স্পষ্ট প্রভেদ আছে। একজন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন লোক অনায়াসে তা বুঝতে পারবেন। কারণটা হচ্ছে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গাওয়া অনারবদের গান প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে তোলে, স্বভাবে বিকৃতি আনে, গুনাহর দিকে আহ্বান করে। এ গানগুলো জিনার দিকে সম্মোহন করে। আর আরবদের যে গান শরিয়তে বৈধ বলা হয়েছে, তাতে আদৌ কোনো ক্ষতি নেই।

অতএব, যে ব্যক্তি প্রচলিত গানের সাথে রাসুল ﷺ অনুমোদিত গানের সাদৃশ্য স্থাপনের চেষ্টা করে, সে মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। কেউ যদি অনুমোদিত গান ও নিষিদ্ধ গানের সার্বিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদিতে স্পষ্ট পার্থক্য থাকার পরও উভয়কে এক প্রমাণ করার চেষ্টা করে, তার এই অপচেষ্টা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।^{২১৩}

স্ত্রীর বিনোদন এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ করেননি তিনি। বরং আয়িশা রা.এর কাছে বালিকাদের গমনাগমনের অনুমতি ছিল। তারা ছিলেন আয়িশা রা.এর খেলার সাথি। রাসুল ﷺ সতর্ক থাকতেন যেন আয়িশার খেলার সাথি এসব মেহমান চলে না যায়।

আয়িশা রা. বলেন, ‘আমি পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার কিছু খেলার সাথিও ছিল। যখন রাসুল ﷺ আমার ঘরে আসতেন, তারা আড়ালে চলে যেত। রাসুল ﷺ তাদের আবার আমার কাছে নিয়ে আসতেন। আমরা আবার আগের মতো খেলতে থাকতাম।’^{২১৪}

ইমাম নববি রহ. বলেন, ‘এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রগাঢ় স্নেহ ও উৎকৃষ্ট আচরণের পরিচয়।’^{২১৫}

আয়িশা রা. পুতুল নিয়ে খেলতেন। রাসুল ﷺ এ নিয়ে তার সাথে রসিকতা করতেন।

আয়িশা রা. বলেন, ‘রাসুল ﷺ তাবুক বা খাইবার যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। আমার খেলনাগুলোর ওপর একটি পর্দা ছিল। হঠাৎ বাতাস এসে তার এক প্রান্ত উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমার কিছু পুতুল দেখা গেল।

রাসুল ﷺ বললেন, “এগুলো কী?”

আমি বললাম, “আমার পুতুল।”

২১৩. ইবনে রজব রহ. কৃত ফাতহুল বারি : ৬/৭৮।

২১৪. সহিহুল বুখারি : ৬১৩০, সহিহ মুসলিম : ২৪৪০।

২১৫. ইমাম নববি রহ. কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১০/২০৫।

রাসুল ﷺ পুতুলের মাঝে দু'ডানাবিশিষ্ট কাপড়ের তৈরি একটি ঘোড়া দেখিয়ে বললেন, “মাঝখানের এটা কী?”

- ঘোড়া।

- ঘোড়ার পিঠে এ দুটো কী?

- এ দুটো ঘোড়ার ডানা।

- ঘোড়ার পিঠে দুটো ডানা?!

- কেন? আপনি কী শুনেছেন—সুলাইমান ﷺ-এর ঘোড়ার পিঠে বেশ কয়েকটি ডানা ছিল?

এ শুনে রাসুল ﷺ এমন হাসলেন যে, তার মাড়ির দাঁত দেখা গেল।^{২১৬}

রাসুল ﷺ-এর সে হাসি তাঁর স্ত্রীর মনকে কতটা প্রফুল্ল করেছিল—সেটার পরিমাপ কি আমরা করতে পারব। রাসুল ﷺ-এর এক রসিকতা তাঁর স্ত্রীর মনকে যে রকম পুলকিত করেছিল, নিশ্চয় সে রকম পুলকই স্ত্রী পেতে চায় তাঁর স্বামীর কাছ থেকে।

রাসুল ﷺ সাহাবিদেরকে স্ত্রীর সাথে হাসি-কৌতুক করার প্রতি উৎসাহিত করতেন। কারণ, এতে তাদের অন্তর পুলকিত হয়, হৃদয় হয় প্রফুল্ল। ‘জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বিয়ে করলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, “তুমি কিশোরী কেন বিয়ে করলে না—তুমি তার সাথে খেলতে, আর সেও তোমার সাথে খেলত। অথবা তুমি তাকে হাসাতে আর সেও তোমাকে হাসাত।”^{২১৭}

রাসুল ﷺ আরও বলেন, ‘আল্লাহর জিকির ছাড়া অন্যসব কাজ অনর্থক। তবে চারটি ব্যতীত। এক. দুই লক্ষ্যস্থলের মাঝে ছুটে চলা। দুই. ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। তিন. স্ত্রীর সাথে হাসি-কৌতুক করা। চার. সাঁতার শেখা।^{২১৮}

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটু খুনসুটি, একটু হাস্যরস, একটুখানি রসিকতা আনন্দে ভরে তোলে পরিবারকে। ঘর হয় শান্তির আবাস। দাম্পত্য বন্ধন

২১৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৩২। হাদিসের মান : সহিহ।

২১৭. সহিহুল বুখারি : ২০৯৭, সহিহ মুসলিম : ৭১৫।

২১৮. তাবারানি ﷺ কৃত আল-কাবির : ১৭৮৫। হাদিসের মান : সহিহ।

হয় শক্তিশালী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার হৃদয়তা ও ভালোবাসা গভীর হতে থাকে ক্রমশ।

‘রসিকতা, কৌতুক ও খেলাধুলা স্ত্রীর মন জয় করার তিনটি মোক্ষম উপায়।’^{২১৯}

‘উমর রাঃ কঠোর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বলেন, “একজন পুরুষের উচিত স্ত্রীর সাথে শিশুর মতো আচরণ করা। কিন্তু বাড়ির বাইরে যখনই দরকার হবে, তখন বীর পুরুষের মতো আবির্ভূত হওয়া।”^{২২০}

সাবিত বিন উবাইদ রাঃ বলেন, ‘জাইদ বিন সাবিত রাঃ বাড়িতে শিশুর মতো হাস্যরস করতেন। আবার বাড়ির বাইরে তিনি ছিলেন বীর-বাহাদুরদের একজন।’^{২২১}

‘একবার এক বেদুইন নারী সদ্যপ্রয়াত স্বামীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, “আল্লাহর কসম, তিনি যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন হাসোজ্জ্বল থাকতেন। বাড়ির বাইরে গম্ভীর সুপুরুষ হয়ে যেতেন। বাড়িতে যা থাকত, তা খেতেন। বাড়িতে নেই এমন খাবার খেতে মন চাইলেও কখনো চাইতেন না।”^{২২২}

মানুষজন এখন বিপরীতমুখী আচরণ করছে। বন্ধুবান্ধব বা কর্মক্ষেত্রের সঙ্গীদের সাথে হাসি-খুশি আচরণ। কিন্তু বাড়িতে এলেই গুরু-গম্ভীর। গোমড়া হয়ে যায় তার মুখ। বিরক্তিতে কুঁচকে থাকে কপাল।

স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন

আয়িশা রাঃ বলেন, ‘একবার রাসুলুল্লাহ সঃ-এর সঙ্গে এক সফরে বের হলাম। আমি তখন কিশোরী। শারীরিকভাবে ছিলাম হালকা। শরীরে তেমন মেদ জমেনি। রাসুল সঃ সাহাবীদের বললেন, “তোমরা এগিয়ে যাও।” রাসুল সঃ-এর আদেশে তাঁরা এগিয়ে গেল। এরপর আমাকে বললেন, “চলো, দৌড় প্রতিযোগিতা করি।” আমরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম। দৌড়ে হারিয়ে দিলাম তাঁকে। তিনি চুপ করে থাকলেন, কিছু বললেন না। (এরপর অনেক

২১৯. মাওইজাতুল মুমিনিন : ১৬৮।

২২০. আল-মাজালিসাহ ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৩/৪৩০।

২২১. ইমাম বাগাবি রাঃ কৃত শারহুস সুন্নাহ : ১৩/১৮৩।

২২২. মাওইজাতুল মুমিনিন : ১০৬।

সময় কেটে যায়) আমার শরীর বাড়তে লাগল। দেহে মেদ জমল। আগের প্রতিযোগিতার কথা ভুলে গিয়েছিলাম ততদিনে। কোনো এক সফরে রাসুল ﷺ সাহাবিদের বললেন, “তোমরা এগিয়ে যাও।” রাসুল ﷺ-এর আদেশে তাঁরা এগিয়ে গেল। এরপর আমাকে বললেন, “চলো, দৌড় প্রতিযোগিতা করি।” আমি এবারও প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। এবার তিনি আমাকে হারিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলেন। বললেন, “এটা আগেরটার প্রতিশোধ।”^{২২৩}

রাসুল ﷺ-এর কাঁধে অনেক দায়িত্ব ছিল। শত ব্যস্ততা সর্বদা ঘিরে থাকত তাঁকে। কিন্তু তবুও তিনি স্ত্রীদের মনোরঞ্জনের দিকে নজর দিয়েছেন। বৈধ বিনোদনের ব্যবস্থা করেছেন তাদের জন্য। অথচ আমরা! আমরা বড় কর্মবিমুখ। একই সাথে বিমুখ হয়ে আছি রাসুল ﷺ-এর আদর্শ থেকেও। আমরা স্ত্রীদের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করব তো দূরের কথা, হাঁটতেও অস্বস্তি বোধ করি।

নৈশভ্রমণে স্ত্রীদের সঙ্গে গল্প করতেন

রাসুল ﷺ যখন বের হতেন, তখন স্ত্রীদের মাঝে লটারি দিয়ে সফরসঙ্গী নির্বাচন করতেন। একবার এ রকম ভ্রমণের লটারিতে আয়িশা ও হাফসা ﷺ-এর নাম এল। দুজনই রাসুল ﷺ-এর সাথে বের হলেন। রাসুল ﷺ প্রায় রাতের বেলা আয়িশা ﷺ-কে নিয়ে বের হতেন, তাঁর সাথে কথা বলতেন। এবার হাফসা ﷺ আয়িশা ﷺ-কে বললেন, ‘তুমি কি রাতের বেলা আমার বাহনে চড়বে আর আমি তোমারটায়? তারপর আমরা দেখব কী হয়।’ আয়িশা ﷺ বললেন, ‘হাঁ।’ যেমন বলা তেমন করা। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আয়িশা ﷺ-এর বাহনের নিকটে এলেন, কিন্তু তার ওপরে যে হাফসা ﷺ। রাসুল ﷺ এসে তাকে সালাম দিলেন, তাকে নিয়ে ভ্রমণে বের হলেন। এভাবে আয়িশা ﷺ সুযোগ হারালেন। এতে তার ঈর্ষা হতে লাগল। বাহন থেকে নেমে তিনি পদযুগল ইজখির ঘাসে জড়াতে লাগলেন। বলতে থাকলেন, ‘হে রব, আমার ওপর বিচ্ছু বা সাপ নিযুক্ত করে দিন, যেন সেগুলো আমাকে দংশন করে। আপনার রাসুলকে আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারব না।’^{২২৪}

২২৩. মুসনাদু আহমাদ : ২৫৭৪৫, সুনানু আবি দাউদ : ২৫৭৮, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৯।
হাদিসের মান : সহিহ। শব্দউৎস : মুসনাদু আহমাদ।
২২৪. সহিহুল বুখারি : ৫২১১, সহিহ মুসলিম : ২৪৪৫।

সফরে ধীরে উট চালানোর নির্দেশ দিতেন

আনাস   বলেন, ‘রাসুল   তাঁর কোনো এক সফরে ছিলেন । তখন আনজাশা নামক কালো এক কিশোর গান গেয়ে উট চালাচ্ছিল । (ফলে উটগুলো জোরে পা ফেলছিল) রাসুল   তাকে বললেন, “আনজাশা, উট ধীরে চালাও, তুমি কিছু কাচপাত্র (মহিলা) সাথে নিয়ে সফর করছ ।”^{২২৫}

আলিমগণ বলেন, ‘রাসুল   মহিলাদের কাচপাত্রের সঙ্গে উপমা দিলেন । কারণ, নারীদের ওপর কোনো কিছুর প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায় । তারা কঠিন কিছুর ধকল সহিতে পারে না ।

রাসুল  -এর কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, উটের গতি কমিয়ে মহিলাদের সফর সহজ করা । কারণ, উট যখন উটচালকের গান শুনত, তখন উট জোর গতিতে চলতে শুরু করত । এতে করে কষ্ট পড়ত আরোহী । নারীগণ দুর্বল গড়নের হওয়ার কারণে উটের দ্রুত ধাবমানতার ধকল সহিতে না পারার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকত । নারীদের কোনো ক্ষতি হওয়ার বা উট থেকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত । রাসুল   তাই আনজাশাকে গান গাইতে নিষেধ করেছিলেন ।^{২২৬}

স্ত্রীদের পরস্পরের ঠাট্টার অনুমোদন দিতেন

রাসুল  -এর ঘর যেন শুধু ঘর নয়, এ যে খুশির মহল । আয়িশা   বলেন, ‘একদিন সাওদা   আমার ঘরে এল । তখন রাসুল   আমার ঘরে । রাসুল  -এর এক পা ছিল আমার কোলে । আরেক পা ছিল সাওদার কোলে । সাওদার জন্য “হারিরা” প্রস্তুত করলাম আমি । (হারিরা হলো—আটা, চর্বি ও পানি দিয়ে পাকানো একধরনের স্যুপ)

তাকে বললাম, “নাও, খাও ।” সে অস্বীকার করল ।

আমি বললাম, “তোমাকে অবশ্যই খেতে হবে, অন্যথা আমি তোমার মুখে খাবার মেখে দেবো ।” তারপরও সাওদা অস্বীকার গেল ।’

২২৫. সহিহুল বুখারি : ৬১৬১, সহিহ মুসলিম : ২৩২৩ ।

২২৬. ইমাম নববি   কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৫/৮১ ।

আয়িশা   বলেন, ‘এরপর আমি আমার হাতে খাবার নিয়ে তার মুখে মেখে দিলাম। এ দেখে রাসুল   হাসতে লাগলেন।

তিনি সাওদাকে বললেন, “তুমিও তার মুখে খাবার মেখে দাও।” সাওদাও আমার মুখে খাবার মেখে দিল। রাসুল   আবারও হেসে উঠলেন। এদিকে উমর তখন ঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি ডাক দিলেন, “হে আব্দুল্লাহ বিন উমর! হে আব্দুল্লাহ বিন উমর!” নবিজি   মনে করলেন, উমর বোধ হয় ঘরে প্রবেশ করতে চাইবেন। তাই তিনি বললেন, “যাও তোমরা মুখ ধুয়ে নাও।”^{২২৭}

বর্তমান যুগে যদি মাঝখানে বসা স্বামীর উপস্থিতিতে দুই স্ত্রী এমন খুনসুটি করত, মূর্খতাবশত সে স্ত্রীদের তালাকই দিয়ে বসত। তার তো খবর নেই, রাসুলুল্লাহ   স্ত্রীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন। কীভাবে তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতেন।

আনন্দঘন পরিবেশে রাসুল  -এর প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে এ হাদিসে। এখানে রাসুল  -এর ন্যায়পরায়ণতাও লক্ষণীয়। যদিও রাসুল   স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন আয়িশা  -কে। ভালোবাসা মনের ব্যাপার। কিন্তু প্রকাশ্যে অন্য স্ত্রীদের প্রতি ন্যায়ভিত্তিক আচরণ করতেন। যেমন এখানে আয়িশা  -এর কর্মের পর রাসুল   সাওদা  -কে বললেন, তিনিও যেন আয়িশার মুখে খাবার মেখে দেন। রাসুল   যেভাবে বলেছেন, সাওদা  -ও সেভাবে করেছেন। এভাবে সে মজলিস হাসি-খুশি ও আনন্দে ভরে উঠল।

কুলসুম   বর্ণনা করেন, ‘রাসুল  -এর স্ত্রী জাইনাব   রাসুল  -এর মাথায় উকুন দেখছিলেন। তখন রাসুল  -এর কাছে উসমান বিন মাজউন ও কিছু মুহাজির নারী উপস্থিত। তারা তাঁর কাছে তাদের বাসস্থান নিয়ে অভিযোগ দায়ের করছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর ঘরটা অন্য ওয়ারিশরা নিয়ে যেত। স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে হতো প্রয়াত স্বামীর ঘর। এটা তাদের জন্য কষ্টকর

২২৭. সুনানুন নাসায়ি : ৮৯১৭, আবু বকর শাফিয়ি   কৃত আল-ফাওয়ায়িদ : ১১২। ইহইয়া উলুমিদ্দিনের হাদিসের তাখরিজে হাফিজ ইরাকি (৪/১৬৮২) বলেন, ‘এ হাদিসের সনদ জাইয়িদ।’

হয়ে দাঁড়াত। রাসুল ﷺ-এর মাথার উকুন দেখা ছেড়ে মহিলাদের আলাপে জাইনাবও জুড়ে গেলেন। রাসুল ﷺ তখন কৌতুক করে বললেন, “চোখ দিয়ে তো আর কথা বলছ না। চোখ চোখের কাজ করুক। মুখ মুখের কাজ করুক।” এরপর রাসুল ﷺ মুহাজির নারীদের ঘরের ওয়ারিশ বানানোর আদেশ দিলেন।^{২২৮}

রাসুল ﷺ স্ত্রীদের কৌতুক শুনতেন

আয়িশা   বলেন, ‘আমি একবার রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশে বললাম, “আল্লাহর রাসুল, মনে করুন, আপনি একটি উপত্যকায় অবতরণ করলেন আপনার উটকে খাবার খাওয়াবেন বলে। উপত্যকায় একটি গাছ আছে, যার পাতা খাওয়া। অন্য আরেকটি গাছ থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। আপনি কোনটা থেকে উটকে খাওয়াবেন?” রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, “যে গাছ থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি।” আয়িশা   এ কথার মাধ্যমে নিজেকেই বোঝাতে চাচ্ছিলেন। আল্লাহর রাসুল কেবল তাকেই কুমারি অবস্থায় বিয়ে করেছেন।’^{২২৯}

আরেকবারের ঘটনা। আয়িশা   বলেন, ‘বাকি কবরস্থানে একটা জানাজা ছিল। জানাজা থেকে ফিরে এসে রাসুল ﷺ দেখলেন, আমি মাথা ব্যথায় কাতরাচ্ছি। আমি বলছিলাম, “ওহ! আমার মাথা!” আমার কথা শুনে তিনি বললেন, “বরং মাথা ব্যথা আমার। তুমি যদি মাথা ব্যথায় মারা যাও, তবে তোমার তো কোনো কষ্ট নেই। সব কষ্ট তো আমাকেই করতে হবে। তোমাকে গোসল দিতে হবে, কাফন পরাতে হবে, এরপর জানাজা পড়ে দাফন করতে হবে না!” আমি বললাম, “হাঁ, আপনি তো তা-ই চান। আমি মারা যাই, আর সেদিনই আপনি অন্য স্ত্রী আমার ঘরে এনে তার সাথে সময় কাটান।” রাসুল ﷺ আমার কথা শুনে মুচকি হাসলেন। এ ঘটনার কিছু সময় পরই রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর অসুস্থতা শুরু হয়।’^{২৩০}

২২৮. মুসনাদু আহমাদ : ২৬৫১০। হাদিসের মান : হাসান। এ হাদিসের সংক্ষিপ্ত একটি রূপ এসেছে, ‘সুনানু আবি দাউদ’-এর ৩০৮০ নং হাদিসে; এ হাদিসের সনদ সহিহ।

২২৯. সহিহুল বুখারি : ৫০৭৭।

২৩০. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৭২০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৪৬৫। হাদিসের মান : হাসান। ঘটনার সংক্ষিপ্তসার বর্ণিত হয়েছে বুখারিতে : ৫৬৬৬।

وَبِلُطْفِهِ يَرْعَى مَشَاعِرَهَا *** فِي كُلِّ نَائِبَةٍ يُوَاسِيهَا
 مُتَجَمِّلًا مِنْ أَجْلِهَا عِطْرًا *** إِنَّ الَّذِي يُرْضِيهِ يُرْضِيهَا
 وَعَلَى الَّذِي هَوَيْتُ يُتَابِعُهَا *** فِي مَا يُحِلُّ لَهَا وَيُعْطِيهَا
 وَعَلَى جَلَالَتِهَا يُسَابِقُهَا *** وَإِذَا تُجَارِيهِ يُجَارِيهَا
 إِنَّ السَّمَاحَةَ فِي شَرِيعَتِهِ *** وَالْيُسْرَ أَصْلُ كَامِنٌ فِيهَا

‘প্রিয়তমার আবেগ-অনুভূতির খেয়াল রাখতেন প্রগাঢ় মমতায়। প্রতিটি বিপদে বাড়িয়ে দিতেন সহমর্মিতার হাত। তাদের হৃদয়কে ভুলিয়ে রাখতে উদিত হতেন সুরভিত দেহে। জীবনসাথির যে রূপ দেখতে তিনি ভালোবাসতেন, একই রূপে তিনি নিজেকে পেশ করতেন তাদের সামনে। তাদের বৈধ আবদারগুলো মেটাতেন উদার হৃদয়ে। পাহাড়সম ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি। তবুও দৌড় প্রতিযোগিতায় নামতেন স্ত্রীদের সাথে। তাদের সঙ্গে জুটে কাজ করতেন অনায়াসে। ক্ষমা, উদারতা ও সারল্যের অদৃশ্য ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর শরিয়ত।’



দ্বিতীয় পর্ব

তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে মুমিন নারীদের আদর্শ হিসেবে বিনির্মাণ

স্ত্রীদের সাথে হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক করা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ স্ত্রীদের তালিম-তরবিয়তের প্রতি ছিলেন বেশ আগ্রহী ও সচেতন। উদ্দেশ্য—তারা যেন অন্য নারীদের জন্য সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে গড়ে ওঠেন। স্ত্রীকে তালিম-তরবিয়তের মাধ্যমে গড়ে তোলা স্বামীর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন—সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে কি না। এমনকি পুরুষকে তার পরিবারের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।’^{২৩১}

ইবনে উমর র. বলেন, ‘রাসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক শাসিতের ওপর দায়িত্বশীল; তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ তার পরিবারের ওপর দায়িত্বশীল; তাকে তার পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।’^{২৩২}

বর্তমান সময়টা ফিতনার—অধঃপতনের। চারদিকে পাপ-পঙ্কিলতার ছড়াছড়ি। প্রায়ই দেখা যায়, স্ত্রীর দ্বিনি তালিম-তরবিয়তের ব্যাপারে স্বামীর শিথিলতা ও তাদের হক আদায়ে অবহেলার কারণে তাদের জীবনে পঙ্কিলতার অনুপ্রবেশ ঘটছে।

২৩১. নাসায়ি র. কৃত আস-সুনানুল কুবরা : ৯১৭৪। আনাস বিন মালিক র. থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : সহিহ।

২৩২. সহিহুল বুখারি : ৮৯৩, সহিহ মুসলিম : ১৮২৯।

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের ইবাদত ও নফল আদায়ের শিক্ষা দিতেন

উম্মে সালামা   বলেন, ‘একরাতে রাসুল ﷺ ভীত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। বললেন, “পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহ তাআলার। কত পুণ্যভান্ডার তিনি নাজিল করলেন! নাজিল করলেন কত ফিতনা! কে অন্তঃপুরবাসিনীদের জাগিয়ে দেবে নামাজ পড়ার জন্য? দুনিয়ার কত বস্ত্রাবৃত্তা আখিরাতে বিবস্ত্র হয়ে থাকবে।”’^{২৩৩}

রাসুল ﷺ যখন জানলেন, একদিনেই অগণিত পুণ্যের ধারা ও ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার কথা, তিনি ভীত ও বিস্মিত হলেন। এই অবস্থায় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আশ্চর্য হলেন এ বিষয়ে মানুষের অমনোযোগিতা দেখে। পুণ্যের আধিক্য দেখে তাদের ইবাদতে মনোযোগী হওয়া উচিত; আর ফিতনার প্রাচুর্য দেখে তাদের ভীত হওয়া উচিত। তাই তিনি নামাজ আদায়ের জন্য স্ত্রীদের জাগানোর আদেশ দিলেন।

রাসুল ﷺ ‘অগণিত পুণ্যের ধারা ও ফিতনার দ্বার’ উন্মুক্ত হওয়ার কথা বলে স্ত্রীদের সাবধান করে দিলেন, তারা যেন ইবাদতে গাফিলতি না করেন; রাসুল ﷺ-এর স্ত্রী হওয়ার ওপর নির্ভর করে ইবাদত পরিত্যাগ না করেন।

এ হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই, পুরুষদের উচিত রাতের ইবাদতের জন্য স্ত্রীদের জাগিয়ে দেওয়া। বিশেষ করে দুর্যোগের সময়।

রমাজানের শেষ দশ রাতে কিয়ামুল লাইল ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য স্ত্রীদের জাগিয়ে দিতেন

আয়িশা   বলেন, ‘রমাজানের শেষ দশক এলে বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন রাসুল ﷺ। রাত জেগে নিজে ইবাদত করতেন। স্ত্রীদেরও জাগিয়ে দিতেন।’^{২৩৪}

২৩৩. সহিহুল বুখারি : ৭০৬৯।

২৩৪. সহিহুল বুখারি : ২০২৪, সহিহ মুসলিম : ১১৭৪।

আলি ؓ বলেছেন, ‘রমাজান মাসের শেষ দশকে রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের জাগিয়ে তুলতেন ইবাদত করার জন্য।’^{২৩৫}

ইবনে হাজার ؓ বলেন, ‘রমাজানের শেষ দশকে রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের জাগিয়ে দিতেন কিয়ামুল লাইল, জিকির ও দোয়া করার জন্য। আর সারা বছর বিশেষ করে বিতরের জন্য জাগিয়ে তুলতেন। কারণ, বিতর ধারাবাহিক ও অবশ্যপালনীয় বিধানগুলোর একটি।’^{২৩৬}

সারা বছর স্ত্রীদের বিতরের জন্য জাগিয়ে দেওয়ার কথা বর্ণনা করে আয়িশা ؓ বলেন, ‘রাসূল ﷺ রাতের একটা সময়ব্যাপী নামাজ পড়তেন। যখন তিনি বিতর আদায় করতেন, তখন বলতেন, “ওঠো। বিতর আদায় করো, আয়িশা।”’^{২৩৭}

স্ত্রীদের ইখলাসের শিক্ষা দিতেন

আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত আছে, ‘রাসূল ﷺ যখন ইতিকাকের ইচ্ছে করতেন, ফজরের নামাজ পড়ে সে স্থানে আসতেন, যেখানে তিনি ইতিকাকের জন্য অবস্থান করবেন। একবার রমাজানের শেষ দশকে ইতিকাক করার ইচ্ছে করলেন তিনি। আদেশ করলেন তাঁরু খাটাবার। আয়িশা ؓ-ও ইতিকাক করার অনুমতি চাইলেন তাঁর কাছে। রাসূল ﷺ অনুমতি দিলে তার জন্যও তাঁরু খাটানো হলো। ইতিকাকের কথা হাফসা ؓ-এর কানে এল। তিনিও তৈরি করলেন একটি তাঁরু। জাইনাব ؓ শুনে তিনিও বসালেন আরেকটি তাঁরু। সকালবেলা তিনি দেখলেন, দুটোর জায়গায় চারটি তাঁরু। জানতে চাইলেন, “এগুলো কী?” উম্মুল মুমিনদের তাঁরু খাটানোর কথা জানানো হলো তাঁকে। শুনে তিনি বললেন, “তারা কি সাওয়াবের আশায় এরূপ করেছে?”

অন্য বর্ণনায় এসেছে, “এমনটা করার কারণ কী? নেক নিয়ত?” এরপর রাসূল ﷺ তাঁরুগুলো তুলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। বললেন, “এগুলো তুলে ফেলো। এগুলো আমি দেখতে চাই না।”

২৩৫. সুনানুত তিরমিজি : ৭২৫। হাদিসের মান : সহিহ।

২৩৬. ফাতহুল বারি : ৬/২৫১। ঈমৎ পরিমার্জিত।

২৩৭. সহিহুল বুখারি : ৫১২, সহিহ মুসলিম : ৭৪৪।

রাসুল ﷺ-এর আদেশমতো তাঁবুগুলো তুলে দেওয়া হলো। রমাজানে আর তিনি ইতিকার্য করেননি। শাওয়াল মাসের প্রথম দশ দিন ইতিকার্য করেন।’^{২৩৮}

স্ত্রীদের এ প্রতিযোগিতা ইখলাসের ওপর ভিত্তি করে নয় বলে তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন তাঁর আশপাশে থাকা বা তাঁকে নিয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে স্ত্রীরা তাঁর খাটিয়েছে। তাই তাঁর উঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি।

ইবনে হাজার رحمه বুলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর আশঙ্কা হয়েছিল ইতিকার্যের জন্য স্ত্রীদের তাঁবু-খাটানো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়; বরং ঈর্ষা ও অহংকারের প্রতিযোগিতার বশবর্তী হয়ে এমনটা করেছে তারা। তাদের এ কাজের পেছনে রাসুল ﷺ-এর নিকটে থাকার আশাই নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ফলে তাদের ইতিকার্যের উদ্দেশ্য—আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে অন্য কিছু হয়ে যাওয়ায় রাসুল ﷺ তাঁর তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।’^{২৩৯}

স্ত্রীদেরকে অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিতেন

আয়িশা رضي বুলেন, ‘একবার রাসুল ﷺ আমার হাত ধরলেন। তাঁদের দিকে ইশারা করে বললেন, “আয়িশা, এ জিনিসের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। কারণ, এটিই অন্ধকার রাতকে সমাগতকারী।”’^{২৪০}

রাসুল ﷺ রাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার আদেশ দিলেন। কারণ, রাতের বেলায়ই অনিষ্টতার সয়লাব ঘটে। ‘তবে রাত অনিষ্ট হওয়ার কারণ চাঁদ নয়। চাঁদ তো কেবল রাতের একটা চিহ্ন মাত্র। রাতের বেলায়-ই তো চাঁদ ওঠে।’^{২৪১}

এ হাদিসে স্ত্রীকে শেখানোর ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ কতটা গুরুত্ব দিতেন, তার চিত্র উঠে এসেছে। রাসুল ﷺ প্রথমে আয়িশা رضي-এর হাত ধরলেন। এরপর উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে করণীয় বললেন। বললেন তার কারণ।

২৩৮. সহিহুল বুখারি : ২০৩৩, সহিহ মুসলিম : ১১৭৩।

২৩৯. ফাতহুল বারি : ৪/২৭৬।

২৪০. সুনানুত তিরমিজি : ৩২৮৮। হাদিসের মান : সহিহ।

২৪১. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/৫৩৬।

স্ত্রীদের উপকারী জিকির শেখাতেন

জুয়াইরিয়া   বলেন, ‘ফজরের সময় রাসুল   তার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর চাশতের সময় ফিরে এসে দেখলেন, তিনি বসে আছেন নামাজের জায়গায়। রাসুল   বললেন, “তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত তুমি এভাবেই বসে আছ?” জুয়াইরিয়া   বললেন, “হাঁ।” এরপর রাসুল   বললেন, “তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার করে বলেছি। যদি আমার সে জিকির আজকের দিনে তোমার পঠিত জিকিরের সাথে ওজন দেওয়া হয়, তবে এ কালিমা চারটির জিকিরের সমান হবে। জিকিরটি হচ্ছে—

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدادَ
كَلِمَاتِهِ

“আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি—
তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান,
তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি
পরিমাণ (অগণিত অসংখ্য)।”^{২৪২}

‘কিছু জিকির আছে বিশেষ মাহাত্ম্যবিশিষ্ট। ব্যাপকতা এবং রবের নাম ও
গুণের সমাহারে এ জিকিরগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। তাই অন্যান্য জিকির
অনেক সময় ধরে করা হলেও সেগুলোর তুলনায় এ জিকিরের কয়েকবার
পাঠই উত্তম হয়।’^{২৪৩}

সহজে আদায়যোগ্য উত্তম ইবাদতের নির্দেশনা দিতেন

আয়িশা   বলেন, ‘আমার প্রবল ইচ্ছে ছিল বাইতুল্লাহর ভেতরে গিয়ে নামাজ
পড়ব। একদিন রাসুল   আমার হাত ধরে এগিয়ে গেলেন। হিজরে নিয়ে দাঁড়
করালেন আমাকে। বললেন, “যখন বাইতুল্লাহয় নামাজ পড়ার ইচ্ছে জাগবে,
তখন হিজরে নামাজ পড়ে নেবে। কারণ, এটি বাইতুল্লাহরই অংশ।”^{২৪৪}

২৪২. সহিহ মুসলিম : ২৭২৬।

২৪৩. হাশিয়াতুস সুয়ুতি ওয়াস সিনদি আলা সুনানিন নাসায়ি : ৩/৭৮।

২৪৪. সুনানুত তিরমিজি : ৮০২, সুনানুন নাসায়ি : ২৯১২। হাদিসের মান : সহিহ।

ইবাদতে মধ্যমপস্থা অবলম্বনের আদেশ দিতেন

আনাস রাঃ বলেন, ‘একদিনের কথা। রাসুল সঃ মসজিদে এসে দেখলেন, মসজিদে দুটি সারির মাঝে রশি বাঁধা। তিনি বললেন, “এ রশি কেন?” সাহাবিরা বললেন, “এটি জাইনাবের রশি। তিনি নামাজ পড়তে থাকেন। যখন অলসতা আসে বা শরীর অবসন্ন হয়, তখন এর সাহায্য নেন।” রাসুল সঃ বললেন, “এ রশি খুলে ফেলো। তোমরা যতক্ষণ শরীরে উদ্যম অনুভব করবে, ততক্ষণ নামাজ পড়বে। যখন শরীর ক্লান্ত বা অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন বসে পড়বে।”^{২৪৫}

ইমাম নববি রাঃ বলেন, ‘এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, ইবাদতে মধ্যমপস্থা অনুসরণ করতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ। ইবাদত করতে হবে উদ্যম ও প্রাণবন্ততার সাথে। কিন্তু ইবাদত করতে করতে যখন শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন আরাম করতে হবে যতক্ষণ না অবসন্নতা কেটে যায়।’^{২৪৬}

সারা রাত নির্ঘুম ইবাদতের কথা শুনে অপছন্দ করলেন

আয়িশা রাঃ হতে বর্ণিত, ‘হাওলা বিনতে তুয়াইত নামের এক নারী এলেন আয়িশা রাঃ-এর কাছে। তখন রাসুল সঃ আয়িশার ঘরে। তিনি রাসুল সঃ-কে জানালেন, “এ হাওলা। লোকেরা ধারণা করে সে রাতে ঘুমায় না। পুরো রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেয়।” এ শুনে রাসুল সঃ বললেন, “সে রাতেও ঘুমায় না?! তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী ইবাদত করো। আল্লাহর কসম, তোমরা যতক্ষণ ক্লান্ত হবে না, ততক্ষণ আল্লাহ সাওয়াব দিতে থাকবেন।”^{২৪৭}

‘সে রাতেও ঘুমায় না?’—এই প্রশ্ন থেকে বোঝা গেল, এ রকম সারা রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেওয়া তাঁর পছন্দ নয়। এটি ইবাদতে বাড়াবাড়ির নামান্তর।

২৪৫. সহিহুল বুখারি : ১১৫০, সহিহ মুসলিম : ৭৮৪।

২৪৬. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ৬/৭৩।

২৪৭. সহিহুল বুখারি : ৪৩, সহিহ মুসলিম : ৭৮৫। শব্দউৎস : সহিহ মুসলিম।

আমল কম হলেও নিয়মিত করার প্রতি উৎসাহ দিতেন

আয়িশা ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে নিয়মিত কৃত আমল; যদিও তা কম হয়।”

কাসিম বিন মুহাম্মাদ ؓ বলেন, ‘আয়িশা ؓ কোনো আমল করলে সে আমলটা অবধারিত করে নিতেন নিজের জন্য।’^{২৪৮}

ইবনুল জাওজি ؓ বলেন, ‘দুই কারণে নিয়মিত আমল পছন্দনীয় :

এক. কোনো আমল ছেড়ে দেওয়া সে আমল থেকে বিমুখ হওয়ার মতো।

দুই. কোনো আমল নিয়মিত করা মনিবের সেবায় প্রতিটি সময় লেগে থাকার মতো। এক লোক মনিবের সেবার উদ্দেশ্যে দরোজার পাশে দিনের একটি অংশ দাঁড়িয়ে থাকল। দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি মনিবের সেবার উদ্দেশ্যে দরোজার পাশে সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকল। এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিই উত্তম প্রথম ব্যক্তির তুলনায়। দ্বিতীয় ব্যক্তির সাদৃশ্য নিয়মিত আমলকারীর সাথে।’^{২৪৯}

সাদাকা ও কল্যাণের পথে ব্যয় করার প্রতি স্ত্রীদের উৎসাহ দিতেন

আয়িশা ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ তাকে বলেছেন, “আয়িশা, এক ফালি খেজুর সাদাকা করে হলেও জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কেননা, এক ফালি খেজুরও ক্ষুধার্তের তৃপ্তির কারণ হয়।”’^{২৫০}

এক ফালি খেজুর বলে এখানে খুব অল্প জিনিস বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ হলেও সাদাকা করো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আয়িশা ؓ-কে সাদাকা ও নেক আমলের মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করতে বলেছেন। যদিও সেই সাদাকা ও নেক

২৪৮. সহিহুল বুখারি : ৬৪৬৫, সহিহ মুসলিম : ৭৮৩। শব্দউৎস : সহিহ মুসলিম।

২৪৯. ফাতহুল বারি : ১/১০৩।

২৫০. মুসনাদু আহমাদ : ২৩৯৮০; ইবনে হাজার এ হাদিসকে হাসান বলেছেন : ৩/৩৩৪। আলবানি ؓ এ হাদিসকে সহিহ বলেছেন (আত-তারগিব ওয়াত তারহিব : ৮৬৫)।

আমলের পরিমাণ খুবই অল্প হয়। সামান্য সাদাকাও মানুষকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করে ফেলে।

আয়িশা   আরও বলেন, ‘এক ফকির আমার কাছে এল। তখন আমার ঘরে রাসুল   ছিলেন। তাকে কিছু দেওয়ার জন্য (খাদিমাকে) আদেশ দিলাম আমি। এরপর সাদাকার বস্তুটা নিয়ে আসার জন্য বললাম। সেটার প্রতি তাকলাম। তখন রাসুল   বললেন, “তুমি কি চাও না যে তোমার অগোচরে ঘরে কোনো কিছু প্রবেশ করুক বা বের হোক?” আমি বললাম, “হাঁ।” রাসুল   বললেন, “যেতে দাও, আয়িশা, হিসেব কোরো না, তুমি হিসেব করলে আল্লাহও তোমায় হিসেব করে দেবেন।””^{২৫১}

ইবনে হাজার   বলেন, ‘হিসেব করে দেওয়ার অর্থ—কোনো কিছুর নির্দিষ্ট ওজন বা সংখ্যা জানা। আর অনেকে সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সাদাকা করে না। সাদাকা না করার এ মনোবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়েছে এ হাদিসে। এমন মনোবৃত্তি সম্পদ থেকে বরকত রহিত হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। কেননা, আল্লাহ তাআলা দানের প্রতিদানে অনেক সাওয়াব দিয়ে থাকেন। তাই যে ব্যক্তি অগণিত পুরস্কার পেতে চায়, সে যেন দানের সময় হিসেবি না হয়, কৃপণতা না করে। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে আল্লাহ তাআলা অগণিত রিজিক দিতে পারেন, তার ওপর কর্তব্য হচ্ছে, বিনা হিসেবে দান করা।’^{২৫২}

‘পরিবারের লোকেরা যখন ছাগল জবাই করতেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, “সাদাকা দেওয়ার পর কতটুকু আর বাকি আছে?” আয়িশা   বললেন, “কাঁধের গোশতটুকু।” রাসুল   বললেন, “তবে তো কাঁধের গোশত ছাড়া আর সবটাই অক্ষত আছে (সাদাকা দিয়ে)।””^{২৫৩}

‘অর্থাৎ তোমার কাছে কাঁধের যে গোশতটুকু আছে, সেটা অক্ষত নেই। বরং সাদাকা যা দিয়েছ, তা অক্ষত আছে। রাসুল  -এর এ কথা এ আয়াতের

২৫১. সুনানু আবি দাউদ : ১৭০০, সুনানুন নাসায়ি : ২৫৪৯। শব্দউৎস : সুনানুন নাসায়ি। হাদিসের মান : হাসান।

২৫২. ফাতহুল বারি : ৩/৩০০। ঈষৎ পরিমার্জিত।

২৫৩. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯৪। হাদিসের মান : সহিহ।

প্রতি ইঙ্গিত করে, আল্লাহ তাআলা বলেন : مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ : “তোমাদের কাছে যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে; আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা টিকে থাকবে।” (সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৬)^{২৫৪}

স্ত্রীদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সাদাকা করবে, সে সবার আগে রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হবে

আয়িশা রা.ব. বলেন, ‘রাসুল ﷺ একবার বললেন, “তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা, সে-ই মৃত্যুর পর আমার সাথে সবার আগে মিলিত হবে।”’
আয়িশা রা.ব. বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর কথা শুনে আমরা নিজেদের হাত মাপ দিতে থাকলাম। (সবার মাঝে সাওদার হাতই লম্বা ছিল। কিন্তু রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁর কাছে প্রথম জাইনাবই যায়।) আসলে আমাদের মাঝে সবচেয়ে লম্বা হাতের অধিকারী ছিল জাইনাব। জাইনাব হাতে কাজ করত এবং সাদাকা করত।’^{২৫৫}

‘হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে, রাসুল ﷺ-এর কথা শুনে উম্মুল মুমিনিনদের ধারণা হলো বাহ্যিকভাবে হাত লম্বা হওয়ার কথাই তিনি বলেছেন। তাই তারা বাঁশের কাঠি নিয়ে তাদের হাত মাপতে লাগলেন। দেখা গেল, সবার মাঝে সাওদা রা.ব.এর হাত বেশি লম্বা। অন্যদিকে জাইনাব রা.ব. কল্যাণের কাজ ও সাদাকার দিক থেকে সবার চেয়ে বেশি অগ্রসর ছিলেন। জাইনাব রা.ব.-ই রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে সবার আগে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তারা রাসুল ﷺ-এর কথার মর্মার্থ বুঝতে পারলেন যে, হাত লম্বার অর্থ সাদাকা ও উদারতায় এগিয়ে থাকা।’^{২৫৬}

ইবনে হাজার রা.ব. বলেন, ‘এ হাদিসে প্রমাণিত হচ্ছে, সক্ষমতা থাকাকালীন কেউ অধিক পরিমাণে দান করলে সে নবিজি রা.ব.এর সাথে জান্নাতে মিলিত হবে। আর এ তো সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ চূড়া।’^{২৫৭}

২৫৪. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/১৪২।

২৫৫. সহিহুল বুখারি : ১৪২০, সহিহ মুসলিম : ২৪৫২।

২৫৬. ইমাম নববি রা.ব. কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৬/৮।

২৫৭. ফাতহুল বারি : ৩/২৮৬।

স্ত্রীদের নেক কাজ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দিতেন

আয়িশা   বলেন, ‘পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পরের ঘটনা। আবুল কুআইসের ভাই আফলাহ আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমি বললাম, “যতক্ষণ আমাকে নবিজি   অনুমতি না দেন—আমি অনুমতি দেবো না।” কেননা, আফলাহর ভাই আবুল কুআইস আমাকে দুধ পান করায়নি। আমাকে দুধ পান করিয়েছিল আবুল কুআইসের স্ত্রী। নবিজি   আমার কাছে আসলে তাঁকে বললাম, “আবুল কুআইসের ভাই আফলাহ আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। আপনার কাছ থেকে না জেনে আমি অনুমতি দিইনি।” নবিজি   বললেন, “তোমার চাচাকে অনুমতি দিতে বাধা কোথায়?” আমি বললাম, “আবুল কুআইস তো আমাকে দুধ পান করায়নি। আমাকে দুধ পান করিয়েছিল তার স্ত্রী।” রাসুল   এবার বললেন, “তোমার হাত ধুলোয় ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি দেবে, কারণ সে তোমার চাচা।”^{২৫৮}

না জেনে কথা বলতে স্ত্রীদের নিষেধ করতেন

রাসুল   তাঁর স্ত্রীদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন—যা জানো না, তা নিয়ে মুখ খুলো না। না জেনে তড়িঘড়ি করে কোনো ফতোয়া দিতে বা বিধান বর্ণনা করতে তিনি নিষেধ করতেন। তাদের এ আদর্শের ওপর দৃঢ় করেছেন যে, জানার পরই কেবল বিধান বর্ণনা করা যাবে; এর আগে নয়।

আয়িশা   বলেন, ‘একদিন রাসুল  -কে এক আনসারি শিশুর জানাজায় ডাকা হলো। আমি রাসুল  -এর উদ্দেশে বললাম, “আল্লাহর রাসুল, তার কোনো গুনাহ নাই। পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত সে। তাই জান্নাতের এ চড়ুইয়ের জন্য সুসংবাদ।” আমার কথা শুনে রাসুল   বললেন, “অন্যটাও হতে পারে, আয়িশা, আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের সৃষ্টি করেছেন জান্নাতের জন্য। তাদের গন্তব্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তারা যখন তাদের পিতার ঔরসে। আবার জাহান্নামবাসীদের সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য। তারা যখন তাদের পিতার ঔরসে থাকে, তখনই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল তাদের গন্তব্য।”^{২৫৯}

২৫৮. সহিহুল বুখারি : ৪৭৯৬, সহিহ মুসলিম : ১৪৪৫।

২৫৯. সহিহ মুসলিম : ২৬৬২।

ইমাম নববি رحمہ اللہ বলেন, ‘আলিমদের ইজমা হচ্ছে, মুসলিম শিশু মৃত্যুবরণ করলে, সে জান্নাতবাসী। কারণ, শরিয়তের বিধিনিষেধ পালন করা তার জন্য আবশ্যিক হয়নি। আলিমগণ আয়িশা رضی اللہ عنہا বর্ণিত এ হাদিসের ব্যাপারে বলেন, আয়িশা رضی اللہ عنہا চটজলদি অকাট্য দলিল ছাড়াই কথাটা বলে ফেলেছেন। তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করে রাসুল ﷺ কথাটি বলেছেন।’^{২৬০}

স্ত্রীদের মুত্তাকি ও চরিত্রবান হতে আদেশ দিতেন

আয়িশা رضی اللہ عنہا বলেন, ‘রাসুল ﷺ আমাকে সম্বোধন করে বললেন, “আয়িশা, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। নম্র হও। কারণ, নম্রতা যেকোনো কিছুকেই সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর নম্রতা হারালে যেকোনো কিছুই তার সৌন্দর্য হারায়।”’^{২৬১}

স্ত্রীদের দয়র্দ্র ও সংযমী হওয়ার শিক্ষা দিতেন

আয়িশা رضی اللہ عنہا বলেন, ‘রাসুল ﷺ তাকে বলেছেন, “আয়িশা, দয়র্দ্র হও। আল্লাহ কোনো পরিবারের ভালো চাইলে তাদের দয়ার পথ দেখান।”’^{২৬২}

স্ত্রীদের সুন্দর কথা বলার শিক্ষা দিতেন

আয়িশা رضی اللہ عنہا বলেন, ‘একদল ইহুদি এল রাসুল ﷺ-এর কাছে। তারা সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, “আসসামু আলাইকুম (আপনার মৃত্যু হোক।)।” রাসুল ﷺ জবাব দিলেন, “ওয়া আলাইকুম (তোমাদেরও)।” তখন আমি বললাম, “আসসামু আলাইকুম, ওয়া লাআনাকুমুল্লাহ, ওয়া গাজাবা আলাইকুম। (তোমাদের মৃত্যু হোক। আল্লাহর অভিশাপ তোমাদের ওপর। আল্লাহর গজব তোমাদের ওপর।)।” রাসুল ﷺ এবার আমাকে বললেন, “ছাড়ো, আয়িশা! তুমি দয়র্দ্র হও। কদর্য কথা থেকে বিরত থাকো।”’ আয়িশা رضی اللہ عنہা বললেন, ‘আপনি কি শুনেনি, তারা কী বলল?’ রাসুল ﷺ জবাবে বললেন, ‘তুমি

২৬০. ইমাম নববি رحمہ اللہ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৬/২০৭।

২৬১. মুসনাদু আহমাদ : ২৩৭৮৬। হাদিসের মান : সহিহ। হাদিসের সংক্ষিপ্তসার বর্ণিত হয়েছে ‘সহিহ মুসলিম’-এর ২৫৯৪ নং হাদিসে।

২৬২. মুসনাদু আহমাদ : ২৩৯০৬। হাদিসের মান : সহিহ।

কি শুনোনি, আমি কী বললাম? আমি তাদের কথার উত্তর দিয়েছি। তাদের ব্যাপারে আমার এ কথা আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের কথা গৃহীত হয়নি।”^{২৬৩}

মুসলিম ﷺ-এর অপর বর্ণনায় এসেছে, ‘ছাড়া, আয়িশা! আল্লাহ কদর্যতা ও কঠোরতা পছন্দ করেন না।’

রাসুল ﷺ স্ত্রীদের আকিদার বিষয়াদি শেখাতেন। তাদের শিক্ষা দিতেন আল্লাহকে ভয় করার। যখনই আকাশে কালো মেঘ বা প্রবল বাতাস দেখা দিত, তিনি একবার ঘর থেকে বের হতেন আবার ঘরে প্রবেশ করতেন। তাঁর চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যেত।

আয়িশা ﷺ বলেন, ‘রাসুল যখন মেঘ বা বাতাস দেখতেন চেহারা তার স্পষ্ট প্রভাব পড়ত।’ আয়িশা ﷺ রাসুল ﷺ-কে বললেন, ‘আল্লাহর রাসুল, মানুষকে আমি দেখছি, মেঘ দেখে খুশি হয়। তারা আশা করে মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনাকে দেখছি, আপনি মেঘ দেখে সন্তুষ্ট হন না। কারণ কী?’ রাসুল ﷺ বললেন, ‘আয়িশা, মেঘ তো আজাব নিয়েও আসতে পারে! এক সম্প্রদায়কে বাতাস দিয়ে শান্তি দেওয়া হয়েছে। তারা মেঘ দেখে বলেছিল, “এই তো মেঘ। আমাদের বৃষ্টি দেবে।”’^{২৬৪}

বিগত আকিদা শিক্ষা দিতেন

আয়িশা ﷺ বলেন, ‘একবার রাসুল ﷺ অসুস্থ হলে জনৈক স্ত্রী হাবশার একটি গির্জার কথা তুলল তাঁর সামনে। এ গির্জাকে মারিয়া বলা হতো। উম্মে সালামা ও উম্মে হাবিবা দুজনই হাবশায় গিয়েছিল। তারা এ গির্জার সৌন্দর্য ও গির্জায় থাকা ছবিগুলোর ব্যাপারে বলল। রাসুল ﷺ তখন মাথা তুলে বললেন, “তাদের কোনো নেক লোক মৃত্যুবরণ করলে এসব লোক নেক লোকগুলোর কবরে সিজদা করে। এরপর তাদের ছবি বানিয়ে নেয়। আল্লাহর নিকট এরা সবচেয়ে মন্দ সৃষ্টি।”’^{২৬৫}

২৬৩. সহিহুল বুখারি : ২৯৩৫, সহিহ মুসলিম : ২১৬৫।

২৬৪. সহিহুল বুখারি : ৪৮২৯, সহিহ মুসলিম : ৮৯৯।

২৬৫. সহিহুল বুখারি : ৪২৭, সহিহ মুসলিম : ৫২৮।

লক্ষ করুন, অসুস্থতা সত্ত্বেও আলোচনায় উঠে আসা একটি মারাত্মক ভ্রান্তির
অপনোদন করা থেকে বিরত থাকেননি রাসুল ﷺ ।

ঘরে কোনো মন্দ কাজ হলে চুপ থাকতেন না

ঘর মন্দ কাজ ও কথা থেকে মুক্ত রাখা একজন পুরুষের ওপর অর্পিত মহা
কর্তব্যগুলোর একটি । কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا : أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا**
পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো ।’ (সুরা আত-তাহরিম, ৬৬
: ৬)

আয়িশা ؓ বলেন, ‘একদিন রাসুল ﷺ আমার ঘরে এসে দেখলেন, আমার
ঘরে ছবি আঁকা একটি পর্দা । এ দেখে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল । তিনি
পর্দাটা ছিঁড়ে ফেললেন । বললেন, “কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ভয়ংকর শাস্তি
দেওয়া হবে তাদের, যারা এসব ছবি আঁকে ।”^{২৬৬}

রাসুল ﷺ কথা ও কাজ উভয় মাধ্যম ব্যবহার করে তাঁর স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিলেন ।

মানুষকে তুচ্ছ করে কিছু বলার ব্যাপারে সতর্ক করতেন

আয়িশা ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর সামনে এক লোক নিয়ে ব্যঙ্গ করলাম
আমি । তিনি তখন বললেন, “যদি দুনিয়ার এত এত সম্পদ আমাকে দেওয়া
হতো, তবুও আমি কোনো মানুষের ব্যঙ্গ করা পছন্দ করতাম না ।”^{২৬৭}

‘অর্থাৎ কাউকে ব্যঙ্গ করে তার কথা বা কাজ নকল করতে কখনোই আমি সন্তুষ্ট
হতাম না; যদিও আমাকে দুনিয়ার অটেল সম্পদ দেওয়ার প্রস্তাব আসত ।’^{২৬৮}

ইমাম নববি ؓ বলেন, ‘ল্যাংড়িয়ে চলা বা মাথা কাত করে কিবা অন্য কোনো
অঙ্গভঙ্গি করে ব্যঙ্গ করা হারাম গিবতের অন্তর্ভুক্ত ।’^{২৬৯}

২৬৬. সহিহুল বুখারি : ৬১০৯ ।

২৬৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৭৫, সুনানুত তিরমিজি : ২৫০২ । হাদিসের মান : সহিহ ।

২৬৮. আওনুল মাবুদ : ১৩/১৫১ ।

২৬৯. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/১৭৬ ।

বড় গুনাহের মতো ছোট ছোট গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকার তাকিদ দিতেন

আয়িশা   বলেন, ‘রাসুল   আমাকে উপদেশ দেন, “আয়িশা, তুচ্ছ গুনাহ থেকেও বিরত থাকো। কারণ, সেগুলোর জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন নিযুক্ত আছে।”’^{২৭০}

‘তুচ্ছ গুনাহ’—তথা যে গুনাহ মানুষ করতে পরোয়া করে না। একজন নিযুক্ত আছে—তথা একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা আছে, যে এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুনাহ লিখে রাখে। মানুষের কাছে গুনাহগুলো ক্ষুদ্র মনে হলেও আল্লাহর কাছে এ গুনাহগুলো গুরুতর।^{২৭১}

মাসআলা দুর্বোধ্য মনে হলে স্ত্রীগণ বারবার জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট হয়ে নিতেন

ইবনে আবি মুলাইকা   বলেন, ‘আয়িশা   রাসুল  -এর কোনো কথা না বুঝলে বারবার জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতেন। একবার নবিজি   বললেন, “যে হিসাবের সম্মুখীন হলো, তাকে শাস্তি পেতে হবেই হবে।” আয়িশা   বলেন, “তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ কি বলেননি? فَسَوْفَ يُحَاسَبُ - “হিসাব সহজভাবেই নেওয়া হবে। (সূরা আল-ইনশিকাক, ৮৭ : ৮)” উত্তরে রাসুল   বললেন, “এটা তো কেবল প্রকাশ করা। কিন্তু পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে যার হিসেব নেওয়া হবে, সে ধ্বংস হবে।”’^{২৭২}

স্ত্রীদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন গায়রতের অধিকারী

আয়িশা   বলেন, ‘রাসুল  -এর স্ত্রীদের কাছে একজন মুখান্নাস (মেয়েলি পুরুষ) আসত। সবাই তাকে পুরুষত্বহীন মনে করত। একদিন নবিজি   ঘরে উপবিষ্ট। মুখান্নাসটি তখন রাসুল  -এর কোনো স্ত্রীর ঘরে (উম্মে সালামা  -এর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া  -কে) এক মহিলার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলল, “কেননা, সে এতই কমণীয় যে, যদি সে সম্মুখপানে আসে, তবে তার পেটের সামনের দিকে চার ভাঁজ পড়ে। আর পেছন ফিরে

২৭০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৪৩। হাদিসের মান : সহিহ।

২৭১. হাশিয়াতুস সিনদি আলা সুনানি ইবনি মাজাহ : ৮/৫৯।

২৭২. সহিহুল বুখারি : ১০৩, সহিহ মুসলিম : ২৮৭৬।

গেলে আট ভাঁজ পড়ে।” তখন নবিজি ﷺ বললেন, “এ তো বেশ বর্ণনা দিতে পারে। তোমরা একে তোমাদের কাছে আর আসতে দেবে না।” এরপর থেকে তার সাথে পর্দা করা হতো।’^{২৭৩}

‘প্রথমে সবাই মনে করেছিল এ ব্যক্তিটি পুরুষত্বহীন, তার যৌনকামনা নেই। তাই রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে আসার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু যখন তার কাছ থেকে এমন বিবরণ শোনা গেল, তখন জানা গেল যে, আসলে সে তাড়নাহীন নয়। একজন নারীর এমন কামনাসক্তকারী বর্ণনা যে দিতে পারে, তার মাঝে নারীর প্রতি আকর্ষণ অবশ্যই আছে। তা ছাড়া, রাসুল ﷺ ভয় করলেন, এ লোক বাইরে গিয়ে রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীদের বর্ণনা দেবে। এটা পর্দার অর্থের একরকম বিপরীত হবে। তাই রাসুল ﷺ তাকে স্ত্রীদের ঘরে আসতে নিষেধ করে দিলেন।

এ হাদিস প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি নারীর বর্ণনা প্রকাশ করে আদতে তাকে দেখা দেওয়া জায়িজ হলেও এ দোষটির কারণে তার থেকে দূরে থাকতে হবে।’^{২৭৪}

নবিজি ﷺ ছিলেন গায়রতের অধিকারী। ছিলেন নিজ স্ত্রী-কন্যাদের ব্যাপারে প্রবল আত্মসম্মানের অধিকারী। কিন্তু আজকালকার পুরুষরা যেন তাদের পৌরুষই হারিয়ে বসেছে! তারা নিজেদের স্ত্রী, বোন ও মেয়েদের পরপুরুষদের সাথে ছেড়ে দিচ্ছে। ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’, ‘ফ্রেন্ড লাইক এ ব্রাদার’ ইত্যাদির বেড়াজালে পড়ে যাচ্ছে। তার ঘরের নারী অন্যের সাথে ঘুরছে; অথচ তার আত্মসম্মানে ঘা লাগে না এতটুকুও। এ কেমন পুরুষ?

রাসুল ﷺ নিজ স্ত্রীদের ব্যাপারে সুধারণা রাখতেন

আনাস ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ সফর থেকে ফিরে রাতের বেলা কখনো তাঁর স্ত্রীর কাছে আসতেন না। তিনি সকাল বা গোধূলি বেলায় ঘরে আসতেন।’^{২৭৫}

রাসুল ﷺ সাহাবিদেরও নিষেধ করতেন, যেন তারা রাতের বেলা ঘরে না আসে। জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ নিষেধ করেছেন, কেউ

২৭৩. সহিহুল বুখারি : ৪৩২৪, সহিহ মুসলিম : ২১৮১।

২৭৪. ফাতহুল বারি : ৯/৩৩৬।

২৭৫. সহিহুল বুখারি : ১৮০০, সহিহ মুসলিম : ১৯২৮।

যেন স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা যাচাই বা তার পদস্থলন যাচাইয়ের জন্য সফর থেকে ফিরে রাতের বেলা নিজ পরিবারের কাছে না আসে।’^{২৭৬}

‘বিশ্বাসঘাতকতা যাচাই’—তথা স্ত্রী স্বামীর পেছনে কী করে, তা যাচাই করা; অনুপস্থিতিতে স্ত্রী তাকে ধোঁকা দেয় কি না, তা যাচাই করা। তাই যার সফর লম্বা হঠাৎ করেই রাতের বেলা ঘরে এসে তার উপস্থিত হওয়া অপছন্দনীয়। অন্যদিকে যার সফর কাছে ধারে কোথাও, স্ত্রীর মনেও স্বামীর শীঘ্র আগমন সম্পর্কে সম্ভাবনা জাগে—এ অবস্থায় রাতের বেলা ঘরে আসতে কোনো বাধা নেই।

ইবনে হাজার رحمہ اللہ বলেন, ‘এ হাদিস মানুষের একে অন্যের মাঝে প্রেম-ভালোবাসার বন্ধন রক্ষার ব্যাপারে জোর উৎসাহ দেয়। আর যখন স্বামী ও স্ত্রীর ব্যাপারটি আসে, তখন তার গুরুত্ব বেড়ে যায় আরও বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অন্যের সকল বিষয়-আশয় জানে। তাদের পরস্পরের কাছে নিজেদের কোনো দোষ-গুণ ও অভ্যাস লুক্কায়িত থাকে না মোটেও। শরিয়ত নিষেধ করেছে রাতের আগমন বিষয়ে। কারণ রাতের আগমনের ফলে স্ত্রী মনে করতে পারে স্বামী তার ব্যাপারে বিরূপ ধারণা রাখে। ফলে তাদের মধ্যকার মধুর সম্পর্ক পরিণত হবে জটিল সম্পর্কে।’^{২৭৭}

হঠাৎ করে না আসা এবং ঘরে আসার পূর্বে স্ত্রীকে জানানোর ফলে স্ত্রী তৈরি হওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় পেয়ে যায়।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ رحمہ اللہ বলেন, ‘রাসুল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন রাতের বেলা সফর থেকে ফিরে আসে, তখন যেন সে স্ত্রীর নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত না আসে, যতক্ষণ স্ত্রী তার প্রয়োজনীয় ক্ষৌরকর্ম করতে পারে এবং এলোকেশী নারী তার চুল চিরুনি করে নিতে পারে।”’^{২৭৮}

এ হুকুম তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা দীর্ঘ দিন ঘর থেকে দূরে সফরে ছিল। কারণ, অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুল ﷺ বলেছেন, ‘যখন তোমরা দীর্ঘ দিন

২৭৬. সহিহুল বুখারি : ১৮০১, সহিহ মুসলিম : ৭১৫।

২৭৭. ফাতহুল বারি : ৯/৩৪১।

২৭৮. সহিহুল বুখারি : ৫২৪৬, সহিহ মুসলিম : ৭১৫।

সফরে থেকে বাড়ি থেকে অনুপস্থিত থাকো, রাতের বেলা সফর থেকে ফিরে আসলে রাতেই ঘরে প্রবেশ করবে না।’

ইবনে হাজার رحمہ اللہ বলেন, ‘এ হাদিসে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতির শর্ত আনার কারণ হচ্ছে, যে কারণে রাতের আগমন নিষেধ করা হয়েছে, সে কারণটি ঘটলে স্বামীর দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতির মাঝেই ঘটতে পারে। আর হুকুমও কারণ তথা ইল্লতকে আবর্তন করে হয়।

অন্যদিকে, কেউ যদি কোনো কাজে দিনের বেলা বের হয় বাড়ি থেকে আর রাত নাগাদ ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে, তবে এ সফরটি দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতির হুকুমে পড়বে না।

দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ধারণা থাকবে না স্বামী কখন আসে। তাই এ সময়টাতে হয়তো স্ত্রী অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকবে, স্বামীকে স্বাগত জানানোর মতো প্রস্তুতি তার থাকবে না। অথচ স্ত্রীর কাছে স্বামীর চাওয়া থাকে, স্বামীর জন্য স্ত্রী সেজেগুজে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ দিনের সফর শেষে স্বামী হঠাৎ এসে যদি স্ত্রীকে এলোমেলো-অগোচালো দেখে, তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের মাঝে ঘৃণার উন্মেষ ঘটার আশঙ্কা থাকে।’^{২৭৯} অন্যদিকে, স্ত্রীকে যে স্বামী আগমনের সময়ের ব্যাপারে জানিয়ে দেবে, সে স্বামীর ক্ষেত্রে রাতের আগমনের ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

স্ত্রীদের ঈর্ষার বিষয়টি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সামাল দিতেন

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসার টান থাকে। এর ওপর নির্ভরশীল হয় স্ত্রীদের ঈর্ষাপরায়ণতা। স্ত্রী জাতির মধ্যে এ স্বভাবটি বিদ্যমান। এ স্বভাব দিয়েই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি বর্ণনায় এসেছে, ‘আল্লাহ নারীদের মাঝে ঈর্ষাপরায়ণতা অবধারিত করেছেন।’^{২৮০} ঈর্ষাপরায়ণতা নারীদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীগণও এর চেয়ে ভিন্ন ছিলেন না।

আয়িশা رضی اللہ عنہا বলেন, ‘এক রাতের কথা। সে রাত আমার পালা ছিল। রাসুল ﷺ আমার কাছে ছিলেন। কিন্তু তিনি বের হয়ে কোথাও গেলেন। আমার

২৭৯. ফাতহুল বারি : ৯/৩৪০।

২৮০. তাবারানি : ১০০৪০। ইবনে মাসউদ رحمہ اللہ থেকে বর্ণিত।

তখন ঈর্ষা এসে গেল। এরপর রাসুল ﷺ এসে আমার অবস্থা দেখে বললেন, “আয়িশা, তোমার কী হয়েছে? তুমি কী ঈর্ষা করছ?” আমি তখন বললাম, “আমার মতো এক নারী কেন আপনার মতো এক পুরুষকে নিয়ে ঈর্ষাপরায়ণ হবে না?” রাসুল ﷺ বললেন, “তোমার কাছে কি তোমার শয়তান এসেছে?” আমি বললাম, “আল্লাহর রাসুল, আমার সাথে কি শয়তান আছে?” রাসুল ﷺ জবাব দিলেন, “হ্যাঁ।” আমি আবার জানতে চাইলাম, “সকল মানুষের সাথেই কি শয়তান থাকে?” রাসুল ﷺ জবাব দিলেন, “হ্যাঁ।” এবার আমি বললাম, “আপনার সাথেও, হে আল্লাহর রাসুল?” তিনি জবাব দিলেন, “হ্যাঁ। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাই সে মুসলিম হয়ে গেছে।”^{২৮১-২৮২}

অন্য ঘটনায় আমরা দেখতে পাই মুমিনদের মা আয়িশা ﷺ-এর ঈর্ষা তাকে নবিজি ﷺ-এর পেছন পেছন যেতে প্ররোচিত করে। নবিজি ﷺ কোথায় যান, তা-ই দেখা ছিল তার উদ্দেশ্য।

আয়িশা ﷺ বলেন, ‘যখন আমার পালা আসত, রাসুল ﷺ যে রাত আমার কাছে থাকতেন, সে রাতে তিনি ঘরে এসে চাদর খুলে রাখতেন। জুতো খুলে পায়ের কাছে রাখতেন। লুঙ্গির এক প্রান্ত বিছিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তেন। এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন, যতক্ষণ না আমি ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর চুপিচুপি চাদর নিতেন, জুতো পরে ধীরে ধীরে দরোজা খুলে বেরিয়ে যেতেন, এরপর চুপচাপ দরোজা লাগিয়ে দিয়ে চলে যেতেন। কিছু সময় বাইরে থাকতেন।

এমন এক রাতে আমি আমার জামায় মাথা ঢেকে, উড়না পরে, কোমরবন্ধ পরে বের হয়ে পড়লাম তাঁর পিছু পিছু। দেখলাম, যেতে যেতে তিনি জান্নাতুল বাকিতে পৌঁছে গেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। এরপর তিনবার হাত তুলে দোয়া করলেন। তারপর তিনি ফিরতি পথ ধরলে আমিও ফিরতি

২৮১. হাদিসে বর্ণিত শব্দটি হচ্ছে *فألم*। মাজির সিগায় শব্দটির অর্থ হবে, সে মুসলিম হয়ে গেছে। তাই এখন আর আমাকে মন্দ কিছুর প্ররোচনা দিতে পারে না। আবার শব্দটি মুজারে’ও হতে পারে। যার অর্থ হচ্ছে, আমি তার অনিষ্টতা থেকে মুক্ত।—হাশিয়াতুস সিনদি আলান নাসায়ি : ৭/৭৩।

২৮২. সহিহ মুসলিম : ২৮১৫।

পথে চলতে লাগলাম। তিনি দ্রুত হাঁটলে আমিও দ্রুত হাঁটতে থাকলাম। তিনি আরও দ্রুত হাঁটলে আমিও আরও দ্রুত হাঁটতে থাকলাম। তিনি দৌড়ে এলে আমি দৌড়ে এলাম। এভাবে আমি তাঁর আগে আগেই ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

তিনি ঘরে এলেন। বললেন, “হে আয়িশ, তুমি হাঁপাচ্ছ কেন?”

আমি বললাম, “না, কিছু না।”

তিনি বললেন, “তুমি বলো—না হলে আল্লাহ তো আমাকে বলে দেবেনই।”

“আল্লাহর রাসুল, আপনার প্রতি আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোক।” বলে আমি সবকিছু তাঁকে জানিয়ে দিলাম।

তিনি বললেন, “তাহলে আমার সামনের কালো ছায়াটি তুমিই ছিলে?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ।”

এরপর রাসুল ﷺ আমার বুকে জোরে আঘাত করলেন। আমি ব্যথা পেলাম।^{২৮৩} তিনি বললেন, “তুমি কি ধারণা করেছিলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমার ওপর অবিচার করবেন?”^{২৮৪} যখন তুমি দেখলে আমি বের হয়েছি, তখন জিবরিল আমার কাছে এসে ডাক দিলেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। বিষয়টা তোমার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে, তাই আমিও তোমাকে কিছু বলিনি। তুমি যেহেতু কাপড়ে নিজেকে ঢেকে নিয়েছিলে, তাই তিনি তোমার কাছে আসেননি। আমিও ধারণা করেছিলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তোমাকে জাগানো ঠিক মনে করিনি। আশঙ্কা করেছিলাম, তুমি ভয় পাবে। জিবরিল বললেন, “আপনার প্রভু আপনাকে আদেশ করেছেন বাকি-এর অধিবাসীদের কাছে যাওয়ার জন্য। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য।” আয়িশা   জিজ্ঞেস করলেন, “আল্লাহর রাসুল, আমি তাদের জন্য কী বলে দোয়া করব?” রাসুল ﷺ বললেন, “তুমি বলো :

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ

২৮৩. কুধারণার কারণে তিনি এ আঘাতটি করেছেন; যাতে আয়িশা  -এর শিক্ষা হয়।

২৮৪. অবিচার করে তোমার পালায় থাকা এ দিনটিতে রাসুল ﷺ অন্য স্ত্রীর কাছে যাবেন?

“এ জায়গার অধিবাসী মুমিন-মুসলমানের ওপর সালাম বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্যে অগ্রগমনকারী ও পশ্চাদ্গমনকারীদের ওপর আল্লাহ রহম করুন। আর আমরাও আল্লাহ চাহে তো অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব।”^{২৮৫}

আয়িশা রাঃ যদিও রাসুল সঃ-এর সমুন্নত মনের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন না কখনো। তবুও রাসুল সঃ-এর অন্য স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন তিনি। জীবিত স্ত্রীরা তো বটেই, তাঁর মৃত স্ত্রী খাদিজার প্রতিও তিনি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। যেমন তিনি বলেছেন, ‘খাদিজাকে যতটা আমি ঈর্ষা করেছি, অন্য কারও প্রতি আমার এত ঈর্ষা জাগেনি।’^{২৮৬}

রাসুল সঃ স্ত্রীদের ঈর্ষাপরায়ণতার ক্ষেত্রে তাদের সাথে প্রজ্ঞার ভিত্তিতে আচরণ করতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ের অনেক মানুষকেই আমরা দেখি, স্ত্রীদের ঈর্ষাপরায়ণতার কারণে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব তো তারা দেয়-ই না; উল্টো স্ত্রীকে ধমক দেয়। মারধর পর্যন্ত করে। ফলে ঈর্ষা থেকে যে সমস্যার উৎপত্তি সেটা বিরাটাকার ধারণ করে।

রাসুল সঃ স্ত্রীদের এমন ঈর্ষার জবাব দিতেন কখনো মুচকি হেসে, কখনো নরম ভাষায় জবাব দিয়ে, কিন্তু যখন বিষয়টি পরিব্যাপ্তিতে বেশি হতো, তখন কখনো তিরস্কার করতেন।

আনাস রাঃ বলেন, ‘নবিজি সঃ তাঁর কোনো স্ত্রীর^{২৮৭} নিকটে ছিলেন। এ সময় তাঁর অন্য এক স্ত্রী^{২৮৮} একটি থালাতে খাবার পুরে পাঠালেন। কিন্তু যার ঘরে তিনি অবস্থান করছিলেন, নবিজি সঃ-এর সে স্ত্রী খাদিমের হাতে আঘাত করলে থালাটি মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। নবিজি সঃ থালার টুকরোগুলো একত্র করতে লাগলেন। তারপর তাতে খাবার উঠাতে লাগলেন। এবং বললেন, “তোমাদের মায়ের ঈর্ষা এসে গেছে।” তিনি খাদিমকে সেখানে দাঁড় করিয়ে

২৮৫. সহিহ মুসলিম : ৯৭৪।

২৮৬. সহিহুল বুখারি : ৩৮১৬, সহিহ মুসলিম : ২৪৩৫।

২৮৭. আয়িশা রাঃ।

২৮৮. জাইনাব বিনতে জাহাশ রাঃ। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন উম্মে সালামা রাঃ।

রাখলেন এবং তাকে সে স্ত্রীর একটি থালা দিয়ে দিলেন, যার কাছ থেকে খাবার এসেছে তার জন্য। যার থালাটি ভেঙেছিল, তাকে ভালো থালাটি দেওয়া হলো এবং যে ভেঙেছিলেন, তার কাছে ভাঙা থালাটি রয়ে গেল।^{২৮৯}

এ হাদিসে স্ত্রীর প্রতি রাসুল ﷺ-এর দয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। যে স্ত্রী থালা ভাঙলেন, রাসুল ﷺ একটু ধমকও দিলেন না তাকে। তার প্রতি রাগও হলেন না। তাকে একটি শব্দও শুনালেন না। তার ওজর কবুল করলেন। একই সময়ে অন্য স্ত্রীর অধিকারেও কমতি করলেন না তিনি। সে স্ত্রীর থালা ভাঙার জরিমানা নিয়ে দিলেন যে স্ত্রী ভেঙেছেন তার কাছ থেকে।

ইবনে হাজার رحمته বলেন, ‘এ হাদিসে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, ঈর্ষায় বিহ্বল স্ত্রীর ভুল ধরা উচিত নয়। কেননা, এ সময়টাতে ঈর্ষায় রাগের মাথায় স্ত্রীর মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে যায়।’^{২৯০}

স্ত্রীরা পরস্পরের ব্যাপারে অযাচিত শব্দ ব্যবহার করলে শুধরে দিতেন

আয়িশা رضي الله عنها বলেন, ‘একবার আমি নবিজি ﷺ-কে বললাম, “সাফিয়া এমন এমন (খাটো), সে-ই আপনার জন্য যথেষ্ট।” রাসুল ﷺ জবাবে বললেন, “তুমি এমন একটি কথা বললে, যদি এ কথাকে সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার রং পরিবর্তন হয়ে যাবে।”^{২৯১}

অর্থাৎ ‘যদিও সমুদ্রের পানি অনেক। কিন্তু তোমার এ কথাটা এতটাই মারাত্মক যে, সমুদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলে পানির প্রাচুর্য সত্ত্বেও সে পানির রং পরিবর্তন হয়ে যাবে। সমুদ্রের পানির তুলনায় একজন মানুষের পুণ্য-আমল অনেক অনেক কম। তাই অযাচিত কথাটি যদি একজন মানুষের আমলের সাথে একত্রিত হয়, তবে সে আমলের কী অবস্থা হবে?’^{২৯২}

২৮৯. সহিহুল বুখারি : ৫২৩৫।

২৯০. ফাতহুল বারি : ৯/৩২৫।

২৯১. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৭৫, সুনানুত তিরমিজি : ২৫০২। হাদিসের মান : সহিহ।

২৯২. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/১৭৭।

স্ত্রীদের পরস্পরের কাছ থেকে সমান বদলা নেওয়ার অনুমতি দিতেন

আয়িশা   বলেন, ‘নবিজি  -এর স্ত্রীগণ দুভাগে বিভক্ত ছিলেন। এক দলে ছিলেন আয়িশা, হাফসা, সাফিয়্যা, সাওদা। অন্য দলে ছিলেন উম্মে সালামা ও অন্য স্ত্রীগণ। আয়িশা  -এর প্রতি রাসুল  -এর অধিক ভালোবাসার কথা জানতেন সাহাবিরা। তাই যদি কেউ রাসুল  -কে হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছে করতেন, তবে আয়িশার পালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। রাসুল   যেদিন আয়িশার ঘরে থাকতেন, সেদিন গিয়ে দিয়ে আসতেন হাদিয়া।

উম্মে সালামা ও তাঁর দলে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা উঠল। তারা বলল, “তুমি রাসুল  -এর সাথে কথা বলে দেখো, তিনি যেন মানুষদের জানিয়ে দেন যে, কেউ রাসুল  -কে হাদিয়া দিতে চাইলে রাসুল   যে স্ত্রীর ঘরেই থাকুক না কেন সে যেন সে ঘরেই হাদিয়া দিয়ে যায়।”

পরামর্শ অনুযায়ী উম্মে সালামা রাসুল  -এর সামনে কথাটা তুললেন। কিন্তু রাসুল   এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। এদিকে দলের বাকি সদস্যরা এসে জিজ্ঞেস করল উম্মে সালামাকে। তিনি বললেন, “রাসুল   তো আমাকে কিছুই বলেননি।” তারা আবারও বলল, “তুমি রাসুল  -এর সাথে আবার কথা বলো।” যেদিন উম্মে সালামার ঘরে রাসুল   গেলেন, তিনি আবারও কথাটা পাড়লেন। এবারও রাসুল   কোনো উত্তর দিলেন না। দলের বাকিরা জিজ্ঞেস করলে তিনি আগের মতোই বললেন, “না, রাসুল   কোনো কিছুই বলেননি।” বাকিরা বললেন, “রাসুল   কিছু বলা পর্যন্ত তুমি বলতে থাকো।” এরপর যেদিন উম্মে সালামার পালা এল, রাসুল   তার ঘরে এলে তিনি কথাটা তুললেন আবার। এবার রাসুল   বললেন, “আয়িশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। কেননা, আয়িশা ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রীর চাদরে থাকা অবস্থায় আমার প্রতি ওহি নাজিল হয়নি।”

উম্মে সালামা বললেন, “আপনাকে কষ্ট দেওয়া থেকে আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি।”

এরপর তারা রাসুল-কন্যা ফাতিমাকে ডাকল। ফাতিমা   এসে রাসুল  -এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি আমার সাথে এক চাদরে শুয়ে ছিলেন।

ফাতিমা   বলল, “আল্লাহর রাসুল, আপনার স্ত্রীরা আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন যেন আমি আবু বকরের মেয়ের ব্যাপারে ইনসাফের কথা বলি আপনাকে।” রাসুল   উত্তর দিলেন, “মেয়ে আমার, তুমি কি তা-ই ভালোবাসো না, যা আমি ভালোবাসি?” ফাতিমা উত্তর দিলেন, “অবশ্যই।” রাসুল   বললেন, “তবে তুমিও একে (আয়িশাকে) ভালোবাসো।” রাসুল  -এর কথা শুনে ফাতিমা   উঠে গেলেন। ফিরে গেলেন রাসুল  -এর স্ত্রীদের কাছে। তাদের জানালেন তার কথা ও রাসুল  -এর কথা। তারা বলল, “তুমি আমাদের কোনো উপকার করতে পারলে না। রাসুল  -এর কাছে আবার যাও।” তাদের কথা শুনে ফাতিমা বললেন, “আল্লাহর কসম, আয়িশার ব্যাপারে রাসুল  -এর সাথে কখনো আমি কথা বলতে যাব না।”

এবার তারা জাইনাব বিনতে জাহাশকে পাঠাল। রাসুল  -এর স্ত্রীদের মধ্যে জাইনাবই তাঁর কাছে আমার মতোই সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল। আমি জাইনাবের মতো উত্তম দ্বীনদার, মুত্তাকি, সত্যভাষী, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, অধিক সাদাকাকারী, যে কাজ করে তিনি সাদাকা করতেন সে কাজে আত্মনিবেদনকারী, আল্লাহর নৈকট্য তালাশকারী কোনো নারী দেখিনি। কিন্তু তার মাঝে কেবল একটি দুর্বলতা ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি রেগে যেতেন, আবার দ্রুতই ঠান্ডা হয়ে যেতেন।

জাইনাব   এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রাসুল   তখন আয়িশার সাথে একই চাদরে শোয়া আগের মতো। জাইনাব   বললেন, “আল্লাহর রাসুল, আপনার স্ত্রীরা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। যেন আপনার কাছে আবু বকরের মেয়ের ব্যাপারটিতে ইনসাফের আবেদন করি।” আয়িশা   বলেন, “এরপর জাইনাব   আমাকে নিয়ে কথা বলতে লাগল। আমাকে কয়েক কথা শুনিয়ে দিল। আর আমি রাসুল  -এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দেবেন কি না। জাইনাব   তখন বলেই যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলাম, আমি যদি জাইনাবকে কিছু বলি, তবে রাসুল   তা অপছন্দ করবেন না।” এরপর আয়িশা   জাইনাব  -এর কথার উত্তর দিতে থাকলেন। জাইনাব  -এর মোক্ষম জবাব দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে ছাড়লেন।

আয়িশা   বলেন, ‘আমি যখন তাকে নিয়ে বলা শুরু করলাম, তাকে একেবারে লা-জাওয়াব করে ছাড়লাম।’ নবিজি   তখন আয়িশার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, “এই না হলো আবু বকরের মেয়ে।”^{২৯৩}

আয়িশা   বেশ সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এখানে। এতে বোঝা যায়, তিনি বেশ বুদ্ধিমতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। অপরপক্ষ যখন বলেই যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ধৈর্য ধরে শুনতে থাকলেন, যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ সীমাতিরিক্ত না করেছে। এরপর তিনি শুরু করলেন, পাঁটা জবাবে প্রতিপক্ষকে লা-জাওয়াব করে দিলেন।

ইবনে হাজার   বলেন, ‘এ হাদিস থেকে বুঝতে পারি, স্বামীকে নিয়ে সতিনে সতিনে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা হতে পারে। স্ত্রীদের পরস্পরের আলাপ-আলোচনায় স্বামী চুপ থাকতে পারে। তবে স্বামী কারও প্রতি অন্যায় সমর্থন দিতে পারে না।’^{২৯৪}



২৯৩. সহিহুল বুখারি : ২৫৮১, সহিহ মুসলিম : ২৪৪২।

২৯৪. ফাতহুল বারি : ৫/২০৮।

তৃতীয় পর্ব

নবি-পরিবারে উদ্ভূত সমস্যাবলি ও তার সমাধান

পূত-পবিত্র স্ত্রীদের নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এক অনুপম শান্তিময় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। এক কথায় তাঁর দাম্পত্য জীবনের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে হলে কুরআনের এ আয়াতটিই যথার্থ। আল্লাহ বলেন : وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‘স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।’^{২৯৫}

কিন্তু প্রতিটি পরিবারেই কিছু না কিছু সমস্যা থাকেই। কোনো সংসারই সমস্যা থেকে পূর্ণ মুক্ত থাকে না। এমনকি এমন কিছু পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছে নবি পরিবারেও। রাসুল ﷺ একজন আদর্শ স্বামী। সকলের জন্য তিনি আদর্শ। সংসারে উদ্ভূত সমস্যাকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হয়, সে ক্ষেত্রেও তো তাঁর নির্দেশনা প্রয়োজন। তাই আল্লাহ তাআলা নবি পরিবারেও কিছু সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়েছেন, যাতে অন্যরা শিখতে পারে, জানতে পারে এ ব্যাপারটিতে রাসুল ﷺ-এর আমল কেমন ছিল; যেন সবাই জানতে পারে তারাই-বা কীভাবে নিজ পরিবারের, নিজ সংসারের সমস্যাগুলোর সমাধান করবে।

সংসারে সমস্যা থাকবে। এটা কোনো গুরুতর বিষয় নয়। কিন্তু পরিস্থিতি গুরুতর হবে তখন, যখন ন্যায় ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করা হবে না। যখন সমস্যার হার বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাবে, তখনই ব্যাপারটা গুরুতর হবে। সংসারে উদ্ভূত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাঁড়িয়ে যায় একটি জীর্ণ-বিবর্ণ অভিশপ্ত দেয়াল। সম্পর্ক নষ্ট হয়। ঘনীভূত সমস্যা একসময় তালাকে গিয়ে গড়ায়।

নবি-পরিবার কিছু কঠিন সময় অতিবাহিত করেছে। উদাহরণত, ইফকের ঘটনা, ভরণপোষণ চাওয়ার ঘটনা, নবিজি ﷺ-এর মারিয়াকে নিজের জন্য হারাম করে নেওয়ার ঘটনা।

এসব সমস্যার বর্ণনা দিয়ে একে একে আমরা উল্লেখ করব রাসুল ﷺ কীভাবে এসব সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

ইফকের ঘটনা

ইফকের ঘটনা আয়িশা রা.এর জীবনে ঘটে যাওয়া বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। বিশাল মুসিবতে পড়েছিলেন তিনি। পরিশেষে সাত আসমানের ওপর আয়িশা রা.এর পবিত্রতার ঘোষণা দিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।

মুমিন-জননী আয়িশা রা. আমাদের জন্য এ ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে :

‘রাসুল ﷺ যখন সফরে বের হওয়ার ইচ্ছে করতেন, স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন। লটারিতে যার নাম আসত, তাকে সাথে নিয়ে সফরে বের হতেন। এ রকমই এক যুদ্ধের সফরের আগে তিনি লটারি করলেন। লটারির ফলাফল এল আমার পক্ষে। রাসুল ﷺ-এর সাথে বের হলাম। সময়টা পর্দার বিধান নাজিল হওয়ার পরের। উটের হাওদায় চড়ে সফর করতাম আমি। প্রয়োজনে হাওদাসমেত আমাকে নামানো হতো। এভাবেই চলছিল আমাদের সফর। যুদ্ধ শেষ হলো। রাসুল ﷺ যুদ্ধ করে অবসর হলে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হলো। মদিনার নিকটবর্তী এক জায়গায় সফর-বিরতি হলো। সফর-বিরতির ঘোষণা শুনে আমি সৈন্যদের থেকে আলাদা হয়ে প্রয়োজন সারতে গেলাম। প্রয়োজন সেরে এসে হাওদায় প্রবেশ করলাম। কিন্তু হঠাৎ করে বুকে হাত দিয়ে দেখি, ইয়ামানের জাফার থেকে আনা আমার হারটি ভেঙে হারিয়ে গেছে। উপায়ান্তর না দেখে আবার সে স্থানে গিয়ে হারটি কুড়িয়ে আনার জন্য গেলাম। কিন্তু হার খুঁজতে খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।

এমন সময় রাসুল ﷺ যাত্রার আদেশ দেন। সাহাবিগণ হাওদা উঠিয়ে নিলেন আমার উটে। তখনকার মেয়েরা হালকা-পাতলা হতো। কারণ, তাদের খাওয়া হতো কমই। তাই চারজনে মিলে হাওদা উঠানোর কারণে তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, আমি ভেতরে আছি কি নেই। আমি তখন কম বয়সী এক তরুণী।

তারা উট হাঁকিয়ে সফর চালিয়ে গেলেন। এদিকে সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর আমি হার খুঁজে পেয়ে বিরতির জায়গায় ফিরে এলাম। কিন্তু সেখানে কাউকে

পেলাম না। আমি যেখানে অবস্থান করেছিলাম, সেখানে বসে থাকলাম। আমার মনে আশা জাগল, তারা যখন দেখবে আমি তাদের সাথে নেই, তারা ফিরে আসবে আমাকে খুঁজতে। আমি বসে রইলাম। চোখে ঘুম জড়িয়ে এল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সফওয়ান বিন মুআত্তাল সুলামি সৈন্যদলের পেছনে পরিদর্শক হিসেবে ছিলেন। সকালবেলা তিনি আমার ঘুমানোর স্থানে এসে পৌঁছালেন। তিনি দেখলেন, একটি ঘুমন্ত মানুষের আকৃতি। তিনি আমার কাছে আসলেন। আমাকে দেখে চিনে ফেললেন তিনি। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমাকে দেখেছিলেন তিনি। আমাকে চিনতে পেরে তিনি “ইন্নালিল্লাহ...” বলে উঠলেন। তার কণ্ঠস্বরে আমি জেগে উঠলাম। মুখের ওপর কাপড় টেনে দিলাম আমার জিলবাবের।

আল্লাহর কসম, তিনি আমার সাথে এক শব্দ কথাও বলেননি। “ইন্নালিল্লাহ” পড়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শব্দ তার মুখ থেকে শুনিনি আমি। তিনি উঠ বসালেন। আমি উঠে আরোহণ করলাম। এরপর বাহন নিয়ে তিনি সামনে চলতে লাগলেন। পরিশেষে আমরা সৈন্যদলের সাথে মিলিত হলাম জোহরের সময়। তারা তখন বিশ্রামে ছিল।

সে সময় আমার ব্যাপারটি নিয়ে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হলো। আর এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল।

সফর শেষে আমরা মদিনায় পৌঁছালাম। মদিনায় এসেই এক মাসের মতো আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। মানুষ অপবাদ রটনাকারীদের কথা চর্চা করতে লাগল। কিন্তু তার কিছুই আমি জানতাম না। রাসুল ﷺ আমাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তার যে স্নেহ পেতাম অসুস্থতার সময়, এ সময়ে সে স্নেহে কমতি হচ্ছিল। তিনি আমার কাছে আসতেন। সালাম দিতেন। এরপর জিজ্ঞেস করতেন, “কেমন আছ?” এতে আমি সন্দেহে পড়ি। কিন্তু মন্দ কিছু আঁচ করতে পারিনি।

কিছুটা সুস্থ হওয়ার পরের কথা। এক রাতে আমি ও উম্মে মিসতাহ বের হলাম প্রয়োজন সারতে। চাদরে পা জড়িয়ে হাঁচট খেল উম্মে মিসতাহ।

বলে উঠল, “মিসতাহর জন্য দুর্ভোগ।” আমি তাকে বললাম, “তুমি বড় মন্দ বলেছ। বদরে অংশ নেওয়া মহৎপ্রাণ এক ব্যক্তিকে তুমি গালি দিলে!” উম্মে মিসতাহ বলল, “সরল নারী, তুমি কি শুনোনি সে কী বলেছে?” আমি বললাম, “কী বলেছে?” এরপর উম্মে মিসতাহ অপবাদ রটনার সকল কথা আমাকে জানাল। ফলে আমার রোগের প্রকোপ আরও বেড়ে গেল। বাড়িতে ফিরে আসলাম আমি। রাসুল ﷺ আমার কাছে এসে সালাম দিলেন। বললেন, “কেমন আছ?” আমি বললাম, “আপনি কি আমাকে বাবা-মার কাছে যাওয়ার অনুমতি দেবেন?” আমি চাচ্ছিলাম মা-বাবার কাছ থেকে ব্যাপারটি নিশ্চিত করি। রাসুল ﷺ অনুমতি দিলেন।

বাবা-মার কাছে চলে গেলাম আমি। মাকে বললাম, “মা, মানুষ কী বলাবলি করছে?” মা বললেন, “মেয়ে আমার, বিষয়টা হালকাভাবে নাও। আল্লাহর শপথ, কোনো সুন্দরী মহিলা যদি এমন স্বামীর কাছে থাকে আর স্বামীও তাকে ভালোবাসে, সাথে যদি সে মহিলার কয়েক সতিন থাকে, তবে তারা সে মহিলাকে নিয়ে একটু-আধটু বলেই।” মায়ের কথা শুনে আমি বললাম, “সুবহানাল্লাহ, তাহলে মানুষ ঠিকই এসব রটিয়েছে?!” সে রাতে অনবরত কাঁদতে কাঁদতে কাটিয়ে দিলাম। একটুও ঘুমাইনি। কাঁদতে কাঁদতে রাত ভোর হলো।

ওহি আসতে দেরি হচ্ছে দেখে রাসুল ﷺ আলি ও উসামাকে স্ত্রী পরিত্যাগের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য ডাকলেন। উসামা বিন জাইদ রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীর নিষ্কলুষতা জানতেন, জানতেন স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা কেমন, এর ওপর ভিত্তি করে তিনি বললেন, “আল্লাহর রাসুল, তিনি আপনার স্ত্রী। তাকে আমরা উত্তমই জানি।” অন্যদিকে আলি ﷺ বললেন, “আল্লাহ আপনার পথ সংকীর্ণ করে দেননি। তিনি ব্যতীত অন্য অনেক নারীই আছেন। আপনি তার দাসী (বারিরা)-কে জিজ্ঞেস করুন। সে সত্যিটা বলতে পারবে।” এরপর রাসুল ﷺ বারিরাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, “বারিরা, আয়িশার মাঝে কৌতূহল-উদ্দীপক কিছু দেখেছ?” বারিরা বলল, “যে সত্তা আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন—তাঁর শপথ, তাঁর মাঝে কখনো আমি দোষের কিছু দেখিনি। তবে তিনি অল্পবয়সী এক কিশোরী। আটা খামির করতে গিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর ওদিকে ঘরের বকরিটি এসে তা খেয়ে ফেলে।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার সম্পর্কে জাইনাবের কাছে জানতে চাইতেন। তিনি বলতেন, “হে জাইনাব তুমি কী জানো? তুমি কী দেখছ?” জাইনাব বলত, “হে আল্লাহর রাসুল, আমি আমার কান ও চোখে পর্যবেক্ষণ করে চলি। আল্লাহর কসম, আমি তার মাঝে কেবল কল্যাণই দেখেছি।” আয়িশা   বলেন, “জাইনাব সর্বদা আমার সাথে প্রতিযোগিতায় লেগে থাকত। কিন্তু এ ব্যাপারটিতে এসে তার ধার্মিকতা-দীনদারিতার কারণে নিজেকে সে রক্ষা করতে পেরেছে।

এরপর রাসুল ﷺ মিস্বারে দাঁড়ালেন। ইবনে উবাইয়ের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সাহাবিদের কাছে বললেন। তিনি বললেন, “মুসলিম জাতি, কে আমাকে সাহায্য করবে এমন এক লোকের বিরুদ্ধে, যে কষ্ট দিতে দিতে এবার আমার পরিবার নিয়েও আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে? আল্লাহর কসম, আমার স্ত্রীর মাঝে ভালো বৈ মন্দ কিছু পাইনি আমি। তারা এমন এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে কথা রটিয়েছে, যাকে আমি উত্তম বলেই জানি। সে আমার সঙ্গ ব্যতীত আমার ঘরে আসেনি কখনো।”

আওস গোত্রের সাদ বিন মুআজ   দাঁড়িয়ে বললেন, “আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর শপথ, আমি আপনাকে সাহায্য করব তার বিরুদ্ধে। যদি সে আওস গোত্রের কেউ হয়, তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। আর যদি সে আমাদের ভাই খাজরাজ গোত্রের কেউ হয়, তবে আপনি যেভাবে আদেশ দেন, সেভাবেই আমরা পালন করব।”

[আয়িশা   বলেন, “খাজরাজ গোত্রের নেতা সাদ বিন উবাদা—তিনি সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তার গোত্রপ্রীতি তাকে মূর্খামিতে উদ্যত করেছে—তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। সাদ বিন মুআজের উদ্দেশ্যে বললেন, “আল্লাহর শপথ, তুমি মিথ্যে বলছ। তুমি তাকে হত্যা করবে না। তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না।” এবার সাদ বিন মুআজের চাচাতো ভাই উসাইদ বিন হুজাইর দাঁড়িয়ে সাদ বিন উবাদাকে বললেন, “আল্লাহর শপথ, তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি একজন মুনাফিক, আরেকজন মুনাফিকের পক্ষে তর্ক করছ।”]

আওস ও খাজরাজ একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি তাদের ঝগড়া যুদ্ধের ইচ্ছে পর্যন্ত গড়াল। রাসুল ﷺ তখনও মিসরের ওপর। তিনি নেমে এসে তাদের শান্ত করলেন। তারাও চুপ হয়ে গেলেন, রাসুল ﷺ-ও আর কিছু বললেন না।

সেদিন কেঁদে কেঁদে পার করলাম আমি। আমার চোখের অশ্রু একটুর জন্যও থামেনি। একটুও ঘুমাইনি সেদিন। এরপর রাতটাও কেঁদে কেঁদে কাটলাম। একটু সময়ের জন্যও থামেনি আমার অশ্রু। স্বপ্ন মুহূর্তও ঘুমের পরশ পাইনি। আমার মা-বাবা মনে করলেন, কাঁদতে কাঁদতে বুঝি আমার কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যায়। তারা দুজন আমার পাশেই বসেছিলেন, আর আমি অনবরত কেঁদে যাচ্ছিলাম। এক সময় এক আনসার নারী প্রবেশের অনুমতি চাইলে অনুমতি দিলাম আমি। সেও আমার কাছে বসে কাঁদতে থাকল। আমরা তখন সে অবস্থায়, এমন সময়ে রাসুল ﷺ আগমন করলেন। সালাম দিয়ে পাশে বসলেন। আমার ব্যাপারে কথা রটানোর পর থেকে তিনি আমার কাছে বসেননি। এ অবস্থায় এক মাস কাটলাম, কিন্তু তাঁর কাছে কোনো ওহি আসেনি আমার সম্পর্কে। রাসুল ﷺ আমার পাশে বসে শাহাদাহ পড়ে বললেন, “আয়িশা, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে এ এ সংবাদ এসেছে। যদি তুমি নিষ্পাপ হয়ে থাকো, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা ঘোষণা করবেন অচিরেই। আর যদি তুমি কোনো পাপ করেই থাকো, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর কাছে তাওবা করো। কোনো বান্দা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে তা স্বীকার করে তাওবা করলে তিনি তাওবা কবুল করেন।”

রাসুল ﷺ-এর কথা শেষ হলো। আমার চোখ থেকে অশ্রুপ্রবাহ একেবারেই নাই হয়ে গেল। এক ফোঁটা পানিও অনুভব করলাম না চোখে। আমি বাবাকে বললাম, “আমার পক্ষ থেকে রাসুল ﷺ-কে উত্তর দিয়ে দিন।” তিনি বললেন, “আল্লাহর শপথ, আমি বুঝে উঠতে পারছি না রাসুল ﷺ-কে কী উত্তর দেবো!” এরপর মাকে বললাম, “আমার পক্ষ থেকে রাসুল ﷺ-কে উত্তর দিয়ে দিন।” তিনিও বললেন, “আল্লাহর শপথ, আমি বুঝে উঠতে পারছি না রাসুল ﷺ-কে কী উত্তর দেবো!”

তখন আমি অল্প বয়স্কা এক তরুণী। কুরআনও খুব বেশি মুখস্থ হয়নি তখন। তবুও আমি বললাম, “আল্লাহর কসম, আমি জানি, আপনারা এ ব্যাপারে যা শোনার শুনেছেন। সেটাই আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তা-ই আপনারা বিশ্বাস করে ফেলেছেন। এখন যদি আমি নিজেকে পবিত্র বলি—আর আল্লাহ জানেন আমি পবিত্র—তবে আপনাদের অন্তর তা মেনে নেবে না। কেননা, আপনারা অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়েছেন। আর যদি না-করা পাপটি আমি স্বীকার করে নিই—আর আল্লাহ জানেন আমি পবিত্র—তবে আপনারা আমাকে মিথ্যের ব্যাপারটিতে বিশ্বাস করে নেবেন। এ জন্য আমার ও আপনাদের জন্য সে-ই উদাহরণই যুৎসই, যা ইউসুফ ؑ-এর পিতা ইউসুফ ؑ-এর ভাইদের বলেছিলেন— فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ “ধৈর্যধারণই উত্তম। আর তোমরা যা বলছ, তার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।”^{২৯৬} এরপর আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

আল্লাহর কসম, আমি তখনও জানতাম আমি নিষ্পাপ। আর আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আমি ধারণা করতে পারিনি যে, আমার ব্যাপারে নাজিলকৃত ওহি কুরআনের পাঠ হিসেবে তিলাওয়াত করা হবে। আমার ব্যাপারে আমার ধারণা ছিল, আমি এতটা উপযুক্ত নই যে, আল্লাহ আমার সম্পর্কে কথা বলবেন এবং তা তিলাওয়াত করা হবে। বরং আমি আশা করছিলাম, রাসুল ﷺ আমার নিষ্কলুষতার বিষয়ে স্বপ্নে দেখবেন, আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করছেন।

আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ তাঁর বসা থেকে ওঠেননি। ঘরের কেউই বের হয়নি। তখনই সেখানে নবিজি ﷺ-এর ওপর ওহি নাজিল হওয়া শুরু হলো। ওহির সময় তাঁর ওপর যে কঠিন অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন তা শুরু হলো। এমনকি সে শীতের দিনেও তিনি ধর ধর করে ঘেমে নেয়ে যেতেন তিনি। তাঁর শরীর থেকে মুক্তোর মতো ঘামের ফোঁটা ঝরত।

ওহি নাজিলের কষ্ট শেষ হয়ে গেলে দেখলাম, রাসুল ﷺ হাসছেন। তিনি প্রথম যে শব্দটি বলেছিলেন সেটি হচ্ছে, “সুসংবাদ নাও আয়িশা, আল্লাহ তাআলা

তোমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন।” তখন আমার মা আমাকে বললেন, “যাও, উঠে রাসুল ﷺ-এর কাছে যাও। (তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো।)” আমি বললাম, “আল্লাহর শপথ, না, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না। আমি কেবল আল্লাহরই প্রশংসা করব। তিনিই আমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করলেন। আল্লাহ নাজিল করেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ - لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ...

“যারা এ অপবাদ রটিয়েছে, তারা তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না। বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি।

তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ইমানদার নারী-পুরুষরা কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি? কেন বলোনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ?”... (সূরা আন-নুর, ২৪ : ১১-২০)

সূরা নুরের দশ আয়াত। আল্লাহ তাআলা এ সকল আয়াত আমার নিষ্কলুষতা ঘোষণায় নাজিল করেছেন।^{২৯৭}

ইফকের ঘটনায় স্ত্রীর প্রতি রাসুল ﷺ-এর আচরণনীতি থেকে শিক্ষা

১. অনুসন্ধান নীতি

ইফকের ঘটনায় রাসুল ﷺ তত্ত্ব-তালাশ ও অনুসন্ধানের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। অপবাদ রটনার পর কোনো সিদ্ধান্তে যাওয়ার আগে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন

রাসুল ﷺ। ধীরে ধীরে অনুসন্ধান করে গেলেন অপবাদ সম্পর্কে। তাড়াহুড়োয় যেন কোনো অন্যায় সিদ্ধান্ত না হয়ে যায়, তাই ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন। অপবাদ রটনার পর থেকে মাসখানেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায় অনুসন্ধানে। এ সময়টাতে এ বিষয়ে আয়িশার সাথে খুলে কথা বলেননি তিনি। বরং অনুসন্ধান করে গেলেন, সত্য তাল্লাশ করতে থাকলেন।

২. আচরণে পরিবর্তন

অপবাদ রটনার পর থেকে রাসুল ﷺ স্ত্রীর সাথে আচরণে পরিবর্তন আনেন। সাধারণ সময়ে আয়িশা ﷺ-এর পাশে এসে বসতেন, তার সাথে কথা বলতেন, আদর-সোহাগে আগলে রাখতেন। কিন্তু এ সময়টাতে রাসুল ﷺ আচরণে পরিবর্তন আনেন। আয়িশা ﷺ স্বয়ং বলেছেন, ‘অসুস্থতার সময় আমার সন্দেহ হলো, অসুস্থতার আগে রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে যে আদর-স্নেহ পেতাম, অসুস্থতার পর সেখানে ঘাটতি হচ্ছে।’

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাসুল ﷺ এ ঘটনায় পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার সাথে আচরণে পরিবর্তন এনেছেন। তিনি আয়িশা ﷺ-কে একেবারে ছেড়ে দেননি। কেননা, আয়িশা ﷺ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া এমন এক গুনাহর শাস্তি হয়ে যাবে, যা প্রমাণিত হয়নি তখনো। তাই রাসুল ﷺ আয়িশা ﷺ-এর খোঁজখবর নিতেন, ‘কেমন আছ’ বলে তার অবস্থা জানতে চাইতেন।

অন্যদিকে ঘটনার আগে আয়িশার প্রতি যে স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন তিনি, সে স্নেহে ঘাটতি আনলেন। যাতে আয়িশা ﷺ বুঝতে পারেন যে, কিছু একটা ঘটেছে, যার সত্যতা জানার জন্য অনুসন্ধান চলছে।

ইবনে হাজার ﷺ বলেন :

‘এ হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আচরণ হবে স্নেহপূর্ণ ও উত্তম আচরণ। কিন্তু স্বামীর কাছে স্ত্রীর মন্দকর্ম সম্পর্কে কোনো সংবাদ আসলে সত্যতা নিশ্চিত না হয়ে স্বামী তৎক্ষণাৎ সংবাদের ওপর পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। বরং পূর্বের স্নেহপূর্ণ আচরণ কমিয়ে দেবে। এ রকম আচরণনীতির সুফল হচ্ছে, স্বামীর আচরণে পরিবর্তন দেখে স্ত্রী কারণ

অনুসন্ধান করবে, যদি স্ত্রী অপরাধ করে থাকে, তবে স্বামীর কাছে স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে।’^{২৯৮}

ইমাম নববি রহিমুল্লাহ বলেন, ‘ইফকের হাদিসে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। একটি শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে, যখন স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে মন্দ কিছু শুনবে, তখন স্নেহ ও আদরে কমতি করবে। যাতে স্ত্রী স্বামীর সোহাগ কমে যাওয়ার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করে স্বামীর কাছে এবং স্বামীর মনের সন্দেহ দূর করে দিতে পারে।’^{২৯৯}

৩. পরামর্শ করা

অপবাদ রটনাকে কেন্দ্র করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসন্ধান চালিয়ে গেলেন। পরিশেষে পরিপূর্ণ গোপনে তিনি আয়িশা রা-এর চরিত্র, তাঁর আচার-আচরণ সম্পর্কে জেনে নিলেন। তার মাঝে কখনো মন্দ কিছু প্রকাশ পেয়েছে কি না, তা জেনে নিলেন।

পরামর্শ করলেন উসামা ও আলি রা এবং বারিরা ও জাইনাব রা-এর সাথে। এ চারজনকে বাছাইয়ের পেছনে প্রজ্ঞা ব্যবহার করেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমনি এমনি তিনি এ চার জনের সাথে পরামর্শ করেননি। বরং তাঁদের বাছাইয়ের পেছনে ছিল বিশেষ কারণ।

আলি রা ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটাত্মীয়। পরিবারের একজন। অন্যদিকে উসামা রা ছিলেন তাঁর নিকটতমদের একজন। নবি-পরিবারের নৈকটে থাকা মানুষ। দুজনই পূর্ণ গোপনীয়তার ব্যাপারে ছিলেন আস্থাভাজন।

ইবনে হাজার রা বলেন :

‘আলি ও উসামা রা-কে বাছাই করে নেওয়ার কারণ ছিল, আলি রা ছিলেন তাঁর ছেলের মতো। কারণ, বাল্যকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লালনপালনাধীন ছিলেন আলি রা। বড় হয়ে গেলেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে পৃথক হননি তিনি। বরং

^{২৯৮}. ফাতহুল বারি : ২/৪৭৯।

^{২৯৯}. ইমাম নববি রহিমুল্লাহ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১৭/১১৭।

ফাতিমা  -কে বিয়ে দিয়ে সম্পর্ক আরও গাঢ় হয় উভয়ের। আলি   রাসুল  -এর পরিবার সম্পর্কে অন্য কারও চাইতে বেশি জ্ঞাত ছিলেন। তাই রাসুল   তাকে বেছে নেন। অন্যথা, সাধারণত ব্যাপক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আবু বকর ও উমর  -এর সাথে আলোচনা করতেন তিনি।

রাসুল  -এর সাথে দীর্ঘ সময় কাটানোর ক্ষেত্রে উসামা   আলি  -এর মতোই ছিলেন রাসুল  -এর কাছে। তিনি তাঁর প্রিয় ও ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। এ জন্য তাকে ‘রাসুল  -এর প্রিয়পাত্র’ নাম দেওয়া হয়েছিল। রাসুল   উসামার পিতামাতাকে বেছে নেননি। বেছে নিয়েছেন যুবক উসামাকে। আলি  -ও যুবক ছিলেন। যদিও উসামা  -এর চাইতে বয়স বেশি ছিল আলি  -এর। দুজন যুবককে বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে, প্রৌঢ় বা বুড়োদের চেয়ে যুবকদের মাথা পরিষ্কার থাকে। যুবকরা অকপটে সত্যটা বলার সাহস রাখে; কিন্তু বয়স্করা পরিণাম বিবেচনায় কখনো জিজ্ঞাসাকারীর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে, কখনো যার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তার দিকে নজর দিয়ে সত্য বা আংশিক সত্য গোপন রাখে।’৩০০

রাসুল   পরামর্শের জন্য নারীদের মধ্যে দুজনকে নির্বাচন করেছেন।

এক. নবি-পরিবারের মধ্য থেকে একজন। তিনি হচ্ছেন তাঁর স্ত্রী জাইনাব  ।

দুই. একজন দাসী। নাম তার বারিরা  । তিনি আয়িশা  -এর নিকটতম ছিলেন। আয়িশা   সম্পর্কে বেশি জানতেন তিনি। তাই তাকে বেছে নেন রাসুল  ।

নিঃসন্দেহে পরামর্শের জন্য এ ব্যক্তিবর্গের বাছাই রাসুল  -এর অনুপম প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করে। প্রমাণ বহন করে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার সাথে ঘটনা নিয়ন্ত্রণের।

গোপন অনুসন্ধানের এ কার্যক্রম ফলাফল এনে দেয়। রাসুল   মিম্বারে ওঠেন। আর বর্ণনা করেন এ ষড়যন্ত্রের পেছনে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলের হাত থাকার কথা। তিনি বলেন, ‘মুসলিম জাতি, কে আমাকে সাহায্য করবে এমন এক লোকের বিরুদ্ধে, যে কষ্ট দিতে দিতে এবার আমার

পরিবার নিয়েও আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে? আল্লাহর কসম, আমার স্ত্রীর মাঝে ভালো বৈ মন্দ কিছু পাইনি আমি। তারা এমন এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে কথা রটিয়েছে, যাকে আমি উত্তম বলেই জানি। সে আমার সঙ্গ ব্যতীত আমার ঘরে আসেনি কখনো।’

‘কসম, আমার স্ত্রীর মাঝে ভালো বৈ মন্দ কিছু পাইনি আমি’ বলে রাসুল ﷺ নিজ স্ত্রীর পক্ষ থেকে অপবাদের বিরোধিতা করেছেন।

যদিও অনুসন্ধান ও পরামর্শের পর রাসুল ﷺ আয়িশা রা.এর নিষ্কলুষতার বিষয়ে নিশ্চিত হলেন। তবুও তিনি ওহি নাজিলের অপেক্ষা করছিলেন। যাতে বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।

অন্যদিকে ওহি নাজিলে বিলম্ব করার মাঝে আল্লাহর বিশেষ প্রজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা চাইছিলেন একজন মুসলিম কীভাবে এ রকম ঘটনাতে সিদ্ধান্ত নেবে, তা স্পষ্ট হয়ে যাক। স্পষ্ট হয়ে যাক, কীভাবে স্ত্রীর সাথে এ সময়ে আচরণ করতে হবে। যাতে সংসার না ভেঙে অটুট থাকে। আর ভালোবাসায় ভরপুর থাকে সব সময়।

৪. স্ত্রীর মুখোমুখি হওয়া

পরিশেষে সমস্যার সমাধান করার পর রাসুল ﷺ আয়িশা রা.এর মুখোমুখি হলেন মনকে পরিপূর্ণ শান্ত করার জন্য। নসিহত ও উপদেশের আঙ্গিকে বললেন, ‘আয়িশা, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে এ এ সংবাদ এসেছে। যদি তুমি নিষ্পাপ হয়ে থাকো, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা ঘোষণা করবেন অচিরেই। আর যদি তুমি কোনো পাপ করেই থাকো, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর কাছে তাওবা করো। কোনো বান্দা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে তা স্বীকার করে তাওবা করলে তিনি তাওবা কবুল করেন।’

৫. ওহি নাজিলের পর স্ত্রীর অভিমানে সহনশীলতা

ওহি নাজিল হলো। আয়িশা রা.এর নিষ্কলুষতা ঘোষণা করলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তখন আয়িশা রা.এর মা বললেন, ‘যাও, উঠে রাসুল ﷺ-এর কাছে যাও। (তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো।)’ আয়িশা রা. বললেন,

‘আল্লাহর শপথ, না, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না। আমি কেবল আল্লাহরই প্রশংসা করব। তিনিই আমাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করলেন।’

ইমাম নববি رحمہ اللہ বলেন, ‘ইফকের ঘটনা ছিল মুনাফিকদের নিরোট ষড়যন্ত্র। ওহির মাধ্যমে কুরআন মাজিদের নস দিয়ে আয়িশা رضی اللہ عنہا-এর পবিত্রতার ঘোষণা এসেছে। ইমামদের ঐকমত্যে, এরপরও কোনো মানুষ যদি এ নিয়ে সন্দেহ করে—নাউজুবিল্লাহ—সে কাফির মুরতাদ হয়ে যাবে।’^{৩০১}

ভরণপোষণ চাওয়ার ঘটনা

এ ঘটনা থেকে বোঝা যাবে, আর্থিক দুরবস্থার সময় রাসুল ﷺ-এর কর্মপন্থা কেমন ছিল। কেমন ছিল তাঁর আচরণ পরিবারের সদস্যদের প্রতি, যখন তাঁরা অতিরিক্ত ভরণপোষণ চেয়েছিলেন।

ঘটনাটি জাবির رضی اللہ عنہ-এর মুখেই শুনা যাক। তিনি বলেন :

‘আবু বকর এলেন রাসুল ﷺ-এর কাছে। দেখলেন, অনেক মানুষ তাঁর দরোজায় বসে আছে। কিন্তু কাউকেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আবু বকর رضی اللہ عنہ এগিয়ে গিয়ে অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন ভেতরে। এরপর এলেন উমর رضی اللہ عنہ। অনুমতি চাইলেন প্রবেশের। তাকেও অনুমতি দেওয়া হলো। উমর দেখলেন, রাসুল ﷺ-এর পাশে তাঁর স্ত্রীরা। রাসুল ﷺ নীরব। তাঁর চেহারায় চিন্তার ছাপ। আবু বকর رضی اللہ عنہ বললেন, “আমি এমন কিছু বলব, যাতে রাসুল হেসে দেন।”

আবু বকর رضی اللہ عنہ বললেন, “আল্লাহর রাসুল, আমার কাছে খোরপোশ চাইলে বিনতে খারিজার (তার স্ত্রী) সাথে কেমন আচরণ করি, আপনি যদি দেখতেন! এ অবস্থায় আমি তার কাছে যাই এবং তার ঘাড়ে আঘাত করি।”

রাসুল ﷺ হেসে দিলেন। বললেন, “আমার পাশে যারা বসে আছে, তারাও আমার কাছে খোরপোশ চাচ্ছে।”

রাসুল ﷺ-এর কথা শুনে আবু বকর ﷺ উঠে গেলেন আয়িশার দিকে। আঘাত করলেন তার ঘাড়ে। ওদিকে উমর ﷺ-ও এগিয়ে গেলেন হাফসার দিকে। আঘাত করলেন তার ঘাড়ে। উভয়ে বলে উঠলেন, “তোমরা এমন কিছু রাসুল ﷺ-এর কাছে চাইছ, যা তাঁর কাছে নেই।”

রাসুল ﷺ তাঁদের দুজনকে নিবৃত্ত করলেন।

তখন রাসুল ﷺ-এর স্ত্রী দুজন বললেন, “আল্লাহর শপথ, আমরা এমন কিছু রাসুল ﷺ-এর কাছে চাইব না, যা তাঁর কাছে নেই।”

(এরপর ত্রিশ কি উনত্রিশ দিন কেটে গেল। রাসুল ﷺ স্ত্রীদের থেকে পৃথক রইলেন।) এরপর আল্লাহ নাজিল করলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

“হে নবি, আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং আখিরাত কামনা করো, তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।”^{৩০২}

আয়াত নাজিলের পর রাসুল ﷺ প্রথমে আয়িশার নিকট আসলেন। বললেন, “আমি তোমাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলি। তুমি তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিয়ো না। তোমার বিষয়ে তোমার বাবা-মার সাথে পরামর্শ করো।”

আয়িশা বললেন, “কোন বিষয়ে হে আল্লাহর রাসুল।” রাসুল ﷺ আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

আয়িশা বললেন, ‘আমি আপনার ব্যাপারে আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ করব? (তার কোনো প্রয়োজন নেই) আমি আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল ও আখিরাতকে বেছে নেব। আমি আপনার কাছে আরেকটি আবদার রাখছি। আপনি আমার বলা কথা আপনার অন্য স্ত্রীর কাউকে বলবেন না।’

উত্তরে রাসুল ﷺ বললেন, “তাদের যে-ই আমার কাছে জানতে চাইবে, আমি তাকে জানিয়ে দেবো তোমার কথা। কারণ আমাকে জেদি ও কঠোরতাকারীরূপে পাঠানো হয়নি। বরং আমাকে পাঠানো হয়েছে সহজপন্থায় শিক্ষাদানকারী হিসেবে।”

রাসুল ﷺ-এর প্রত্যেক স্ত্রী তাঁকেই বেছে নিলেন। আয়িশার যে জবাব ছিল, তাদেরও একই জবাব ছিল।^{৩০৩}

ঘটনা বিশ্লেষণ ও শিক্ষা

- ✓ প্রথমেই রাসুল ﷺ চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করলেন। তাঁর স্ত্রীগণ অতিরিক্ত ভরণপোষণ চাইলেন, কিন্তু তিনি দেবেন কি দেবেন না, তা বললেন না। অন্য কোনো কিছুও বললেন না। বরং নীরব হয়ে থাকলেন।
- ✓ প্রথমে তিনি বিষয়টি উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করলেন। কারণ দাম্পত্য জীবনের অনেক সমস্যা ঝগড়া বা তর্ক-বিতর্কে সমাধান হয় না। বরং এমন কিছু বিষয় আছে, যে বিষয়ে তর্ক করলে ঝগড়া আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।
- ✓ দ্বিতীয় যে কর্মপন্থাটি রাসুল ﷺ গ্রহণ করেছিলেন সেটি হচ্ছে, তিনি স্ত্রীদের বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিলেন। তিনি স্ত্রীদের বেছে নিতে বললেন এ অবস্থায় তাঁর সাথে তারা থাকবেন, না তারা অতিরিক্ত খোরপোশ ও তাঁর থেকে পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন।
- ✓ এ পার্থিব সমস্যাটি সমাধানে রাসুল ﷺ তাখয়ির (تخيير) তথা বাছাই করে নেওয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করলেন। অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে দুটি অপশনের

একটি বাছাই করার স্বাধীনতা দিলেন। দাম্পত্য জীবনের বিবিধ বিষয়ে পরামর্শ করার মূলনীতি দেখিয়ে দিচ্ছে এ পদ্ধতিটি।

- ✓ রাসুল ﷺ স্ত্রীদের ধীরতা অবলম্বন করতে বললেন, তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করলেন। যেমন তিনি আয়িশা রা.কে বললেন, ‘আমি তোমাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলি। তুমি তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নিয়ো না।’
- ✓ এ ব্যাপারটি আমাদের সময়ের সংসারগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখি। আমাদের এ সময়ের সংসারগুলো স্বামী-স্ত্রীতে দ্বিমত হলেই স্বামী স্ত্রীকে তালাকের ধমক দিয়ে যাবে অনবরত। স্ত্রীর কোনো ভুল হলেই বলে উঠবে, ‘আমি তোমাকে তালাক দেবো অচিরেই।’ স্ত্রী যদি কোনো কিছুতে কমতি করে স্বামী বলে উঠবে, ‘আমি তোমাকে তালাক দেবো। যদি তুমি ঘর থেকে বের হও, তবে তুমি তালাক।’ স্ত্রী যদি কণ্ঠস্বরটা একটু উঁচু করে সাথে সাথে বলে উঠবে, ‘অমুক নারীর সাথে কথা বলেছ তো তুমি তালাক।’
- ✓ এ ঘটনা থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি, রাসুল ﷺ স্ত্রীদের ওপর কঠোরতা করেননি। তাদের গায়ে এতটুকু আঘাতও করেননি। তাদের এতটুকু অপমানও করেননি। বরং তিনি তাদের সাথে এক মহৎ পদ্ধতিতে আচরণ করেছেন।
- ✓ অন্যদিকে, যখন আবু বকর ও উমর রা. আয়িশা ও হাফসা রা.-এর দিকে এগিয়ে গেলেন তাদের প্রহার করতে। রাসুল ﷺ নিবৃত্ত করলেন তাদের। কারণ, মারধর করে সব সমস্যার সমাধান হয় না। বরং অনেক সময় আলাপ-আলোচনা করা, স্ত্রীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাস্তবতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমেই হয় সমাধান।

নারীদের প্রতি একটি পরামর্শ

স্বল্প আয়ের স্বামীর ঘরের স্ত্রী যখন ধনী কারও বাড়িতে যায়, বিলাসবহুল কোনো বাড়িতে যায়, তখন তার জন্য উচিত নয় স্বামীকে দুঃখতে থাকা, স্বামীর

কাছে বিলাসিতা কামনা করা। কারণ, তার স্বামী ছাত্র হতে পারে, হতে পারে তার চাকরিটায় বেতন স্বল্প। স্ত্রীর উচিত তার স্বামীর সামর্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখা। আর এটাই আল্লাহর ফয়সালা।

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

“আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের ওপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে।”^{৩০৪}

বাবার বাড়িতে মেয়ে খুব আরামে ছিল, বাবা মেয়েকে প্রতিদিন কিছু না কিছু এনে দিত; এর অর্থ এ নয় যে, স্বামীর বাড়িতে এসে স্বামীকে প্রতিদিন কিছু আনার জন্য বলতে হবে।

অতিরিক্তি খোরপোশ চাওয়া, বেশি বেশি জিনিস চাওয়া স্বামীকে সমস্যায় ফেলে দেওয়ার নামান্তর। বিশেষ করে স্বামী যখন দরিদ্র হয়। কারণ, এভাবেই স্ত্রী দুর্বল ইমানের স্বামীকে ধীরে ধীরে ঠেলে দেয় হারাম উপার্জনের পথে। ফলে স্ত্রী নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, স্বামীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সাথে সাথে একটি পরিবারকে কল্যাণ ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে। স্ত্রীর চাপে পড়ে ঘুষ, চুরি ইত্যাদি অপকর্ম করতে প্ররোচিত হয় স্বামী। ফলে কখনো চাকরিহারা হয়, কখনো-বা জেলে গিয়ে শাস্তি ভোগ করতে হয়। ফলে তার দীন-দুনিয়া দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অন্যদিকে, স্বামীর উচিত স্ত্রীকে অবহেলা না করা। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়া। আদরে-সোহাগে আগলে রাখা। এতে অভাব ও টানাপোড়নের সংসারেও সুখ ও সমৃদ্ধি আসবে। স্বামীর উচিত হবে সাধ্যের মধ্যে স্ত্রীর বৈধ ইচ্ছে পূরণ করা।

রাসুল ﷺ-এর কয়েকজন স্ত্রীর কূটকৌশল

আয়িশা রা. বলেন, ‘রাসুল ﷺ মধু-মিষ্টান্ন পছন্দ করতেন। আসরের পর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট আসতেন। নিকটবর্তী হতেন সবার। রাসুল ﷺ মধু পান করতেন জাইনাব বিনতে জাহাশের কাছে। তার কাছে কিছু সময় কাটাতেন এ কারণে। আমি তখন মনে মনে বললাম, আমি কি একটা কৌশলের আশ্রয় নেব না!

এরপর যা ভাবলাম, তা হাফসার সাথে আলোচনা করলাম। বললাম, ‘এরপর রাসুল ﷺ আমাদের যার কাছেই আসবে, রাসুল ﷺ-কে সে বলবে, “আপনি মাগাফির^{৩০৫} খেয়েছেন? আমি আপনার শরীর থেকে মাগাফিরের দুর্গন্ধ পাচ্ছি।” রাসুল ﷺ-এর শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হবে—এটা খুব অপছন্দনীয় ছিল তাঁর কাছে।

রাসুল ﷺ তাদের দুজনের একজনের কাছে আসলেন। সলা-পরামর্শে ঠিক করা কথাটাই রাসুল ﷺ-কে বলা হলো। উত্তরে তিনি বললেন, “আমি তো জাইনাবের কাছে মধু পান করেছিলাম। শপথ করছি, আর কখনো আমি তার কাছে মধু পান করব না। এ কথাটি কাউকে বলবে না তুমি।”

এরপর নাজিল হলো :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ - إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ - عَسَى رَبُّهُ

৩০৫. উরফুত নামক এক ধরনের গাছের সুমিষ্ট আঠালো কষ, যাতে একপ্রকার কটু গন্ধ থাকে।

إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ
قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

“হে নবি, আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশির জন্য তা নিজের জন্য হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

আল্লাহ তোমাদের শপথ হতে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

যখন নবি তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল, অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবিকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তখন নবি এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু অব্যক্ত রাখল। যখন নবি তা তাঁর সেই স্ত্রীকে জানাল, তখন সে বলল, কে আপনাকে এটা অবহিত করল? নবি বলল, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

যেহেতু তোমাদের হৃদয় বুঁকে পড়েছে, যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা করো (তাহলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন)। কিন্তু তোমরা যদি নবির বিরুদ্ধে একে অপরের সহযোগিতা করো, তাহলে জেনে রেখো যে, আল্লাহই তাঁর বন্ধু এবং জিবরাইল ও সৎ আমলকারী মুমিনগণও। উপরন্তু ফেরেশতারাও তাঁর সাহায্যকারী।

যদি নবি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে, তাহলে তাঁর রব সম্ভবত তাঁকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। যারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী, বিশ্বাসিনী, আনুগত্যকারিণী, তাওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, সিয়াম পালনকারিণী, অকুমারী এবং কুমারী।”^{৩০৬}

রাসুল ﷺ-এর গৃহীত পদক্ষেপ

রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীদের অতিরিক্ত ভরণপোষণ চাওয়া ও মধুর ঘটনার পর রাসুল ﷺ এক মাসের জন্য স্ত্রীদের পরিত্যাগ করেন।

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, ‘সম্ভবত, কয়েকটি কারণ একত্রিত হওয়ার পরই রাসুল ﷺ স্ত্রীদের পরিত্যাগ করেন। রাসুল ﷺ তুরাপ্রবণতা দেখাননি। শ্রেফ তাদের থেকে পৃথক থাকলেন কিছু সময়ের জন্য। উন্নত চরিত্র, প্রশস্ত হৃদয় ও ক্ষমার মাধ্যমে পূর্ণ অন্তর যাঁর, তাঁর থেকে এ পদক্ষেপই যথার্থ ও কাঙ্ক্ষিত। অযাচিত ঘটনা কয়েকবার ঘটার পরই রাসুল ﷺ এমন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হলেন।’

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন যে, তিনি উমর ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন, ‘আমিরুল মুমিনিন, “যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে, যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা করো”—আয়াত দ্বারা রাসুল ﷺ-এর কোন দুজন স্ত্রী উদ্দেশ্য?’

তিনি বললেন, ‘আব্বাস-পুত্র, (এত দেরিতে জিজ্ঞেস করলে বলে) আমি আশ্চর্য হলাম। তারা দুজন হলেন, আয়িশা ও হাফসা।’

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ‘এরপর উমর ﷺ বলে চললেন বাকি ঘটনা, “আমাদের কুরাইশগণের মাঝে নারীরা ততটা স্বাধীনচেতা ছিল না, যতটা না আনসারদের নারীরা ছিল। যখন আমরা আনসারদের নিকটে মদিনায় এলাম, তখন আমাদের নারীরাও তাদের সে স্বাধীনচেতা মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হলো। তাদের আচার-আচরণ শিখতে লাগল আমাদের নারীরা।

আমার বাড়িটি বনু উমাইয়া বিন জাইদের পাশে ছিল। জায়গাটি ছিল উঁচুতে। একবার আমি কোনো ব্যাপারে আমার স্ত্রীর ওপর একটু গলা চড়িয়ে কথা বলি। তখন আমার স্ত্রীও আমাকে অনুরূপ ফিরিয়ে দেয় এবং আমার সাথে বিতর্ক করে। এটা আমার কাছে অপছন্দনীয় মনে হলো।

তখন তিনি বললেন, “আপনি আমার এ কথায় অবাক হচ্ছেন? আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে রাগ করে কথা বলেন। তাদের কেউ কেউ তো রাগ করে পুরো দিন রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলেন না।”^{৩০৭}

তারপর আমি হাফসার কাছে গেলাম। তাকে বললাম, “হাফসা, তোমরা কি রাসুল ﷺ-এর সাথে তর্ক করো?”

“হাঁ।” হাফসা বলল।

“তোমাদের কেউ কি সকাল হতে রাত পর্যন্ত নবিজি ﷺ-এর সাথে রাগ করে কথা বন্ধ করে থাকে?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

হাফসা জবাব দিল, “হাঁ।”

আমি বললাম, “তোমাদের মধ্যে যে এ রকম করল, সে তো ধ্বংস হয়ে গেল। রাসুল ﷺ-কে রাগানোর কারণে তোমরা কেউ কি আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে!? সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে।

কখনো রাসুল ﷺ-এর সাথে তর্কে জড়াবে না। তাঁর কাছে কোনো কিছু চাইবে না। তোমার যা প্রয়োজন আমাকে বলবে। তোমার এ প্রতিবেশী তোমার চাইতে সুন্দরী, তোমার চাইতে বেশি প্রিয় সে রাসুল ﷺ-এর কাছে। তার এমন ব্যবহারে তুমি ধোঁকায় পড়বে না।” উমর রাঃ আয়িশা রাঃ-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তাঁর কথায়।

উমর বলে গেলেন, ‘আমার এক আনসারি প্রতিবেশী ছিল। আমরা পালাক্রমে রাসুল ﷺ-এর কাছে যেতাম। একদিন সে যেত। একদিন আমি যেতাম। যেদিন সে যেত, সেদিন ওহি ও অন্য সব ইলম আমার কাছে নিয়ে আসত। আর আমিও তাকে এসে জানাতাম, যেদিন আমি যেতাম। আমাদের সবার মাঝে গাস্‌সানদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সে সময়। খবর ছড়িয়েছিল, গাস্‌সানিরা আমাদের ওপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

৩০৭. বোঝা যাচ্ছে, রাসুল ﷺ এ ক্ষেত্রে নিজ গোত্রের রীতির পরিবর্তে আনসারদের রীতিটি গ্রহণ করেছেন।

যেদিন আমার এ আনসার বন্ধুর পালা ছিল, সেদিন ইশার সময় সে আমার কাছে আসলো। দরোজায় কড়া নেড়ে আমাকে ডাক দিল। আমি বেরিয়ে এলাম তার কাছে। সে বলল, “মারাত্মক কাণ্ড ঘটে গেছে।”

আমি বললাম, “কী হয়েছে? গাসসানিরা এসে গেছে?”

সে বলল, “না। তার চেয়ে ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে। নবিজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন!”

আমি বললাম, “হাফসা ধ্বংস হয়ে গেল! আমি ধারণা করছিলাম, এমন কিছু একটা ঘটবে।”

ফজর নামাজ পড়ে আমি কাপড়-চোপড় গায়ে চাপিয়ে রাসুল ﷺ-এর বাড়িতে এলাম। চলে এলাম হাফসার কাছে। দেখলাম, সে কেঁদে চলেছে। তাকে বললাম, “রাসুল ﷺ কি তোমাদের তালাক দিয়েছেন?”

“জানি না আমি। তবে তিনি এ কক্ষে পৃথক হয়ে বাস করছেন।” বলে হাফসা ইশারা করে দেখিয়ে দিল।

এরপর আমি রাসুল ﷺ-এর কালো গোলামের কাছে এলাম। তাকে বললাম, “উমরের জন্য অনুমতি নাও।”

সে রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে ফিরে আসলো। বলল, “আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নীরব হয়ে আছেন।”

এরপর আমি সেখান থেকে চলে এলাম। মসজিদে মিস্বারের কাছে এসে বসে পড়লাম। দেখলাম, লোকেরা বসে আছে। কয়েকজন কাঁদছে। আমি কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। কিন্তু আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করল আমার মনের আবেগ। উঠে এলাম সেখান থেকে।

রাসুল ﷺ-এর গোলামের কাছে এসে বললাম, “উমরের জন্য অনুমতি নাও।”

সে রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে ফিরে আসলো। বলল, “আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নীরব হয়ে আছেন।”

আমি পেছন ফিরে চলে আসছিলাম। ঠিক তখন গোলামটি আমাকে ডাক দিয়ে বলল, “আসুন। আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন তিনি।”

আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে এলাম। সালাম দিলাম তাঁকে। দেখলাম, বালিশে হেলান দিয়ে খেজুরের চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন তিনি। ফলে তাঁর শরীরে দাগ পড়ে গেছে চাটাইয়ের।

তাঁকে সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, “আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন?”

তিনি মাথা তুললেন। জবাব দিলেন, “না।”

আমি তখন বলে উঠলাম, “আল্লাহ্ আকবার।”

এরপর দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, “আমি আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের কুরাইশগণের মাঝে নারীরা ততটা স্বাধীনচেতা ছিল না, যতটা না আনসারদের নারীরা। যখন আমরা মদিনায় এলাম, তখন আমাদের নারীরাও তাদের সে স্বাধীনচেতা মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হলো। তাদের অভ্যাস রপ্ত করতে লাগল। আমি কোনো ব্যাপারে আমার স্ত্রীর ওপর একটু গলা চড়িয়ে কথা বলি। তখন আমার স্ত্রীও আমাকে অনুরূপ ফিরিয়ে দেয় এবং আমার সাথে বিতর্ক করে। এটা আমার কাছে অপছন্দনীয় মনে হলো।

স্ত্রী আমাকে বলল, “আপনি আমার এ কথায় অবাক হচ্ছেন? আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে রাগ করে কথা বলেন। তাদের কেউ কেউ তো রাগ করে পুরো দিন রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলে না।” এটা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করল। আমি তাকে বললাম, “তাদের মধ্যে যে এ রকম করল সে তো ধ্বংস। রাসুল ﷺ-কে রাগানোর কারণে তাদের কেউ কি আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে? সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে।”

উমর বলেন, ‘রাসুল ﷺ তখন মুচকি হাসলেন।’

উমর বলেন, ‘এরপর আমি বললাম, “আল্লাহর রাসুল, আপনি কী মনে করেন এ ব্যাপারে যে, আমি হাফসাকে বলে এলাম, তোমার এ প্রতিবেশী তোমার

চেয়ে সুন্দরী, তোমার চাইতে বেশি প্রিয় সে রাসুল ﷺ-এর কাছে। তার এমন ব্যবহারে তুমি ধোঁকায় পড়বে না?”

রাসুল ﷺ আরেকবার মুচকি হাসলেন।

রাসুল ﷺ-কে মুচকি হাসতে দেখে আমি বসলাম।

বললাম, “আল্লাহর রাসুল, আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই একান্তে।”

তিনি বললেন, “হাঁ, বলো।”

আমি রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলতে থাকলাম। একসময় দেখলাম, তাঁর চেহারা থেকে রাগের চাপ একেবারেই মুছে গেছে। এমনকি তিনি হেসে দিলে তাঁর দাঁত দেখা গেল। রাসুল ﷺ ছিলেন সবার চেয়ে সুন্দর দাঁতের অধিকারী।

আমি বসলাম তাঁর পাশে। মাথা তুলে ঘরের আশপাশ দেখলাম। আল্লাহর কসম, আমি সেখানে তিনটি কাঁচা চামড়া ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। আমি বললাম, “আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি যেন আপনার উম্মাহকে সম্পদশালী করেন। রোম-পারস্যকে আল্লাহ ধনসম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু তারা আল্লাহর ইবাদত করে না।”

রাসুল ﷺ এবার সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, “খাত্তাব-পুত্র, তুমি কি সন্দেহের ঘোরে আছ? তারা তো সে জাতি, যাদের দুনিয়ায় ক্ষণিকের জন্য ধনসম্পদ দেওয়া হয়েছে।”

আমি বললাম, “আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, আসতাগফিরুল্লাহ।”

স্ত্রীদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে রাসুল ﷺ কসম করেছিলেন এক মাস পর্যন্ত তিনি তাদের কাছে যাবেন না। পরে আল্লাহ এ আচরণের কারণে তাঁর সমালোচনা করেন।^{৩০৮}

আনাস ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে ইলা করলেন। এরপর ঘরের ওপরের একটি কক্ষে অবস্থান করলেন ২৯ রাত। এরপর তিনি নেমে এলেন।

তখন সাহাবিরা জিজ্ঞেস করল, “আল্লাহর রাসুল, আপনি তো এক মাসের জন্য ইলা করেছিলেন।” রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, “মাস তো উনত্রিশেও হয়।”^{৩০৯}

নববি ﷺ বলেন, ‘ইলা অর্থ স্ত্রীর কাছে এক মাস প্রবেশ না করার শপথ। কিন্তু রাসুল ﷺ-এর ইলা ফিকাহের পরিভাষার ইলার মতো ছিল না; ফিকাহর ভাষায় ইলার যে হুকুম রাসুল ﷺ-এর এই ইলার সে হুকুমও প্রযোজ্য ছিল না।

ইলা শব্দের আভধানিক অর্থ হচ্ছে, কোনো কিছু নিয়ে শপথ করা। কিন্তু ফিকাহর পরিভাষায় স্ত্রী-সঙ্গ থেকে বিরত থাকার শপথ করাকে ইলা বলে।’^{৩১০}

এ সমস্যায় রাসুল ﷺ-এর গৃহীত পদক্ষেপ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

এ সমস্যাটিতে আমরা দেখলাম, রাসুল ﷺ স্ত্রীদের থেকে পৃথক ছিলেন। এ পৃথক থাকার মাধ্যমে তিনি দাম্পত্য জীবনে আসা কয়েকটি সমস্যার সমাধান করলেন। তাই দাম্পত্য জীবনের সমস্যাটি সমাধানের একটি পদ্ধতি হচ্ছে স্ত্রী থেকে কিছু সময়ের জন্য পৃথক থাকা।

রাসুল ﷺ পৃথক থাকার শাস্তি দিলেন স্ত্রীদের। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এক মাস তাদের কাছে না আসার শপথ করলেন।

স্ত্রী থেকে পৃথক থাকা স্ত্রীর জন্য একটি মানসিক শাস্তি। শাস্তি হিসেবে এটি বেশ কার্যকর ও যথার্থ। তিনি স্ত্রীদের ত্যাগ করলেও মারাত্মক ধরনটি অবলম্বন করেননি। রাসুল ﷺ স্ত্রীদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং তাদের ঘরে প্রবেশ করলেন না এক মাসের জন্য। অন্যদিকে একই বিছানায় স্ত্রীর সাথে শুয়ে থেকেও (মিলন না করে) স্ত্রী থেকে পৃথক থাকা আরও বেশি মারাত্মক শাস্তি। কিন্তু রাসুল ﷺ-এর দয়ালুতা লক্ষণীয় এখানে। তিনি মারাত্মক ধরনটি অবলম্বন না করে, হালকা ধরনটি অবলম্বন করেছেন।

৩০৯. সহিহুল বুখারি : ১৯১১।

৩১০. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১০/৮৮।

► হাদিস থেকে শিক্ষা

- ‘একজন পিতা মেয়ের কাছে মেয়ের স্বামীর অনুমতি ব্যতীতও আসতে পারে। তাদের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। বিশেষ করে তাদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে মেয়ের কাছে জানতেও চাইতে পারে।
- একজন পিতা কথার মাধ্যমে তার মেয়েকে আদব শেখাতে পারে, যাতে মেয়ে তার স্বামীর প্রতি যথার্থ আচরণ করতে পারে।
- স্ত্রীদের আচরণে ধৈর্যধারণ করা। তাদের কৰ্কশ কথার প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা। স্ত্রীদের কোনো ভুল হয়ে গেলে তা ক্ষমা করা। তবে আল্লাহর হুক আদায়ে ভুল হলে তা ক্ষমার যোগ্য নয়।
- নারীর ওপর মাত্রাতিরিক্ত বল-প্রয়োগ শরিয়তে নিন্দনীয়। কেননা, নারীদের ওপর বল-প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ নিজ গোত্র কুরাইশের নীতি ছেড়ে গ্রহণ করেছিলেন আনসারদের নীতি।
- কোনো মানুষ যদি একাও থাকে, তবে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই তবে তার কক্ষে প্রবেশ করতে হবে। কারণ, হয়তো কোনো মানুষ এমন অবস্থায়ও থাকতে পারে, যে অবস্থায় তাকে অন্য কেউ দেখুক, তা সে চায় না।
- কোনো ব্যক্তি যখন তার বন্ধুকে চিন্তিত অবস্থায় দেখে, তখন বন্ধুর চিন্তা দূর করার মতো কথা বলে বন্ধুর চিত্ত প্রশান্ত করা মুসতাহাব। যেমন হাদিসে এসেছে, ‘আমি এমন এক কথা বলব, যাতে নবিজি ﷺ হেসে দেবেন।’^{৩১১}



❦ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ❦

সন্তানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসুল ﷺ ছিলেন নিজ পরিবারের প্রতি সর্বোচ্চ সুন্দর আচরণকারী। শ্রেষ্ঠ প্রতিপালন, সর্বোত্তম শিক্ষা পদ্ধতি ও অটুট সম্পর্ক ইত্যাদি মহৎ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল সন্তানদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর আচরণ।

রাসুল ﷺ-এর সন্তানসন্ততি

রাসুল ﷺ-এর পুত্র-সন্তান

রাসুল ﷺ-এর ছেলে-সন্তান ছিল তিনজন—কাসিম, আব্দুল্লাহ ও ইবরাহিম। এ ছাড়া তাইয়িব ও তাহির দুটি নামও পাওয়া যায় তাঁর ছেলেদের। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, তাইয়িব ও তাহির দুটি নামই আব্দুল্লাহর উপাধি।^{৩১২}

রাসুল ﷺ-এর সকল ছেলেই কম বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

কাসিম : মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন দুবছর কয়েক মাস বয়সে। কাসিমের নামানুযায়ী রাসুল ﷺ-এর কুনিয়াত হয় আবুল কাসিম। কাসিম ছিলেন খাদিজা রাঃ-এর গর্ভজাত সন্তান।

আব্দুল্লাহ : রাসুল ﷺ-এর নবুওয়াত লাভের পর জন্ম হয়েছিল তার। মক্কায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনিও খাদিজা রাঃ-এর গর্ভের সন্তান।

ইবরাহিম : তার মায়ের নাম মারিয়া কিবতিয়া। মদিনায় ৮ম হিজরির জিলহজ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৭ কি ১৮ মাস বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

রাসুল ﷺ-এর কন্যা-সন্তান

আল্লাহ তাআলা চারজন কন্যা-সন্তান দান করেছেন তাঁকে। তাঁরা হচ্ছেন—
জাইনাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা ﷺ। সবাই একই মায়ের সন্তান।
সবার জন্ম খাদিজা ﷺ-এর গর্ভে।

জাইনাব : রাসুল ﷺ-এর প্রথম মেয়ে। তাঁর বিয়ে হয় আবুল আস বিন রাবি'র
সাথে।

রুকাইয়া : রাসুল ﷺ-এর দ্বিতীয় কন্যা-সন্তান। ইসলাম-পূর্ব যুগে উতবা
বিন আবু লাহাবের সাথে বিয়ে হয় তাঁর। কিন্তু উতবার সাথে বাসর হওয়ার
আগেই উতবা তালাক দিয়ে দেয় রুকাইয়া ﷺ-কে। এরপর তাঁকে বিয়ে
করেন উসমান বিন আফফান ﷺ। উসমান ﷺ-এর সাথে তিনি হিজরত
করেন হাবশায়। পরবর্তীকালে হিজরত করেন মদিনায়।

রাসুল ﷺ যখন বদর অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, রুকাইয়া ﷺ অসুস্থ
হয়ে পড়েন। তাই রাসুল ﷺ উসমান বিন আফফান ﷺ-কে মদিনায় রেখে যান
তাঁর দেখাশোনার জন্য। রমাজানেই তিনি ইনতিকাল করেন। তখন রাসুল ﷺ
বদর অভিযানে ব্যস্ত।

উম্মে কুলসুম : রাসুল ﷺ-এর তৃতীয় কন্যা। রুকাইয়া ﷺ-এর মৃত্যুর পর
উসমান ﷺ উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। তিনিও মৃত্যুবরণ করেন উসমান
ﷺ-এর বিবাহ বন্ধনে থাকাবস্থায়।

ফাতিমা : রাসুল ﷺ-এর চতুর্থ ও কনিষ্ঠ কন্যা। রাসুল ﷺ-এর মেয়েদের মধ্যে
তিনিই ছিলেন রাসুল ﷺ-এর সর্বাধিক প্রিয়। রাসুল ﷺ-এর যখন ৪১ বছর
বয়স, তখন জন্মগ্রহণ করেন ফাতিমা ﷺ। রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর ৬ মাস পর
মৃত্যুবরণ করেন ফাতিমা ﷺ। তাঁর বিয়ে হয়েছিল আলি বিন আবু তালিব
ﷺ-এর সাথে।

সন্তানদের সুন্দর নাম রাখতেন

রাসুল ﷺ-এর সন্তানদের নামের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, সুন্দর এ নামগুলো তিনি বাছাই করেছেন বেশ যত্নের সাথে। সন্তানদের সুন্দর নাম রাখার প্রতি উৎসাহ দিতেন তিনি। যাদের নাম অসুন্দর হতো, তাদের নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখতেন।

সুফইয়ান সাওরি রাঃ বলেন, ‘বলা হতো, পিতার ওপর সন্তানের অধিকার হচ্ছে, পিতা সন্তানের সুন্দর একটি নাম রাখবে, সন্তান বাল্যে হলে তাকে বিয়ে দেবে, তাকে হজ कराবে এবং সন্তানকে উত্তম আদব শেখাবে।’^{৩১৩}

যেদিন ইবরাহিমের জন্ম, সেদিনই রাসুল ﷺ তাঁর নাম রাখেন। আনাস রাঃ বলেন, ‘রাসুল ﷺ এক সকালে বলেন, “আমার একটি সন্তান জন্ম নেয় রাতে। আমি তার নাম রাখলাম আমার পিতা ইবরাহিমের নামে।”’^{৩১৪}

ছেলে-মেয়েদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর আচরণনীতি

রাসুল ﷺ-এর কন্যা ছিল চারজন। সন্তানদের মধ্যে কন্যারাই কেবল জীবিত ছিলেন। পুত্র-সন্তানগণ শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। রাসুল ﷺ তাঁর কন্যাদের ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। তাদের নিয়ে তিনি অনেক বেশি খুশি ছিলেন।

এখানে কন্যার জনকদের শেখার আছে অনেক কিছু। কন্যা-সন্তান যত বেশিই হোক, পিতার উচিত তাদের নিয়ে খুশি প্রকাশ করা, এই অমূল্য নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং তাদের যথাযথ তালিম-তরবিয়তের দিকে মনোযোগী হওয়া।

রাসুল ﷺ বলেন, ‘কাউকে যদি কন্যা-সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, আর সে যদি তাদের সঙ্গে সদাচরণ করে—তবে তারা জাহান্নাম ও তার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।’^{৩১৫}

৩১৩. ইবনে আবিদ দুনিয়া রাঃ কৃত কিতাবুল ইয়াল : ১৭১।

৩১৪. সহিহ মুসলিম : ২৩১৫।

৩১৫. সহিহুল বুখারি : ৫৯৯৫, সহিহ মুসলিম : ২৬২৯।

কন্যা-সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করার অর্থ হলো, আল্লাহ মানুষকে কন্যা-সন্তান দিয়ে যাচাই করেন—সে তার সঙ্গে কেমন আচরণ করে : ভালো আচরণ করে, না মন্দ। যে ভালো আচরণ করবে, তার জন্য কন্যা-সন্তান জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে। কেননা, কন্যা-সন্তান বেশ দুর্বল হয় এবং অধিক রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন পড়ে।

পিতার কর্তব্য হচ্ছে, কুফু দেখে দীনদার ও উত্তম চরিত্রবান ছেলের সাথে কন্যার বিয়ে দেওয়া। এটি পিতার ওপর ওয়াজিব।

কন্যাদের বিয়ে দিয়েছেন উত্তম পুরুষদের সাথে

জাইনাব রাঃ-এর বিয়ে : জাইনাব রাঃ-কে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন আবুল আস বিন রাবি কুরাইশি রাঃ-এর সাথে। আবুল আস ছিলেন জাইনাবের খালা হালাহ বিনতে খুয়াইলিদের সন্তান। আবুল আস মক্কার সেরা পুরুষদের একজন ছিলেন। ব্যবসা, সম্পদ ও আমানতদারিতায় অনন্য ছিলেন তিনি।

জাইনাব ও তাঁর স্বামী আবুল আসের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয় ইসলাম। তবে রাসুল সঃ তাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হননি একটা সময় পর্যন্ত। জাইনাব রাঃ মুসলিম হয়েও তাঁর স্বামীর সাথে বসবাস করছিলেন। স্বামী তখনও মুশরিক। রাসুল সঃ মদিনায় এলেন। রাসুল সঃ তাকে নিয়ে আসতে সমর্থ ছিলেন না। তাই জাইনাব স্বামীর সাথে মক্কার রয়ে গেলেন।

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সাথে আবুল আসও আসেন। বন্দী ৭০ জনের মধ্যে তিনিও ছিলেন। এরপরের ঘটনা বর্ণনায় আয়িশা রাঃ বলেন, ‘বদরের বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ পাঠাল মক্কাবাসী। আবুল আসের মুক্তির জন্য জাইনাবও মুক্তিপণ পাঠালেন। সে মুক্তিপণের একটা অংশ ছিল খাদিজার হার। আবুল আসের সাথে জাইনাবের যখন বিয়ে হয়, তখন এ হারটি খাদিজা জাইনাবকে উপহার দিয়েছিলেন।

এ হারটি দেখে রাসুল সঃ আবেগ-তাড়িত হয়ে পড়েন ভীষণভাবে। সাহাবিদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, “যদি তোমরা ভালো মনে করো, তবে জাইনাবের বন্দীকে মুক্ত করে দাও। সাথে তার মুক্তিপণও ফিরিয়ে দাও।” সাহাবিরা সায় দিলেন।

রাসুল ﷺ আবুল আস থেকে কথা নিলেন, আবুল আস জাইনাবের হিজরতের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। রাসুল ﷺ জাইদ বিন হারিসা ও এক আনসারকে পাঠালেন জাইনাবকে আনার জন্য। তাদের বললেন, “তোমরা ইয়াজিজ পাহাড়ের পাদদেশে অপেক্ষা করবে জাইনাব আসা পর্যন্ত। জাইনাব সেখানে আসলে তাকে নিয়ে আসবে।”^{৩১৬}

‘রাসুল ﷺ তাঁর জামাতা আবুল আসের প্রশংসায় একবার বলেন, “সে আমার সাথে সত্য বলেছে। আমার সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূরণ করেছে। ওয়াদা দিয়ে সে ওয়াদা পূরণ করেছে।”^{৩১৭}

বদরের পর নবিজি ﷺ ওয়াদা নিয়েছিলেন আবুল আস মক্কায় ফিরে জাইনাবকে পাঠিয়ে দেবে। আবুল আস সে ওয়াদা পালন করেছেন। জাইনাবের প্রতি তার অত্যধিক ভালোবাসা সত্ত্বেও জাইনাবকে যেতে দিয়েছেন।

রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম ﷺ-এর বিয়ে : রাসুল ﷺ রুকাইয়াকে বিয়ে দিয়েছিলেন উসমান ﷺ-এর সাথে। উসমান ﷺ ছিলেন অনন্য চরিত্রের অধিকারী। লজ্জাশীলতা ছিল তাঁর অনুপম চরিত্রের অন্যতম অংশ। রাসুল ﷺ তাঁকে অনেক ভালোবাসতেন। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন।

রুকাইয়া ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন নবিজি ﷺ রুকাইয়ার বোন উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেন উসমান ﷺ-এর সাথে। উম্মে কুলসুম ﷺ-ও মৃত্যু পর্যন্ত উসমান ﷺ-এর সাথে দাম্পত্য জীবনযাপন করেছিলেন।

ফাতিমা ﷺ-এর বিয়ে : ফাতিমা ﷺ-এর বিয়ে দেন আলি ﷺ-এর সাথে। আলি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর চাচাতো ভাই। শিশুদের মধ্যে আলি ﷺ-ই প্রথম ইমান আনেন রাসুল ﷺ-এর প্রতি। ইসলাম-পূর্ব যুগে আলি ﷺ রাসুল ﷺ-এর কাছে লালিতপালিত হন। নবুওয়াতের পর পর্যন্ত রাসুল ﷺ-এর সাথেই ছিলেন আলি ﷺ। নবিজি ﷺ তাকে ভালোবাসতেন, তাকে কাছে টেনে নিতেন। আলি ﷺ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন।

৩১৬. সুনানু আবি দাউদ : ২৬৯২। হাদিসের মান : হাসান।

৩১৭. সহিহুল বুখারি : ৩১১০, সহিহ মুসলিম : ২৪৪৯।

বিয়ের ব্যাপারে কন্যাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন

আতা বিন রবাহ ؓ বলেন, ‘আলি ؓ যখন ফাতিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন, রাসুল ؓ ফাতিমার কাছে এলেন। বললেন, “আলি তোমার কথা বলেছে।” ফাতিমা ؓ চুপ হয়ে থাকলেন। এরপর রাসুল ؓ বেরিয়ে এলেন ফাতিমার কাছ থেকে। তাকে বিয়ে দিলেন আলি ؓ-এর সাথে।”^{৩১৮}

ফাতিমা ؓ-এর চুপ থাকাই সম্মতি ছিল। ‘রাসুল ؓ সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, “কুমারী মেয়ের সম্মতি ব্যতীত তাকে বিয়ে দেবে না।” সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, “তার অনুমতি কেমন, আল্লাহর রাসুল?” রাসুল ؓ উত্তর দিলেন, “কুমারী কন্যার চুপ থাকাই সম্মতি।”^{৩১৯}

কন্যা পিতার কাছে আমানত। কন্যার অমতে তার বিয়ে দেওয়া বৈধ নয়।

কন্যাদের অত্যধিক মোহর নির্ধারণ করতেন না

রাসুল ؓ কম মোহরে বিয়ে দিয়েছেন তাঁর কন্যাদের। ইবনে আব্বাস ؓ বর্ণনা করেন, ‘আলি ؓ বলেন, “আমি ফাতিমাকে বিয়ে করলাম। রাসুল ؓ বললেন, “তাকে কিছু দাও।” আমি বললাম, “আমার কাছে তো দেওয়ার মতো কিছু নেই।” রাসুল ؓ বললেন, “তোমার হুতামি বর্মটি কোথায়?” আমি বললাম, “সেটি আমার কাছে আছে।” রাসুল ؓ বললেন, “সেটিই দিয়ে দাও।”^{৩২০}

এটাই ছিল রাসুল ؓ-এর ছোট কন্যা, আদরের দুলালি, জান্নাতি নারীদের সর্দার ফাতিমার মোহর—একটি হুতামি বর্ম।

হুতামি বর্ম কাকে বলে? ‘হুতামি শব্দটি হুতামা বিন মুহারিব নামক এক গোত্র থেকে এসেছে। এ গোত্রটি আব্দুল কাইস গোত্রের একটি শাখা। তারা বর্ম তৈরির কাজ করত। আবার বলা হয়, হুতামি শব্দটির অর্থ *التي تحطم السيوف* তথা যে বর্ম তলোয়ার ভেঙে দেয়।”^{৩২১}

৩১৮. ইবনে সাদ ؓ কৃত তাবাকাত : ৮/২০।

৩১৯. সহিহুল বুখারি : ৫১৩৬, সহিহ মুসলিম : ১৪১৯।

৩২০. সুনানু আবি দাউদ : ২১২৫, সুনানুন নাসায়ি : ৩৩৭৫। হাদিসের মান : সহিহ।

৩২১. নিহায়া : ১/৯৯৪।

অথচ আমাদের এ যুগের কিছু মানুষ মোহর নির্ধারণে সীমালঙ্ঘন করে ফেলে। এমনটা মোটেও রাসুল ﷺ-এর আদর্শ নয়। যদি বেশি মোহর নির্ধারণ করা সম্মানের বিষয় হতো, তবে রাসুল ﷺ তা-ই করতেন।

কন্যার সংসারের আসবাবপত্র

আলি ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ ফাতিমাকে তার সাথে বিয়ে দিলেন। একটি পশমি চাদর, চামড়ার আবেষ্টনে খেজুর পাতার আঁশভর্তি একটি বালিশ, দুটি পেষণযন্ত্র, পানি রাখার একটি মশক এবং দুটি পানি রাখার মৃৎপাত্র দিয়ে ফাতিমাকে আমার ঘরে পাঠান।’^{৩২২}

রাসুল ﷺ তাদের জন্য একটি ঘর ঠিক করে দেন। ঘরটি ছিল মুমিন-জননী আয়িশা ﷺ-এর ঘরের পেছনে উত্তর দিকে, বাবে জিবরিলের বিপরীতে। রাসুল ﷺ-এর ঘরে একটি ছোট ঘুলঘুলি ছিল—যা দিয়ে আলি-ফাতিমার ঘর দেখা যেত।

► হাদিস থেকে শিক্ষা

বিয়েকে সহজ করাই নববি আদর্শ। এটিই সুন্নাহ। বরের সামর্থ্য অনুযায়ী বিয়ের আয়োজন হবে। দাম্পত্য জীবন কাটানোর ঘর তৈরির ব্যাপারে স্বামী বা স্ত্রীর সামর্থ্যের বাইরে কারও ওপরই চাপ দেওয়া যাবে না।

এই হাদিস থেকে আরও বোঝা যায়, পাত্রীর পিতার উচিত বিবাহের ব্যয় ও দায়িত্ব বহনে পাত্রের সহযোগী হওয়া। এভাবে বলা ঠিক নয় যে, সবকিছু পাত্রকেই দিতে হবে। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ বিয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাত্র সদ্য পাস করা ছাত্র বা নতুন চাকুরে—যার বেতন কম, বিয়েতে যাকে সাহায্য না করলেই নয়। অন্যদিকে অধিকাংশ পিতা হন অবস্থাসম্পন্ন। তাদের দীর্ঘ দিনের চাকরি বা ব্যবসা। হাতের কাছে জমানো টাকা থাকে। তাই পাত্রীর পিতা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাত্রকে সাহায্য করতে পারে অনায়াসে। তাই পিতার উচিত জামাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসা। হতে পারে, ঘরের কিছু আসবাব কিনে দেওয়া বা রান্নাঘরের কিছু সরঞ্জাম ক্রয় করে দেওয়া, যেমনটা আমরা হাদিসে দেখেছি।

অলিমা ছিল সাধারণ

বুরাইদা   বলেন, ‘আলি ও ফাতিমা  -এর বিয়ে হলো। তখন রাসুল   বললেন, “বিয়েতে অবশ্যই অলিমা হওয়া দরকার।” তখন সাদ বললেন, “একটি ভেড়া আনার দায়িত্ব আমার।” আরেকজন বললেন, “আমি এ পরিমাণ আটা আনব।””^{৩২৩}

অলিমা হচ্ছে, বিয়ের ভোজ। শব্দটি এসেছে ওয়ালাম শব্দ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে একত্র করা। যেহেতু বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হয়, তাই এ ভোজকে অলিমা বলে।^{৩২৪} জুমহুর আলিমের মতে, এটি মুসতাহাব।

স্বামী-স্ত্রীর বাসরের পরই অলিমা করা উত্তম। যেমনটা হাদিসে দেখেছি আমরা। তবে বাসরের পূর্বে, আক্দ্ হওয়ার সময় বা পরে করলেও কোনো অসুবিধে নেই।

অলিমার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারে শরয়ি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই সমাজের আচার অনুযায়ী যখন অলিমা করলে ভালো হয়, তখন করতে সমস্যা নেই।

বিয়ের সময় ফাতিমা ও আলি  -এর জন্য দোয়া

বিয়ের রাত নবিজি   আলি  -কে বললেন, ‘আমার সাথে দেখা করা ব্যতীত কোনো কিছু কোরো না।’ এরপর রাসুল   এসে পানি নিয়ে আসতে বললেন। অজু করলেন পানি দিয়ে। অবশিষ্ট পানি আলি  -এর ওপর ছিটিয়ে দিলেন। আর দোয়া করলেন : اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي بَنَائِهِمَا - “হে আল্লাহ আপনি তাদের মাঝে বরকত দান করুন। তাদের দাম্পত্য জীবনে বরকত দান করুন।””^{৩২৫}

৩২৩. মুসনাদু আহমাদ : ২২৫২৬; ইবনে হাজার   ফাতহুল বারিতে বলেন, ‘এ হাদিসের সনদ ত্রুটিমুক্ত।’ আলবানি  -এর মতে হাদিসটি হাসান।

৩২৪. লিসানুল আরব : ১২/৬৪৩।

৩২৫. তাবারানি   কৃত আল-কাবির : ১১৫৩। হাদিসের মান : হাসান।

- স্বামী-স্ত্রীর জন্য বরকতের দোয়া করা মুসতাহাব। নবিজি ﷺ আব্দুর রহমান বিন আওফের জন্য দোয়া করে বলেছিলেন, ‘بَارِكْ اللَّهُ لَكَ - আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।’^{৩২৬}

বিয়ের পরও মেয়ের দেখাশোনা

বিয়ের পরও নবিজি ﷺ আগের মতোই কন্যাদের খোঁজখবর অব্যাহত রাখেন। কোনো ব্যস্ততাতেই তিনি কন্যাদের তত্ত্বাবধানে পিছপা হতেন না। এমনকি কঠিন থেকে কঠিন অবস্থায়ও কন্যাদের ব্যাপারে চিন্তা করতেন। নবিজি ﷺ যখন বদর অভিযানে বের হন। তখন তাঁর কন্যা রুকাইয়া অসুস্থ। একটু পরে তাঁকে কুরাইশ ও কুরাইশের প্রবল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। ভীষণ এক বাস্তবতা তাঁর সামনে। কিন্তু তবুও তিনি কন্যার অসুস্থতার কথা ভুলে যাননি। রুকাইয়া ﷺ-এর স্বামী উসমান বিন আফফান ﷺ-কে তিনি মদিনায় থাকার আদেশ করলেন। যাতে রুকাইয়ার দেখাশোনা করতে পারেন। তিনি তাকে গনিমতের অংশ তো দিলেনই এবং বললেন, আল্লাহর কাছে তিনি জিহাদের সাওয়াবও পাবেন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে কেউ একজন উসমান ﷺ সম্পর্কে ইঙ্গিতে অসংলগ্ন মন্তব্য করল। জবাবে ইবনে উমর ﷺ বলেন, ‘বদরের যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কারণ হচ্ছে—রাসুল ﷺ-এর সাহেবজাদি রুকাইয়া ছিলেন উসমানের স্ত্রী। বদরের সময়টাতে রুকাইয়া বেশ অসুস্থ ছিলেন। তাই নবিজি ﷺ তাঁকে মদিনায় থেকে যাওয়ার আদেশ করলেন এবং বললেন, “তোমার জন্য বদরে যোগদানকারীর প্রতিদান রয়েছে এবং রয়েছে বদরের গনিমতের অংশও।”’^{৩২৭}

কন্যা ও স্বামীর ছোটখাটো মান-অভিमानে হস্তক্ষেপ করতেন না

সাহল বিন সাদ ﷺ বলেন, ‘একদিন রাসুল ﷺ ফাতিমার বাড়িতে এলেন। আলিকে বাড়িতে না দেখে বললেন, “তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?”

৩২৬. সহিহুল বুখারি : ৫১৫৫, সহিহ মুসলিম : ১৪২৭।

৩২৭. সহিহুল বুখারি : ৩১৩০।

ফাতিমা বললেন, “আমার ও তাঁর মাঝে ঝগড়া হয়েছে। আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন তিনি। দুপুরের বিশ্রামও করেননি বাড়িতে।”

রাসুল ﷺ তখন এক ব্যক্তিকে বললেন, “দেখো তো কোথায় গেল সে?”

লোকটি আলির সন্ধান করে এসে বললেন, “আল্লাহর রাসুল, তিনি মসজিদে গুয়ে আছেন।”

রাসুল ﷺ মসজিদে এসে দেখলেন, আলি গুয়ে আছে। তার শরীরের একাংশ থেকে চাদর পড়ে গিয়ে মাটি লেগে গেছে। রাসুল ﷺ তার শরীরের মাটি মুছতে মুছতে বললেন, “উঠো হে মাটিওয়ালা, উঠো হে মাটিওয়ালা!”^{৩২৮}

ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, মেয়ের জামাইয়ের সাথে খোশামোদ করা যায়। রেগে গেলে শান্তও করা যায়।’^{৩২৯}

লক্ষণীয় যে, ফাতিমা ও তাঁর স্বামী আলি রাহিমাহুমা-এর মাঝে কী নিয়ে ঝগড়া হলো রাসুল রাহিমাহু তা জানতে চাননি। তাদের ঝগড়ার বর্ণনাও জিজ্ঞেস করেননি তিনি। বরং পুরো ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেলেন এবং আলি রাহিমাহু-কে শান্ত করতে বেরিয়ে পড়লেন।

কন্যা ও তার স্বামীর ঝগড়ার সময় করণীয় কী, তা জানলাম আমরা। কিন্তু আজকাল অনেকেই স্বামী-স্ত্রীর ছোটখাটো ঝগড়ার মাঝে নাক গলিয়ে বসে। ফলে সমস্যা কমার পরিবর্তে উল্টো বেড়ে যায়। কখনো কখনো গুরুতর আকার ধারণ করে।

এ হাদিসে রাসুল রাহিমাহু-এর উত্তম চরিত্রের আরেকটি চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি। রাসুল রাহিমাহু কন্যা ও তার স্বামীর ঝগড়ার কথা শুনে স্বামীকে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজে তাকে শান্ত করতে গেলেন। তার গায়ের মাটি ঝেড়ে দিলেন। মাটিওয়ালা বলে তার সাথে কৌতুক করলেন, যাতে তিনি ইতস্তত বোধ না করে অনায়াসে রাসুল রাহিমাহু-এর সাথে কথা বলতে পারেন। রাসুল রাহিমাহু তাঁর

৩২৮. সহিহুল বুখারি : ৪৪১, সহিহ মুসলিম : ২৪০৯।

৩২৯. ফাতহুল বারি : ১/৫৩৬।

মেয়ের সাথে ঝগড়া করার জন্য মেয়ের স্বামী আলি ﷺ-কে মোটেই তিরস্কার করেননি। যদিও মেয়ে ফাতিমা ﷺ-ই ছিলেন রাসুল ﷺ-এর অধিক প্রিয়। আলি ﷺ-কে এ বিষয়ে কিছুই বলেননি তিনি। এটা ছিল রাসুল ﷺ-এর প্রজ্ঞার নিদর্শন।

বোঝা গেল, জামাইয়ের প্রতি কোমল আচরণ করা, জামাইয়ের রাগ শান্ত করা, হৃদয়তা অটুট রাখার স্বার্থে জামাইকে তিরস্কার না করা মুসতাহাব।

ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, ‘এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, মর্যাদাবান লোকদেরও স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগি হতে পারে—এতে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই। রাগ একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য। রাগের কারণে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়াও দোষণীয় কিছু নয়।

রাগারাগির পর আলি ﷺ বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন কারণ ফাতিমা ﷺ-এর সাথে হয়তো এমন কোনো আচরণ করে ফেলতেন, যা ফাতিমা ﷺ-এর মর্যাদার সঙ্গে যায় না। তাই মন্দ কিছু করার সম্ভাবনা একেবারেই শূন্যের কোঠায় আনার জন্য উভয়ের রাগ ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত আলি ﷺ ঘরের বাইরে চলে গেলেন।’^{৩৩০}

এ হাদিস থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে, স্বামী যখন অনুভব করবে, স্ত্রীর সাথে রাগারাগিটা আরও গুরুতর সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে, তখন স্বামী ঘর থেকে বের হয়ে সে সম্ভাবনা বাতিল করে দেবে। এ অবস্থায় বাড়ি ত্যাগ করার ফলে মানুষ নিজের কথার হিসেব করার সময় পাবে। রাগের সময় কারও ভুল নিজের কাছে ধরা পড়ে না। কিন্তু বাড়ি থেকে বের হয়ে একান্তে চিন্তা করলে নিজের ভুল নিজের কাছে ধরা দেয়। কিন্তু বাড়িতে থাকলে এমনটা হতো না মোটেই। বাড়িতে থাকলে উল্টো তাদের ঝগড়া সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ে পৌঁছে যেত।

অন্যদিকে, ফাতিমা ﷺ কিন্তু তাদের ঘর থেকে বের হয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসেননি। তিনি এমনটা করলে, সমস্যা আরও বেড়ে যেত। কিন্তু তিনি স্বামীর ঘরে থাকার কারণে সমস্যাটি হতে পারেনি।

পরিবারের লোকদের করণীয় হচ্ছে, দম্পতিকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। তাদের নসিহত করা। স্ত্রীকে সবার করতে বলা। স্বামীর সাথে সদাচরণের নির্দেশনা দেওয়া।

কন্যা পিত্রালয়ে ফিরলে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন এবং আগ বেড়ে এগিয়ে নিতেন

আয়িশা   বলেন, ‘রাসুল  -এর সঙ্গে চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের দিক থেকে ফাতিমার চাইতে এত মিল অন্য কারও মাঝে দেখিনি। ফাতিমা যখন নবিজি  -এর কাছে আসতেন, নবিজি   বসা থেকে উঠে যেতেন, ফাতিমাকে চুমু খেতেন, নিজের জায়গায় তাকে বসাতেন।

আবার নবিজি   যখন ফাতিমার কাছে যেতেন, ফাতিমা বসা থেকে উঠে এসে স্বাগত জানাতেন। তাঁকে চুমু খেয়ে নিজের স্থানে বসাতেন।’^{৩৩১}

আবু দাউদের এক বর্ণনায় এসেছে, ‘রাসুল   ফাতিমার হাত ধরে তাঁকে চুমু খেলেন।’ রাসুল   এটি ফাতিমা  -এর সম্মানার্থে করতেন।

আয়িশা   বলেন, ‘ফাতিমা হেঁটে ঘরে এলেন। মনে হলো তাঁর হাঁটা অবিকল রাসুল  -এর হাঁটা। রাসুল   তাঁকে “এসো আমার প্রিয় কন্যা” বলে নিজের ডান বা বাঁ পাশে বসালেন।...’^{৩৩২}

এ হাদিসে ফাতিমা  -এর প্রতি রাসুল  -এর ভালোবাসা ও সম্মানের একটি অনুপম চিত্র দেখতে পেয়েছি আমরা। রাসুল   যখনই তাঁর মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তাঁকে স্বাগত জানাতেন।

দেখুন, নববি আদর্শ কেমন। আর ভারুন ওই সব কঠোর-হৃদয় লোকদের চাঁছাছোলা মনোভঙ্গি নিয়ে, যারা মনে করে সন্তানদের সামনে সব সময় গম্ভীর ও সিরিয়াস চেহারা করে থাকাটা পৌরুষ, কর্তৃত্ব ও দায়িত্বশীলতার আলামত। বিশেষ করে কন্যা-সন্তানদের সামনে এমনটি বেশি করা হয়।

৩৩১. সুনানু আবি দাউদ : ৫২১৭, সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৭২। হাদিসের মান : সহিহ।

৩৩২. সহিহুল বুখারি : ৩৬২৪, সহিহ মুসলিম : ২৪৫০।

দুনিয়াবিমুখতা ও সাদাকা প্রদানের প্রতি সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ বলেন, ‘একবার রাসুল ﷺ ফাতিমা ؓ-এর ঘরে যান। গিয়ে দেখেন, তাদের দরোজায় একটি পর্দা ঝুলানো। তিনি ঘরে প্রবেশ না করে ফিরে আসেন।

রাসুল ﷺ কোনো সফর থেকে ফিরলে প্রায়শ সবার আগে ফাতিমার ঘরে যেতেন।

আলি ঘরে এসে ফাতিমাকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছে তোমার?”

ফাতিমা ؓ বললেন, “নবিজি ﷺ আমাদের ঘরের সামনে এসে ঘরে না ঢুকে ফিরে গেলেন।”

এরপর আলি ؓ এলেন রাসুল ﷺ-এর কাছে। বললেন, “আব্দুল্লাহর রাসুল, আপনি ফাতিমার ঘরের সামনে গিয়েও ভেতরে গেলেন না, এটা ফাতিমার জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক হয়েছে।”

রাসুল ﷺ বললেন, “দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কী? আমার সাথে কারুকার্যের কী সম্পর্ক? আমি তার ঘরের দরোজায় একটি নকশাদার পর্দা ঝুলতে দেখলাম।”

আলি ؓ ফাতিমার কাছে এসে রাসুল ﷺ-এর কথা জানালেন। ফাতিমা ؓ তখন বললেন, তাহলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করুন, ওই পর্দার ব্যাপারে আমরা কী করব?”

আলি ؓ রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে ফাতিমার কথা বললেন। রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, “তাকে বলো, সে যেন অমুক গোত্রের কাছে এটি পাঠিয়ে দেয়। তাদের প্রয়োজন রয়েছে এটির।”^{৩৩৩}

মুহাল্লিব প্রমুখ আলিমগণ বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য যা অপছন্দ করতেন, আপন মেয়ের জন্যও তা অপছন্দ করতেন। আখিরাতের পূর্বেই

দুনিয়াতে সুখ-শান্তি ভোগ করার বিষয়টি তিনি পছন্দ করতেন না। অন্যথায়, ঘরের দরোজায় পর্দা ঝোলানো হারাম নয়। এই ঘটনাটি খাদিম চাওয়ার ঘটনাটির মতো। একবার ফাতিমা ﷺ ঘরের কাজগুলো করানোর জন্য একজন খাদিম চেয়েছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে। তখন তিনি বলেছিলেন, “আমি কি খাদিমের চেয়েও উত্তম কিছু তোমাকে দেবো না?” এই বলে তিনি ঘুমানোর সময়ের জিকির শিখিয়ে দিলেন।”^{৩৩৪}

দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণময় কাজের নির্দেশনা দিতেন

আলি ﷺ বলেন, ‘একবার ফাতিমা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে এলেন তাঁর আটা পেশার কষ্টের কথা জানিয়ে একটি খাদিম চাওয়ার জন্য। কিন্তু ঘরে এসে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে পেলেন না। তাই বিষয়টি আয়িশা ﷺ-কে বলে চলে গেলেন। রাসুল ﷺ ঘরে এলে আয়িশা ﷺ তাঁকে ফাতিমার খাদিম চাওয়ার কথা জানালেন।’ আলি ﷺ বলেন, ‘এরপর রাসুল ﷺ আমাদের কাছে আসলেন। ততক্ষণে আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমরা উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি “তোমরা আপন জায়গায় থাকো” বলে আমাদের মাঝখানে এসে বসলেন। আমি তখন আমার বুকে তাঁর দুপায়ের শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম। তিনি বললেন, “আমি কি তোমাদের খাদিমের চেয়ে উত্তম কিছুর সন্ধান দেবো না? যখন তোমরা ঘুমানোর জন্য বিছানায় আসবে অথবা শুয়ে পড়বে, তখন ৩৩ বার “আল্লাহু আকবার”, ৩৩ বার “সুবহানাল্লাহ”, ৩৩ বার “আলহামদুলিল্লাহ” পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদিমের চাইতেও বেশি উত্তম।””^{৩৩৫}

রাসুল ﷺ নিজ কন্যাকে খাদিম না দেওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি আহলে সুফফার দরিদ্রদের কষ্ট লাঘব করাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নিজের পরিবারের জন্য সবার করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। কারণ, এতে তারা অধিক সাওয়াবের অধিকারী হয়।

৩৩৪. ফাতহুল বারি : ৫/২২৯।

৩৩৫. সহিহুল বুখারি : ৩৭০৫, সহিহ মুসলিম : ২৭২৭।

► হাদিস থেকে শিক্ষা

এই হাদিসে কন্যা ও জামাতার প্রতি রাসুল ﷺ-এর আদর-স্নেহের আধিক্য এবং সংকোচ ও দূরত্ব ঘুচিয়ে রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে তাঁদের চূড়ান্ত অন্তরঙ্গতার একটি চিত্র উঠে এসেছে আমাদের সামনে। তাঁদের দুজনকে তিনি আপন জায়গা থেকে সরতে দেননি। উভয়কেই আপন অবস্থায় রেখে তিনি মাঝখানে ঢুকে পড়লেন—উভয়ের মাঝে ঢুকিয়ে দিলেন নিজের পা। এভাবে মাঝখানে বসে তাঁদের এমন একটি জিকির শেখালেন, যা তাঁদের কাক্ষিত গোলাম থেকে উত্তম। এটি মূলত কাউকে এমন কিছু দান করা, যা সে চায়নি। এর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদের বোঝালেন যে, তাঁরা যা পেতে চাচ্ছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু হলো : আখিরাতের পাথেয় জোগাড় করা, দুনিয়ার কষ্টে ধৈর্যধারণ করা এবং ধোঁকার রাজ্য দুনিয়া থেকে যথাসম্ভব দূরে অবস্থান করা।^{৩৩৬}

খাদিম দেওয়ার পরিবর্তে রাসুল ﷺ ফাতিমা ؓ-কে আরও একটি দোয়া শিখিয়েছিলেন। আবু হুরাইরা ؓ বলেন, ‘ফাতিমা ؓ নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে একটি খাদিম চাইলেন। রাসুল ﷺ তাকে বললেন, “তুমি বরং এ দোয়া পড়ো—

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ
الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ
الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ
عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

“হে আল্লাহ, হে সপ্ত আকাশের রব, জমিনের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব ও প্রত্যেক বস্তুর রব, হে শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী! হে তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন নাজিলকারী! আমি প্রত্যেক এমন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

করি, যার (মাথার) অগ্রভাগ আপনি ধরে রেখেছেন (নিয়ন্ত্রণ করছেন)। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম—আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না, আপনি সর্বশেষ—আপনার পরে কোনো কিছু থাকবে না, আপনি সবকিছুর ওপরে—আপনার ওপরে কিছুই নেই, আপনি সর্বনিকটে—আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই, আপনি আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে অভাবগ্রস্ততা থেকে অভাবমুক্ত করুন।”^{৩৩৭}

সন্তানদের দায়িত্বশীলতা শেখাতেন

রাসুল ﷺ বলেন, ‘ফাতিমা, নিজেকে তুমি জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। কারণ, আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করার ব্যাপারে আমি তোমার এতটুকু উপকারেও আসব না।’^{৩৩৮}

ইমাম বুখারির বর্ণনায় এসেছে, ‘হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, আমার সম্পদের যা চাও চেয়ে নাও। কিন্তু আল্লাহর সামনে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না।’

ইমাম নববি رحمه বলেন, ‘হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে—“ফাতিমা, তুমি রাসুলের কন্যা, এই আত্মীয়তার ওপর ভরসা কোরো না। কেননা, আল্লাহ যদি তোমার বদ আমলের কারণে তোমাকে কোনো শাস্তি দিতে চান, তবে আমি সে শাস্তি রোধ করতে পারব না।’^{৩৩৯}

কন্যাদের তাহাজ্জুদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন

আলি رحمه থেকে বর্ণিত আছে, ‘রাসুল ﷺ একদিন রাতের বেলা ফাতিমা رحمه-এর কাছে আসলেন। আলি ও ফাতিমা رحمه-কে বললেন, “তোমরা কি রাতের নামাজ পড়বে না?” আলি رحمه বললেন, “আল্লাহর রাসুল, আমাদের সবকিছু তো আল্লাহর হাতে। তিনি যখন (শেষ রাতে) আমাদের তুলবেন আমরা উঠব।”

৩৩৭. সহীহ মুসলিম: ২৭২৬ (৪/২০৮৪)

৩৩৮. সহিহুল বুখারি : ২৭৫৩, সহিহ মুসলিম : ২০৪।

৩৩৯. ইমাম নববি رحمه কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৩/৮০।

আলি ؓ বলেন, “আমার কথা শুনে রাসূল ﷺ কোনো কিছু না বলেই চলে গেলেন। যেতে যেতে তিনি উরুর ওপর হাত দিয়ে প্রহার করে বলছিলেন : وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا - কিন্তু মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বিতর্ককারী। (সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ৫৪)”^{৩৪০}

ইবনে বাত্তাল ؒ বলেন, ‘এ হাদিস থেকে কিয়ামুল লাইলের ফজিলত এবং পরিবার-পরিজনদের কিয়ামুল লাইলের ব্যাপারে সচেতন করার গুরুত্ব বোঝা যায়।

ইমাম তাবারি ؒ বলেন, ‘শেষ রাতের সময়টা মানুষের জন্য প্রশান্তিদায়ক সময়, একই সাথে এ সময়টা কিয়ামুল লাইলের সময়। ঘুমের প্রশান্তির চাইতে কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহর কাছে কিয়ামুল লাইল আদায়কারীদের অনন্য মর্যাদা হওয়ার কারণে রাসূল ﷺ আলি ও ফাতিমা ؑ-কে দুবার জাগালেন। রাতের আরাম ও প্রশান্তিকে পাশ কেটে আলি ও ফাতিমার জন্য কিয়ামুল লাইলের সাওয়াবকেই তিনি উত্তম মনে করলেন।’^{৩৪১}

‘রাসূল ﷺ-এর কথার পর আলি ؑ-এর তড়িৎ জবাবে এবং ওজর ছাড়াই রাসূল ﷺ-এর সাথে দ্বিমত করার কারণে রাসূল ﷺ নিজের উরুতে হাত দিয়ে প্রহার করে আয়াতটি বলেছিলেন আশ্চর্য হওয়ার কারণে।

যাহোক, এ হাদিসে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হলো, তাহাজ্জুদ যেহেতু ওয়াজিব কোনো আমল নয়; বরং নফল আমল, তাই রাসূল ﷺ তাঁদের দুজনকে সে অনুযায়ী উৎসাহিত করেছেন। আলি ؑ-এর জবাব শুনে তিনি চলে গেলেন। অনথ্যায় যেকোনো ওয়াজিব আমলের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ তাঁদের আপন অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতেন না। ওয়াজিব পালনে শিথিলতা তিনি সহ্য করতেন না। আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।’^{৩৪২}

৩৪০. সহিহুল বুখারি : ১১২৭, সহিহ মুসলিম : ৭৭৫।

৩৪১. শারহ সহিহিল বুখারি : ৩/১১৫।

৩৪২. ইবনে বাত্তাল ؒ কৃত শারহ সহিহিল বুখারি : ৩/১১৫, হাশিয়াতুস সিনদি : ৩/২০৫।

সন্তানদের আবেগ-অনুভূতির ব্যাপারে সচেতন ছিলেন

মিসওয়্যার বিন মাখরামা   বলেন, ‘আলি বিন আবি তালিবের ঘরে নবি-কন্যা ফাতিমা থাকা অবস্থায় তিনি আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। এ কথা শুনে ফাতিমা রাসুল  -এর কাছে আসলেন। বললেন, “আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলছে, আপনি নিজ কন্যাদের জন্য রাগবেন না। আলিকে দেখুন—তিনি আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করছেন।”

ফাতিমার কথা শুনে রাসুল   উঠে গেলেন। তখন আমি শুনলাম, তিনি শাহাদাহ উচ্চারণ করে বলতে শুরু করলেন, “হামদ ও সালাতের পর। আমি আবুল আস বিন রাবির কাছে আমার মেয়ে দিয়েছি। সে আমাকে কথা দিয়ে কথা রেখেছে। আমাকে ওয়াদা করে, ওয়াদা পালন করেছে সে। ফাতিমা আমারই অংশ। যা তাকে কষ্ট দেয়, সেটা আমাকেও কষ্ট দেয়। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসুলের কন্যা ও আল্লাহর শত্রুর কন্যা একই ব্যক্তির বিবাহের অধীনে আসতে পারে না কখনো।” এরপর আলি   আবু জাহেলের কন্যাকে দেওয়া বিবাহের প্রস্তাব ফিরিয়ে নিলেন।’^{৩৪৩}

আলি  -কে বিয়ে করতে নিষেধ করার পেছনে আলিমগণ অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন। সেগুলোকে আমরা মোটামুটি এই চারটি পয়েন্টে একত্রিত করতে পারি :

প্রথমত, এ বিয়ের কারণে ফাতিমা   কষ্ট পেতেন। আর ফাতিমা কষ্ট পাওয়া মানে স্বয়ং নবিজি   কষ্ট পাওয়া। আর নবিজি  -কে কষ্ট দেওয়া কবিরাত গুনাহের শামিল। রাসুল   স্পষ্ট বলেছেন, ‘ফাতিমা আমারই অংশ। যা তাকে অস্থির করে, তা আমাকেও অস্থির করে এবং যা তাকে কষ্ট দেয়, সেটা আমাকেও কষ্ট দেয়।’ তবে এ বিষয়টি নবিজি  -এর কন্যাগণ ব্যতীত অন্য কারও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, ফাতিমা  -এর ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা। যেমনি বুখারির (হাদিস : ৩১১০) বর্ণনায় এসেছে, রাসুল   বলেছেন, ‘আমি আশঙ্কা করছি, ফাতিমা দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হবে।’

স্বামীর ক্ষেত্রে গায়রত থাকা নারীদের স্বভাব। এ স্বভাব দিয়েই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসুল ﷺ আশঙ্কা করলেন, ফাতিমার গায়রত হয়তো তাকে এমন কাজের প্রতি প্ররোচিত করবে, যা মোটেই ফাতিমার উপযুক্ত হবে না এবং ফাতিমার মর্যাদার সঙ্গে যাবে না—অথচ ফাতিমা হচ্ছেন জগতের সকল নারীর সর্দার।

বিশেষ করে, ফাতিমা ﷺ তাঁর মাকে হারালেন। হারালেন একে একে তাঁর সকল বোনকে। তাই গায়রতের কারণে ফাতিমার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠলে তাঁকে শান্ত করার মতো কেউ নেই।

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, ‘এ ঘটনা মক্কা-বিজয়ের পরের। তখন কেবল ফাতিমা ﷺ বেঁচে ছিলেন নবি-কন্যাদের মধ্যে। তাঁর মা খাদিজা ﷺ-এর মৃত্যুর পর একে একে বোনদের মৃত্যু তাঁকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাই স্বামীর নতুন বিয়ের কারণে জেগে ওঠা গায়রত তাঁর দুঃখকে আরও বাড়িয়ে দেবে।’^{৩৪৪}

তৃতীয়ত, আল্লাহর রাসুলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা একই ঘরে একই স্বামীর বিবাহধীন থাকবে—এটা রাসুল ﷺ-এর কাছে ছিল অপছন্দনীয়। রাসুল ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসুলের কন্যা ও আল্লাহর শত্রুর কন্যা একই ব্যক্তির বিবাহধীনে আসতে পারে না কখনো।’

চতুর্থত, ফাতিমা ﷺ-এর অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে রাসুল ﷺ এ বিয়ে নিষেধ করেছেন। রাসুল ﷺ এ ক্ষেত্রে ফাতিমা ﷺ-এর মর্যাদা ও সম্মানের স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।

মোটকথা, সামষ্টিক বা স্বতন্ত্রভাবে এ সকল কারণই সক্রিয় ছিল আলি ﷺ-এর এই বিয়ে বাধাগ্রস্ত হওয়ার নেপথ্যে। তবে এই হাদিসে মোটেও বহুবিবাহের বিরোধীদের জন্য কোনো প্রকার প্রমাণ নেই। রাসুল ﷺ স্বয়ং এমন দলিল গ্রহণের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। কেননা, এ হাদিসেই তিনি নিজেই বলেছেন, ‘তবে আমি হালালকে হারামকারী নই—হারামকে হালালকারী নই।’

সন্তানদের হাসি-খুশি ও প্রফুল্ল রাখতে পছন্দ করতেন

আয়িশা   বলেন, ‘একবার ফাতিমা   হাঁটতে হাঁটতে (রাসুলুল্লাহ  -এর ঘরে) এলেন। তার হাঁটার ভঙ্গি অবিকল রাসুল  -এর মতো ছিল। রাসুল   বললেন, “এসো এসো আমার মেয়ে।” তাকে নিজের ডানে বা বামে বসালেন। এরপর চুপিচুপি তাকে কী যেন বলতে লাগলেন। শুনে ফাতিমা   কেঁদে ফেললেন। আমি বললাম, “আপনি কাঁদছেন কেন?” তারপর রাসুলুল্লাহ   আবারও তার কানে কানে কী যেন বললেন। এবার তিনি হেসে উঠলেন।

আমি তখন বললাম “আজকের মতো কখনো এভাবে কেঁদে উঠে পরক্ষণেই হেসে ফেলতে দেখেনি আমি।” আমি ফাতিমার কাছে এর কারণ জানতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, “রাসুল  -এর গোপনে বলা কথা আমি কারও কাছে প্রকাশ করব না।”

এরপর একদিন রাসুল   আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তখন আমি আবারও ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম। এবার তিনি বললেন, “রাসুল   চুপিচুপি আমাকে বলেছিলেন, “জিবরিল প্রতি বছর একবার আমাকে পুরো কুরআন শোনাতেন। কিন্তু এ বছর তিনি দুবার তিলাওয়াত করেছেন। মনে হয় আমার বিদায়ের সময় চলে এসেছে। আর আমার পরিবার থেকে তুমিই সবার আগে আমার সাথে যুক্ত হবে।” রাসুল  -এর এ কথা শুনে আমি কেঁদে ফেলি। তখন রাসুল   আবার বললেন, “তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমিই হচ্ছে জান্নাতি নারী বা মুমিন নারীদের সর্দার?” তাঁর এ কথায় আমি হেসে উঠি।”^{৩৪৫}

হাদিসের মাঝে একটু দৃষ্টি দিলেই অনায়াসে আমরা বুঝতে পারব যে, ফাতিমা  -এর কান্নায় রাসুল  -এর মন কেঁদে ওঠে। তাই সাথে সাথে নিজ কন্যার দুঃখ সারিয়ে তুলতে তিনি তাকে সুন্দর একটা কথা বলে দিলেন, যাতে তার অন্তর থেকে দুঃখ-কষ্ট চলে গিয়ে অন্তর পুলকিত হয়ে ওঠে।

সন্তানদের জিকির ও দোয়ার প্রতি উৎসাহ দিতেন

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ ফাতিমাকে বলতেন, “ফাতিমা, আমার উপদেশ শুনতে কীসে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? সকাল-সন্ধ্যায় তুমি এ দোয়া পড়বে—

يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِّيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ
إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

“হে চিরজীব, চিরস্থায়ী! তোমারই রহমতের আশ্রয় চাই। আমার জন্য আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও। এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের দায়িত্বে সোপর্দ করো না।”^{৩৪৬}

সন্তানদের হাদিয়া ও তুহফা পাঠাতেন

আলি ؓ বলেন, ‘একবার রাসুল ﷺ আমাকে রেশমের তৈরি এক সেট পোশাক দিলেন। আমি সেটি পরে বাইরে বের হলাম। তিনি দেখে বললেন, “আলি, তুমি পরার জন্য তো এটি দিইনি। এটি থেকে ফাতিমাদের জন্য ওড়না বানাও।”^{৩৪৭}

ইমাম নববি ؓ বলেন :

‘ফাতিমাদের জন্য—ফাতিমাদের বলে উদ্দেশ্য তিন ফাতিমা। এক. রাসুল-কন্যা ফাতিমা। দুই. আলি ؓ-এর মা ফাতিমা বিনতে আসাদ। তিন. ফাতিমা বিনতে হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব।’^{৩৪৮}

বিপদের সময় সন্তানদের সবরের উপদেশ দিতেন

উসামা বিন জাইদ ؓ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক কন্যা (জাইনাব) তাঁর কাছে এই খবর দিয়ে লোক পাঠালেন—আমার এক পুত্র মরণাপন্ন; আপনি

৩৪৬. ইবনুস সুন্নি কৃত আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ : ৪৬। হাদিসের মান : হাসান।

৩৪৭. সহিহুল বুখারি : ২৬১৪, সহিহ মুসলিম : ২০৭১, মুসনাদু আহমাদ : ৭১২।

৩৪৮. ইমাম নববি ؓ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১৪/৫১।

আমাদের কাছে চলে আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তঁাকে) আমার সালাম দেবে এবং বলবে :

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. فَلْتَصْبِرْ
وَلْتَحْتَسِبْ

“আল্লাহ যা কেড়ে নেন আর যা দান করেন—সব তাঁরই অধিকারে। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখে।”

তিনি (জাইনাব) আল্লাহর কসম দিয়ে আবার লোক পাঠালেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যেন তার কাছে অবশ্যই আগমন করেন। এবার রাসুলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাদ বিন উবাদা, মুআজ বিন জাবাল, উবাই বিন কাব, জাইদ বিন সাবিত ؓ-সহ আরও কতিপয় সাহাবি। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে শিশুটিকে তুলে দেওয়া হলো। সে তখন অস্থির হয়ে হাত-পা ছুড়ছিল। তার শ্বাস পুরাতন মশকে পানি ঢালার মতো শব্দ করছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। সাদ ؓ বললেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, এ কী? আপনি কাঁদছেন!” তিনি বললেন :

هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ
الرُّحَمَاءَ

“এ হলো রহমত! যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রাখেন। আর আল্লাহ তো কেবল তাঁর দয়ালু বান্দাদেরই রহম করেন।”^{৩৪৯}

ইমাম নববি ؒ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, “আল্লাহ যা কেড়ে নেন আর যা দান করেন—সব তাঁরই অধিকারে। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। কাজেই, সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখে।”—এই কথাগুলো বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ জাইনাব ؓ-কে সবরের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

রাসুল ﷺ-এর কথার মর্মার্থ হচ্ছে, ‘তোমাদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে, তা মূলত তোমাদের নয়। তাই আল্লাহর নিয়ামত আল্লাহ নিয়ে নিয়েছেন। তাই কারও কাছে রাখা আমানত বা ধারের বস্তু মূল মালিক ফেরত চাইলে দুঃখবোধ করা বা অধৈর্য হওয়ার কিছু নেই।’

‘আর তিনি যা দিয়েছেন, তাও তাঁর অধিকারে’—অর্থাৎ আল্লাহ যা দেন, তা তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর দানকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে তিনি যা ইচ্ছে করতে পারেন।

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। সাদ বললেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ! এ কী? আপনি কাঁদছেন!”—সাদ ﷺ ধারণা করেছিলেন, (মৃত ব্যক্তির শোকে) সকল প্রকার কান্না হারাম। চোখে অশ্রু প্রবাহিত হওয়াও হারাম। তিনি মনে করেছিলেন, নবিজি ﷺ বিষয়টা ভুলে গেছেন। তাই ‘এ কী, আপনি কাঁদছেন!’ বলে রাসুল ﷺ-কে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তখন রাসুল ﷺ জানালেন, কান্না করা, চোখে অশ্রু আসা হারাম নয়, মাকরুহও নয়। বরং অনেক কান্না আছে রহমত ও ফজিলতের। বিলাপ ও আর্তনাদ ইত্যাদি সহযোগে কান্না করাই হারাম।’^{৩৫০}

ছেলে-মেয়েদের মৃত্যুতে তিনি শোকাহত হতেন

সন্তান হারিয়ে যারা পরীক্ষায় পড়েছেন, তারা যেন জেনে নেয়, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুত্র-কন্যা সব হারিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর কেবল ফাতিমা ﷺ জীবিত ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি একে একে তাঁর সকল সন্তান হারিয়েছেন। রাসুল ﷺ-এর কোনো সন্তান মৃত্যুবরণ করলে তিনি কাঁদতেন। সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত হতেন। তাঁর দুচোখ থেকে গড়িয়ে পড়ত ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। তবে মুখে কেবল সে কথাই উচ্চারণ করতেন, যে কথায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, যে কথা আল্লাহ পছন্দ করেন।

আনাস ﷺ উম্মে কুলসুম ﷺ-এর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের বর্ণনায় বলেন, ‘আমরা রাসুল-কন্যার জানাজা পড়লাম। রাসুল ﷺ কবরের পাশে বসে রইলেন। আমি দেখলাম, তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।’^{৩৫১}

৩৫০. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৬/২২৫।

৩৫১. সহিহুল বুখারি : ১২৮৫।

রাসুল ﷺ-এর চোখের সে অশ্রু অস্থিরতার অশ্রু ছিল না। আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি অসম্ভ্রষ্টিও এই অশ্রুর কারণ ছিল না। বরং এ অশ্রু ছিল রহমতের, এ অশ্রু ছিল স্নেহের। দয়াবানদের চোখ থেকে এমন অশ্রু বের হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, ‘একবার আমরা কর্মকার আবু সাইফের বাড়িতে এলাম। তিনি ছিলেন নবি-তনয় ইবরাহিমের দুধ-পিতা। রাসুল ﷺ ইবরাহিমকে চুমু খেলেন, তাকে নাকে-মুখে লাগিয়ে আদর করলেন।

এরপর আরেকবার আমরা ইবরাহিমের কাছে এসে দেখি, সে মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছে। রাসুল ﷺ-এর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। আব্দুর রহমান বিন আওফ তখন বলে উঠলেন, “আপনিও হে আল্লাহর রাসুল?”

রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, “এ অশ্রু রহমতের, হে ইবনে আওফ।”

এরপর রাসুল ﷺ আবার কাঁদতে থাকলেন। বললেন :

تَذْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَاللَّهُ يَا
إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ

“চোখগুলো আজ প্রবহমান, অন্তর বেদনাক্লিষ্ট। তবুও আমরা শুধু তা-ই বলব, যাতে খুশি হন আমাদের রব। আল্লাহর কসম, হে ইবরাহিম, আমরা তোমার বিয়োগব্যথায় শোকাহত।”^{৩৫২}

আনাস ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ ছাড়া শিশুদের প্রতি এত বেশি দয়াশীল অন্য কাউকে দেখিনি আমি। রাসুল ﷺ-এর এক পুত্র ইবরাহিম মদিনার গ্রামাঞ্চলে দুধপানের সময় পার করছিলেন। রাসুল ﷺ তাকে দেখতে যেতেন। আমরাও তাঁর সাথে থাকতাম। সে বাড়িতে প্রবেশ করে দেখা যেত ধোঁয়াচ্ছন্ন পরিবেশ। (অন্য বর্ণনায় আছে, বাড়িটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে। আমি তখন রাসুল ﷺ-এর সামনে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দুধ-পিতাকে বলতাম, “আবু সাইফ, বন্ধ করো, রাসুল ﷺ এসেছেন।”)

ইবরাহিমের দুধ-পিতা একজন কামার ছিল। রাসুল ﷺ তাঁর শিশুপুত্র ইবরাহিমকে তুলে নিয়ে চুমু খেতেন। এরপর ফিরে আসতেন।

ইবরাহিম যখন মারা যায়, তখন রাসুল ﷺ বলেন, “ইবরাহিম আমার ছেলে। দুধপানের বয়সে সে মারা গেছে। তার জন্য জান্নাতে দুধ-পিতা ও দুধ-মাতা রয়েছে—তারা তার দুধপানের সময়টুকু পূর্ণ করবে।”^{৩৫৩}

অর্থাৎ ইবরাহিমের যখন দুধপানের বয়স, তখন সে মারা গেছে। অথবা দুধপান করা অবস্থায় সে মারা গেছে। জান্নাতের দুধ-পিতা ও দুধ-মাতা তাকে দুধপান করিয়ে দুবছর পূর্ণ করবে। কেননা, ১৬ বা ১৭ মাস বয়সে তার ওফাত হয়ে যায়। তাই বাকি সময়টুকু ওরাই দুধ পান করাবে। কারণ, কুরআনে দুধপানের সময় দুই বছর বলা হয়েছে।

► হাদিস থেকে শিক্ষা

ইমাম নববি رحمہ اللہ বলেন :

- ‘রাসুল ﷺ-এর মহৎ চরিত্র, শিশু ও দুর্বলের প্রতি তাঁর দয়া-স্নেহের অনুপম এক চিত্র দেখেছি আমরা এ হাদিসে।
- এ হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে, শিশু সন্তানের প্রতি দয়া করার ফজিলত। তাদের গালে চুমু ঐকে দেওয়ার ফজিলত।’^{৩৫৪}

সন্তানদের মৃত্যুর পর রাসুল ﷺ তাদের গোসল, কাফন, জানাজা ও দাফনের তত্ত্বাবধান করতেন। তাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন।

উম্মে আতিয়্যাহ আনসারি رحمہ اللہ বলেন, ‘রাসুল-কন্যা উম্মে কুলসুমের ওফাতের পর রাসুল ﷺ আমাদের কাছে এসে বললেন, “তোমরা তাকে তিনবার বা পাঁচবার অথবা প্রয়োজনে তারও অধিকবার গোসল করাবে। বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল দাও। এরপর কর্পূর দিয়ে দেবে। অথবা

৩৫৩. সহিহ মুসলিম : ২৩১৬।

৩৫৪. ইমাম নববি رحمہ اللہ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৫/৭৬।

(বলেছেন) খানিকটা কর্পূর মেখে দেবে। গোসলের কাজ শেষ হলে আমাকে খবর দেবে।”

আমরা গোসল শেষ করে তাঁকে জানালাম। তিনি তাঁর একটি চাদর এগিয়ে দিলেন। বললেন, “এটি পরাও।”^{৩৫৫}

এখানে রাসুল ﷺ-এর প্রজ্ঞা লক্ষণীয়। রাসুল ﷺ প্রথমেই কাফনের জন্য নিজের চাদর দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি গোসল শেষে দিয়েছিলেন চাদরটি। যাতে রাসুল ﷺ-এর শরীর থেকে কাপড়টি খুলে রাসুল-কন্যার শরীরে পরানোর মাঝখানে সময়ের ব্যবধান বেশি না হয়।

এই ছিল সন্তানদের সাথে রাসুল ﷺ-এর আচরণের একটি রূপরেখা। এ পরিচ্ছেদ শেষে অবশ্যই আমরা স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি সন্তানদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর আচরণের ব্যাপারে—কেমন ছিল তাঁর তরবিত, ভালোবাসা ও ব্যবহার।

أَوْلَادُنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي *** فِي الْأَرْضِ تَحْتَ السَّمْعِ وَالْبَصْرِ
بِالْحُبِّ وَالْإِحْسَانِ نُنْشِئُهُمْ *** حَتَّى يَكُونُوا قَادَةَ الْبَشَرِ
أَعْمَارُنَا بَذَلْتُ لَهُمْ كَرَمًا *** يَبْقَى الْعَطَاءُ لآخرِ الْعُمُرِ

‘পৃথিবীর বাগানে কচি কচি পা ফেলে বিচরণ করে আমাদের কলিজার টুকরো সন্তানরা। আমাদের নিখুঁত তত্ত্বাবধান নিরাপদ রাখে তাদের পথচলা। নির্মল স্নেহ আর ভালোবাসায় আমরা তাদের গড়ে তুলি আগামী পৃথিবীর কর্ণধার হিসেবে। আমাদের জীবন তাদের সরবরাহ করে নিরবচ্ছিন্ন প্রাণশক্তি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জারি থাকে আমাদের এই দান।’

نَفْسِي لِحَيْرِ الْمُرْسَلِينَ فِدَى *** انْظُرْ لَهُ بَشْرًا مِنَ الْبَشَرِ
نِعْمَ الْأَبُ الْحَانِي لِمَنْ وَلَدَا *** لِيُنْ النَّسِيمَ يَهْبُ فِي السَّحَرِ

لِبَنَاتِهِ يَخْتَارُ مُحْتَرَمًا *** رَغَبَاتِهِنَّ مُرَاعِي الصَّغِيرِ

الْمَهْرَ وَالتَّجْهِيزَ يَسْرُهُ *** وَحَلَاوَةَ التَّرْوِيجِ فِي الْيُسْرِ

‘প্রিয় নবির কদমে কুরবান হোক আমার জীবন! কোথায় পাবে তুমি এমন অনুপম মানব। কত চমৎকার পিতা তিনি! সন্তানদের প্রতি তাঁর স্নেহ যেন ভোরে মৃদুমন্দ হিমেল হাওয়া। গুরুত্বের সঙ্গে পূরণ করতেন মেয়েদের কচিমনের চাওয়াগুলো। মোহর ও উপহার তাকে আনন্দিত করত। বস্তুত সহজ বিয়েগুলোতেই আছে সুখের মিষ্টতা।’

مُوَصِّ لَهَا بِالزَّوْجِ تُكْرِمُهُ *** مِنْ غَيْرِ تَنْغِيصٍ وَلَا كَدَرٍ

لَيْسَتْ تُكَلِّفُ مَا يُثْقَلُهُ *** وَالصَّبْرُ خَيْرٌ عَطَا لِمُصْطَبِرٍ

يُغْضِي إِذَا مَا كَانَ بَيْنَهَا *** شَيْءٌ فَتِلْكَ طَبِيعَةُ الْبَشَرِ

‘কন্যাদের তিনি উপদেশ দিতেন—মেয়ে আমার, স্বামীকে সম্মান করো। স্বচ্ছ ও নির্মল রাখো তার জীবন। কঠিন কোনো ভার চাপাতেন না তাদের ওপর। আর সবরই হলো ধৈর্যশীলের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। কন্যা ও স্বামীর সাধারণ রাগ-অভিমানগুলো এড়িয়ে যেতেন। বস্তুত এটিই তো প্রজ্ঞার পরিচয়।’

كَفَّاهُ نَحْوَ بَنَاتِهِ جَرَّتَا *** بِالْجُودِ مِثْلَ تَدْفُقِ النَّهْرِ

وَإِذَا ذَهَابَ حَدُّهُ يُصْبِرُهَا *** وَعُظَا لَهَا بِتَحْتُمِ الْقَدَرِ

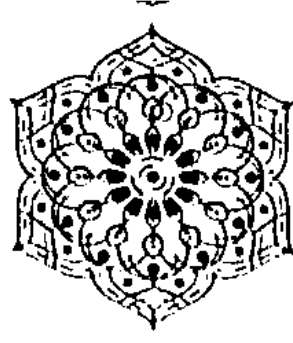
مَا زَالَ يَرْعَاهَا بِرَحْمَتِهِ *** وَحَنَانِهِ لِنَهَايَةِ الْعُمُرِ

فَبَكَى لِأَجْلِ فِرَاقِهَا أَسْفًا *** بِاللَّهِ إِنَّكَ أَرْحَمُ الْبَشَرِ

‘বহতা নদীর চঞ্চল স্রোতের মতো তাঁর মুবারক হাত হতে প্রবাহিত হতো দয়া ও করুণার অবিরল ধারা—যা প্লাবিত করত আদরের কন্যাদের হৃদয়-মন। কখনো মুসিবতের আঁধার নেমে এলে, তাদের হৃদয়ে জ্বালাতেন সবরের দীপ। তাকদিরের অমোঘ বিধানের কথা

বলতেন উপদেশের স্বরে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাদের পরিচর্যা করতেন পরম স্নেহ ও ভালোবাসায়। তাদের বিয়োগে হতেন পরম শোকাতুর। আল্লাহর কসম, মানুষের মাঝে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’





❦ [তৃতীয় পরিচ্ছেদ] ❦

নাতিদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

সন্তানের মতো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নাতির সংখ্যা ছিল সাত। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ :

১. হাসান বিন আলি : রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল ছিল তার। আলি ও ফাতিমা ﷺ-এর প্রথম সন্তান তিনি। জন্মগ্রহণ করেন তৃতীয় হিজরিতে। আর মৃত্যুবরণ করেন ৪৯ হিজরিতে। রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর সময় তার বয়স সাত বছরের মতো।
২. হুসাইন বিন আলি : আলি ও ফাতিমা ﷺ-এর দ্বিতীয় সন্তান। চতুর্থ হিজরিতে জন্ম এবং মৃত্যু একষটি হিজরিতে।
৩. উম্মে কুলসুম বিনতে আলি : রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বিয়ে করেন উমর বিন খাত্তাব ﷺ। তাদের ঘরে জন্ম নেয় জাইদ ও রুকাইয়া নামে দুজন সন্তান। উম্মে কুলসুম ও তার পুত্র জাইদ ৭৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।
৪. জাইনাব বিনতে আলি : রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বিয়ে করেন রাসুল ﷺ-এর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাফর ﷺ। আব্দুল্লাহর বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জাইনাব ও জাফর ﷺ-এর সন্তানদের অনেকে বেঁচেছিলেন—তাদের সংখ্যাও ছিল অনেক।
৫. আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আফফান : রাসুল-তনয়া রুকাইয়া ﷺ-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান হাবশা। ৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

৬. উমামা বিনতে আবুল আস : রাসুল-তনয়া জাইনাব ؓ-এর ঘরে জন্ম হয় উমামার। ফাতিমা ؓ-এর মৃত্যুর পর আলি ؓ উমামাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাদের কোনো সন্তান হয়নি। আলি ؓ মৃত্যুবরণ করার পর মুগিরা বিন নাওফাল তাকে বিয়ে করেন। তাদেরও কোনো সন্তান হয়নি। মুগিরার বিবাহ বন্ধনে থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন উমামা।

৭. আলি বিন আবুল আস : উমামা বিনতে জাইনাবের ভাই ছিলেন তিনি। রাসুল ؓ-এর জীবদশায় বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করেন।

রাসুল ؓ-এর সন্তানদের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর পর বেঁচেছিলেন কেবল ফাতিমা ؓ। আবার রাসুলুল্লাহ ؓ-এর নাতিদের মধ্যে কেবল বেঁচেছিলেন ফাতিমা ؓ-এর সন্তানগণ। রাসুলুল্লাহ ؓ-এর দুই নাতি হাসান ও হুসাইন ؓ-এর মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছে তাঁর বংশ। হাসানের বংশধরদের বলা হয় হাসানি আর হুসাইনের বংশধরদের বলা হয় হুসাইনি।^{৩৫৬}

নাতিদের সঙ্গে রাসুল ؓ-এর আচরণ ছিল আদর, সোহাগ ও দয়ায় ভরা। তিনি ছিলেন আদর্শ পিতৃত্বের অনুপম নমুনা। নাতিদের সাথে মায়া ও স্নেহভরা ব্যবহারগুলো তাঁর উন্নত মানবিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর অসাধারণ তরবিরত ও নিখুঁত তত্ত্বাবধান সব সময় নাতিদের ঘিরে রাখত।

৩৫৬. ইমাম বুখারি আদাবুল মুফরাদে (৮২৩), ইবনে হিব্বান স্বীয় গ্রন্থে (৬৯৮৫), ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৭৬৯) আলি ؓ-এর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ‘যখন হাসানের জন্ম হলো, আমি তার নাম রাখলাম হারব। রাসুল ؓ এসে বললেন, “কোথায় আমার সন্তান? আমার কাছে আনো তাকে। কী নাম রেখেছ তার?” আমি বললাম, “হারব।” রাসুল ؓ বললেন, “না। বরং সে হাসান।” এরপর যখন হুসাইনের জন্ম হলো, আমি তার নাম রাখলাম হারব। রাসুল ؓ এসে বললেন, “কোথায় আমার সন্তান? আমার কাছে আনো তাকে। কী নাম রেখেছ তার?” আমি বললাম, “হারব।” রাসুল ؓ বললেন, “না। বরং সে হুসাইন।” তৃতীয় সন্তান জন্ম হলে তার নাম রাখলাম হারব। রাসুল ؓ এসে বললেন, “কোথায় আমার সন্তান? আমার কাছে আনো তাকে। কী নাম রেখেছ তার?” আমি বললাম, “হারব।” রাসুল ؓ বললেন, “না। বরং সে মুহসিন।” এরপর বললেন, “হারুন ؓ-এর সন্তান শাব্বার, শুবাইর ও মুশাব্বিরের নামানুসারে এদের নাম রেখেছি আমি।”—হানি বিন হানি নামক রাবির জাহালতের কারণে এ হাদিস জইফ। দেখুন, সিলসিলাতুজ জইফা : ৮/১৮২।

জন্মের পর নাতিদের কানে আজান দিতেন

যখনই রাসুল ﷺ-এর কোনো নাতি জন্ম নিতেন, রাসুল ﷺ তার ডান কানে আজান দিতেন—যাতে শিশুর কর্ণকুহরে গুঞ্জনিত প্রথম শব্দটি হয় মহান রবের বড়ত্ব ও মহত্ত্বব্যঞ্জক আওয়াজ। আবু রাফি রূবালী বলেন, ‘ফাতিমার যখন সন্তান হলো আমি দেখলাম, রাসুল ﷺ নামাজের আজানের মতো করে হাসানের কানে আজান দিচ্ছেন।’^{৩৫৭}

আলিমগণ বলেন, নবজাতক শিশুর কানে আজান দেওয়া মুসতাহাব। এতে শয়তান বিতাড়িত হয়। আর শিশুর কানে প্রবেশ করা প্রথম শব্দ হয় আল্লাহর জিকির।

ইবনে কাইয়িম রূবালী বলেন, ‘আজান দেওয়ার মাহাত্ম্য আল্লাহই ভালো জানেন। তবে আজান দেওয়ার কারণে একজন মানুষের কানে প্রবেশ করা প্রথম শব্দ হয় আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের বাণীর। একজন মানুষের কানে প্রবেশ করে ইসলামে প্রবেশ করার শাহাদাহর বাণী। যেন একরকমের তালকিন এটি। দুনিয়াতে আসার সময় তার কানে ইসলামের একটি শিআরের উচ্চারণ হয়। যেভাবে দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় মানুষের কানে তাওহিদের কালিমার তালকিন দেওয়া হয়।

যদিও শিশু আজানের বাক্য না বুঝে, তবুও আজানের প্রভাব তার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ ছাড়াও এর আরও কিছু উপকারিতা রয়েছে। যেমন, আজানের শব্দ শুনে শয়তানের পলায়ন।...শিশুকে মন্ত্রণা দিতে আসা শয়তান আজান শুনে দুর্বল হয়ে পড়ে। শিশুর সাথে সম্পর্ক করতে আসার প্রথম সময়েই শয়তান রেগে যায় আজান শুনে।’^{৩৫৮}

৩৫৭. সুনানু আবি দাউদ : ৫১০৫, সুনানুত তিরমিজি : ১৫১৪; ইমাম তিরমিজি, নববি ও ইবনে মুলকিন রূবালী এ হাদিসকে সহিহ বলেছেন। তবে ইবনে হিব্বান রূবালী বলেছেন এ হাদিস জইফ। আলবানি রূবালী এ হাদিসকে হাসান বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এ হাদিসকে জইফ বলেছেন তিনি।
৩৫৮. তুহফাতুল মাওদুদ : ৩১।

আজানের পর নবজাতক নাতির তাহনিক করতেন তিনি

আয়িশা রা বলেন, ‘রাসুল সা-এর কাছে কোনো শিশুকে নিয়ে আসা হলে, তিনি প্রথমে দোয়া করতেন শিশুর জন্য, এরপর তাহনিক করতেন।’^{৩৫৯}

তাহনিক

তাহনিক হচ্ছে, খেজুর বা খেজুরজাতীয় কিছু চিবিয়ে শিশুর তালুতে ঘষে দেওয়া। খেজুর ভিন্ন অন্য মিষ্টি দ্রব্য দিয়ে তাহনিক করলেও সুন্নাত আদায় হবে। তবে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা উত্তম।^{৩৬০}

কারণ, খেজুরের মিষ্টতা শিশুর জন্য সবচেয়ে ভালো।

চিকিৎসাবিজ্ঞান তাহনিকের উপকারিতার বিবিধ দিক আবিষ্কার করেছে। ড. মুহাম্মদ আলি আল-বার বলেন, ‘আধুনিক বিজ্ঞান তাহনিকের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা প্রমাণ করেছে। তাহনিকের ফলে নবজাতকের শরীরে সুপ্রভাব রাখে। শিশুর শরীর বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

তাহনিকের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিস থেকে আমরা জেনেছি যে, খেজুর বা মিষ্টিজাতীয় কোনো খাবার শিশুর উদরে যাওয়া উচিত। রাসুল সা-এর সুন্নাহ বিবৃত হওয়ার ১৪০০ বছর পর চিকিৎসাবিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে তাহনিকের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা।

সদ্যপ্রসূত শিশু দু্কারণে মারা যেতে পারে। এক. রক্তের মধ্যে সুগার লেবেল কমে যাওয়া। দুই. ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে শিশু-শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া।

শিশুর রক্তে সুগার লেবেল (গ্লুকোজ) কমে যাওয়ার ফলে কয়েকটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি সামনে আসতে পারে—

- শিশুর দুধপানে অনীহা।

৩৫৯. সহিহ মুসলিম : ২৮৬।

৩৬০. ইমাম নববি রা কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৪/১২৪।

- শিশুর পেশি টিলে হয়ে যাওয়া।
- বারবার শ্বাসকষ্ট হওয়া।
- শরীর নীলচে হয়ে যাওয়া।

এ ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন : কখনো কখনো শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় কিংবা মানসিকভাবে শিশু অপরিণত হয়।

এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা খুবই সহজ। আর সেটা হচ্ছে, পানিতে গ্লুকোজ গুলে মুখে দেওয়া বা ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্লুকোজ দেওয়া। যখন তাহনিক করা হয়, তখন তাহনিকের মাধ্যমে গ্লুকোজ প্রবেশ করে শিশুর শরীরে। ফলে শিশু মারাত্মক বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পায়।

গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয়েছে, তাহনিকের সময় তালুতে দেওয়া খেজুর চেটে খেতে শিশু যখন জিব ও মুখের হাড়গোড় নাড়ায়, তখন পেশিগুলো শক্তিশালী হয়। আর শিশু দুধপান করতে পারে অনায়াসে।^{৩৬১}

অন্যদিকে আজওয়া খেজুর তাহনিকের জন্য উত্তম ও বরকতময়। কারণ, আজওয়া খেজুর জান্নাত থেকে নাজিল হয়েছে। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ বলেছেন, “আজওয়া জান্নাতের খেজুর। এতে বিষের প্রতিষেধক আছে।”^{৩৬২}

তবে আজওয়া খেজুর পৃথিবীতে আসার পর নিঃসন্দেহে তার স্বাদ ও গুণে পরিবর্তন এসে গেছে। তাই দুনিয়ার আজওয়া খেজুর হুবহু জান্নাতের সে আজওয়া আর থাকেনি।

শিশু নাতিদের আকিকা দিতেন

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ হাসান ও হুসাইনের আকিকা দিয়েছিলেন জোড়া জোড়া ভেড়া জবাই করে।’^{৩৬৩}

৩৬১. ইসলাম ওয়েবে লিখিত আর্টিকেল। <http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=143055>

৩৬২. সুনানুত তিরমিজি : ২০৬৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৪৫৫। হাদিসের মান : সহিহ।

৩৬৩. সুনানুন নাসায়ি : ৪২১৯। হাদিসের মান : সহিহ।

শিশুর জন্মের পর যে পশু জবাই করা হয়, তাকে আকিকা বলে। ছেলে শিশুর জন্য দুটি ছাগল। আর মেয়ে শিশুর জন্য একটি ছাগল।

ইবনে হাজার رحمہ বলেন, ‘আকিকার অনেক উপকারিতা। আকিকা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এতে আছে মর্যাদা ও দয়া। এতে শিশু সন্তানের প্রতি (পিতামাতার) দায় সেরে যায়। এ ছাড়াও আকিকা শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও স্থায়ী সুস্থতার কারণ হয় এবং শিশুকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে হিফাজত করে।’^{৩৬৪}

শিশু জন্মের পর সপ্তম দিন পর্যন্ত আকিকা বিলম্বিত করতেন

আয়িশা رضی اللہ عنہا বলেন, ‘রাসুল ﷺ হাসান ও হুসাইনের জন্মের পর সপ্তম দিনে আকিকা ও নামকরণ করেছিলেন।’^{৩৬৫}

‘শিশুর জন্ম শনিবারে হলে তার আকিকা হবে সপ্তম দিন হিসেবে শুক্রবারে। অর্থাৎ জন্মগ্রহণের দিনের আগের দিন। এটাই হচ্ছে নিয়ম। তাই শিশু যদি বৃহস্পতিবারে জন্ম নেয়, তবে আকিকা হবে বুধবারে। এভাবে হবে হিসাবটা।’^{৩৬৬}

রাসুল ﷺ আরও বলেন, ‘শিশু আকিকার ওপর বন্ধক (দায়বদ্ধ) থাকে। জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা দিতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে।’^{৩৬৭} রাসুল ﷺ তাঁর এক সন্তানের নাম রেখেছিলেন শিশুর জন্মের দিনেই। যেমন তিনি বলেছিলেন, ‘গত রাতে আমার একটি সন্তান জন্ম নিয়েছে। আমি তার নাম রেখেছি আমার বাবা ইবরাহিমের নামে।’^{৩৬৮}

৩৬৪. তুহফাতুল মাওদুদ বি আহকামিল মাওলুদ : ৬৯।

৩৬৫. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৫৩১১; এ হাদিসকে ইবনে হাজার رحمہ সহিহ বলেছেন। দেখুন, ফাতহুল বারি : ৯/৫৮৯।

৩৬৬. আশ-শারহুল মুমতি’ : ৭/৪৯৩।

৩৬৭. সুনানু আবি দাউদ : ২৮৩৮, সুনানুত তিরমিজি : ১৫২২। হাদিসের মান : সহিহ।

৩৬৮. সহিহ মুসলিম : ৩১২৬।

শিশুর মাথা কামিয়ে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা দান করার নির্দেশ দিতেন

রাসুল ﷺ-এর গোলাম আবু রাফি ؓ বলেন, ‘হাসানের জন্মের পর তার মা ফাতিমা দুটি ছাগল জবাই করে আকিকা দিতে চাইলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ বললেন, “আকিকা কোরো না। এখন তার মাথা মুগুন করে চুলের ওজনের সমান রূপা সাদাকা করো আল্লাহর রাস্তায়।” হুসাইনের জন্মের পরও ফাতিমা তেমনই করলেন।’^{৩৬৯}

‘আকিকা কোরো না’—বলার কারণ হচ্ছে রাসুল ﷺ নিজে নাতির আকিকা করতে চাইছিলেন।

আনাস ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ হাসান-হুসাইনের জন্মের সপ্তম দিনে তাদের মাথা মুগুন করার আদেশ দিলেন। এরপর মুগুনো চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সাদাকা করলেন।’^{৩৭০}

নবজাতক শিশুর মাথা মুগুন করা অনেক উপকারী। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, নবজাতকের মাথা কামানোর ফলে মাথার লোমকূপগুলো উন্মুক্ত হয় এবং চুল গজানোর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

মাথা মুগুনের পর জাফরান দিয়ে মাথা মুছে দেওয়া একটি ভুলে যাওয়া সুন্নাত। মানুষ এ সুন্নাহটি পালন করে না বললেই চলে। আয়িশা ؓ বলেন, ‘জাহিলি যুগে লোকেরা শিশুর আকিকা করে জন্তুর রক্ত একটি কাপড়ের টুকরোয় নিয়ে মুণ্ডিত মাথায় লেপে দিত। নবিজি ﷺ এ বিষয়ে বলেন, “তোমরা জন্তুর রক্তের পরিবর্তে নবজাতকের মাথায় খালুক (সুগন্ধি) দাও।”’^{৩৭১}

৩৬৯. মুসনাদু আহমাদ : ২৬৬৫৫। হাদিসের মান : হাসান।

৩৭০. আল-বাজ্জার : ৬১৯৯। হাদিসের মান : হাসান।

৩৭১. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৫৩২৮। হাদিসের মান : সহিহ।

হাদিসে খালুক শব্দটি এসেছে। খালুক হচ্ছে লাল ও হলুদ বর্ণের সুগন্ধিকে জাফরানের সাথে মিশিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের সুগন্ধি।—নিহায়া : ২/১৪৪।

শিশুর জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করতেন

রাসুল ﷺ শিশুদের সুন্দর সুন্দর নাম রাখতেন। এই কাজটি ছিল তাঁর স্বভাবজাত। এমনকি বয়স্ক লোকদের মন্দ নামও তিনি পরিবর্তন করে দিতেন। পিতার ওপর সন্তানের অধিকার হচ্ছে, তার সুন্দর একটি নাম রাখা। একটি ভালো নাম বাছাই করে নেওয়া। আজগুবি, দুর্বোধ্য, শ্রুতিকটু ও নিকৃষ্ট অর্থবোধক নাম পরিহার করতে হবে।^{৩৭২}

নাতিরা কোলে পেশাব করলেও রাগতেন না

লুবাবা বিনতে হারিস রা বলেন, ‘একবার শিশু হুসাইন রা রাসুলুল্লাহ স-এর কোলে প্রস্রাব করে দিল।

তখন আমি বললাম, “অন্য একটি কাপড় পরে নিন। আপনার এ লুঙ্গিটি আমাকে দিন—আমি ধুয়ে দিচ্ছি।”

রাসুল স বললেন, “কন্যা শিশুর পেশাব লাগলে কাপড় ধুতে হয়। আর ছেলে শিশুর পেশাব লাগলে কাপড়ের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেই হয়।”^{৩৭৩}

৩৭২. নামের ব্যাপারে দুটি ঘটনা বলছি : ‘একবার বিমানবন্দরের এক কর্মকর্তার সামনে এল বৃদ্ধা এক নারী মুসাফির। কর্মকর্তা জিজ্ঞেস করল, “আপনার নাম কী?” বৃদ্ধা বলল, الصلاة على النبي—নবির ওপর দরুদ পড়ো।” কর্মকর্তা বলল, عليه الصلاة والسلام—সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবির ওপর। আপনার নামটা বলুন।” বৃদ্ধা আবারও বলল, “الصلاة على النبي—নবির ওপর দরুদ পড়ো।” কর্মকর্তা আবারও নবিজি স-এর ওপর দরুদ পড়ল। বলল, “عليه الصلاة—সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবির ওপর। আপনার নামটা বলুন।” কিন্তু বৃদ্ধা আগের কথাটাই বলল। শেষে কর্মকর্তা বুঝতে পারল আসলে বৃদ্ধার নামই হচ্ছে, “الصلاة على النبي—নবির ওপর দরুদ পড়ো।”

এ রকম আরেক লোককে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘তোমার উপনাম কী?’

লোকটা উত্তর দিল, ‘أبو عبد الملك الكريم الذي يُمسِكُ السَّيِّءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ’—অর্থাৎ সম্মানিত মালিকের বান্দার পিতা যিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়।’

জিজ্ঞেসকারী মোবারকবাদ জানিয়ে বলল, ‘অর্ধ কুরআনের বাপ তুমি, উচু হও।’

৩৭৩. সুনানু আবি দাউদ : ৩৭৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৫২২। হাদিসের মান : সহিহ।

আবুস সামহ্ ؓ বলেন, ‘আমি রাসুল ﷺ-এর খিদমত করতাম। যখন তিনি গোসল করতে চাইতেন, তখন আমাকে বলতেন পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াও। তখন আমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে আড়াল করতাম। একবার হাসান বা হুসাইনকে আনা হলো রাসুল ﷺ-এর কাছে। রাসুল ﷺ-এর বুকের ওপর পেশাব করে দিল সে। আমি পেশাব ধুয়ে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলাম। তখন তিনি বললেন, “মেয়ে শিশুর পেশাব ধুতে হয়। ছেলে শিশুর পেশাবের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেই হয়।”^{৩৭৪}

আবু লাইলা ؓ বলেন, ‘একদিন আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তাঁর বুক বা পেটের ওপর হাসান বা হুসাইন বসে ছিল। সে পেশাব করতে শুরু করছে দেখে আমরা উঠে তাঁর দিকে গেলাম। তখন রাসুল ﷺ বললেন, “তোমরা আমার সন্তানকে ছেড়ে দাও। পেশাব করা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে তোমরা ভয় দেখিও না।” এরপর পেশাবের ওপর তিনি পানি ছিটিয়ে দিলেন।^{৩৭৫}

এ হাদিসগুলোতে আমরা স্পষ্টভাবে দেখেছি, নাতিদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর আদর-স্নেহ, ভালোবাসা ও উত্তম তত্ত্বাবধানের অনুপম কিছু চিত্র।

নাতিদের জন্য দোয়া করতেন

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, ‘অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে রাসুলুল্লাহ ﷺ হাসান-হুসাইনের জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলতেন :

أَعِذُّكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَآمَةٍ

“আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাতে অসিলায় আমি তোমাদের দুজনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রতিটি শয়তান, ক্ষতিকর প্রাণী ও কুদৃষ্টি নিক্ষেপকারী প্রতিটি চোখ থেকে।” রাসুল ﷺ আরও বলতেন :
“ইবরাহিম ؑ এভাবেই ইসহাক ও ইসমাইল ؑ-এর জন্য আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতেন।”^{৩৭৬}

৩৭৪. সুনানু আবি দাউদ : ৩৭৬, সুনানুন নাসায়ি : ৩০৪, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৫২৬। হাদিসের মান : সহিহ।

৩৭৫. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৫৮০। হাদিসের মান : সহিহ।

৩৭৬. সহিহুল বুখারি : ৩৩৭১, সুনানুত তিরমিজি : ২০৬০। শব্দউৎস : সুনানুত তিরমিজি।

কারও মতে ‘আল্লাহর কালিমাত’ মানে কুরআনুল কারিম। আবার কারও মতে আল্লাহর নাম ও গুণসমূহ।

‘পরিপূর্ণ’ বলার কারণ হলো, আল্লাহর কালামে কোনো অপূর্ণতা বা ত্রুটি নেই, যেমনটি মানুষের কালামে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, রাসুল ﷺ আল্লাহর কালামকে পরিপূর্ণ শব্দ দিয়ে বিশেষায়িত করেছেন, কারণ এ কালামের মাধ্যমে যে আল্লাহর আশ্রয় চায়, সে উপকৃত হয়। এর অসিলায় আল্লাহর আশ্রয় চাইলে আল্লাহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন এবং তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

প্রতিটি শয়তান থেকে আশ্রয় চাই—এখানে জিন ও ইনসান প্রতিটি শয়তান অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসে ব্যবহৃত (هَامَّةٌ) শব্দের অর্থ ক্ষতিকর প্রাণী। (هَامَّةٌ) ওই সব বিষধর প্রাণীকে বলা হয়, যেগুলো প্রাণঘাতী। আর যেসব বিষধর প্রাণী প্রাণঘাতী নয়, সেগুলোকে আরবিতে (السامة) বলে। যেমন : বিছু ও ভিমরুল।

কুদৃষ্টি নিক্ষেপকারী প্রতিটি চোখ—অর্থাৎ অনিষ্ট সাধন করে এমন প্রতিটি কুদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ।^{৩৭৭}

খাত্তাবি ﷺ বলেন, ‘এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসিক বিকৃতি ও বৈকল্য মানুষকে বিপদে ও অসুখে ফেলে যে কষ্ট দেয়, তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছি।’^{৩৭৮}

রাসুল ﷺ তাঁর নাতিদের দোয়া শেখাতেন

হাসান ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়েছিলেন, সেগুলো আমি বিতরে পড়তাম। বাক্যগুলো হচ্ছে :

৩৭৭. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৬/১৮৪।

৩৭৮. ফাতহুল বারি : ৬/৪১০।

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

“হে আল্লাহ যাদের আপনি হিদায়াত দিয়েছেন, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। যাদের প্রতি আপনি উদারতা দেখিয়েছেন, আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আপনি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের মতো আমাকেও আপনার অভিভাবকত্বে গ্রহণ করে নিন। আমাকে দানকৃত প্রতিটি বস্তুর মাঝে বরকত দিন। আপনার নির্ধারিত অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ, আপনিই নির্দেশ দিতে পারেন, আপনার ওপর কারও নির্দেশ চলে না। আপনি যাকে বন্ধু ভাবেন, সে কখনো অপমানিত হয় না। আপনি কল্যাণময়, আপনার মর্যাদা সুউচ্চ।”^{৩৭৯}

নাতিদের মসজিদে নিয়ে আসতেন

আবু বাকরাহ রাঃ বলেন, ‘একবার রাসুল সঃ-কে আমি মিম্বারের ওপর উপবিষ্ট দেখতে পাই। পাশে হাসান বিন আলি। সে একবার মানুষের দিকে তাকায় আরেকবার রাসুল সঃ-এর দিকে তাকায়। রাসুল সঃ তখন বলছিলেন, “আমার এ নাতি একজন মহান নেতা। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করবেন।”^{৩৮০}

বুরাইদা বিন হুসাইব রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন হাসান ও হুসাইনকে দেখা গেল তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। গায়ে তাদের লাল জামা। হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার উপক্রম করছে, আবার সোজা হয়ে পা ফেলছে। রাসুল সঃ মিম্বার থেকে নেমে এসে তাদের কোলে নিয়ে মিম্বারে উঠে গেলেন। এবং বললেন, “আল্লাহ সত্যি বলেছেন : **إِنَّمَا - أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ** - তোমাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাদের

৩৭৯. সুনানুত তিরমিজি : ৪৬৪। হাদিসের মান : সহিহ।

৩৮০. সহিহুল বুখারি : ২৭১৪।

জন্য পরীক্ষার বস্তু।” (সুরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : ১৫) আমি এ দুজনকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলাম না।” এতটুকু বলার পর রাসুল ﷺ খুতবায় ফিরে গেলেন আবার।^{৩৮১}

‘হোঁচট খাওয়ার উপক্রম করছে অর্থাৎ শিশুসুলভ দুর্বলতার কারণে কচি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার এদিকে ঝুঁকে যাচ্ছে তো আবার ওদিকে টলে পড়তে চাইছে। তাই রাসুল ﷺ তাদের দুজনকে কোলে তুলে নিলেন। আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-কে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন এ পৃথিবীতে। এ ঘটনায় আমরা তারই একখণ্ড চিত্র দেখতে পাই।’^{৩৮২}

ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আর আল্লাহর বাণী : **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ** : **فِتْنَةٌ** এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, সম্পদ ও সন্তান মানুষের মন আচ্ছন্ন করে রাখে, ফলে মানুষ আল্লাহর ইবাদতে অগ্রগামী হতে পারে না। হাদিসের মাঝে আমরা দেখেছি রাসুল ﷺ খুতবা দেওয়া বন্ধ করে নেমে এসেছেন তাঁর দুই নাতির জন্য। সন্তানের প্রতি হৃদয়ে লালিত ভালোবাসাই তাঁকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে। সন্তানের কারণে আসা ফিতনা বা পরীক্ষা কয়েক স্তরের হয়। হাদিসে বর্ণিত এ পরীক্ষার স্তরটি ছিল নিম্ন একটি স্তর। কখনো কখনো কারও কারও ক্ষেত্রে ভয়াবহ স্তরে এসে দাঁড়ায়। তাই সাবধান থাকতে হবে সম্পদ ও সন্তানের ফিতনার ব্যাপারে।’^{৩৮৩}

নামাজের সময় তাদের কাউকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন

আবু কাতাদা আনসারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমি দেখলাম, রাসুল ﷺ মানুষদের সাথে নিয়ে নামাজে ইমামতি করছেন। আবুল আস ও রাসুল-কন্যা জাইনাবের মেয়ে, রাসুলের নাতনি উমামা তখন রাসুলের কাঁধে। রাসুল ﷺ যখন রুকুতে যেতেন, তাকে নামিয়ে রাখতেন। আবার যখন সিজদায় যেতেন, তাকে উঠিয়ে নিতেন।’^{৩৮৪}

৩৮১. সুনানু আবি দাউদ : ১১০৯, সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৭৪, সুনানুন নাসায়ি : ১৪১৩, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৬০০। হাদিসের মান : সহিহ।

৩৮২. হাশিয়াতুস সিনদি আলা সুনানিন নাসায়ি : ৩/১০৮।

৩৮৩. ফাতহুল বারি : ১১/২৫৪। ঈষৎ পরিমার্জিত।

৩৮৪. সহিহুল বুখারি : ৫১৬, সহিহ মুসলিম : ৫৪৩। শব্দউৎস : সহিহ মুসলিম।

নামাজের মাঝে নাতিদের শিশুসুলভ আচরণ সহ্য করতেন

শাদাদ রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ একদিন মাগরিব বা ইশার সময় মসজিদে এলেন হাসান বা হুসাইনকে কোলে করে। তারপর উভয়কে একপাশে রেখে তাকবির বলে নামাজ শুরু করলেন। একসময় সিজদায় গেলেন। কিন্তু আর উঠছিলেন না তিনি। সিজদা দীর্ঘ হতে দেখে আমি সিজদা থেকে মাথা তুললাম।^{৩৮৫} দেখলাম, রাসুল সঃ-এর পিঠে বসে আছে শিশু নাতি। অবস্থা দেখে আমি আবার সিজদায় চলে গেলাম।

নামাজ শেষে মানুষজন বলল, “আল্লাহ রাসুল, আপনি নামাজে অনেক দীর্ঘ সিজদা করেছেন! আমরা ভেবেছিলাম, আপনার কোনো সমস্যা হয়েছিল^{৩৮৬} কিংবা আপনার ওপর ওহি নাজিল হচ্ছিল।”

রাসুল সঃ জবাব দিলেন, “এমন কিছুই হয়নি। বরং আমার সন্তানটি পিঠে চড়ে বসে।^{৩৮৭} তাই আমি দ্রুত উঠতে চাইনি। চাইছিলাম, সে তার খেলা শেষ করুক এরপর সিজদা থেকে উঠি।”^{৩৮৮}

শিশুদের দুষ্টমিতে বিরক্ত হতেন না

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ‘একবার আমরা রাসুল সঃ-এর পেছনে ইশার নামাজ পড়ছিলাম। তিনি যখন সিজদায় যেতেন, হাসান-হুসাইন সাথে সাথে লাফ দিয়ে তাঁর পিঠে চড়ে বসত। তিনি যখন সিজদা থেকে মাথা তুলতেন, তখন তাঁর পিঠ থেকে আস্তে করে তাদের নামিয়ে রাখতেন। এভাবে রাসুল সঃ সিজদায় গেলে, তারা আবারও তাঁর পিঠে চড়ে বসত, আর তিনি তাদের নামিয়ে রাখতেন। নামাজ শেষে তিনি তাদেরকে উরুর ওপর বসিয়ে নিলেন। তখন আমি এগিয়ে এসে বললাম, “আল্লাহর রাসুল, আমি কি তাদের ঘরে

৩৮৫. যদি কোনো মুসল্লি আশঙ্কা করে যে ইমামের কিছু হয়েছে, তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সিজদা থেকে মাথা তোলা জায়েজ আছে। আর নামাজও শুদ্ধ হবে তার। তেমনিভাবে ইমাম তাকবির দিয়েছে ধারণা করে যদি কেউ মাথা তুলে দেখে, আসলে ইমাম এখনও সিজদায় আছে, তাকবির দেয়নি—এ মাথা তোলার কারণেও নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। তার নামাজও শুদ্ধ হবে।

৩৮৬. মৃত্যু বা অসুস্থতা।

৩৮৭. পিঠে চড়ে বাহনে চড়ার খেলাটি খেলছিল।

৩৮৮. সুনানুন নাসায়ি : ১১৪১। হাদিসের মান : সহিহ।

দিয়ে আসব?” সে সময় আকাশে বিদ্যুৎ চমকের শব্দ শোনা গেল। রাসূল ﷺ তখন বললেন, “তোমরা মায়ের কাছে যাও।” তারা মায়ের কাছে পৌঁছার আগ পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকের আলো থেমে ছিল।”^{৩৮৯}

আবু বাকরা ؓ বলেন, ‘একদিন রাসূল ﷺ নামাজ পড়ছিলেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন হাসান তাঁর পিঠে-কাঁধে উঠে পড়তেন। তখন রাসূল ﷺ ধীরে ধীরে সিজদা থেকে উঠতেন, যাতে হাসান পড়ে না যায়। একাধিকবার এমনটা করলেন তিনি।

নামাজ শেষে লোকেরা রাসূল ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন, “আল্লাহর রাসূল, আমরা দেখলাম আপনি হাসানকে নিয়ে এমন কিছু করলেন, যা এর আগে কখনো করেননি।”

রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, “হাসান দুনিয়ায় আমার সুগন্ধময় ফুল। আমার এ সন্তান একজন নেতা। আশা করি, আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুসলিমদের দুটি দলের মধ্যকার বিভেদ মিটিয়ে দেবেন।”^{৩৯০}

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, শিশুদের মসজিদে আনা জায়িজ।^{৩৯১}

নাতি-নাতনিদের সাথে তাঁর আচরণের ভিত্তি ছিল দয়া ও স্নেহ। ছোট শিশুর প্রয়োজন ভালোবাসা, স্নেহ, আদর ও মায়ার। শিশুর এ প্রয়োজন পূরণ করবে তার পিতামাতা। খাবার ও পানি যেমন প্রয়োজনীয় তাদের জন্য, তেমনই আদর-স্নেহ-ভালোবাসাও অপরিহার্য। আদর ও ভালোবাসায় ঘেরা একটি পরিবেশ দরকার শিশুর স্থির ও সরল ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য।

নাতিদের অনেক ভালোবাসতেন

আবু হুরাইরা ؓ বলেন, ‘একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দিনের বেলা বের হলাম। তিনি আমার সাথে কথা বললেন না। আমিও তাঁর কাছে কিছু

৩৮৯. মুসনাদু আহমাদ : ১০২৮১। হাদিসের মান : সহিহ।

৩৯০. মুসনাদু আহমাদ : ১৯৯৯৪। হাদিসের মান : সহিহ।

৩৯১. শিশুদের মসজিদে না আনার নিষেধাজ্ঞায় “তোমরা শিশু ও পাগলদের মসজিদ থেকে দূরে রাখো” বর্ণিত হাদিসটি জইফ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৭৫০। হাদিসের সনদের রাবি ওয়াসিলা বিন আসকা জইফ। দেখুন, জইফুল জামি’ : ২৬৩৬।

জানতে চাইনি। এভাবে আমরা পৌছালাম বনু কাইনুকার বাজারে। এরপর তিনি ফিরতি পথ ধরলেন। আমি এলাম তাঁর সাথে। ফাতিমার ঘরের সামনে এসে “ছোট ছেলেটি কোথায়? ছোট ছেলেটি কোথায়?” বলে তিনি হাসানকে ডাকছিলেন। আমরা ধারণা করছিলাম, হাসানের মা তাকে ধরে রেখেছে গোসল করে মালা পরিয়ে তারপর পাঠাবে বলে। কিন্তু একটু পরই হাসান দ্রুত গতিতে চলে এলেন। রাসুল ﷺ ও হাসান, দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন, “হে আল্লাহ, আমি একে ভালোবাসি। তাই আপনিও তাকে ভালোবাসুন। যে একে ভালোবাসবে, আপনি তাকেও ভালোবাসুন।”

আবু হুরাইরা র‍া বুলেন, ‘সেদিন আল্লাহর রাসুলের সে কথা বলার পর থেকে হাসানের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই আমার কাছে।’^{৩৯২}

ইমাম নববি র‍া বুলেন, ‘হাদিসের আলোকে শিশুদের আদর-স্নেহে সিক্ত করা, তাদের সোহাগ করে কথা বলা, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করাসহ এমন অন্যান্য আচরণ মুসতাহাব। হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, ছেলে শিশুদেরও মালা ইত্যাদি পরানো জায়েজ। শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা মুসতাহাব। বিশেষ করে তারা যখন মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের নিকট যাবে তখন।’^{৩৯৩}

রাসুল ﷺ-এর দুই নাতি হাসান-হুসাইন ছিলেন তাঁর জন্য বিশেষ উপহার

ইবনে উমর র‍া বুলেন, ‘আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “হাসান ও হুসাইন দুনিয়াতে আমার সুগন্ধময় ফুল।”’^{৩৯৪}

‘অর্থাৎ আল্লাহ তাদের দান করেছেন রাসুল ﷺ-কে। উপহার দিয়েছেন তাঁকে। মানুষ ফুল দেখলে যেমন চুমু খায়, ফুলকে আদর করে, তেমনই হাসান-হুসাইনও যেন ফুলের মতো—যাদের আদর করে চুমু খেতেন রাসুল ﷺ।’^{৩৯৫}

৩৯২. সহিহুল বুখারি : ৫৮৮৪, সহিহ মুসলিম : ২৪২১।

৩৯৩. ইমাম নববি র‍া কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৫/১৯৩। ঈষৎ পরিমার্জিত।

৩৯৪. সহিহুল বুখারি : ৩৭৫৩, সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৭০। শব্দউৎস : সুনানুত তিরমিজি।

৩৯৫. ফাতহুল বারি : ১০/৪২৭।

রাসুল ﷺ তাঁর নাতিদের বুকে জড়িয়ে চুমু খেতেন

আবু হুরাইরা র‍া বুলেন, ‘রাসুল ﷺ হাসান বিন আলিকে চুমু খেলেন। তখন পাশে বসা আকরা বিন হাবিস বলল, “আমার দশজন সন্তান। কখনো আমি তাদের কাউকে চুমু দিইনি।”

রাসুল ﷺ আকরার দিকে তাকিয়ে বললেন, “যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।”^{৩৯৬}

হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার র‍া বুলেন, ‘আকরা র‍া-এর প্রতি বলা রাসুল ﷺ-এর কথার মধ্যে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শিশুদের চুমু খাওয়া স্নেহ, দয়া ও ভালোবাসার পরিচয়। অনুরূপভাবে শিশুদের বুকের সঙ্গে লাগানো, তাদের ঘ্রাণ নেওয়া ইত্যাদিও স্নেহের নিদর্শন।’^{৩৯৭}

নাতিদের কাঁধে চড়াতেন

আবু হুরাইরা র‍া বুলেন, ‘একবার রাসুল ﷺ আমাদের সামনে এলেন। তখন তাঁর এক কাঁধে হাসান। অন্য কাঁধে হুসাইন। তিনি একবার হাসানকে চুমু দেন, তো আবার হুসাইনকে চুমু দেন। এভাবে তিনি আমাদের কাছে এসে পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, “আল্লাহর রাসুল, আপনি তাদের দুজনকে ভালোবাসেন।” রাসুল ﷺ বললেন, “যে এ দুজনকে ভালোবাসল, সে আমাকে ভালোবাসল। আর যে এ দুজনের প্রতি রাগান্বিত হলো, সে আমার প্রতি রাগান্বিত হলো।”^{৩৯৮}

রাসুল ﷺ-এর আদর্শ থেকে আমরা কত দূরে! আমাদের সমাজের চিত্রের সাথে রাসুল ﷺ-এর আদর্শকে মিলাতে গেলে আমাকে হতাশা ঘিরে ধরে। আজকাল সন্তানরা মা-বাবার আদর-স্নেহ পায় না বললেই চলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শিশু সন্তান থাকে বুয়ার কোলে। শিশুরা বেড়ে ওঠে আদর-যত্নহীন। তাদের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না। এমনকি তাদের কথা বলার ভাষা

৩৯৬. সহিহুল বুখারি : ৫৯৯৭, সহিহ মুসলিম : ২৩১৮।

৩৯৭. ফাতহুল বারি : ১০/৪৩০।

৩৯৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৪৩, মুসনাদু আহমাদ : ৯৩৮১। হাদিসের মান : সহিহ।

পর্যন্ত বিশুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও পরিপুষ্ট হয় না। কারণ বুয়াদের কাছে থেকে এরা অশুদ্ধ ভাষায় আয়ত্ত করে।

নাতির মুখ থেকে লালার ঝরলে অস্বস্তি বোধ করতেন না

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ‘আমি দেখলাম, নবিজি সঃ হুসাইনকে কাঁধে বহন করে আছেন। ওদিকে হাসানের মুখের লালার ঝরছে তাঁর গায়ে।’^{৩৯৯}

নাতি হাসান রাঃ-এর ঠোঁটে চুমু খেতেন

মুআবিয়া রাঃ বলেন, ‘আমি দেখলাম, রাসুল সঃ হাসানের জিহ্বা বা ঠোঁটে চুমু দিচ্ছেন। আর সে জিহ্বা বা ঠোঁট কখনো আজাব প্রাপ্ত হবে না, যেটাতে রাসুল সঃ চুমু খেয়েছেন।’^{৪০০}

নাতিদের নিয়ে বাহনে চড়তেন

আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ সফর থেকে ফিরে এলে পরিবারের শিশুদের মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানানো হতো। একবার তিনি সফর থেকে ফিরলে আমাকে এগিয়ে দেওয়া হলো স্বাগত জানানোর জন্য। তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসিয়ে নিলেন বাহনে। এরপর ফাতিমার কোনো এক ছেলে আসলে তাকে পেছনে বসিয়ে নিলেন।’^{৪০১}

ইয়াস রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, তার পিতা সালামাহ রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ-এর সাদা খচ্চরটির ওপর রাসুল সঃ নিজে এবং তাঁর দুই নাতি হাসান-হুসাইন বসা ছিলেন। আমি খচ্চরকে টেনে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন হাসান-হুসাইনের একজন তাঁর সামনে আরেকজন তাঁর পেছনে বসা ছিল।’^{৪০২}

৩৯৯. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৬৮৫। হাদিসের মান : সহিহ।

৪০০. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৪০৬। হাদিসের মান : সহিহ।

৪০১. সহিহ মুসলিম : ২৪২৮।

৪০২. সহিহ মুসলিম : ২৪২৩।

শিশুদের সাথে হাসাহাসি ও খেলাধুলা করতেন

সাইদ বিন আবু রশিদ বর্ণনা করেন, ইয়ালা বিন মুররা رضي الله عنه তাকে বলেন, ‘একবার তারা নবিজি عليه السلام-এর সাথে খাওয়ার দাওয়াতে বের হলেন। তখন হুসাইন সরু গলির মধ্যে খেলছিলেন।

রাসুল ﷺ তার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালেন। কিন্তু হুসাইন এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছিল। রাসুল ﷺ তাকে হাসাতে হাসাতে ধরে ফেললেন। তার চোয়ালের নিচে এক হাত রেখে, আরেক হাত তার মাথার পেছনে রেখে তাকে চুমু খেলেন। বললেন, “হুসাইন আমার থেকে। আমি হুসাইনের থেকে। যে হুসাইনকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন একাই একটি জাতি।”^{৪০৩}

“হুসাইন আমার থেকে। আমি হুসাইনের থেকে।”—অর্থাৎ আমাদের এমন গাঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান যে, আমাদের একজন অন্যজনের অংশ বললে অত্যাুক্তি হবে না।

“হুসাইন একাই একটি জাতি।”—অর্থাৎ কল্যাণজনক দল। যারা কল্যাণের কাজ করবে। রাসুল ﷺ-এর এ কথাটি ইঙ্গিত করে যে, হুসাইনের মাধ্যমে একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠবে। তার সন্তানসন্ততি অনেক হবে। তার বংশধর অনেক হওয়ার সাথে সাথে দীর্ঘস্থায়ী হবে তার বংশধারা। আর বাস্তবেই এমনটি হয়েছে।^{৪০৪}

তাদের জন্য রহমতের দোয়া করতেন

উসামা বিন জাইদ رضي الله عنه বলেন, ‘রাসুল ﷺ আমাকে উঠিয়ে তাঁর এক উরুর ওপর বসাতেন। অপর উরুতে বসাতেন হাসানকে। এরপর উভয়কে জড়িয়ে ধরে দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ, আপনি এ দুজনের ওপর রহম করুন, কারণ আমি এ দুজনকে ভালোবাসি।”^{৪০৫}

৪০৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৪৪। সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকারে এসেছে—সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৭৫। হাদিসের মান : সহিহ।

৪০৪. তুহফাতুল আহওয়াজি : ১০/১৭৮।

৪০৫. সহিহুল বুখারি : ৬০০৩।

উপহারের একটি অংশ নাতিরাও পেত

উপহার মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে। বিশেষ করে শিশুদের মনকে আনন্দে বিহ্বল করে তোলে। রাসুল ﷺ-এর কাছে উপহার এলে তিনি উপহারের একটা অংশ নাতিদের দিয়ে দিতেন।

আয়িশা রা. ব বলেন, ‘নাজ্জাশির কাছ থেকে রাসুল ﷺ-এর জন্য কিছু অলংকার উপহার আসলো। অলংকারের মধ্যে একটি সোনার আংটি ছিল। আংটিতে একটি হাবশি পাথর বসানো। রাসুল ﷺ অন্যদিকে ফিরে কাঠি বা তাঁর আঙুল দিয়ে আংটিটি তুলে ধরলেন। এরপর আবুল আস ও জাইনাবের ঘরের রাসুলের নাতনি উমামাকে ডাক দিয়ে বললেন, “প্রিয় কন্যা, এটি পরো।”^{৪০৬}

ছোটবেলা থেকেই নাতিদের হারাম বর্জনের শিক্ষা দিতেন

আবু হুরাইরা রা. ব বলেন, ‘হাসান বিন আলি সাদাকার খেজুর হতে একটি খেজুর তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন। সাথে সাথে নবিজি ﷺ “কাখ, কাখ” বলে উঠলেন যেন হাসান খেজুরটা ফেলে দেয় মুখ থেকে।

এরপর বললেন, “তুমি কি জানো না যে, আমরা সাদাকা খাই না?”^{৪০৭}

‘এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়,

- বড়রা যে জিনিস থেকে বেঁচে থাকে, ছোটদেরও সে জিনিস পরিহার করতে হবে। আর এ বুঝটা ছোটদের প্রদান করা বড়দের ওপর ওয়াজিব দায়িত্ব।
- শিশুদের উপকারী কথা ও কাজ শেখাতে হবে। যদিও তারা শরিয়তের বিধান মানার বাধ্যবাধকতার বয়সের নয়, তবুও হারামের মতো ক্ষতিকর কথা ও কাজ করতে নিষেধ করতে হবে তাদের।^{৪০৮}

৪০৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪২৩৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৬৪৪। হাদিসের মান : হাসান।

৪০৭. সহিহুল বুখারি : ১৪১৯, সহিহ মুসলিম : ১০৬৯।

৪০৮. ইমাম নববি রা. কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৭/১৭৫, ফাতহুল বারি : ৩/৩৫৫।

সন্তান কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ

ইয়ালা আমিরি ﷺ বলেন, ‘হাসান ও হুসাইন দৌড়ে রাসুল ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এল। রাসুল ﷺ দুজনকেই জড়িয়ে নিলেন বুকের মাঝে। এরপর বললেন, “সন্তান কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ।””^{৪০৯}

‘অর্থাৎ শিশু সন্তানের কারণে মানুষ কৃপণতা করে। সন্তানের ভালোবাসাই বাবাকে কৃপণতার দিকে ঠেলে দেয়। সন্তানের প্রতি মায়ার কারণেই মানুষ কাপুরুষ হয়ে যায়, ভীৰু হয়ে পড়ে।’^{৪১০}

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাসুল ﷺ হাসান-হুসাইনকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। রাসুল ﷺ প্রথমে তাদের দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর যা বলার বললেন।

এই ছিল নাতিদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর আচরণের কিছু আলোচনা। নাতিদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্নেহ ও ভালোবাসার সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র উঠে এসেছে এখানে।



৪০৯. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৬৫৬। হাদিসের মান : সহিহ।

৪১০. হাশিয়াতুস সিনদি : ৭/৭২।



❦ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ❦

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

আত্মীয়দের প্রতি রাসুল ﷺ ছিলেন পৃথিবীর সর্বোত্তম সদাচরণকারী। আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ প্রতিটি মানুষের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল ভালোবাসাপূর্ণ। রাসুল ﷺ-এর সাহাবিদের ভাষায়, ‘তিনি মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ অনুগ্রহকারী ও সর্বোত্তম আত্মীয়তা রক্ষাকারী।’^{৪১১}

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা

‘রাসুল ﷺ-এর চাচাগণ হলেন— ১. আল্লাহর সিংহ ও আল্লাহর রাসুলের সিংহ, শহিদদের সর্দার হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব। ২. আব্বাস। ৩. আবু তালিব (নাম : আদে মানাফ)। ৪. আবু লাহাব (আব্দুল উজ্জা)। ৫. জুবাইর। ৬. আব্দুল কাবা। ৭. মুকাওয়িম। ৮. জিরার। ৯. কুসাম। ১০. মুগিরা (উপাধি : হাজল)। ১১. গাইদাক (মুসআব)। কেউ কেউ বলেন, নাওফাল ও হারিসও রাসুল ﷺ-এর চাচা ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, হারিস আর মুকাওয়িম একজনই।’^{৪১২}

রাসুল ﷺ-এর চাচাদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন হারিস। আর সর্বকনিষ্ঠ চাচা ছিলেন আব্বাস ﷺ।

চাচাদের ইসলাম গ্রহণ

রাসুল ﷺ-এর চাচাদের মধ্যে ইসলামের যুগ পেয়েছেন চারজন। আবু তালিব, আবু লাহাব, হামজা ও আব্বাস। তন্মধ্যে কেবল হামজা ও আব্বাস ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেন।^{৪১৩}

৪১১. সহিহ মুসলিম : ১০৭২।

৪১২. জাদুল মাআদ : ১/১০৪।

৪১৩. হাফিজ ইবনে হাজার ﷺ বলেন, ‘রাসুলের চার চাচা ইসলামের যুগ পেয়েছেন। দুজন ইসলাম

রাসুল ﷺ-এর ফুফু

রাসুল ﷺ-এর ফুফু ছিলেন ছয়জন। তারা হলেন, জুবাইর বিন আওয়ামের মা সাফিয়্যা, আতিকা, বাররা, আরওয়া, উমাইমা, উম্মে হাকিম বাইজা। ফুফুদের মধ্যে সাফিয়্যা ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি নিশ্চিত। তবে আতিকা ও আরওয়ার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।^{৪১৪}

রাসুল ﷺ-এর চাচাতো ভাই

রাসুল ﷺ-এর চাচাতো ভাইদের সংখ্যা পঁচিশ। তাদের মধ্যে কেবল দুজন ইসলাম গ্রহণ করেননি। তারা হলেন আবু তালিবের পুত্র তালিব ও আবু লাহাবের পুত্র উতাইবা। রাসুল ﷺ-এর চাচাতো ভাইদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন—আলি বিন আবু তালিব, জাফর বিন আবু তালিব, আকিল বিন আবু তালিব, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ফজল বিন আব্বাস, উবাইদুল্লাহ বিন আব্বাস, কুসাম বিন আব্বাস, আবু সুফইয়ান বিন হারিস ও রাবিআ বিন হারিস।

চাচাতো বোন

উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব, জুবাআহ বিনতে জুবাইর, দুররাহ বিনতে আবু লাহাব ও উমামাহ বিনতে হামজা।

ফুফুদের সন্তান

রাসুল ﷺ-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন ১১ জন। ফুফাতো বোন ছিলেন ৩ জন। তাদের মধ্যে কয়েকজন জন হলেন : আমির বিন বাইজা, আতিকার দুই পুত্র আব্দুল্লাহ ও জুহাইর, আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ, উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ, জুবাইর

গ্রহণ করেননি। আর দুজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আশ্চর্য এক ঘটনাচক্র দেখুন, রাসুলের যে দুজন চাচার নাম মুসলিমদের নামের সাথে সাদৃশ্য রাখে না, তারা ইসলাম গ্রহণ করেননি। তারা হলেন, আবু তালিব ও আবু লাহাব। আবু তালিবের মূল নাম, আব্দু মানাফ (মানাফের দাস)। আর আবু লাহাবের মূল নাম ছিল, আব্দুল উজ্জা (উজ্জা মূর্তির দাস)। অন্যদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন, হামজা ও আব্বাস ﷺ।—ফাতহুল বারি : ৭/১৯৬।

৪১৪. জাদুল মাআদ : ১/১০৫।

বিন আওয়াম, জাইনাব বিনতে জাহাশ, হামনাহ বিনতে জাহাশ। এদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ ছাড়া সবাই ইসলামের ওপর অটল থেকে সৌভাগ্যময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

রাসুল ﷺ-এর দুধ ভাই-বোন

‘রাসুল ﷺ-এর দুধ ভাই-বোনের মধ্যে অন্যতম হলেন—হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব, আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ, রাসুল ﷺ-এর চাচাতো ভাই আবু সুফইয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আব্দুল্লাহ বিন হারিস, শাইমা বিনতে হারিস, উনাইসা বিনতে হারিস। ইবনে হাজার رحمته উনাইসার নাম উল্লেখ করেছেন আসিয়া। তবে উনাইসা নামটিই অধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।’^{৪১৫}

আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিতেন

জাইদ বিন আরকাম رحمته বলেন, ‘রাসুল ﷺ একদিন এক জলাশয়ের পাশে খুতবা দেওয়ার জন্য আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। মক্কা ও মদিনার মম্বামাবি অবস্থিত এই জলাশয়টি খুম্ম নামে পরিচিত ছিল। তিনি হামদ পড়লেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন, ওয়াজ করলেন, নসিহত করলেন। এভাবে একসময় বললেন, “হে লোকসকল, আমি একজন মানুষ। অচিরেই আমার কাছে প্রভুর ফেরেশতা আসবে। আর আমিও তাঁর ডাকে সাড়া দেবো। আমি তোমাদের নিকট দুটি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। এতে রয়েছে হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা। যে ব্যক্তি এটিকে আঁকড়ে ধরবে, সে সঠিক পথের ওপর থাকবে। আর যে ব্যক্তি এ কিতাব ছেড়ে দেবে, সে পথভ্রষ্ট হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজন। আমি আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। আমি আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। আমি আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের।”

৪১৫. দেখুন, সিরাতু ইবনি ইসহাক : ৪৮, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৪০৮, সিয়রু আলামিন নুবালা : ১/১৬২, জাদুল মাআদ : ১/৮১, ইসাবাহ : ৮/৩।

বর্ণনাকারী হুসাইন বিন সাবরাহ   জাইদ বিন আরকামকে জিজ্ঞেস করলেন, “জাইদ, আহলে বাইত কারা? রাসুল  -এর স্ত্রীগণ কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন?” জাইদ   উত্তর দিলেন, “হাঁ, রাসুল  -এর স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আহলে বাইত দ্বারা তারা উদ্দেশ্য, রাসুল  -এর পর যাদের জন্য সাদাকা-জাকাত গ্রহণ করা জাযিজ নয়।” হুসাইন জিজ্ঞেস করলেন, “তারা কারা?” জাইদ   উত্তর দিলেন, “তারা হচ্ছে, আলি, আকিল, জাফর ও আব্বাসের পরিবার ও বংশধর।”^{৪১৬}

আবু বকর   বলতেন, ‘তোমরা মুহাম্মাদ  -এর পরিবার-পরিজনদের হিজাফত করো।’^{৪১৭} অর্থাৎ ‘তাদের অধিকার আদায় করো। তাদের কষ্ট দিয়ো না। তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার কোরো না।’^{৪১৮}

আয়িশা   বর্ণনা করেন, ‘আবু বকর   আলি  -কে বললেন, ‘সে সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণের চাইতে আল্লাহর রাসুলের আত্মীয়দের প্রতি সদাচরণ করাকে আমি অধিক পছন্দ করি।’^{৪১৯}

মায়ের কবর জিয়ারত করতে গিয়ে

আবু হুরাইরা   বলেন, ‘নবিজি   তাঁর মায়ের কবর দেখতে গেলেন। সেখানে নিজে কাঁদলেন। অন্যদেরও কাঁদালেন। বললেন, “আমি আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলাম আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার। কিন্তু আল্লাহ অনুমতি দেননি আমাকে। আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলাম আমার মায়ের কবর জিয়ারত করার। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তাই তোমরা কবর জিয়ারত করো। কারণ, কবরের জিয়ারত মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।”^{৪২০}

তাঁর মা ইসলামের দিনগুলো পেলেন না। ইসলামও গ্রহণ করতে পারলেন না। তাই মায়ের কবরের পাশে গিয়ে তিনি কেঁদেছিলেন।

৪১৬. সহিহ মুসলিম : ২৪০৮।

৪১৭. সহিহল বুখারি : ৩৭১৩।

৪১৮. ফাতহুল বারি : ৭/৭৯।

৪১৯. সহিহল বুখারি : ৩৭১২।

৪২০. সহিহ মুসলিম : ৯৭৬।

বুরাইদা ؓ বলেন, ‘রাসূল ﷺ এগিয়ে গিয়ে থামলেন চিহ্নিত একটি কবরের পাশে। বসলেন সেখানে। অন্যরাও বসে পড়ল তাঁর পাশে। রাসূল ﷺ মাথা দোলাতে লাগলেন, যেন কারও কথা শুনছেন। এরপর কেঁদে উঠলেন।

তখন উমর ؓ এগিয়ে গিয়ে বললেন, “আল্লাহর রাসূল, আপনি কাঁদছেন কেন?”

রাসূল ﷺ জবাব দিলেন, “এটি আমিনা বিনতে ওয়াহাবের কবর। আমি আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলাম আমার মায়ের কবর জিয়ারত করার। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলাম আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার। কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। তাই আমি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে কাঁদছি।” বুরাইদা ؓ বলেন, সেদিনের মতো একসঙ্গে এত বেশি সংখ্যক মানুষকে আমি কখনো কাঁদতে দেখিনি।”^{৪২১}

আত্মীয়দের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ছিলেন^{৪২২}

আবু হুরাইরা ؓ বলেন, ‘যখন আল্লাহ নাজিল করলেন : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ : الْأَقْرَبِينَ - আপনি নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করে দিন। (সূরা আশ-শুআরা, ২৬ : ২১৪)। তখন রাসূল ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। নিজ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশে বললেন, “কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদের আজাব থেকে রক্ষা করো। আমি আল্লাহর আজাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারব না। আদে মানাফের বংশধরেরা, আমি আল্লাহর আজাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারব না।

হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহর আজাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারব না। হে রাসূলের ফুফু সাফিয়্যা, আমি আল্লাহর আজাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা, তুমি আমার

৪২১. বাইহাকি ؓ কৃত দালায়িলুন নুবুওওয়াহ : ১/১৮৯। হাদিসের মান : সহিহ।

৪২২. একজন মানুষ পরকালের অনন্ত শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তাকে মুসলিম হতে হবে। তাই যেকোনো মুসলিম তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনের কেউ অমুসলিম থাকলে তাকে অবশ্যই ইসলামের দাওয়াত দেবে। যেন তার এ প্রিয় মানুষটিও জাহান্নামের সে অনন্ত অগ্নি থেকে বাঁচতে পারে। (অনুবাদক)

সম্পদ থেকে যা দরকার চেয়ে নাও; কিন্তু আমি আল্লাহর আজাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারব না।”^{৪২৩}

মুসলিমের এক রিওয়াযাতে (হাদিস : ২০৪) এসেছে, এরপর রাসূল ﷺ বলেন, ‘তবে আমি তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করব।’

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, ‘প্রথমেই নিকটাত্মীয়দের দাওয়াত দেওয়ার আদেশের মর্ম হচ্ছে, যদি ইসলামের সত্যতা আত্মীয়দের ওপর প্রতিষ্ঠা পায়, তবে অন্যদের ওপরও এটি অনায়াসে কার্যকর হবে।’^{৪২৪}

আত্মীয়দের দাওয়াত প্রদান

রাসূল ﷺ তাঁর নিকটাত্মীয়দের অন্যতম আলি ﷺ-কে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলিম হয়ে গেলেন। আলি ﷺ ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম কিশোর।

তিরমিজি ﷺ বলেন, ‘কতক আলিম বলেন, পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আবু বকর ﷺ। আলি ﷺ আট বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। নারীদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন খাদিজা ﷺ।’^{৪২৫}

চাচা আবু তালিবের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন

সাইদ বিন মুসাইয়িব ﷺ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ‘যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, রাসূল ﷺ এলেন তার কাছে। এসে দেখলেন, আবু তালিবের পাশে আবু জাহেল ও আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া বিন মুগিরা বসা। রাসূল ﷺ তাঁর চাচার উদ্দেশে বললেন, “চাচা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ুন। এ বাক্যটি পড়ুন। আমি এর মাধ্যমে আল্লাহর সামনে প্রমাণ পেশ করব।” অন্য বর্ণনায় এসেছে, “এর মাধ্যমে আমি আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য পেশ করব।”

আবু জাহেল ও ইবনে আবু উমাইয়া আবু তালিবের উদ্দেশে বলতে লাগল, “তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে?”

৪২৩. সহিহুল বুখারি : ২৭৫৪, সহিহ মুসলিম : ২০৬।

৪২৪. ফাতহুল বারি : ৮/৫০৩।

৪২৫. সুনানুত তিরমিজি : ৫/৬৪২।

ওদিকে আবু তালিবের শেষ কথা বলা পর্যন্ত রাসূল ﷺ সে কথাটি বলতে থাকলেন তার সামনে। আবু তালিবের শেষ কথা ছিল, তিনি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর থাকবেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে তিনি অস্বীকার করলেন। তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন, “আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে নিষেধ না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যাব।”

এরপর আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ - “নবি ও মুমিনদের জন্য জায়িজ নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। (সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১১৩)” আল্লাহ তাআলা আবু তালিবের ব্যাপারে নাজিল করলেন : إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ - “আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। (সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ৫৬)”^{৪২৬}

ইমাম আহমাদের বর্ণনায় আছে, ‘আবু তালিব তার শেষ কথায় বলেছিলেন, “মৃত্যুর ভয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করছি” এ কথা বলে কুরাইশরা আমাকে লজ্জা দেওয়ার আশঙ্কা না থাকলে আমি এ কালিমা পাঠ করে তোমার অন্তর শীতল করতাম।”^{৪২৭}

যদিও রাসূল ﷺ-এর চাচা কাফির অবস্থায় মারা গেছেন, রাসূল ﷺ অনবরত তার জন্য শাফাআত করতে থাকার কারণে আল্লাহ তার আজাব কম করে দিয়েছেন।

আবু তালিব সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের আজাব পাবে। কারণ, রাসূল ﷺ তার জন্য সুপারিশ করেছেন। ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, ‘রাসূল ﷺ বলেছেন, “জাহান্নামের সর্বনিম্ন আজাব হবে আবু তালিবের। আগুনের দুটি জুতো পরিয়ে দেওয়া হবে তাকে। এতে তার মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে।”^{৪২৮}

৪২৬. সহিহুল বুখারি : ৩৮৮৮৪, সহিহ মুসলিম : ২৪।

৪২৭. মুসনাদু আহমাদ : ৯৩২৭।

৪২৮. সহিহ মুসলিম : ২১১।

‘রাসুল ﷺ-এর আরেক চাচা আব্বাস ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আবু তালিবের কোনো উপকার করতে পেরেছেন? সে তো আপনার হিফাজত করেছেন, আপনার হয়ে অন্যদের বিরোধিতা করেছেন।”

রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, তার পায়ের গোছা পর্যন্ত আগুনে রয়েছে। যদি আমি উপকারে না আসতাম, তবে জাহান্নামের নিম্নস্থলে জায়গা হতো তার।”^{৪২৯}

রাসুল ﷺ তাঁর আত্মীয়তার প্রশংসা ও মূল্যায়ন করতেন

মুত্তালিব বিন আবু বিদাআ ﷺ বলেন, ‘কারও মুখে কিছু একটা শুনে আব্বাস ﷺ এলেন রাসুল ﷺ-এর কাছে। রাসুল ﷺ মিম্বারে উঠে সবার উদ্দেশে বললেন, “আমি কে?” সবাই বলল, “আপনি আল্লাহর রাসুল, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।”

এরপর তিনি বললেন, “আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ তাআলা মাখলুককে সৃষ্টি করলেন। তাদের মধ্যকার উত্তম দলে আমাকে রাখলেন। এরপর এ দলকে তিনি দুটি ভাগে বিভক্ত করলেন। সবচেয়ে উত্তম দলে আমাকে রাখলেন। এরপর এ দলটিকে তিনি অনেকগুলো গোত্রে বিভক্ত করলেন। আমাকে রাখলেন সর্বোত্তম গোত্রে। এরপর সে গোত্রকে অনেকগুলো ঘরে বিভক্ত করলেন। আমাকে রাখলেন সবচেয়ে উত্তম ঘর ও সবচেয়ে উত্তম বংশে।”^{৪৩০}

“কারও মুখে কিছু একটা শুনে আব্বাস ﷺ এলেন রাসুল ﷺ-এর কাছে”— অর্থাৎ কোনো কাফিরের মুখে রাসুল ﷺ-এর নিন্দা শুনে তাঁর কাছে এলেন আব্বাস ﷺ। আর এ হাদিসে রাসুল ﷺ-এর আত্মীয়দের সর্বোচ্চ প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে।

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ আব্বাসের উদ্দেশে বললেন, “এ হচ্ছে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, কুরাইশদের মাঝে সবচেয়ে মহানুভব ও সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তা রক্ষাকারী।”^{৪৩১}

৪২৯. সহিহ মুসলিম : ২০৯।

৪৩০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৫৫। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৩১. মুসনাদু আহমাদ : ১৬১৩। হাদিসের মান : সহিহ।

চাচা আব্বাস ؓ-এর উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন

‘ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, “মক্কা-বিজয়ের দিন আব্বাস ؓ আবু সুফইয়ান বিন হারবকে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলেন। আবু সুফইয়ান মক্কার নিকবটতী জায়গা মাররুজ জাহরানে ইসলাম গ্রহণ করলেন।”

তখন আব্বাস ؓ বললেন, “আল্লাহর রাসুল, আবু সুফইয়ান গৌরব পছন্দ করে। আপনি যদি তাকে একটু গৌরবান্বিত করতেন!”

রাসুল ﷺ বললেন, “হাঁ, যে ব্যক্তি আবু সুফইয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি দরোজা বন্ধ করে ঘরে থাকবে, সে নিরাপদ।”^{৪৩২}

পরিবার-পরিজনদের ইবাদতের ভুল শুধরে দিতেন

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, ‘একদিন আমি (আমার খালা ও রাসুল ﷺ-এর স্ত্রী) মাইমুনার ঘরে ঘুমিয়েছিলাম। দেখলাম, নবিজি ﷺ ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে মুখ ও হাত ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর আবার তিনি ঘুম থেকে উঠে পানির মশকের কাছে এসে তার ঢাকনা খুললেন। তারপর মাঝারি রকমের অজু করলেন—অধিক পানি ব্যবহার করলেন না। অথচ পরিপূর্ণ অজুই সেরে ফেললেন। এরপর নামাজে দাঁড়ালেন।

এরপর আমিও জেগে উঠলাম। আড়মোড়া ভেঙে এমন ভান করলাম যেন তিনি বুঝতে না পারেন, আমি গুরু থেকেই তাঁকে লক্ষ্য করছি। আমি উঠে এসে অজু করে তাঁর বাঁ পাশে নামাজে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কান ধরে ঘুরিয়ে এনে আমাকে ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।...’^{৪৩৩}

আত্মীয়দের মন্দ কাজে বাধা দিতেন

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ বলেন, ‘একদিনের কথা। ফজল রাসুল ﷺ-এর সাথে একই বাহনের পেছনে বসা ছিল। তখন সেখানে খাসআম গোত্রের এক মহিলা আসলো। ফজল ও সে মহিলা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। নবিজি ﷺ ফজলের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

৪৩২. সুনানু আবু দাউদ : ৩০৩১। হাদিসের মান : হাসান।

৪৩৩. সহিহুল বুখারি : ৬৩১৬, সহিহ মুসলিম : ৭৬৪।

এরপর মহিলাটি বলল, “আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ বান্দাদের ওপর হজ ফরজ করেছেন। আমার বাবা একেবারেই বয়োবৃদ্ধ মানুষ। বাহনে চড়তে অক্ষম তিনি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করতে পারব?”

রাসুল ﷺ বললেন, “হাঁ।” আর ঘটনাটি বিদায় হজের সময়কার।^{৪৩৪}

বিশেষ মুহূর্তে আপন আত্মীয়দের সাহায্য চাইতেন

আকাবার ঘটনায় রাসুল ﷺ তাঁর চাচা আব্বাসকে নিয়ে এসেছিলেন। ঘটনাটি কাব বিন মালিক ؓ-এর মুখে শোনা যাক। তিনি বলেন, ‘আমরা হজে এলাম। রাসুল ﷺ আমাদের ওয়াদা দিলেন তাশরিকের দিনগুলোর মধ্যবর্তী এক দিনে আসবেন তিনি। আমরা সময়মতো সাক্ষাতের স্থানে এসে রাসুল ﷺ-এর অপেক্ষা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত রাসুল ﷺ উপস্থিত হলেন। সাথে ছিলেন তাঁর চাচা আব্বাস। তখনো তিনি মুসলমান হননি। তবে তিনি চাচ্ছিলেন যে, ভাতিজার বিষয়টিতে তিনি হাজির থাকেন এবং আলোচনাটি সুদৃঢ় করেন।

আমরা সবাই বসে পড়লাম। আব্বাস প্রথমে কথা আরম্ভ করেন। বলেন, “খাজরাজ গোত্র, তোমরা জানো মুহাম্মাদকে আমরা আমাদের গোত্রের ভেতরের শত্রুদের থেকে নিরাপদে রেখেছি। তিনি আপন গোত্রের মাঝে সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে আছেন। কিন্তু তোমাদের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি সংকল্পবদ্ধ। তোমরা যদি তোমাদের ওয়াদামাফিক তাঁকে সাহায্য করো এবং তাঁর শত্রুদের অনিষ্ট থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকো, তবে ঠিক আছে। তোমরা যে জিম্মাদারি গ্রহণ করতে যাচ্ছ, আশা করি তার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমাদের জানা আছে।

কিন্তু যদি বিষয়টি এমন হয় যে, তোমাদের কাছে যাওয়ার পর তোমরা তাঁকে শত্রুদের হাতে সোপর্দ করবে, বিপদে তাঁর সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে, তবে এখনি তাঁকে পরিত্যাগ করো। কেননা, তিনি আপন গোত্রে সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তার সাথে আছেন।

কাব ﷺ বললেন, “আমরা আপনার কথা মেনে নিয়েছি।” তারপর রাসুল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কথাবার্তা বলুন। আপনি নিজের জন্য এবং আপনার রবের জন্য যা শর্ত নির্ধারণ করতে চান করুন। এরপর রাসুল ﷺ কথা বললেন। কুরআন তিলাওয়াত করলেন; আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবং সমবেত লোকদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করলেন....”^{৪৩৫}

আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করতেন

রাসুল ﷺ অনেকভাবে আত্মীয়দের প্রতি দয়া করতেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, অবিবাহিত আত্মীয়দের বিয়ের ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, আব্দুল মুত্তালিব বিন রাবিআ বিন হারিস বলেন, ‘রাবিআ বিন হারিস (রাসুল ﷺ-এর চাচাতো ভাই) ও আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব পরস্পর বলছিলেন, “আল্লাহর শপথ, যদি আমরা এ দুজনকে (আব্দুল মুত্তালিব বিন রাবিআ ও ফজল বিন আব্বাস) রাসুল ﷺ-এর কাছে পাঠাই। তারা দুজন রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলবে। রাসুল ﷺ তাদের দুজনকে সাদাকা আদায়ের কাজে লাগিয়ে দেবেন। তারা অন্যদের মতো সাদাকা উত্তোলন করে দেবে। ফলে রাসুল ﷺ তাদেরও তা-ই দেবেন, যা অন্য সাদাকা উত্তোলনকারীদের দিয়ে থাকেন।

তাদের কথা বলার সময় আলি ﷺ এসে উপস্থিত হলেন। তারা দুজন আলিকে বললেন ব্যাপারটা। আলি ﷺ বললেন, “এমনটা করবে না। আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ কখনো এমনটা করবেন না। (তথা সাদাকা উত্তোলনের পারিশ্রমিক দেবেন না।)”

আলির কথায় রাবিআ বিন হারিস রাগান্বিত হয়ে বললেন, “আল্লাহর শপথ, তুমি আমাদের প্রতি হিংসাবশতই এমন বলছ। আল্লাহর কসম, তুমি তো রাসুল ﷺ-এর জামাই হয়েছে, আমরা তো তোমার প্রতি হিংসা পোষণ করি না।”

এরপর আলি ﷺ “ঠিক আছে। তাদের পাঠিয়ে দাও।” বলে নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে সেখানে শুয়ে পড়লেন। বললেন, “আমি সাইয়িদ হাসানের

পিতা। আল্লাহর কসম, তোমরা যে উদ্দেশ্যে তোমাদের ছেলেদের পাঠালে তার (বিফলতার) জবাব না আসা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।”

আব্দুল মুত্তালিব বলেন, “রাসুল ﷺ জোহর পড়ে আসার আগেই আমরা তাঁর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি এসে আমাদের দুজনের কান ধরে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, “কী উদ্দেশ্যে এসেছ, না লুকিয়ে বলে ফেলো।”

এরপর রাসুল ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে এলাম ঘরের ভেতর। সেদিন তিনি জাইনাব বিনতে জাহাশের ঘরে ছিলেন। কথা বলার জন্য আমরা একে অন্যকে বলছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের একজন কথাটা তুলল। বলল, “আল্লাহর রাসুল, আপনি মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ অনুগ্রহকারী। সর্বোত্তম আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আমরা বিয়ের উপযুক্ত হয়েছি। তাই আপনার কাছে এসেছি, যদি আপনি আমাদের সাদাকা উত্তোলনের কাজ দেন, তবে আমরা অন্যদের মতো সাদাকা তুলে দেবো, আপনি অন্যদের যে রকম পারিশ্রমিক দেন, আমাদেরও তেমন দেবেন।”

এরপর রাসুল ﷺ অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আমরাই কথা বলার জন্য উদ্যত হচ্ছিলাম এমন সময় জাইনাব পর্দার আড়াল থেকে ইশারা করে আমাদের চুপ থাকতে বললেন।

এরপর রাসুল ﷺ বললেন, “মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের জন্য সাদাকা ভিক্ষণ করা সমীচীন নয়। সাদাকা মানুষের (সম্পদের) ময়লা। মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের জন্য এটা হালাল নয়। তোমরা মাহমিয়া বিন জাজ’ ও নাওফাল বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবকে ডেকে আনো।” বনু আসাদের এক লোকের নাম ছিল মাহমিয়া। রাসুল ﷺ তাকে খুমুসের^{৪৩৬} কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন।

তারা দুজন এলে মাহমিয়াকে রাসুল ﷺ বলেন, ‘এ ছেলের কাছে তোমার মেয়েকে বিয়ে দাও’—এই বলে তিনি ফজল বিন আব্বাসের দিকে ইশারা করলেন। মাহমিয়া তাকে তার মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দিল।

৪৩৬. জিহাদে মুজাহিদরা যে গনিমত লাভ করে, তার এক-পঞ্চমাংশকে খুমুস বলা হচ্ছে। (অনুবাদক)

তারপর আমার (আব্দুল মুত্তালিব) দিকে ইশারা করে নাওফাল বিন হারিসকে বললেন, “এ ছেলের সাথে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও।” নাওফাল তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিলেন।

এরপর তিনি মাহমিয়াকে বললেন, “খুমুসের সম্পদ থেকে এত এত পরিমাণ এদের দুজনকে দাও।”^{৪৩৭}

ইমাম নববি رحمہ اللہ বলেন :

‘খুমুসের ভান্ডার থেকে এদের দাও—হতে পারে রাসুল ﷺ-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে খুমুস থেকে তারা দুজন একটা অংশ পেয়েছিলেন। কারণ, তারা দুজন রাসুল ﷺ-এর নিকটাত্মীয় ছিলেন। আবার এও হতে পারে যে, খুমুসের যে অংশ রাসুলুল্লাহ ﷺ পেতেন, সেখান থেকেই তাদের দুজনকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।’^{৪৩৮}

বদরের বন্দী চাচা আব্বাসের প্রতি অনুগ্রহ

জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضی اللہ عنہ বলেন, ‘বদরের দিন বন্দীদের সাথে আব্বাসকেও আনা হয়। তার গায়ে কাপড় ছিল না। নবিজি ﷺ তাকে খালি গায়ে দেখে জামার খোঁজ লাগালেন। সাহাবিগণ দেখলেন, আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের জামা আব্বাসের গায়ের মাপের। ইবনে উবাই থেকে জামা নিয়ে আব্বাসকে পরতে দিলেন তিনি। তাই ইবনে উবাইয়ের দাফনের সময় রাসুল ﷺ নিজের জামা দিয়েছিলেন কাফনের জন্য।’ ইবনে উয়াইনা رحمہ اللہ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর ওপর ইবনে উবাইয়ের এ ঋণটা বাকি ছিল। রাসুল ﷺ সে ঋণ শোধ করে দিলেন কাফনের জন্য নিজের জামাটি দিয়ে।’^{৪৩৯}

বাহরাইনের জিজিয়া থেকে চাচা আব্বাসকে দান করেছিলেন

আনাস رضی اللہ عنہ বলেন, ‘বাহরাইনের জিজিয়ার সম্পদ এল রাসুল ﷺ-এর কাছে। তিনি বললেন, “এগুলো মসজিদে রাখো।” জিজিয়ার পরিমাণ সম্পদ

৪৩৭. সহিহ মুসলিম : ১০৭২।

৪৩৮. ইমাম নববি رحمہ اللہ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৭/১৮০।

৪৩৯. সহিহুল বুখারি : ৩০০৮।

বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি ছিল সেবারের জিজিয়ার সম্পদের ঢের। রাসুল ﷺ নামাজের জন্য এলেন মসজিদে। কিন্তু সম্পদের দিকে একটু তাকালেন না। নামাজ শেষে তিনি সম্পদের স্তুপের কাছে এসে বসলেন। যাকেই দেখলেন, তাকেই একটা অংশ দিলেন।

এ সময় আব্বাস ﷺ এলেন সেখানে। বললেন, “আল্লাহর রাসুল, আমাকে কিছু দিন। আমি (বদরের বন্দিদের) মুক্তিপণ দিয়েছি নিজের ও আকিলের।”^{৪৪০}

রাসুল ﷺ তাকে বললেন, “নাও।”

আব্বাস তার কাপড়ে নিতে লাগলেন যতটুকু চাইলেন। এরপর উঠানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। রাসুল-কে বললেন, “আল্লাহর রাসুল, কাউকে বলুন আমার এ বোঝাটা তুলে দিতে।”

রাসুল ﷺ বললেন, “না।”

আব্বাস ﷺ বললেন, “তাহলে আপনি তুলে দিন।”

“না।” রাসুল ﷺ বললেন।

এরপর কাপড়ের ওপর থেকে আরও কম করলেন আব্বাস ﷺ। উঠাতে গিয়ে এবারও পারলেন না উঠাতে। বললেন, “আল্লাহর রাসুল, কাউকে বলুন আমার এ বোঝাটা তুলে দিতে।”

রাসুল ﷺ বললেন, “না।”

আব্বাস ﷺ বললেন, “তাহলে আপনি তুলে দিন।”

“না।” রাসুল ﷺ বললেন।

এরপর আরেকটু সম্পদ কমানোর পর উঠাতে পারলেন। বোঝাটা উঠিয়ে কাঁধে ফেলে চলে গেলেন সেখান থেকে।

৪৪০. আব্বাস ﷺ ছিলেন কুরাইশদের মধ্যকার অন্যতম সম্পদশালী। কিন্তু বদরের যুদ্ধে বন্দিত্ব বরণের পর নিজের ও আকিল ﷺ-এর মুক্তিপণ আদায় করতে গিয়ে প্রায় রিক্তহস্ত হয়ে পড়েন তিনি।

সে স্তূপে একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত রাসুল ﷺ উঠে যাননি সেখান থেকে।^{৪৪১}

ইবনে রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এ হাদিসে আমরা রাসুল ﷺ-এর মহানুভবতার দৃষ্টান্ত দেখেছি। দেখেছি রাসুল ﷺ-এর দুনিয়াবিমুখতার অনুপম চিত্র। সম্পদ বেশি হোক বা কম তিনি মোটেও ভ্রক্ষেপ করতেন না সেদিকে।

লক্ষণীয় যে, আব্বাস রাহিমাহুল্লাহ বিশাল দেহী ছিলেন। ছিলেন বেশ শক্তিদরও। এ থেকেও বোঝা যায়, সেদিন আব্বাস রাহিমাহুল্লাহ অনেক বেশি পরিমাণে সম্পদ নিয়ে নিয়েছিলেন তার কাপড়ের ওপর। তাই বহন করতে ব্যর্থ হয়েছেন প্রথম দুবার। আর রাসুল ﷺ-ও তাকে নিষেধ করেননি। তাকে তার ইচ্ছেমতো নিতে দিলেন।^{৪৪২}

আত্মীয়দের ইবাদতের প্রতি উৎসাহ দিতেন

‘জুবাআ রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এলেন রাসুল ﷺ। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি হজের নিয়ত করেছ?”

জুবাআ বললেন, “হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, কিন্তু আমার অসুস্থতা লেগেই আছে।”

রাসুল ﷺ জুবাআকে বললেন, “তুমি হজ করো। আর এভাবে শর্ত-সহযোগে নিয়ত করো—হে আল্লাহ, যেখানেই আমি আটকে যাব, সেখানে আমি ইহরাম পরিত্যাগ করব।”^{৪৪৩}

আত্মীয়দের শারীরিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ রাখতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘রাসুল ﷺ হাজম পরিবারকে অনুমতি দিয়েছিলেন সাপে দংশিত রোগীর রুকইয়া করতে। আসমা বিনতে উমাইসকে একদিন তিনি বলেন, “আমার চাচাতো ভাইয়ের সন্তানদের কী হলো, আমি তাদের দুর্বল দেখছি কেন? তারা কি অভাবে আছে?”

৪৪১. সহিহুল বুখারি : ৩১৬৫।

৪৪২. ফাতহুল বারি : ৩/১৭৮।

৪৪৩. সহিহুল বুখারি : ৫০৮৯, সহিহ মুসলিম : ১২০৭। শব্দউৎস : সহিহ মুসলিম।

“না, তারা অভাবে নেই। কিন্তু তাদের ওপর কুনজর খুব তাড়াতাড়ি লেগে যায়।”—উমাইস জবাব দিলেন।

রাসুল ﷺ বললেন, “তুমি তাদের রুকইয়া করে দাও।”

উমাইস বললেন, “এরপর আমি রাসুল ﷺ-এর সামনে দোয়াটি উপস্থাপন করলাম।”

রাসুল ﷺ বললেন, “ঠিক আছে, তুমি তাদের রুকইয়া করো।”^{৪৪৪}

উম্মে মুনজির বিনতে কাইস আনসারিয়া রাঃ বলেন, ‘একদিন রাসুল ﷺ আলিকে নিয়ে আমাদের ঘরে এলেন। আলি রাঃ তখনও পুরোপুরি সেরে উঠেনি। আমাদের ঘরে অনেকগুলো আধপাকা খেজুরের কাঁদি ঝোলানো ছিল। রাসুল ﷺ সেখান থেকে খেতে উঠলেন। তখন আলিও দাঁড়ালেন। কিন্তু রাসুল ﷺ বললেন, “থামো আলি। এগুলো খেয়ো না। তুমি এখনও পুরোপুরি সেরে উঠেনি।” আলি রাঃ বিরত হলেন।

এরপর আমি জব ও সবজি পাতার খাবার তৈরি করে দিলাম আলির জন্য। রাসুল ﷺ তখন বললেন, “আলি, তুমি এটা খাও। এটা তোমার জন্য উপকারী হবে।”^{৪৪৫}

আত্মীয়দের সহযোগিতা নিতেন এবং তাদের দায়িত্ব দিতেন

কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

- হিজরতের রাতে নিজের বিছানায় শোয়ার জন্য আলি রাঃ-কে আদেশ দেন।
- খাইবারের যুদ্ধের দিন আলি রাঃ-কে মুসলিম বাহিনীর আমির নিযুক্ত করেন।

৪৪৪. সহিহ মুসলিম : ২১৯৮।

৪৪৫. সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৫৬, সুনানুত তিরমিজি : ১৯৬০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৪৪২।
হাদিসের মান : হাসান।

- হজের সময় রাসুল ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কুরবানির জন্য পশুগুলো রেখে অতিরিক্ত জন্তুগুলো আলি ﷺ-কে দিয়ে দিয়েছিলেন। রাসুল ﷺ-এর উটগুলোর দায়িত্বও দিলেন তাকে। তার দায়িত্ব ছিল উট জবাইয়ের গোশত, চামড়া ও উটের ঝুল মানুষকে দান করা।^{৪৪৬}

আলি ﷺ বলেন, ‘নবিজি ﷺ হাদি হিসেবে একশটি উট নিয়েছিলেন সাথে। জবাইয়ের পর আমাকে গোশত বণ্টনের নির্দেশ দিলেন। আমি বণ্টন করে দিলাম। এরপর হুকুম দিলেন উটগুলোর ঝুল বণ্টন করার। আমি করলাম। এরপর নির্দেশ দিলেন উটগুলোর চামড়া বাটোয়ারা করে দেওয়ার। আমি তাও করলাম।’^{৪৪৭}

- রাসুল ﷺ তাঁর চাচাতো ভাই জাফরকে হাবশার মুহাজিরদের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেন। রাসুল ﷺ-এর পক্ষ থেকে তিনিই হাবশার বাদশাহর কাছে প্রথম রিসালাতের ফরমান নিয়ে যান। তিনিই নাজ্জাশির সামনে ইসলামের পরিচিতিমূলক সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ভাষণ দেন।

হাবশা থেকে জাফর ﷺ-এর প্রত্যাগমনে আনন্দিত হন

খাইবার যুদ্ধের বিজয়ের পরপরই আগমন করে জাফর ﷺ। তাকে দেখে রাসুল ﷺ এগিয়ে এলেন। তার কপালে চুমু খেলেন। তাকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর বললেন, ‘আমি জানি না, আজ আমি কীসে বেশি আনন্দিত, জাফরের আগমনে না খাইবার বিজয়ের কারণে!’^{৪৪৮} এরপর রাসুল ﷺ জাফর ﷺ-কে মসজিদে নববির পাশেই একটি ঘর দিলেন থাকার জন্য। খাইবারের গনিমতের একাংশও দিলেন তাকে।

জাফর ﷺ-কে মুতার যুদ্ধে জাইদ বিন হারিসা ﷺ-এর পরবর্তী সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

এই যুদ্ধে তিনি শহিদ হলে রাসুল ﷺ তার পরিবারকে সান্ত্বনা জানান এবং তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন।

৪৪৬. সহিহুল বুখারি : ১৭০৭, সহিহ মুসলিম : ১৩১৭।

৪৪৭. সহিহুল বুখারি : ১৭১৮, সহিহ মুসলিম : ২৩২১।

৪৪৮. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪২৪৯। হাদিসের মান : হাসান।

জাফরের ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, ‘রাসুল ﷺ মুসলিমদের একদলকে অভিযানে পাঠালেন। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন জাইদ বিন হারিসা। রাসুল ﷺ বলেন, “যদি জাইদ শহিদ হয়ে যায়, তবে তোমাদের আমির হবে জাফর। যদি জাফরও শহিদ হয়ে যায়, তবে তোমাদের আমির হবে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা।”

রাসুল ﷺ-এর কাছে তাদের সংবাদ এল। তিনি মানুষের সামনে এলেন। আল্লাহর প্রশংসা করে কথা শুরু করলেন। বললেন, “তোমাদের ভাইয়েরা শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে। জাইদ পতাকা হাতে নিল। এরপর শহিদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকল। তারপর পতাকা হাতে নিল জাফর বিন আবু তালিব। সেও শহিদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকল। এরপর পতাকা হাতে নিল আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা। সেও শহিদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকল। এরপর পতাকা হাতে নিল আল্লাহর তরবারি খালিদ বিন ওয়ালিদ। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দিলেন মুসলিমদের।”

এরপর রাসুল ﷺ তিন দিন পর্যন্ত জাফরের পরিবারকে অবকাশ দিলেন জাফরের জন্য কাঁদা বা শোক প্রকাশের জন্য। তিন দিন পর তিনি এলেন। বললেন, “আজ বা আগামীকালকের পর থেকে তোমরা আমার ভাই জাফরের জন্য কাঁদবে না। তোমরা আমার ভাইয়ের সন্তানদের ডেকে দাও।”

এরপর আমাদের ডাকা হলো। আমাদের চুল দেখে মনে হচ্ছিল যেন এগুলো পাখির সদ্য গজানো পালক। রাসুল ﷺ বললেন, “নাপিতকে ডাকো।”

নাপিতকে ডেকে আনা হলো। আমাদের সকলের মাথা মুগুন করা হলো।^{৪৪৯} এরপর রাসুল ﷺ বললেন, “মুহাম্মাদ বিন জাফর হচ্ছে আমাদের চাচা আবু তালিবের মতো। আর আব্দুল্লাহর অবয়ব ও চরিত্র আমার মতো।” এতটুকু বলে রাসুল ﷺ আমার হাত উঁচু করে ধরে বললেন, “হে আল্লাহ আব্দুল্লাহকে পরিবারে জাফরের স্থলাভিষিক্ত করুন। তাকে ব্যবসায় বরকত দিন।” এ কথা তিনি তিনবার বললেন।

৪৪৯. জাফর ﷺ-এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস ﷺ স্বামীর শোকে কাতর ছিলেন। তাই ছোট ছেলে-মেয়েদের মাথা চিরুনি করা, তাদের পরিপাটি রাখার প্রতি নজর দিতে পারেননি। ফলে তাদের মাথায় উকুন হয়ে যায়। তাই নাপিত ডেকে তাদের মাথা মুগুন করে উকুনমুক্ত করা হয়।

এরপর আমাদের মা এলেন। আমাদের এতিম হয়ে যাওয়ার কথা তুলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দুঃখভারাক্রান্ত করে দিলেন। রাসুল ﷺ বললেন, “তুমি তাদের অভাবের ব্যাপারে ভয় করছ? তবে শুনে নাও, দুনিয়া-আখিরাতে আমিই তাদের অভিভাবক।”^{৪৫০}

শিশুদের বাহনে তুলে নিতেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন

আব্দুল্লাহ বিন জাফর ﷺ বলেন, ‘আমি, কুসাম ও উবাইদুল্লাহ বালক বয়সের ছিলাম। আমরা খেলতাম। রাসুল ﷺ বাহনে চড়ে যাওয়ার সময় যদি আমাদের দেখতেন। বলতেন, “একে উঠিয়ে দাও।” কেউ আমাকে উঠিয়ে দিলে তিনি আমাকে বাহনে তাঁর সামনে বসিয়ে নিতেন। কুসামকে দেখিয়ে বলতেন, “একেও উঠিয়ে দাও।” কুসামকে উঠিয়ে দেওয়া হলে তাকে পেছনে বসিয়ে নিতেন।

এরপর আমার মাথায় তিনবার হাত বুলিয়ে তিনবার এ দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ, আপনি জাফরের সন্তানকে তার স্থলাভিষিক্ত করুন।”^{৪৫১}

আত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার কতিপয় নিদর্শন

আত্মীয়দের কারও সাথে মন্দ কিছু ঘটে গেলে, দুঃখ ও চিন্তা এসে তাঁকে গ্রাস করত। হামজা ﷺ যখন শহিদ হলেন এবং তার লাশ বিকৃত করা হলো— তিনি অত্যন্ত শোকাবুদ হয়ে পড়েন। একে তো প্রিয় চাচার বিয়োগব্যথা। তার ওপর চাচার লাশ বিকৃত করার বিষয়টি তাঁকে খুবই কষ্ট দেয়।

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, ‘হামজার শাহাদাতের পর রাসুল ﷺ তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। হামজার শরীর বিকৃত। রাসুল ﷺ তার দিকে তাকালেন। প্রিয় চাচার বিকৃত শরীর দেখা ছিল তাঁর কাছে চরম বেদনাদায়ক। এর আগে কোনো আচরণে এতটা ব্যথা পাননি কখনো। রাসুল ﷺ তখন বললেন, “আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তুমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে। তুমি কল্যাণময় কাজে অগ্রগামী ছিলে। তোমার রেখে যাওয়া আত্মীয়রা যদি

৪৫০. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৬৩। হাদিসের মান : হাসান।

৪৫১. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৫৩। হাদিসের মান : সহিহ।

মনে কষ্ট না পেত, তবে আমি তোমার লাশ এখানেই ছেড়ে যেতাম আর হাশরের দিন তোমার দেহ জোড়া নিত বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে। আল্লাহর শপথ, তোমার স্থলে আমি তাদের ৭০ জনের দেহ বিকৃত করব।”

নবিজি ﷺ সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। তখন জিবরাইল ﷺ সুরা নাহলের শেষ দিকের অংশ নিয়ে আসলেন। আল্লাহ নাজিল করলেন :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ

“যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও, তবে ততটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ করো যতটুকু অন্যায় তোমাদের ওপর করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো, তবে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য অবশ্যই তা উত্তম।” (সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১২৬)

এ আয়াত নাজিলের পর রাসুল ﷺ কসমের কাফফারা আদায় করলেন। আর তাঁর মনের ইচ্ছা দমন করলেন।^{৪৫২}

আত্মীয়দের জন্য বেশি বেশি দোয়া করতেন

✽ আব্বাস ও তাঁর সন্তানদের জন্য দোয়া

ইবনে আব্বাস ؓ বর্ণনা করেন, ‘একবার রাসুল ﷺ আব্বাসকে বললেন, “আগামীকাল সোমবার তুমি তোমার সন্তানকে নিয়ে আসবে। আমি তোমাদের জন্য এমন এক দোয়া করব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সন্তানকে উপকৃত করবেন।”

পরের দিন আমরাও আব্বাসের সাথে চলে এলাম রাসুল ﷺ-এর কাছে। তিনি দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ, আব্বাসকে ক্ষমা করে দিন, আপনি তার

৪৫২. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪৮৯৪, তাবারানি ؓ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৩/১৪৩। তাবারানির সনদে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। বিষয়টা হাফিজ ইবনে হাজার ؓ উল্লেখ করেছেন ফাতহুল বারি ৭ম খণ্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠায়।

সন্তানদেরও ক্ষমা করে দিন। তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। সকল গুনাহ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিন। হে আল্লাহ, আপনি তাকে তার সন্তানদের বিষয়াদিতে নিরাপদ রাখুন।”^{৪৫৩}

অর্থাৎ তাকে সন্তানদের মাধ্যমে সম্মানিত করুন এবং সন্তানদের নিয়ে যেন তিনি কষ্টে না পড়েন।

✽ আলি রাঃ-এর জন্য দোয়া

আলি রাঃ বলেন, ‘আবু তালিবের মৃত্যুর পর আমি নবিজি সঃ-এর কাছে এলাম। বললাম, “আপনার বৃদ্ধ চাচা মৃত্যুবরণ করেছেন।” রাসুল সঃ বললেন, “যাও, তাকে দাফন করো। তারপর কিছু না করে আমার কাছে আসো।”

আমি তাকে দাফন করে রাসুল সঃ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, “যাও, গোসল করে নাও, তারপর কিছু না করে আমার কাছে আসো।”

রাসুল সঃ-এর কথামতো আমি গোসল করে তাঁর কাছে আসলাম। তারপর রাসুল সঃ আমার জন্য এমন সব দোয়া করলেন, যার কারণে আমি এতটা খুশি হলাম, যদি আমাকে এর বদলে লাল ও কালো উটও দেওয়া হতো, তবুও আমি এতটা খুশি হতাম না।^{৪৫৪}

✽ ইবনে আব্বাস রাঃ-এর জন্য দোয়া

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ আমাকে তাঁর বুকের সাথে মিলালেন। এরপর দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ, আপনি তাকে হিকমাহ শিক্ষা দিন।”^{৪৫৫}

অন্য বর্ণনায় এসেছে ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, ‘নবিজি সঃ শৌচাগারে প্রবেশ করলেন। আমি তখন তাঁর জন্য অজুর পানি রাখলাম। পরে তিনি জানতে চাইলেন, “এ পানি কে রাখল?” তাঁকে জানানো হলো, পানি আমি রেখেছি।

৪৫৩. সুনানুত তিরমিজি : ২৭৬২। হাদিসের মান : হাসান।

৪৫৪. মুসনাদু আহমাদ : ৮০৯। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৫৫. সহিহুল বুখারি : ৩৭৫৬।

তখন তিনি দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ, আপনি তাকে দ্বীনের ফিকহ দান করুন।”^{৪৫৬}

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় (হাদিস : ৩০২৪) রাসুল ﷺ-এর দোয়ায় আরেকটু যুক্ত হয়ে এসেছে, ‘তাকে কুরআনের ব্যাখ্যা শিখিয়ে দিন।’

তাদের উপকারী দোয়া শেখাতেন

আব্বাস রা বলেন, ‘একবার আমি রাসুলুল্লাহ স-কে বললাম, “হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমি আল্লাহর কাছে চাইতে পারি।” তিনি বললেন, “আপনি আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।” কিছুদিন পর আমি পুনরায় একই কথা বললাম, “হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমি আল্লাহর কাছে চাইতে পারি।” তিনি বললেন :

يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“হে আব্বাস, হে আল্লাহর রাসুলের চাচা, আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।”

আব্বাস রা বলেন, ‘আমি রাসুল স-কে বললাম, “আল্লাহর রাসুল, আমাকে দোয়া শিখিয়ে দিন। সে দোয়া পড়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাব আমি।” তিনি বললেন, “আল্লাহর কাছে (আফিয়াত) সুস্থতা ও নিরাপত্তার প্রার্থনা করুন।”^{৪৫৭}

‘আব্বাস রা আবেদন জানালেন, তাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিতে, যার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর কাছে চাইবেন। কিন্তু রাসুল স বারবার একই দোয়া করতে বললেন তাকে। এখান থেকে বোঝা যায় সুস্থতা ও নিরাপত্তার দোয়া হলো সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া। অন্য কোনো দোয়া এর সমকক্ষ নয়।

রাসুল স তাঁর চাচা আব্বাস রা-কে তাঁর বাবার সমান মর্যাদা দিতেন। একজন সন্তানের ওপর পিতার যে অধিকার থাকে, আব্বাস রা-এর প্রতি তিনি সেরূপ আচরণই করতেন।

৪৫৬. সহিহুল বুখারি : ১৪৩, সহিহ মুসলিম : ২৪৭৭।

৪৫৭. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫১৪। হাদিসের মান : সহিহ।

আব্বাসের মতো এমন প্রিয় মানুষকে বিশেষভাবে এই দোয়া শেখানো এবং বারবার এই দোয়া করতে বলা—এই দুটি আচরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের উচিত বেশি বেশি সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা এবং এই দোয়ার মাধ্যমে বিপদাপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করা।^{৪৫৮}

অসুস্থ আত্মীয়দের দেখতে যেতেন

উম্মে ফজল রাঃ বলেন, ‘আব্বাসের অসুস্থতার সময় নবিজি সঃ তাকে দেখতে এলেন। আব্বাস তখন রোগের তাড়নায় মৃত্যু কামনা করছিলেন। নবিজি সঃ তাকে বললেন, “আব্বাস, আল্লাহর রাসুলের চাচা, মৃত্যু কামনা করবেন না। যদি আপনি নেক আমলকারী হয়ে থাকেন, তবে বেঁচে থাকলে আপনি আরও বেশি নেক আমল করতে পারবেন। আর যদি আপনি গুনাহগার হয়ে থাকেন, তবে বেঁচে থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করতে পারবেন। তাই মৃত্যু কামনা করবেন না।”^{৪৫৯}

কল্যাণময় কাজে তাদের উৎসাহিত করতেন

নবিজি সঃ তাঁর পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের ইবাদতের প্রতি উৎসাহ দিতেন। আখিরাতের পাথেয় জোগাড় করার উদ্দীপনা জোগাতেন। জাবির রাঃ থেকে হজসংক্রান্ত দীর্ঘ এক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সে হাদিসে তিনি বলেন, ‘এরপর রাসুল সঃ বাইতুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। মক্কায এসে জোহর আদায় করে বনি আব্দুল মুত্তালিবের কাছে আসলেন। তখন তারা হাজিদের জমজমের পানি পান করাচ্ছিল। রাসুল সঃ বললেন, “আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, তোমরা পানি তুলতে থাকো। যদি আমার এ ভয় না হতো যে, লোকেরা এ কাজে তোমাদের পরাভূত করে ফেলবে, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে পানি তুলতে লেগে যেতাম।” এরপর তারা রাসুল সঃ-এর প্রতি পানির একটি বালতি এগিয়ে দিল। রাসুল সঃ সেখান থেকে পানি পান করলেন।^{৪৬০}

৪৫৮. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৯/৩৪৮।

৪৫৯. মুসনাদু আহমাদ : ২৬৩৩৩। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৬০. সহিহ মুসলিম : ১২১৮।

হাদিসের ব্যাখ্যা

‘এ হাদিসে বনি আব্দুল মুত্তালিব বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে আব্বাস ؑ ও তার দল। কারণ, হাজিদের পানি পান করানোর দায়িত্ব ছিল তাদের ওপর। “তোমরা পানি তুলতে থাকো”—রাসুল ﷺ-এর আদেশসূচক বাক্য ব্যবহার ওয়াজিব অর্থে ছিল না, ছিল মুসতাহাব অর্থে। রাসুল ﷺ-এর কথাটি তাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। এ কথার মাধ্যমে তিনি তাদের অনুপ্রাণিত করছিলেন যে, এ কাজটি একটি বিরাট কল্যাণজনক কাজ। এতে রয়েছে অনেক সাওয়াব।

“যদি আমার এ ভয় না হতো...”—রাসুল ﷺ যদি তাদের সাথে পানি তোলার কাছে নেমে পড়তেন, তবে অন্য সব মুসলিমও এ কাজের জন্য ভিড় জমাত। আব্বাস ও তার দলকে মানুষ অব্যাহতি দিয়ে দিত পানি তোলার প্রতি উৎসাহিত হওয়ার ফলে।

ইমাম নববি ؒ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর এ কথার মর্ম হচ্ছে, আমি যদি পানি তুলতে নেমে পড়ি, তবে মানুষজন মনে করবে জমজমের পানি তোলাও হাজার একটি বিধান। তাই তারা এসে ভিড় করবে এ কাজের জন্য। তারা তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এ কাজ থেকে তোমাদের হটিয়ে দেবে—যদি এ ভয় না থাকত, তবে আমিও তোমাদের সাথে এ কাজে অংশ নিতাম। কারণ, এ কাজে অনেক ফজিলত, অনেক সাওয়াব।’^{৪৬১}

আত্মীয় হলেও ধীনের হুকুম পালনে তাদের এতটুকু ছাড়ও দিতেন না

আনাস ؓ বলেন, ‘আব্বাস ؑ বদরে বন্দী হলেন।^{৪৬২} কতক আনসার রাসুল ﷺ-কে বললেন, “আমাদের অনুমতি দিন। আমরা আমাদের ভাগ্নের মুক্তিপণ মাফ করে দেবো।”

রাসুল ﷺ বললেন, “তোমরা তার একটি দিরহামও ছাড়বে না।”^{৪৬৩}

৪৬১. ইমাম নববি ؒ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৮/১৯৪।

৪৬২. মুশরিকরা আব্বাস ؑ-কে জোর করে বদরের সময় তাদের সাথে নিয়ে আসে।

৪৬৩. সহিহুল বুখারি : ২৫৩৭।

হাদিসের ব্যাখ্যা

ইবনে হাজার رحمہ اللہ বলেন, ‘আনসারগণ আব্বাস رحمہ اللہ-কে ভাগ্নে বলার কারণ হচ্ছে, মূলত আনসাররা আব্বাস رحمہ اللہ-এর পিতা আব্দুল মুত্তালিবের মামা ছিলেন। কারণ, আব্দুল মুত্তালিবের মা ইয়াসরিবের অধিবাসী ছিলেন। তার নাম ছিল সালমা বিনতে আমর বিন উহাইহা। তিনি বনু নাজ্জারের মেয়ে ছিলেন।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়—আনসারগণ বলেছেন ‘আমাদের ভাগ্নে’। তারা কিন্তু রাসুল ﷺ-এর প্রতি সম্পর্কিত করে বলতে পারত ‘আপনার চাচা’। কিন্তু তারা ‘আমাদের ভাগ্নে’ বলে তাদের ওপর অনুগ্রহ করতে বললেন রাসুল ﷺ-কে। যদি ‘আপনার চাচা’ বলতেন তারা, তাহলে রাসুল ﷺ-এর প্রতি অনুগ্রহের ব্যাপারটি চলে আসত। রাসুল ﷺ তা মেনে নিতেন না। তাই তারা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে বললেন, আমাদের ভাগ্নে। এখানে তাদের মেধাশক্তি ও সম্বোধনের ক্ষেত্রে উত্তম আদবের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।’^{৪৬৪}

এ ব্যাপারে ইবনে হাজার رحمہ اللہ আরও বলেন, ‘ইবনে আয়িজ رحمہ اللہ তাঁর “কিতাবুল মাগাজি” গ্রন্থে বলেন, “বন্দীদের বাঁধার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল উমর رضی اللہ عنہ-কে। তিনি আব্বাস رحمہ اللہ-এর বাঁধন শক্ত করে বাঁধলেন। রাতের বেলা রাসুল ﷺ আব্বাস رحمہ اللہ-এর গোঙানি শুনে ঘুমাতে পারছিলেন না। আনসাররা এটা জানতে পেরে আব্বাস رحمہ اللہ-এর বাঁধন খুলে দিলেন।

বাঁধন খুলে দেওয়ায় আনসাররা দেখলেন রাসুল ﷺ সন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন তাঁরা রাসুল ﷺ-কে আরও বেশি সন্তুষ্ট করার জন্য আব্বাসের মুক্তিপণ ক্ষমা করে দেওয়ার বিষয়টি তুললেন। কিন্তু রাসুল ﷺ তাঁদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।’^{৪৬৫} ‘রাসুল ﷺ আনসারদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ দ্বীনের মাঝে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।’^{৪৬৬}

৪৬৪. ফাতহুল বারি : ৫/১৬৮।

৪৬৫. ফাতহুল বারি : ৭/৩২২।

৪৬৬. ফাতহুল বারি : ৫/১৬৮।

এ রকম আরও দৃষ্টান্ত হচ্ছে, জাহিলি যুগের রক্তপাতের বদলা নাকচ করার কথা বলে রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম নিজের আত্মীয়দের রক্তপাতের বদলা নাকচ করলেন। সুদ হারামের ঘোষণা দিয়ে, তিনি সর্বপ্রথম তার চাচা আব্বাস ؓ-এর সুদি কারবারির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন।

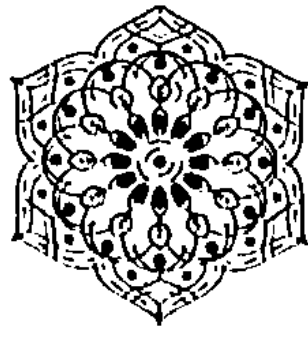
আরাফাতের ময়দানে খুতবা দেওয়ার সময় তিনি বলেন, ‘সাবধান! জেনে রাখো, জাহিলি যুগের সকল মন্দ রীতিনীতি আমার পদতলে। সেগুলো বাতিল। জাহিলি যুগের রক্তপাতের বদলা বাতিল। আমি সবার আগে আমার বংশের রক্তপাতের বদলা বাতিল করছি। রাবিআ বিন হারিসের ছেলের রক্তপাতের বদলা বাতিল। দুধপানের জন্য বনু সাদে ছিল সে। হুজাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। জাহিলি যুগের সকল সুদ বাতিল ঘোষণা করছি। আর সবার আগে বাতিল ঘোষণা করছি আমার বংশের সুদের। আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদি কারবার বাতিল ঘোষণা করছি। এসব কিছুই বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।’^{৪৬৭}

‘রাসূল ﷺ-এর চাচাতো ভাই রাবিআ বিন হারিসের যে ছেলে নিহত হয়েছিল হুজাইলের হাতে, তার নাম ছিল ইয়াস। সে তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু—এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত। বনু সাদ ও বনু লাইস বিন বকর গোত্রের মধ্যকার লড়াইয়ে একটি পাথরের আঘাতে তার মৃত্যু হয়।’

ইমাম নববি ؒ বলেন, ‘এ হাদিস থেকে আমরা অনেক বড় একটা শিক্ষা পাই যে, নেতা বা সাধারণ কোনো মুসলিম যখন কোনো ভালো কাজের আদেশ করেন বা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন, তখন সবার আগে তার মাঝে, তার পরিবারের মাঝেই এ আদেশ-নিষেধের প্রয়োগ করতে হবে। কারণ, এ রকমটা করে থাকলে মানুষ সহজেই তার কথা মেনে নেবে এবং আমল করবে। আর যারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের জন্যও এটি মানসিক স্থিরতার কারণ হবে।’^{৪৬৮}

৪৬৭. সহিহ মুসলিম : ১২১৮।

৪৬৮. ইমাম নববি ؒ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৮/১৮২।



❖ [পঞ্চম পরিচ্ছেদ] ❖

প্রতিবেশীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহয় অসংখ্য বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা, তাদের কল্যাণ কামনা করা, সম্মানের হিফাজত করা, তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা, তাদের গাইরে মাহরামদের দেখলে চম্ফু অবনত রাখা, তাদের সন্দেহের উদ্বেক হয় কিংবা কষ্ট হয়—এমন কাজ থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি প্রতিবেশীর হকের মধ্যে পড়ে।

কথায় ও কর্মে রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন আদর্শ প্রতিবেশী

কথায় ও কাজে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতিবেশীদের হকের প্রতি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। আল্লাহ তাআলা আপন হকের সঙ্গে প্রতিবেশীর হক উল্লেখ করেছেন। এখান থেকে প্রতিবেশীর হকের গুরুত্ব ফুটে ওঠে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

‘আর তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত করো। তাঁর সাথে কাউকে শরিক কোরো না। মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার করো। আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর, মুসাফির এবং তোমাদের দাস-দাসীদের সাথেও

সদ্যবহার করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী আত্মাভিমानीকে ভালোবাসেন না।^{৪৬৯}

আয়াতের ব্যাখ্যা

(وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ) — আত্মীয় প্রতিবেশী। এ প্রতিবেশীর দুটি হক। একটি আত্মীয় হিসেবে। অন্যটি প্রতিবেশী হিসেবে। সামাজিক প্রথা অনুসারে তার হক আদায় করতে হবে এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে।

(وَالْجَارِ الْجُنُبِ) — অনাত্মীয় প্রতিবেশী। যে প্রতিবেশীর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। এমন প্রতিবেশীদের মধ্যে যার ঘর যত কাছে, তার হক আদায় করা তত বেশি জরুরি হবে। হাদিয়া, সাদাকা, উত্তম আচরণ, সুন্দর সম্বোধন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে হবে। কি কথায় কি কাজে কোনোভাবেই তাদের কষ্ট দেওয়া যাবে না।

(وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ) — পার্শ্ববর্তী সহচর। কেউ বলেন, আয়াতের এ অংশের অর্থ সফরসঙ্গী। কেউ বলেন, এখান থেকে স্ত্রী উদ্দেশ্য। আবার কেউ বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো, সাধারণভাবে যাদের সাথে হিসেবে গণ্য করা হয়। আর শেষ অর্থটাই গ্রহণীয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, সঙ্গী শব্দটি ঘরে ও সফরের সকল সঙ্গীকেই অন্তর্ভুক্ত করে। স্ত্রীও এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত।^{৪৭০}

রাসুল ﷺ-এর প্রতিবেশী

আনসার প্রতিবেশী

ইবনে হাজার رحمته বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর আনসার প্রতিবেশী ছিলেন, সাদ বিন উবাদা, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (জাবিরের পিতা), আবু আইউব আনসারি, আসআদ বিন জুরারা رحمته।’

ইবনে হাজার رحمته আরও বলেন, ‘ইবনে সাদ তাবাকাতুন নিসা-তে বর্ণনা করেন, মুমিন-জননী উম্মে সালামা رحمته বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর কাছে যে সকল

৪৬৯. সূরা আন-নিসা, ৪ : ৩৬।

৪৭০. তাফসিরুস সাদি : ১/১৭৭।

আনসার অধিক পরিমাণে উপহার পাঠাতেন, তারা হচ্ছেন সাদ বিন উবাদা, সাদ বিন মুআজ, উমারাহ বিন হাজম, আবু আইউব ؓ । কারণ, তাঁরা রাসুল ﷺ-এর নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন ।’^{৪৭১}

নাজ্জার গোত্র রাসুল ﷺ-এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্যে গৌরববোধ করত

আনাস ؓ বলেন, ‘একবার নবিজি ﷺ মদিনার পথ ধরে যাচ্ছিলেন । তিনি দেখতে পেলেন একদল বালিকা দফ বাজাচ্ছে আর গান গাইছে—

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ *** يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

‘আমরা বনু নাজ্জারের বালিকা-দল! বাহ, কী চমৎকার! মুহাম্মাদ হলেন আমাদের প্রতিবেশী ।’

রাসুল ﷺ বললেন, “আল্লাহ জানেন, আমি তোমাদের ভালোবাসি ।”^{৪৭২}

আয়িশা ؓ এ সকল প্রতিবেশীর প্রশংসা করে বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর কতক আনসার প্রতিবেশী ছিলেন । তারা সত্যিকার অর্থেই প্রতিবেশী ছিলেন । তাদের হাদিয়ার পশু ছিল । তারা দুধ দোহন করে রাসুল ﷺ-এর জন্য পাঠাতেন । রাসুল ﷺ আমাদের তা-ই পান করাতেন ।’^{৪৭৩}

‘হাদিয়ার পশু’ বলে বোঝানো হচ্ছে, এমন সব পশু যেগুলোকে মালিক কিছুদিনের জন্য অন্যকে হাদিয়াস্বরূপ দিয়ে দেয় । আর সে পশুর দুধ, বাচ্চা ও পশম থেকে লোকটি উপকৃত হয় । তারপর নির্দিষ্ট সময় পর মালিককে আবার ফেরত দেয় ।

৪৭১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৮/১৬৩, ফাতহুল বারি : ৫/২০৬ । এ হাদিসের সনদে ওয়াকিদি নামের একজন রাবি আছে । যাকে হাদিস বিশারদগণ কাজ্জাব অভিধায়ুক্ত করেছেন ।

৪৭২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৯৯ । হাদিসের মান : সহিহ ।

৪৭৩. সহিহুল বুখারি : ২৫৬৭, সহিহ মুসলিম : ২৯৭২ ।

মুহাজির প্রতিবেশী

নাজ্জার গোত্রের প্রতিবেশীরা ছাড়াও রাসুল ﷺ-এর কয়েকজন মুহাজির প্রতিবেশী ছিল। তাঁরা হলেন, আবু বকর, আলি, আব্বাস প্রমুখ সাহাবি রাঃ।

মক্কার প্রতিবেশীরা রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দিত

ইবনে ইসহাক বলেন, ‘মক্কায় যেসব লোক রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দিত, তারা হচ্ছে, আবু লাহাব, হাকাম বিন আস বিন উমাইয়া, উকবা বিন আবু মুআইত, আদি বিন হামরা সাকাফি, ইবনে আসদা হুজালি প্রমুখ। এরা ছিল রাসুল ﷺ-এর প্রতিবেশী। তবে হাকাম বিন আবুল আস তাঁকে কষ্ট দিত না।

তাদের কেউ এসে সদ্য প্রসব করা ছাগলের নাড়িভুঁড়ি এনে নামাজ পড়া অবস্থায় রাসুল ﷺ-এর ওপর ফেলত। রাসুল ﷺ তখন তাঁর দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন, “হে আদে মানাফের গোত্র! এটা কোন ধরনের প্রতিবেশিত্ব?!”^{৪৭৪}

প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে সচেতন করতেন

আয়িশা রাঃ বলেন, ‘রাসুল ﷺ বলেন, “জিবরিল আমাকে প্রতিবেশীদের সম্পর্কে এত বেশি নির্দেশনা দিচ্ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা হলো অচিরেই প্রতিবেশীদের ওয়ারিশ বানিয়ে দেওয়া হবে।”^{৪৭৫}

এক আনসারি সাহাবি বলেন, ‘আমি ঘর থেকে বেরিয়ে নবিজি সঃ-এর কাছে এলাম। দেখলাম, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এক লোক তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। আমার মনে হলো, হয়তো লোকটার কোনো প্রয়োজন আছে।

আল্লাহর কসম, রাসুল সঃ এত দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমার নিজেরই দুঃখবোধ হতে লাগল তাঁর জন্য। লোকটা চলে গেলে আমি এগিয়ে এলাম রাসুল সঃ-এর কাছে। বললাম, “আল্লাহর রাসুল, লোকটা এত দীর্ঘ সময় ধরে আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখল যে, আমি দুঃখবোধ করতে শুরু করেছিলাম আপনার জন্য।”

৪৭৪. তাহজিবু সিরাতি ইবনি হিশাম : ১/১২১।

৪৭৫. সহিহুল বুখারি : ৬০১৪, সহিহ মুসলিম : ২৬২৪।

রাসুল ﷺ বললেন, “তুমি তাকে দেখেছ?”

“জি”, বললাম আমি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি জানো, কে ছিল লোকটা?”

“না”, বললাম আমি।

রাসুল ﷺ বললেন, “লোকটা ছিল জিবরিল। তিনি আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার বিষয়ে এত বেশি নির্দেশনা দিতে থাকলেন যে, আমার ধারণা হচ্ছিল প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে ওহি নাজিল হবে।”^{৪৭৬}

এমনকি বিদায় হজের দিনও রাসুল ﷺ সাহাবীদের নির্দেশনা দিলেন প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে। আবু উমামা ؓ বলেন, ‘বিদায় হজের দিন রাসুল ﷺ-কে তাঁর উটের ওপর বসে বলতে শুনলাম, “আমি তোমাদের প্রতিবেশীর অধিকার বিষয়ে অসিয়ত করছি।” তিনি এ কথাটি অনেক বার বললেন। এমনকি আমি মনে মনে বলে ফেললাম, রাসুল ﷺ প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ ঘোষণা করবেন।’^{৪৭৭}

প্রতিবেশীর সম্মান করা ইমানের নিদর্শন আখ্যা দিয়েছেন

আবু গুরাইহ আদাবি ؓ বলেন, ‘আমি নিজ কানে শুনেছি। নিজ চোখে দেখেছি। যখন রাসুল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।”’^{৪৭৮}

‘এ হাদিসের রাবি আতা খুরাসানি ؓ-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, প্রতিবেশীর অধিকার কী কী?’

তিনি বললেন, ‘যখন প্রতিবেশী তোমার কাছে সাহায্য চায়, তাকে সাহায্য করা। যখন ঋণ চায়, ঋণ দেওয়া। প্রতিবেশী দরিদ্র হলে তাকে দান করা। অসুস্থ

৪৭৬. মুসনাদু আহমাদ : ১৯৪৫৯। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৭৭. তাবারানি ؓ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৭/১১৮। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৭৮. সহিহুল বুখারি : ৬০১৯, সহিহ মুসলিম : ৪৮। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় আছে, ‘সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করে।’

হলে সেবা করা। ভালো কিছু অর্জন করলে তাকে অভিনন্দন জানানো। বিপদে পতিত হলে সাহায্য জানানো। মৃত্যুবরণ করলে তার জানাজায় অংশ নেওয়া।

প্রতিবেশীর অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরটি এত উঁচু তৈরি করবে না যে, এতে করে প্রতিবেশীর ঘরে বাতাস প্রবেশে বিঘ্ন ঘটে। প্রতিবেশীকে তোমার ঘরের রান্নার ঘ্রাণ দিয়ে কষ্ট দেবে না, যদি না তুমি তাকে সে খাবারের কিছু অংশ দাও।

যদি ফল কিনে থাকো, তবে তার কিছু প্রতিবেশীকে হাদিয়া দাও। যদি হাদিয়া না দিতে পারো, তবে নিজের ঘরে ফল গোপনে প্রবেশ করাও। তোমার সন্তানদের হাতে দিয়ে সে ফল নিয়ে বাইরে বের হতে দেবে না। এতে প্রতিবেশীর সন্তানের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে।^{৪৭৯}

ইবনে হাজার  বলেন, ‘প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা পরিপূর্ণ ইমানের নিদর্শন। এমনকি ইসলাম-পূর্ব যুগেও এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করার ধরন হচ্ছে, সাধ্যমতো প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করা। যেমন : তাকে হাদিয়া দেওয়া, সালাম দেওয়া। তার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা। তার খোঁজখবর নেওয়া। প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য করা। বাহ্যিক ও মানসিক দিক থেকে কষ্ট না দেওয়া এবং কষ্টের কারণ দূর করা।’^{৪৮০}

যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী অনিরাপদ তার ইমানের ব্যাপারে আশঙ্কা করেছেন

আবু গুরাইহ  বলেন, ‘নবিজি  একদিন বললেন, “আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়।”

জিজ্ঞেস করা হলো, “কে সে হে আল্লাহর রাসুল?”

রাসুল  উত্তর দিলেন, “যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে ব্যক্তি।”^{৪৮১}

৪৭৯. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/৩৫০।

৪৮০. ফাতহুল বারি : ১০/৪৪২।

৪৮১. সহিহুল বুখারি : ৬০১৬, মুসনাদু আহমাদ : ৭৮১৮। ইমাম আহমাদের বর্ণনায় আরও যোগ হয়ে এসেছে।

এ হাদিস প্রমাণ করে, প্রতিবেশীর অধিকারের গুরুত্ব অনেক। কারণ, রাসুল ﷺ আল্লাহর নামে কসম করেছেন। সে কসমও একবার নয়, বরং তিনবার কসম করে একই কথা বলেছেন।

‘এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কথায় বা আচরণের মাধ্যমে কষ্ট দেয়, তার ইমান নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। তবে ইমান দ্বারা এখানে পূর্ণ ইমান উদ্দেশ্য। আর নিঃসন্দেহে একজন গুনাহগার পূর্ণ মুমিন নয়।

আল্লাহর রাসুল সে লোকের ইমান নিয়ে আশঙ্কা করলেন, যে তার প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধন করে। প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে এ কথাটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রকাশক। এ হাদিস থেকে আরও বোঝা গেল, প্রতিবেশীর ক্ষতি করা কবির গুনাহ।’^{৪৮২}

প্রতিবেশীকে কষ্টদাতা জান্নাতে প্রবেশ করবে না

এমনকি রাসুল ﷺ বলেছেন, ‘প্রতিবেশীকে যে কষ্ট দেয়, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত।’ আবু হুরাইরা র. বুলেন, ‘রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।”’^{৪৮৩}

প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়া নিকৃষ্ট কাজ

মিকদাদ বিন আসওয়াদ র. বুলেন, ‘রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেছেন, “তোমরা জিনা সম্পর্কে কী বলো?”

সাহাবিগণ বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এটাকে হারাম করেছেন। এটা কিয়ামত অবধি হারাম থাকবে।”

রাসুল ﷺ বললেন, “একজন লোক অন্য দশজন নারীর সাথে জিনা করার চাইতে অধিক পাপের হচ্ছে প্রতিবেশী এক নারীর সাথে জিনা করা।”

এরপর রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “চুরি সম্পর্কে তোমরা কী বলো?”

৪৮২. ফাতহুল বারি : ১০/৪৪২।

৪৮৩. সহিহ মুসলিম : ৪৬।

সাহাবিগণ বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এটাকে হারাম করেছেন। তাই এটা হারাম।”

রাসূল ﷺ বললেন, “একজন মানুষ অন্য দশ ঘরে চুরি করার চাইতে অধিক পাপের হচ্ছে এক প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করা।”^{৪৮৪}

‘কারণ হচ্ছে, প্রতিবেশীদের একে অন্যের ওপর অধিকার হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা না করা। যদি কেউ তার প্রতিবেশীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার স্ত্রীর সাথে জিনা করে, তবে এ এক নারীর সাথে জিনা করা-ই অন্য দশ নারীর সাথে জিনা করার সমান।’^{৪৮৫}

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহর অভিশাপ ও মানুষের অভিশাপের কারণ

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ‘এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল। রাসূল ﷺ বললেন, “যাও, ধৈর্য ধরো।” কিন্তু লোকটি দুই কি তিনবার এল ফিরে ফিরে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, “যাও, তোমার মাল-সামানা রাস্তায় ফেলে রাখো।”

লোকটি তার মাল-সামানা এনে রাস্তায় রাখল। যে লোকই সে রাস্তা দিয়ে যেত, তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করত। সে তার প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টের কথা জানাত। মানুষজন তার কথা শুনে প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিতে থাকল। বলতে লাগল, “আল্লাহ তার এমন এমন করুক।”

শেষ পর্যন্ত তার প্রতিবেশী এসে তাকে বলল, “ফিরে এসো তুমি। ভবিষ্যতে আমার কাছ থেকে তুমি আর কোনো মন্দ আচরণ পাবে না।”^{৪৮৬}

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘সে লোকের প্রতিবেশী এল নবিজি ﷺ-এর কাছে। বলল, “আল্লাহর রাসূল, মানুষ আমার সাথে মন্দ আচরণ করছে।”

রাসূল ﷺ বললেন, “কেমন আচরণ করছে?”

৪৮৪. মুসনাদু আহমাদ : ২৩৩৪২। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৮৫. ফাইজুল কাদির : ৫/৩২৯।

৪৮৬. সুনানু আবি দাউদ : ৫১৫৩। হাদিসের মান : সহিহ।

লোকটা বলল, “তারা আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে।”

রাসুল ﷺ বললেন, “মানুষের আগে আল্লাহ তোমাকে অভিশাপ দিয়েছেন।”

লোকটা বলল, “আমি আর এমনটা করব না।”

এরপর অভিযোগকারী এল রাসুল ﷺ-এর কাছে। রাসুল ﷺ তাকে বললেন, “তুমি তোমার মাল-সামানা উঠিয়ে নাও। যথেষ্ট হয়েছে।”^{৪৮৭}

প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারীর আমল তার কাজে আসবে না

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ‘এক লোক রাসুল ﷺ-কে বলল, “আল্লাহর রাসুল, এক নারী তার অত্যধিক নামাজ, রোজা, দানের জন্য সুপরিচিত। কিন্তু সে কথার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?”

“সে জাহান্নামী।” বললেন রাসুল ﷺ।

লোকটা আবার বলল, “আল্লাহর রাসুল, আরেক নারীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, সে রোজা কম রাখে, দানও কম করে এবং নামাজও কম পড়ে। বলতে গেলে সে এক টুকরো পনিরই দান করে। কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?”

রাসুল ﷺ জবাব দিলেন, “সে জান্নাতি।”^{৪৮৮}

মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই প্রতিবেশীর অধিকার পাবে

মুজাহিদ রাঃ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ বিন আমরের ঘরে একটি ছাগল জবাই হলো। তিনি ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কি আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে ছাগলের গোশত হাদিয়া দিয়েছ? আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “জিবরিল আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে এত বেশি নির্দেশনা দিতে থাকলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা হলো, অচিরেই প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে ওহি নাজিল হবে।”^{৪৮৯}

৪৮৭. তাবারানি : ৩৫৬। হাদিসের মান : হাদিস সহিহ লি গাইরিহি।

৪৮৮. মুসনাদু আহমাদ : ৯২৯৮। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৮৯. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৪৩। হাদিসের মান : সহিহ।

ইবনে হাজার رحمہ اللہ বলেন, ‘প্রতিবেশী মুসলিম হোক বা কাফির, ইবাদতগুজার বা পাপাচারী, বন্ধু বা শত্রু, মুসাফির বা স্থায়ী বাসিন্দা, উপকারী বা ক্ষতিকর, আত্মীয় বা অনাত্মীয়, ঘরের দিক থেকে কাছের বা দূরের, সব ধরনের প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে অবস্থা বিবেচনায় প্রতিবেশিত্বের অধিকার প্রযোজ্য হবে।

প্রতিবেশীর বিবিধ স্তর আছে। এ স্তর বিন্যাসে সবচেয়ে উচ্চ স্তরে আছে সে প্রতিবেশী, যার মাঝে প্রথম গুণগুলো (মুসলিম, ইবাদতগুজার, বন্ধু ইত্যাদি) বিদ্যমান আছে। এর পরের স্তরে আছে, যার মাঝে প্রথম গুণগুলো যত বেশি থাকে সে। এভাবে প্রথম গুণগুলোর মধ্যে যার মাঝে সর্বনিম্ন একটি গুণ থাকে সে। একইভাবে, এর উল্টো যার মাঝে দ্বিতীয় শ্রেণির বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি আছে, প্রতিবেশিত্বের দিক থেকে তার স্তর সবচেয়ে নিচে। এভাবেই হিসেব করে সকলের অবস্থা বিবেচনায় প্রতিবেশিত্বের অধিকার আদায় করতে হবে। কখনো কখনো দেখা গেছে এক প্রতিবেশীর মাঝে পরস্পর বিপরীত দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কখনো এর বৈপরীত্যের সংখ্যা আরও বেশি হয়। এসব দিক বিবেচনায় রেখে প্রাধান্য দিতে হবে তাদের মাঝে।’^{৪৯০}

সং প্রতিবেশী লাভকে মানুষের সৌভাগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন

আব্দুল হারিস رحمہ اللہ বলেন, ‘রাসুল ﷺ বলেছেন, “ব্যক্তির সৌভাগ্যের অংশ হচ্ছে, সং প্রতিবেশী, আরামদায়ক বাহন এবং সুপরিসর বাসস্থান।”’^{৪৯১}

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رحمہ اللہ বলেন, ‘রাসুল ﷺ বলেছেন, “চারটি জিনিস সৌভাগ্যের অংশ : নেক স্ত্রী, সুপরিসর বাসস্থান, সং প্রতিবেশী, আরামদায়ক বাহন। আর চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের অংশ : মন্দ প্রতিবেশী, মন্দ স্ত্রী, সংকীর্ণ বাসস্থান, মন্দ বাহন।”’^{৪৯২}

রাসুল ﷺ মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন। তিনি দোয়ায় বলতেন, “হে আল্লাহ, স্থায়ী আবাসের ক্ষেত্রে মন্দ প্রতিবেশী থেকে আপনার আশ্রয় চাই। কারণ, বেদুইনরা বাসস্থান পরিবর্তন করতে থাকে।”’^{৪৯৩}

৪৯০. ফাতহুল বারি : ১০/৪৪২।

৪৯১. মুসনাদু আহমাদ : ১৪৯৪৭। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৯২. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৪০৩২। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৯৩. মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৯৫১। হাদিসের মান : হাসান।

‘রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের আদেশ দিতেন, তাঁরা যেন স্থায়ী বাসস্থানের ক্ষেত্রে মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়। কারণ, মরুভূমির বেদুইনরা জায়গা পরিবর্তন করে নেবে তোমাদের পাশ থেকে। (এরপরে হয়তো মন্দ কেউ এসে উঠবে সে জায়গায়।)’^{৪৯৪}

উত্তম প্রতিবেশী সে-ই, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা বলেন, ‘রাসুল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে উত্তম সঙ্গী সে-ই, যে তার সঙ্গীর নিকট উত্তম। তোমাদের মধ্যে উত্তম প্রতিবেশী সে-ই, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।”’^{৪৯৫}

অর্থাৎ উত্তম সঙ্গী সে-ই, যে তার সঙ্গীর প্রতি উত্তম ব্যবহার করে। তেমনিভাবে উত্তম প্রতিবেশী সে-ই, যে তার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করে।

‘প্রতিবেশীর অধিকার কেবল এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় যে, তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকলেই তার অধিকার আদায় হয়ে যাবে। বরং প্রতিবেশীর কল্যাণের জন্য দরকার হলে নিজেকে কষ্ট করতে হবে। কেবল এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় প্রতিবেশীর অধিকার। প্রতিবেশীর প্রতি উত্তম ব্যবহার করতে হবে, তাকে সৎ ও কল্যাণের নির্দেশনা দিতে হবে। এর স্বরূপ এমন যে, প্রথমে আগ বেড়ে তাকে সালাম দিতে হবে। অসুস্থ হলে সেবা-গুশ্রুষা করতে হবে। তার বিপদে সাহায্য দিতে হবে তাকে। আনন্দের সময় অভিবাদন জানাতে হবে। তার আনন্দে অংশগ্রহণ করতে হবে। তার ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করতে হবে। প্রতিবেশী গাইরে মাহরাম হলে দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। প্রতিবেশী যখন ঘরের বাইরে সফরে থাকবে, তখন তার ঘরের হিফাজত করতে হবে। তার সন্তানদের প্রতি কোমল আচরণ করতে হবে। দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের পথে তাকে আহ্বান করতে হবে।’^{৪৯৬}

৪৯৪. সুনানুন নাসায়ি : ৫৫০২। হাদিসের মান : হাসান।

৪৯৫. সুনানুত তিরমিজি : ১৮৬৭। হাদিসের মান : সহিহ।

৪৯৬. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/২১৩।

প্রতিবেশী যত কাছে হবে হকও তত গুরুত্বপূর্ণ হবে

আয়িশা রাঃ বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সঃ-কে বললাম, “আল্লাহর রাসুল, আমাদের দুজন প্রতিবেশী। কাকে হাদিয়া দেবো আমি?”

তিনি জবাব দিলেন, “যার ঘর তোমার অধিক কাছে, তাকে দাও।”^{৪৯৭}

হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার রাঃ বলেন, ‘নিকটতর প্রতিবেশীকে হাদিয়াটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে, একজনের ঘরে কোনো জিনিস প্রবেশ করলে সেটা নিকটের প্রতিবেশীই দেখে, দূরের প্রতিবেশী নয়। নিকটের প্রতিবেশী দেখার পর অপেক্ষায় থাকে সে জিনিসটার জন্য। অন্যদিকে দূরের প্রতিবেশী দেখেনি, তাই তার প্রতীক্ষায় থাকারও কথা না। তা ছাড়া নিকটের প্রতিবেশী বিপদের সময় সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারে সবার আগে। বিশেষ করে মানুষ যখন ঘুমন্ত বা চেতনাহীন থাকে, তখনও অন্য মানুষের তুলনায় নিকটের প্রতিবেশীই দ্রুত এগিয়ে আসতে পারে সাহায্য করার জন্য।’^{৪৯৮}

প্রতিবেশীর সংজ্ঞায়নে আলিমদের বিভিন্ন মত

- শাফিয়ি ও হাম্বলিদের মতে, নিজ ঘরের চারপাশের ৪০ ঘর হচ্ছে প্রতিবেশী। তাদের দলিল, ‘প্রতিবেশীর অধিকার ৪০ ঘর পর্যন্ত। এদিক থেকে, এদিক থেকে এবং এদিক থেকে।’^{৪৯৯}
- মালিকিদের মতে, নিজ ঘরের সাথে লাগোয়া ঘরের অধিবাসীই প্রতিবেশী। অথবা নিজ ঘরের মুখোমুখি যাদের ঘর, তারাই হচ্ছে প্রতিবেশী। পরস্পরের ঘরের মাঝে ছোটখাটো রাস্তা থাকতে পারে। তবে বেশি দূরত্ব থাকবে না। যেমন বাজার বা প্রশস্ত নদী বড় দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছে এমন হবে না। অথবা একই মসজিদ বা পাশাপাশি দুই মসজিদের মুসল্লি পরস্পরের প্রতিবেশী।

৪৯৭. সহিহুল বুখারি : ২২৫৯।

৪৯৮. ফাতহুল বারি : ১০/৪৪৭।

৪৯৯. আবু ইয়াল্লা রাঃ কৃত ইতহাফুল মাহরাহ : ৫০৯৮। আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। হাদিসের মান : জইফ।

- আবু হানিফা رحمہ اللہ এর মতে, লাগোয়া ঘরের অধিবাসীই প্রতিবেশী। কারণ প্রতিবেশী শব্দের আরবি কোনো কিছুই পাশ্চবর্তী হওয়া বোঝায়।

ইবনে হাজার رحمہ اللہ বলেন, ‘প্রতিবেশীর সংজ্ঞায় সালাফের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়—

আলি رحمہ اللہ বলেন, “যারা একে অপরের ডাক শুনতে পায়, তারা পরস্পরের প্রতিবেশী।”

কেউ কেউ বলেন, “যে তোমার সাথে একই মসজিদে ফজরের সালাত আদায় করে, সে হচ্ছে তোমার প্রতিবেশী।”

সবচেয়ে সঠিক অভিমত হচ্ছে, প্রতিবেশীর সংজ্ঞা যার এলাকায় যেভাবে প্রচলিত, সেভাবে নির্ণীত হবে প্রতিবেশী কারা।

ইবনে কুদামা رحمہ اللہ বলেন, “যে নিকটবর্তী, সে-ই হচ্ছে প্রতিবেশী। এ ক্ষেত্রে যে দেশে যে রূপ প্রচলন আছে, তা-ই ধর্তব্য হবে প্রতিবেশীর সংজ্ঞায়।”^{৫০০}

অল্প হলেও হাদিয়া দিতে উৎসাহিত করেছেন

আবু হুরাইরা رضی اللہ عنہ বলেন, ‘রাসুল ﷺ বলেছেন, “হে মুসলিম নারী, কোনো মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে—চাই তা ছাগলের খুর হোক।”^{৫০১}

হাদিসের ব্যাখ্যা

‘তুচ্ছ মনে না করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা হাদিয়ার বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে, পরিমাণ কম বলে কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে কোনো কিছু হাদিয়া দিতে সংকোচ বোধ না করে। বরং যা থাকবে, কম হোক বেশ হোক, তা-ই হাদিয়া দেবে। যদিও পরিমাণে তা ছাগলের পায়ের খুরের মতো কোনো বস্তু হোক না কেন। রাসুল ﷺ এখানে ছাগলের খুরের কথা উল্লেখ করেছেন হাদিয়ার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য।

৫০০. ফাতহুল বারি : ১০/৪৪৭, মুগনি : ৬/৫৭৮, মাওসুআতুল ফিকহিয়া কুয়াইতিয়া : ১৬/২১৭।

৫০১. সহিহুল বুখারি : ২৫৬৬, সহিহ মুসলিম : ১০৩০।

হতে পারে রাসুল ﷺ-এর এ নিষেধাজ্ঞা হাদিয়াদানকারীর জন্য নয়; বরং এ নিষেধাজ্ঞা হাদিয়া যাকে দেওয়া হয়, তার জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেওয়া হবে, পরিমাণে কম হওয়ার কারণে সে যেন হাদিয়াকে তুচ্ছ মনে না করে।

এ হাদিসে পরিমাণ কম হলেও হাদিয়া দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ, অনেক সময় বেশি পরিমাণ থাকে না। তাই কম কম করে যখন হাদিয়া দেওয়া হতে থাকে, একসময় তা বিরাট পরিমাণ ধারণ করে। এ হাদিসে হৃদয়তার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, লৌকিকতা পরিহার করার।^{৫০২}

প্রতিবেশীকে খাবার পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করতেন তিনি

আবু জার রা বলেন, ‘রাসুল স বললেন, “হে আবু জার, যখন তুমি তরকারি রান্না করবে, তখন তরকারিতে ঝোল বাড়িয়ে দেবে এবং কিছুটা তরকারি তোমার প্রতিবেশীকে দেবে।”^{৫০৩}

হাদিসটি আবু জার রা থেকে অন্য শব্দেও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আমার বন্ধু রা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, “তুমি তরকারি রান্না করার সময় ঝোল বাড়িয়ে দিয়ো। এরপর তোমার বাড়ির প্রতিবেশীদের খোঁজ নিয়ো। তাদের সে তরকারি থেকে সুষমভাবে কিছুটা দিয়ো।”^{৫০৪}

আজকে যারা নিজেদের মুসলিম হিসেবে দাবি করে, তাদের মাঝে এ আমল দেখা যায় কি?! নিজ পরিবারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার রান্না হয়। এরপর সে খাবার পুরোটাই খেতে না পারায় ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রতিবেশীকে দেওয়া হয় না। অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। ক্ষুধা নিবারণের মতো কিছুই নেই তার কাছে।

আর এটি পরিষ্কার প্রতিবেশীর অধিকার লঙ্ঘন এবং মানবিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী। ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণিত, রাসুল স বলেন, ‘যে ব্যক্তি

৫০২. ইমাম নববি রা কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ৭/১২০, ফাতহুল বারি : ৫/১৯৮, ১০/৪৪৫।

৫০৩. সহিহ মুসলিম : ২৬২৫।

৫০৪. সহিহ মুসলিম : ৪৭৫৯।

জ্ঞাতসারে তার প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে তৃপ্তিভরে খেয়ে রাত যাপন করে, সে আমার প্রতি ইমান আনেনি।’৫০৫

রাসুল ﷺ সাহাবিদের উৎসাহিত করতেন, তারা যেন প্রতিবেশীকে খাওয়ায়। আনাস র. বর্ণনা করেন, ‘একবার উম্মে সুলাইম আমাকে বলেন, “নবিজি ﷺ-এর কাছে যাও, তাঁকে বলো, যদি তিনি আমাদের এখানে খেতে চান, তবে যেন খেতে আসেন।”

আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে খবর পৌঁছে দিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমার সাথে যারা আছে, তারাও কি আসবে?”

আমি বললাম, “জি।”

এরপর রাসুল ﷺ উপস্থিত লোকদের বললেন, “চলো।”

আমি উম্মে সুলাইমের কাছে চলে এলাম। কিন্তু রাসুল ﷺ-এর সাথে এত অধিক লোক দেখে বিস্মিত হলাম। পরিস্থিতি দেখে উম্মে সুলাইম বললেন, “আনাস, এ কী করলে তুমি?!”

এর পরপরই রাসুল ﷺ প্রবেশ করলেন। উম্মে সুলাইমকে বললেন, “তোমার কাছে ঘি আছে?”

উম্মে সুলাইম : জি, একটি কৌটায় অল্প ঘি আছে।

রাসুল ﷺ : তা-ই নিয়ে আসো।

এরপর আমি ঘির কৌটা নিয়ে আসলাম। রাসুল ﷺ তা খুললেন এবং বললেন, “বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ এতে বরকত দিন।”

এরপর রাসুল ﷺ উম্মে সুলাইমকে বললেন, “এটি উল্টো করো।” তিনি উল্টো করলেন। রাসুল ﷺ বিসমিল্লাহ পড়ে কৌটাটি নাড়া দিয়ে ঘি বের করতে লাগলেন। তারপর আমি তৃপ্তিভরে খাওয়ার পরিমাণ নিলাম এবং

সেখান থেকে ৮০ জনেরও অধিক লোক খেল। তারপরও কৌটায় ঘি থেকে যায়। রাসুল ﷺ সেটি উম্মে সুলাইমকে দিলেন এবং বললেন, “এখান থেকে নিজে খাও এবং তোমার প্রতিবেশীদের খাওয়াও।”^{৫০৬}

স্ত্রীকে নিয়ে প্রতিবেশীর দাওয়াতে যেতেন

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর এক ফারসি (বর্তমান ইরানি) প্রতিবেশী ছিল। ভালো স্যুপ রান্না করতে পারত সে। একদিন স্যুপ রান্না করে সে রাসুল ﷺ-কে দাওয়াত দিতে আসলো। রাসুল ﷺ তখন বললেন, “আয়িশাও?” সে জবাব দিল, “না।” রাসুল ﷺ বললেন, “তাহলে আমিও না।” লোকটি আবারও দাওয়াত দিল। রাসুল ﷺ আবারও বললেন, “আয়িশাও?” লোকটি উত্তর দিল, “না।” রাসুল ﷺ বললেন, “তবে আমিও না।” তৃতীয়বার দাওয়াত দিলে রাসুল ﷺ একই কথা বললেন। এবার লোকটি “হাঁ” বলল। এরপর তাঁরা দুজন হুড়মুড় করে উঠলেন। পরস্পরকে অনুসরণ করে চলতে চলতে উপস্থিত হলেন সে ফারসির বাড়িতে।^{৫০৭}

হাদিস বিশারদগণ বলেন, ‘ফারসি সাহাবির কাছে খাবারের পরিমাণ কম ছিল। তাই আয়িশা ؓ-কে প্রথমে দাওয়াত দিতে চাননি। তিনি চাইছিলেন, রাসুল ﷺ-কে পেট পুরে খাওয়াতে।’

ইমাম নববি ؒ বলেন, ‘রাসুল ﷺ আয়িশা ؓ-কে রেখে একা দাওয়াতে যেতে অপছন্দ করলেন। স্ত্রীর প্রতি সুন্দর আচরণের এক সুন্দর নিদর্শন এটি। দাম্পত্য জীবনের অধিকার আদায় ও অন্তরঙ্গতারও একটি যথার্থ উদাহরণ এ হাদিসটি।’^{৫০৮}

প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন

উম্মে সালামা ؓ বলেন, ‘একদিন আমি ও রাসুল ﷺ একই লেপের নিচে শুয়ে ছিলাম। এমন সময় আমাদের প্রতিবেশীর একটি ছাগল দরোজা ডিঙিয়ে

৫০৬. মুসনাদু আহমাদ : ১৩১৩৫। হাদিসের মান : সহিহ।

৫০৭. সহিহ মুসলিম : ২০৩৭।

৫০৮. ইমাম নববি ؒ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৩/২০৯।

ভেতরে চলে এল। আমাদের খাবার রুটি থেকে একটি নিয়ে নিল মুখে। আমি তখন ছাগলটির দিকে এগিয়ে গেলাম। তার মুখ থেকে রুটিটি কেড়ে নিলাম।

তখন রাসুল ﷺ বললেন, “এত কঠোরতার সাথে তার থেকে নেওয়া উচিত হয়নি তোমার জন্য। কারণ, প্রতিবেশীকে এতটুকু কষ্ট দেওয়াও গুরুতর।”^{৫০৯}

মুনাবি ﷺ বলেন, ‘অর্থাৎ প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে যে কষ্ট দেয়, কম হলেও সে কষ্ট ক্ষমার অযোগ্য। কষ্টের পরিমাণ কম হলেও এতে গুনাহ হয় অধিক।’^{৫১০}

হাসান ﷺ বলেন, ‘কেবল প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়াই প্রতিবেশীর হক উত্তমরূপে আদায় করা নয়। বরং প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে আসা কষ্টে ধৈর্যধারণ করাও উত্তম প্রতিবেশিত্বের অংশ।’^{৫১১}

প্রতিবেশীর মূল্যায়নেই চেনা যায় সৎ মানুষ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, ‘এক লোক রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, “আমি কীভাবে বুঝব যে, কখন আমি ভালো করি আর কখন খারাপ কর্ম করি?”

রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, “যখন তুমি শুনবে, তোমার প্রতিবেশী বলছে, তুমি ভালো করেছ। তবে তুমি ভালো করেছ। যখন তুমি শুনবে, তোমার প্রতিবেশী বলছে, তুমি মন্দ করেছ। তবে তুমি মন্দ করেছ।”^{৫১২}

প্রতিবেশীর প্রয়োজনে কখনো না বোলো না

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কোনো প্রতিবেশী যদি প্রয়োজনে তোমাদের দেয়ালে কড়িকাঠ স্থাপন করতে চায়, তোমরা তাকে বাধা দিয়ো না।”

৫০৯. তাবারানি ﷺ কৃত আল-কাবির : ১৩/২৫৮, হাদিস নং : ৫৩৫; ইবনে আরাবি ﷺ কৃত মা'জাম : ৩৫৩; হাইসুমি ﷺ আল-মাজমা'তে বলেন, ‘এ হাদিসের সনদের রাবিগণ সিকাহ।’ আলবানি ﷺ-এর মতে হাদিসটি জইফ; জইফুল জামি : ২০৭৭।

৫১০. আত-তাইসির বি-শারহিল জামিয়িস সাগির : ২/৫০২।

৫১১. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৪১।

৫১২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৩৩। হাদিসের মান : সহিহ।

আবু হুরাইরা رضي الله عنه হাদিস বলা শেষ করে দেখলেন, উপস্থিত লোকদের মাথা নিচু হয়ে আছে। তখন তিনি বলে উঠলেন, “কী হলো আমি যে তোমাদের অনাগ্রহী দেখছি? আল্লাহর শপথ, যতক্ষণ তোমরা এটি (হাদিস) গ্রহণ করে না নেবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের ঘাড়ের ওপর এ কথা নিষ্ক্ষেপ করতে থাকব। (ততক্ষণ আমি তোমাদের হাদিসটি গুনিয়ে যাব।)”^{৫১৩}

ইবনে রজব رحمته الله বলেন, ‘এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ইমাম আহমাদের মাজহাব হচ্ছে, প্রতিবেশীর যখন প্রয়োজন পড়বে অপর প্রতিবেশীর দেয়ালে কাঠ স্থাপনের, অপর প্রতিবেশীর সে সুযোগ দেওয়া আবশ্যিক। তবে দেয়ালের কোনো ক্ষতি হতে পারবে না।

জুমহুর আলিমদের মত : একাধিক হাদিসে এসেছে, কোনো মুসলমানের সম্ভ্রুটি ব্যতীত তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করা হারাম। তাই জুমহুর আলিমগণ অন্যান্য হাদিসের সাথে সমন্বয় করে এ হাদিসের আদেশকে মুসতাহাব হুকুম বলে উল্লেখ করেছেন।^{৫১৪}

প্রতিবেশীকে শুফআর হক দিয়েছেন

রাসুল ﷺ বলেন, ‘প্রতিবেশী অধিক হকদার তার নৈকট্যের কারণে।’^{৫১৫}

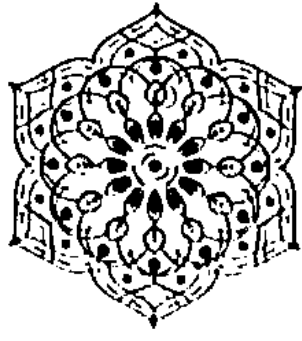
‘প্রতিবেশী যদি (তার অংশীদার প্রতিবেশীকে না জানিয়ে) নিজের অংশের জমি অন্য কাউকে বিক্রি করে দেয়, তবে অংশীদার প্রতিবেশীর এই অধিকার আছে যে, সে ক্রেতা থেকে একই মূল্য দিয়ে জমিটি নিয়ে নেবে। এটিকে শুফআর হক বলে।’^{৫১৬}

৫১৩. সহিহুল বুখারি : ২৪৬৩, সহিহ মুসলিম : ১৬০৯, সুনানুত তিরমিজি : ১২৭৩। শব্দউৎস : সুনানুত তিরমিজি।

৫১৪. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৪০।

৫১৫. সহিহুল বুখারি : ২২৫৮। আবু রাফি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

৫১৬. আল-ইকনা ফি ফিকহিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্মল : ২/৩৬২।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মেহমান ও মেজবানের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

এই পরিচ্ছেদকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ১. মেজবান হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ। ও ২. মেহমান হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ।

মেজবান হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসুল ﷺ উদারতা ও বদান্যতায় সবার শীর্ষে ছিলেন। আর উত্তম খাতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো জুড়ি নেই। ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। আর রমাজান মাসে তাঁর উদারতা আরও বেড়ে যেত।’^{৫১৭}

প্রতিবছর রমাজানে জিবরিল ؑ রাসুল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। রাসুল ﷺ তাঁকে কুরআন পড়ে শোনাতে। আর যখন জিবরিল ؑ-এর সাথে রাসুল ﷺ-এর সাক্ষাৎ হতো, তখন তাঁর দানের গতি প্রবহমান বাতাসের চেয়ে দ্রুত হয়ে পড়ত।

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, ‘পরোপকার, বদান্যতা ও সাহসিকতায় রাসুল ﷺ সবার শীর্ষে ছিলেন।’^{৫১৮}

তাঁর বদান্যতার একটি বিশেষ দিক হলো অতিথিপরায়ণতা। আরবরা অতিথিপরায়ণতা ব্যতীত বদান্যতার কল্পনাও করতে পারে না। যার মাঝে এই গুণটি নেই, তাকে তারা দানশীল বলে স্বীকার করে না। এমনকি তাদের কেউ কেউ মেহমানের জন্য মাইল-দুই মাইল সফর পর্যন্ত করে থাকে।

৫১৭. সহিহুল বুখারি : ৬, সহিহ মুসলিম : ২৩০৮।

৫১৮. সহিহুল বুখারি : ২৮২০, সহিহ মুসলিম : ২৩০৭।

রাসুল ﷺ-এর ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে বেশি জানেন, সেই উম্মত-জননী খাদিজা ﷺ তাঁর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ‘আল্লাহর কসম, আপনি আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় ও নিঃস্বের সহায় হন, মেহমানের মেহমানদারি করেন এবং অধিকার-বঞ্চিতদের সাহায্য করেন।’^{৫১৯}

এখানে খাদিজা ﷺ বিশেষ গুণসমূহের মধ্যে তাঁর অতিথিপরায়ণতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ মেহমানদের সম্মান করার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। সফরসঙ্গীদের সঙ্গে তাঁর অসাধারণ আচরণ সবাইকে মুগ্ধ করত। ফুলের মতো পাপড়ি মেলে তাঁর চরিত্রে বিকশিত হয়েছিল অনুপম শিষ্টাচার—মেহমান ও মেজবানের প্রতি নিখুঁত আচরণ।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ থেকে কেউ কিছু চেয়েছে আর তিনি ‘না’ বলেছেন, এমনটি কখনো ঘটেনি।

وَإِذَا سَخَوْتُ بَلَغْتَ بِالْجُودِ الْمَدَى *** وَفَعَلْتَ مَا لَا تَفْعَلُ الْكُرْمَاءُ

‘যখন প্রসারিত হলো তোমার দানের হাত, উদারতার চূড়ায় নয় একেবারে চূড়ান্তে গিয়ে থামলে! ইতিহাসখ্যাত যত দানবীর পড়ে রইল তোমার পেছনে—বহু পেছনে।’

আল্লাহ তাআলা মহানুভব এবং তিনি মহানুভবতা ভালোবাসেন

সাহল বিন সাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মহানুভব এবং তিনি মহানুভবতা ও উন্নত চরিত্র ভালোবাসেন। আর মন্দ কাজ অপছন্দ করেন।’^{৫২০}

এ জন্যই আমরা বিন হারিস ﷺ বলেন, ‘মৃত্যুর সময় রাসুল ﷺ দিনার, দিরহাম, গোলাম, বাঁদি ইত্যাদি কিছুই রেখে যাননি। কেবল রেখে যান একটি

৫১৯. সহিহুল বুখারি : ৪, সহিহ মুসলিম : ১৬০।

৫২০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৫২।

সাদা খচ্চর, যুদ্ধের হাতিয়ার আর এক খণ্ড জমি—যেটি তিনি সাদাকা করে দিয়েছিলেন। এমনকি মৃত্যুর সময় তাঁর বর্মটি এক ইহুদির কাছে ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল।'৫২১

অতিথিপরায়ণতাকে ইমানের আলামত বলেছেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ইমান রাখে, সে যেন মেহমানের প্রতি সদাচার করে।'৫২২

মেহমানের প্রতি সদাচার বলতে বোঝায়, তার সাথে হাসিমুখে কথা বলা, দ্রুত তার মেহমানদারির ব্যবস্থা করা, উদার হৃদয়ে তার সেবা করা ইত্যাদি।

অতিথিপরায়ণ ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'তারুক অভিযানের সময় রাসুল ﷺ খুতবা দিলেন। বললেন, “মানুষের মধ্যে দুই ব্যক্তির মতো (উত্তম) কেউ নেই। তাদের একজন হলো, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকে। দ্বিতীয়জন হলো, যে ছাগলের পাল নিয়ে জঙ্গলে বসবাস করে, মেহমানদারি করে এবং মেহমানের হক আদায় করে।'৫২৩

প্রত্যেক মুসলমান মেহমানদারি পাওয়ার হক রাখে

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'এক রাত মেহমানদারি করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। কারও বাড়ির সীমানায় যদি মেহমানের পদার্পণ ঘটে, তবে এক দিনের মেহমানদারি তার ওপর কর্তব্য হিসেবে আপতিত হয়। মেহমান চাইলে তা আদায় করে নিতে পারে কিংবা তার দাবি পরিত্যাগ করতে পারে।'৫২৪

৫২১. সহিহুল বুখারি : ২৯১৬, সহিহ মুসলিম : ১৬০৩। আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত।

৫২২. সহিহুল বুখারি : ৬০১৮, সহিহ মুসলিম : ৪৭। আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত।

৫২৩. মুসনাদু আহমাদ : ১৯৮৮।

৫২৪. সুনানু আবু দাউদ : ৩৭৫০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৬৭৭।

খাত্তাবি ؓ বলেন, ‘যুগ যুগ ধরে মেহমানদারি ভালো ও নেককার মানুষদের আলামত হিসেবে স্বীকৃত এবং মেহমানদারি করতে অস্বীকৃতি মানুষের কাছে নিন্দিত।’^{৫২৫}

রাসুল ؐ উসমান বিন মাজউন ؓ-কে বললেন, ‘নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার মেহমানের অধিকার রয়েছে।’^{৫২৬}

উকবা বিন আমির ؓ বলেন, ‘একবার আমরা বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কখনো কখনো আমাদের এমন সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন, যারা আমাদের মেহমানদারি করে না। এমতাবস্থায় আমরা কী করব?” উত্তরে রাসুল ؐ বললেন, “যদি তোমরা কোনো কওমের কাছে গিয়ে পৌঁছাও, তখন মেহমানদারিস্বরূপ তারা যা কিছু তোমাদের দেয়, তা সাদরে গ্রহণ করো। আর যদি তারা তা না করে, তখন মেহমানদারির অধিকার তাদের থেকে (যেকোনো উপায়ে) আদায় করে নিয়ো।”’^{৫২৭}

এই হাদিস মেহমানদারি গ্রহণ করতে একান্ত বাধ্য লোকদের জন্য প্রযোজ্য। কেননা, তাদের মেহমানদারি করা ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি তাদের মেহমানদারি না করে, তখন তারা যেকোনো উপায়ে তাদের প্রয়োজন আদায় করে নেওয়ার অধিকার রাখবে।

আর কেউ কেউ বলেন, ‘হাদিসের মর্ম হচ্ছে, তোমাদের মেহমানদারি না করার কারণে তোমরা তাদের কৃপণতা ও নীচুতার কথা লোকদের বলে তাদের মানহানি করতে পারবে।’^{৫২৮}

মেহমানদারির সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন

আবু গুরাইহ ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুল ؐ ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের (কিয়ামতের) ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করার

৫২৫. আওনুল মাবুদ : ১০/১৫৪।

৫২৬. সুনানু আবি দাউদ : ১৩৬৯। আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত।

৫২৭. সহিহুল বুখারি : ২৪৬১, সহিহ মুসলিম : ১৭২৭

৫২৮. ইমাম নববি ؓ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১২/৩২।

মাধ্যমে তার ন্যায্য অধিকার আদায় করে দেয়। লোকেরা বলল, “হে আল্লাহর রাসুল, তার ন্যায্য অধিকার কী?” তিনি বললেন, “এক দিন ও এক রাত তার মেহমানদারি করা। সাধারণভাবে মেহমানদারি হলো তিন দিন। এর অতিরিক্ত করলে তা হবে সাদাকা অর্থাৎ অতিরিক্ত উদারতা। আর কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয় মেজবানের কাছে এত বেশি সময় অবস্থান করা, যাতে সে গুনাহে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।” লোকেরা বলল, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, গুনাহে লিপ্ত হতে বাধ্য হয় মানে কী?” তিনি বললেন, “এত বেশি সময় তার কাছে অবস্থান করা, যাতে মেহমানদারি করার মতো তার কাছে কিছু থাকে না।”^{৫২৯}

ওপরে উল্লেখিত হাদিসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয়, মেহমানের হক তিন স্তরের : ওয়াজিব, মুসতাহাব ও সাদাকা।

ওয়াজিব হলো এক দিন, এক রাত। মুসতাহাব হলো তিন দিন। তিন দিনের বেশি মেহমানদারি করা সাদাকা।

মেহমান যদি মুসাফির হয় এবং অন্য শহর থেকে আসা কোনো আগন্তুক হয়, তখন তাকে সম্মান করা এবং তাকে খানা খাওয়ানো মেজবানের ওপর ওয়াজিব। যদি না করে, তাহলে তার সম্পদে মেহমানের হক থেকে যাবে।

পক্ষান্তরে, মেহমান যদি নিজ শহরের হয়, তখনও হাদিসের ব্যাপকতার দাবি অনুযায়ী তাকে সম্মান করতে হবে এবং তাকে খানা খাওয়াতে হবে। তবে যে মেহমানকে খানা খাওয়ানো রাসুল ﷺ ওয়াজিব বলেছেন, এই মেহমান সেই মেহমান নয়। তাই একে খানা না খাওয়ালে মেজবানের সম্পদে তার হক থেকে যাবে না।

আর তিন দিনের বেশি অবস্থান করার মাধ্যমে মেজবানের ওপর বোঝা হওয়া মেহমানের জন্য জাযিজ নেই। কেননা, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘মেহমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে মেজবানের কষ্ট হওয়া পর্যন্ত তার নিকট অবস্থান করবে।’^{৫৩০}

৫২৯. সহিহুল বুখারি : ৬০১৯, সহিহ মুসলিম : ৪৮

৫৩০. সহিহুল বুখারি : ৬১৩৫। আবু গুরাইহ ﷺ থেকে বর্ণিত।

হাদিসের মর্ম হচ্ছে, মেজবানের পক্ষ থেকে আরও কদিন থাকার অনুরোধ ব্যতীত তিন দিনের বেশি তার কাছে মেহমান হয়ে থাকা অবৈধ।

দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর অতিথিপরায়ণতার ব্যাপ্তি বোঝা যেত

মিকদাদ বিন আমর رضي الله عنه বলেন, ‘আমি ও আমার এক বন্ধু (মদিনায়) এলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। আমরা মানুষের কাছে নিজেদের পেশ করতে লাগলাম। কেউই আমাদের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করল না। অতঃপর আমরা রাসূল ﷺ-এর নিকট এলাম। বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা খুবই ক্ষুধার্ত। লোকদের নিকট গিয়েছিলাম, কেউ আমাদের মেহমানদারি করতে রাজি হয়নি। তাই আপনার নিকট আসলাম।”

তখন তিনি আমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনটি মেষ ছিল। নবিজি ﷺ বললেন, “তোমরা দুধ দোহন করবে। এ দুধ আমরা ভাগ করে পান করব।” এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ পান করত। আর আমরা নবিজি ﷺ-এর জন্য তাঁর অংশ তুলে রাখতাম।

মিকদাদ বলেন, “তিনি রাতে আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হয় আর জাগ্রত ব্যক্তি শুনতে পায়। এরপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করতেন এবং ফিরে এসে দুধ পান করতেন। এক রাতে আমার কাছে শয়তান এল। আমি তখন আমার অংশ পান করে ফেলেছিলাম। সে বলল, “মুহাম্মাদ আনসারিদের কাছে গেলে তারা তাকে হাদিয়া দিয়ে থাকে এবং তাঁদের কাছে তিনি খেয়েও থাকেন। তার এ সামান্য দুধের প্রয়োজন নেই।” তখন আমি এসে সেটুকুও পান করে ফেললাম। দুধ যখন ভালোভাবে আমার পেটে প্রবেশ করল এবং আমি বুঝলাম, এ দুধ বের করার আর কোনো উপায় নেই, তখন শয়তান আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বলল, “তোমার সর্বনাশ হোক তুমি কী কাণ্ড করলে! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুধ পান করে ফেলেছ? তিনি এসে যখন তা পাবেন না, তখন তোমার ওপর

বদদোয়া করবেন। তাতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে।”

আমার গায়ে ছিল একটা চাদর। এটি এত ছোট যে পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে আবার মাথা আবৃত করতে গেলে পা দেখা যায়। আমার ঘুম আসছিল না। আমার সঙ্গীদ্বয় ঘুমাচ্ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি।

এরপর নবিজি ﷺ এসে যেভাবে সালাম দিতেন, সেভাবেই সালাম দিলেন। তারপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করলেন। এরপর দুধের কাছে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি তাঁর মাথা আসমানের দিকে তুললেন। আমি তখন (মনে মনে) বললাম, “এখনই তিনি আমার ওপর বদদোয়া করবেন, আর আমি ধ্বংস হয়ে যাব।” তিনি বললেন, “হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি আমাকে আহার করায়, তাকে তুমি আহার করাও। আর যে আমাকে পান করায়, তাকে তুমি পান করাও।”

মিকদাদ ﷺ বলেন, “এ সময় আমি চাদরটি নিয়ে শরীরে বাঁধলাম, আর একটি ছুরি নিলাম, তারপর (এই ভেবে) মেষগুলির কাছে গেলাম যে, এগুলোর মাঝে যেটি সবচেয়ে মোটাতাজা, আমি সেটি রাসূল ﷺ-এর জন্য জবাই করব। গিয়ে দেখলাম, সেটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য সব মেষও দুধে পরিপূর্ণ। এরপর আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের একটি পাত্র নিয়ে এলাম, যাতে তাঁরা দুধ দোহানোর কথা ভাবতেন না (পাত্রটি বড় হওয়ার কারণে)।

আমি তাতেই দুধ দোহন করলাম, এমনকি পাত্রের ওপরিভাগে ফেনা ভেসে উঠল। এরপর আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি বললেন, “তোমরা কি রাতের দুধ পান করেছ?” আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি পান করুন।” তিনি পান করলেন, এরপর আমাকে দিলেন। আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি পান করুন।” তিনি পান করে আবার আমাকে দিলেন। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, নবিজি ﷺ পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং আমি তাঁর দোয়া পেয়ে গেছি, তখন আমি হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে গেলাম।

নবিজি ﷺ বললেন, “হে মিকদাদ, এটি তাহলে তোমার কাজ?” তখন আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এই এই কাজ করেছি।” তখন নবিজি ﷺ

বললেন, “এটা একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানি। তুমি কেন আমাকে অবহিত করলে না? আমরা আমাদের সাথিদ্বয়কে জাফত করতাম, তাহলে তারাও এর ভাগ পেত।”

আমি তখন বললাম, “যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন— তাঁর শপথ, আপনি যখন পেয়েছেন এবং আমি যখন আপনার সাথে ভাগ পেয়েছি, তখন অন্য কোনো লোক পেয়েছি কি পায়নি, তার পরোয়া করি না।”^{৫৩১}

‘আমি হাসতে হাসতে জমিনে পড়ে গেলাম’—এর কারণ হলো, তিনি রাসুল ﷺ-এর ভাগের দুধ খেয়ে খুব টেনশনে ছিলেন, রাসুল ﷺ তার জন্য আবার বদদোয়া করেন কি না! কিন্তু যখন দেখলেন, রাসুল ﷺ পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং তার ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর দোয়া কবুল হয়ে গেছে, তখন আনন্দের আতিশয্যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। মাত্রাতিরিক্ত পেরেশানির স্থলে মাত্রাতিরিক্ত খুশি! এমন অবস্থায় আর নিজেকে ধরে রাখেন কেমন করে? তাই খুশিতে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন।^{৫৩২}

মেহমানের সাথে বসে খোশগল্প করতেন

রাসুল ﷺ-এর আজাদকৃত দাস সাওবান ﷺ বলেন, ‘একবার আমাদের বাড়িতে এক বেদুইন মেহমান এলেন। রাসুল ﷺ তাকে নিয়ে বাড়ির সামনে বসলেন। তারপর রাসুল ﷺ তাকে লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন যে, ইসলামে এসে তারা কেমন খুশি, সালাতের সাথে তাদের কেমন সখ্যতা গড়ে উঠেছে? মেহমান তাঁকে প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। এতে রাসুল ﷺ-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলাম।

তারপর যখন দিন বেড়ে খাবারের সময় হলো, তখন রাসুল ﷺ আমাকে ডেকে চুপিচুপি বললেন, “আয়িশার ঘরে যাও আর তাকে বলো যে, রাসুলের একজন মেহমান আছে।”

৫৩১. সহিহ মুসলিম : ২০৫৫

৫৩২. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৪/১৫।

আয়িশা   বললেন, “সে সত্তার শপথ—যিনি হিদায়াত ও সত্য দ্বীন প্রেরণ করেছেন, আমাদের ঘরে মানুষের খাওয়ার মতো কিছুই নেই।”

এরপর রাসুল   আমাকে এক এক করে তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। কিন্তু সকলেই আয়িশা  -এর মতো ওজর পেশ করলেন। এতে রাসুল  -এর চেহারা মলিন হয়ে উঠতে দেখলাম।

বেদুইন বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, “এ যুগের বেদুইনরা কষ্ট সহ্য করতে পারে বেশ। আমরা শহরবাসীর মতো নই। একটি খেজুর ও একটু দুধই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।”

তখন সামনে দিয়ে সদ্য দুধ দোহনকৃত আমাদের একটি ছাগী হেঁটে যাচ্ছিল। তাকে আমরা সামরা বলে ডাকতাম। রাসুল   তার নাম ধরে ‘সামরা, ও সামরা’ বলে ডাক দিলেন।

ছাগীটি ম্যাঁ ম্যাঁ করতে করতে রাসুল  -এর কাছে আসলো। রাসুল   বিসমিল্লাহ বলে তার পায়ের পাশ দিয়ে হাত গলিয়ে ওলান স্পর্শ করলেন। সাথে সাথে ছাগীর ওলান দুধে ভরপুর হয়ে গেল!

রাসুল   আমাকে ডেকে পাত্র আনতে বললেন। পাত্র নিয়ে আসলে তিনি বিসমিল্লাহ বলে দুধ দোহন করলেন। পাত্রটি তখনই ভরে গেল দুধে।

এরপর বললেন, “বিসমিল্লাহ বলে তাকে দাও।”

আমি মেহমানকে তা দিলাম। তিনি লম্বা এক চুমুক দিয়ে তা থেকে পান করলেন। অতঃপর পাত্র রেখে দেওয়ার ইচ্ছা করলে রাসুল   বললেন, “আবার পান করো।” তিনি আবার পান করলেন। এরপর রেখে দেওয়ার ইচ্ছে করলে রাসুল আবার বললেন, “আবার পান করো।” এভাবে কয়েকবার পান করে তার পেটভর্তি হয়ে গেল। আল্লাহ যতটুকু চাইলেন, মেহমান ততটুকু পান করলেন।

এরপর রাসুল   বিসমিল্লাহ বলে আবারও দুধ দোহন করলেন। সাথে সাথে পাত্রটি ভরে গেল। অতঃপর বললেন, “এগুলো আয়িশার কাছে নিয়ে যাও। তারপর যে পরিমাণ সম্ভব, সে পরিমাণ যেন সে এখান থেকে পান করে।”

রাসুল ﷺ-এর আদেশ পালনের পর আমি ফিরে এলাম। তিনি আগের মতো বিসমিল্লাহ বলে দুধ দোহন করলেন। পাত্র পূর্ণ হলো। অতঃপর আমাকে এক এক করে তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। যখনই কোনো স্ত্রী পান করতেন, বিসমিল্লাহ বলে পুনরায় দুধ দোহন করে আমাকে আরেক জনের কাছে পাঠাতেন। এভাবে একে একে আমাকে তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। সবার কাছ থেকে ফিরে এসে আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে এলাম।

তিনি বললেন, “আমার দিকে বাটিটি উত্তোলন করো।” আমি বাটি ওঠালাম। তিনি বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহ যতটুকু চান পান করলেন। এরপর আমাকে দিলেন। আমি পাত্রে ঠোট লাগিয়ে পান করলাম। দুধটা মধুর চাইতেও মিষ্টি ছিল। মিশকের চাইতেও বেশি সুগন্ধ ছিল। এরপর রাসুল ﷺ বললেন, “হে আল্লাহ, এ ছাগীর মাঝে তার পরিবারের জন্য বরকত দিন।”^{৫৩৩}

মেহমানদারির সামর্থ্য না থাকলে মেহমানকে অন্যের হাতে তুলে দিতেন

আবু হুরাইরা র. বলেন, ‘এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, “আমি খুব ক্ষুধার্ত।” তিনি তাঁর কোনো এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন, “যে সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন—তাঁর শপথ, আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই।” তিনি অন্য এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনিও একই কথা বললেন। এভাবে তাঁরা সকলে একই কথা বললেন, “সেই সত্তার শপথ—যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আমার নিকট পানি ছাড়া আর কিছুই নেই।”

তখন রাসুল ﷺ বললেন :

أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ

“কোনো ব্যক্তি কি নেই, যে আজ রাতে লোকটির মেহমানদারি করবে? আল্লাহ তার ওপর রহম করবেন।”

এ সময় জনৈক আনসারি ব্যক্তি উঠে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি করব।” এ বলে তিনি মেহমানকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন,

“রাসুল ﷺ-এর মেহমানকে সম্মান করো।” স্ত্রী বললেন, “বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত আমাদের ঘরে তো আর কিছুই নেই।” আনসারি বললেন, “তুমি আহার প্রস্তুত করো এবং চেরাগ জ্বালিয়ে রাখো। আর বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর যখন মেহমান প্রবেশ করবেন, তখন চেরাগ সেখানে রাখবে। তাকে বোঝাবে যে, আমরাও আহার করছি। মেহমান যখন খাওয়া শুরু করবে, তখন তুমি চেরাগের কাছে গিয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে।”

(স্বামীর কথা অনুযায়ী) স্ত্রী চেরাগ জ্বালালেন, বাচ্চাদের ঘুম পাড়ালেন এবং সামান্য খাবার যা ছিল, তা উপস্থিত করলেন। (তারপর মেহমানসহ তারা খেতে বসলেন।) তখন চেরাগ ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে তা নিভিয়ে দিলেন এবং মেহমানকে বোঝাতে থাকলেন যে, তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন।

এভাবে তারা উভয়ে (বাচ্চারা-সহ) সারা রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকলেন।

সকালে যখন রাসুল ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, “আল্লাহ তাআলা তোমাদের গতকালের কার্যকলাপ দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা (বলেছেন) খুশি হয়েছেন।” এবং আয়াত নাজিল করেছেন :

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“তারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর যাদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।”^{৫৩৪-৫৩৫}

► হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- রাসুল ﷺ ও তাঁর পরিবার দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। বিলাসিতা তাঁদের মাঝে ছিল না। ক্ষুধা ও অনটনের সময় তাঁরা সবর করতেন।
- কওমের সর্দারের জন্য উচিত হলো, প্রথমে তিনি নিজেই যথাসাধ্য মেহমানদারি করার চেষ্টা করবেন। অতঃপর অন্যান্য লোকের কাছে

৫৩৪. আল-হাশর, ৫৯ : ৯।

৫৩৫. সহিহুল বুখারি : ৩৭৯৮, সহিহ মুসলিম : ২০৫৪।

ভালো কাজের সহযোগিতা চাওয়ার ভিত্তিতে মেহমানদারি করার কথা বলবেন।

- অনটনের সময়েও অপরের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা চাই।
- মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া ফজিলতপূর্ণ কাজ।
- উল্লিখিত আনসারি সাহাবি ও তাঁর স্ত্রীর অনেক ফজিলত অর্জিত হয়েছে।
- মেহমান মেজবানের অভাব দেখে স্বাচ্ছন্দ্যে মেহমানদারি গ্রহণ না করার আশঙ্কা থাকলে মেজবান কোনো উপায় অবলম্বন করে মেহমানকে তার অভাব বুঝাতে দেবে না। যেমনটি হাদিসের ঘটনায় সাহাবি ও তাঁর স্ত্রী চেরাগ নিভিয়ে উপায় অবলম্বন করেছেন। কেননা, যদি মেহমান দেখতে পেতেন যে, বাড়িতে খাবার খুব কম আছে, আর মেজবান তার সাথে খাচ্ছেন না, তখন তিনিও আহার করা থেকে বিরত থাকতেন।^{৫৩৬}

মেহমান কাফির হলেও সম্মান প্রদর্শন করতেন

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, ‘রাসুল সঃ-এর কাছে এক কাফির মেহমান হলো। রাসুল সঃ তার জন্য একটি ছাগল থেকে দুধ দোহন করতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সে তার দুধ পান করল। অতঃপর আরেকটি ছাগলের দুধ দোহনের নির্দেশ দিলেন—সে তাও পান করল, তারপর আরেকটি ছাগল... এভাবে সাতটি ছাগল থেকে দুধ দোহন করে তাকে পান করালেন।

সকালবেলা সে ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর রাসুল সঃ তার জন্য একটি ছাগলের দুধ দোহন করার নির্দেশ দিলেন। সে তা পান করল। অতঃপর আরেকটির দুধ দোহনের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তা পুরোপুরি পান করতে পারল না। তখন রাসুল সঃ বললেন, “মুমিন এক পেটে খাবার গ্রহণ করে আর কাফির সাত পেটে খাবার গ্রহণ করে।”^{৫৩৭}

৫৩৬. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১৪/১২।

৫৩৭. সহিহুল বুখারি : ৫৩৯৭, সহিহ মুসলিম : ২০৬৩।

হাদিসের মর্ম হলো, মুমিন বিসমিল্লাহ বলে খাবার গ্রহণ করে। ফলে তার দুটি উপকার অর্জিত হয়। ১. খাবারে বরকত হয়। ২. শয়তান খাবারে ভাগ বসাতে পারে না। ফলে মুমিনের খাবার কম লাগে। যেন কেবল একটি পেটেই সে খাবার গ্রহণ করে।

পক্ষান্তরে, বিসমিল্লাহ না পড়ার কারণে কাফিরের খাবারে বরকত হয় না। এ ছাড়াও তার খাবার থেকে শয়তানও খায়। তাই স্বাভাবিকভাবে তার আহাৰ্য বেশি হয়। যেন সাত অল্প দিয়েই সে খাবার গ্রহণ করে।

মুমিন শরিয়তের শিষ্টাচার বজায় রেখে খাবার গ্রহণ করে। ফলে সে এক পেটে খায়। আর কাফির প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হয়ে খাবার গ্রহণ করে, তাই সে সাত পেটে খাবার খায়।

কেউ কেউ বলেন, ‘হাদিসের মর্ম হচ্ছে, প্রকৃত মুমিন প্রয়োজন অনুপাতে খাবার গ্রহণ করে। অল্পতেই পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। কাফির তার বিপরীত। সে লোভীদের মতো যতটুকু পারে সাবাড় করে।’^{৫৩৮}

অতিথিদের সেবা করতেন

খন্দক যুদ্ধের বর্ণনা-সম্পর্কিত জাবির -এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ‘আমি রাসুল -কে ডেকে বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার (বাড়িতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। আপনি একজন বা দুজন সাথে নিয়ে চলুন।” রাসুল  বললেন, “কী পরিমাণ খাবার আছে?” আমি তার নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, “এ তো অনেক উত্তম।” এরপর তিনি আমাকে ডেকে বললেন, “তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বলো, সে যেন আমি না আসা পর্যন্ত উনুন থেকে ডেকচি ও রুটি না নামায়।”

এরপর তিনি বললেন, “ওঠো (জাবির তোমাদের খাবার দাওয়াত দিয়েছে)।” মুহাজিরগণ উঠলেন (এবং চলতে লাগলেন)। জাবির  তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন, “এখন কী হবে?” নবিজি  তো মুহাজির, আনসার এবং

তাদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন। তিনি (জাবিরের স্ত্রী) বললেন, “তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?” আমি বললাম, “হ্যাঁ।”

এরপর নবিজি ﷺ (উপস্থিত হয়ে) বললেন, “তোমরা সকলেই প্রবেশ করো এবং ভিড় কোরো না।” এ বলে তিনি রুটি টুকরো করে এর ওপর গোশত দিয়ে সাহাবিগণের নিকট তা বিতরণ করতে শুরু করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকাচি এবং উনুন ঢেকে রেখেছিলেন। এমনি করে তিনি রুটি টুকরো করে প্রত্যেকের হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন। এতে সকলে পেট ভরে খাওয়ার পরেও কিছু বাকি রয়ে গেল। অতঃপর তিনি (জাবিরের স্ত্রীকে) বললেন, “এগুলো তুমি খাও এবং অন্যকে হাদিয়া দাও। কেননা, লোকদেরও ক্ষুধা পেয়েছে।”^{৫৩৯}

এই মুহাজির ও আনসার মেহমানগণ যদিও জাবির ﷺ-এর ঘরে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা আসলে রাসুল ﷺ-এর মেহমান ছিলেন। কেননা, খাবার বেড়ে যাওয়াটা রাসুল ﷺ-এর মুজিজার কারণেই হয়েছে। জাবির ﷺ-এর যে খানা ছিল, তা কেবল কয়েকজন খেতে পারতেন। আর রাসুল ﷺ-এর বরকতে তা খন্দক খননে নিয়োজিত সকল মুজাহিদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল।

এখানে রাসুল ﷺ মেহমানদের সেবা করেছেন। তাদের হাতে হাতে গোশত ও খাবার বণ্টন করেছেন। এর সবই মেহমানের প্রতি তাঁর অনবদ্য অতিথিপরায়ণতার বহিঃপ্রকাশ।

মেহমানদের আচরণে কষ্ট হলেও তাদের বিদায় করতে লজ্জা পেলেন

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَازِلٍ فَإِنْ دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا
وَلَا مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ
وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

‘হে মুমিনগণ, তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহাৰ্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবির গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, তবে অতঃপর খাওয়া শেষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে চলে এসো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবির জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না।’^{৫৪০}

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের রাসুল ﷺ-এর গৃহে প্রবেশ করার আদব শিক্ষা দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, গৃহে প্রবেশের অনুমতি ছাড়া খাবার খাওয়ার উদ্দেশ্যে নবির গৃহে প্রবেশ করা নিষেধ।

অনুরূপভাবে খাবারের অপেক্ষায় রাসুল ﷺ-এর বাড়িতে বসে থাকতে এবং খাবার খাওয়ার পর গল্পগুজব করতেও নিষেধ করেছেন।

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে : নবিজি ﷺ-এর ঘরে দুটি শর্ত ব্যতীত প্রবেশ করা যাবে না—

১. প্রবেশের অনুমতি থাকতে হবে।

২. প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পরপরই উঠে যেতে হবে।

এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন, ‘তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, তবে অতঃপর খাওয়া শেষে স্বেচ্ছায় চলে এসো। (খানা খাওয়ার আগে বা পরে) কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না।’

এরপর আল্লাহ তাআলা এই নিষেধাজ্ঞার হিকমতও জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ‘নিশ্চয় এটা (প্রয়োজনের অধিক বসে থাকা) নবির জন্য কষ্টদায়ক (অর্থাৎ তোমাদের বসে থাকার কারণে তিনি কষ্ট পান। কারণ, তোমাদের কারণে তাঁর বাড়ির স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়)।

(فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ) ‘তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন’—
তোমাদের বের হয়ে যেতে বলতে পারেন না। কেননা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ
সাধারণত মানুষজনকে তাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলতে লজ্জা
অনুভব করেন। কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না।^{৫৪১}

আয়াত থেকে একটা শিক্ষা পাওয়া যায় যে, শরিয়তের বিধান ছেড়ে দেওয়াটা
বাহ্যিকভাবে শিষ্টাচার বা আদব মনে হলেও বা তা পালনে লজ্জা অনুভব
হলেও, শরিয়তের বিধান মানা আবশ্যিক। কারণ, শরিয়তের বিধানের
বিপরীত আদব হতেই পারে না।

আর আল্লাহ তাআলা এমন কোনো বিষয় বলতে লজ্জা করেন না, যেখানে
আমাদের কল্যাণ রয়েছে। আর রাসুল ﷺ-এর প্রতি দয়া করতে তিনি কোনো
কসুর রাখেননি।

মেহমান হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

এতক্ষণ আমরা মেজবান হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ কেমন ছিল, তা
নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আলোচনা হবে মেহমান হিসেবে তিনি কেমন
ছিলেন।

রাসুল ﷺ ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তিনি খাওয়ার দাওয়াত কবুল করতেন,
যদিও তা খুব অল্প খাবারই হোক। তিনি বলেন, ‘যদি আমাকে কেবল একটি
হাতা বা পায়ার খেতে দাওয়াত দেওয়া হয়, আমি অবশ্যই তা কবুল করব।’^{৫৪২}

তিনি জন্তুর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও নিকৃষ্ট অংশ—উভয়টিকে একত্র করার জন্য
বিশেষভাবে হাতা ও পায়ার নাম নিয়েছেন। কেননা, হাতা রাসুল ﷺ-এর খুব
প্রিয় ছিল। আর পায়ার তো কোনো মূল্যই নেই।^{৫৪৩}

৫৪১. তাফসিরুস সাদি : ১/৬৭০।

৫৪২. সহিহুল বুখারি : ২৫৬৮।

৫৪৩. ফাতহুল বারি : ৫/১৯৯।

দাওয়াত কবুল করতেন, যদিও দাওয়াতদাতা গোলাম হোক

আনাস বিন মালিক ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমি নবিজি ؐ-এর সাথে তাঁর এক দরজি গোলামের বাড়িতে গেলাম। সে তাঁর সামনে “সারিদেব”^{৫৪৪} পেয়ালা উপস্থিত করল এবং নিজের কাজে লিপ্ত হলো। তখন নবিজি ؐ খুঁজে খুঁজে কদু বের করতে শুরু করলে আমি কদুর টুকরোগুলো বেছে বেছে তাঁর সামনে দিতে লাগলাম। এরপর থেকে আমি কদু পছন্দ করতে শুরু করি।’^{৫৪৫}

► হাদিস থেকে কয়েকটি বিষয় বোঝা যায় :

- দরজি পেশা বৈধ।
- সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার চেয়ে নিম্নশ্রেণির মানুষের ঘরে খাবার খেতে পারবে এবং তার দাওয়াত কবুল করতে পারবে।
- খাদিমের সাথে একপাত্রের খাওয়া যায়।
- রাসুল ؐ খুবই বিনয়ী ছিলেন। সাহাবিদের সাথে তাঁর বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। তাদের বাড়িতে গিয়ে সে সম্পর্ক আরও পোক্ত করতেন।
- সামান্য পরিমাণ খাবারের দাওয়াত দেওয়া হলেও দাওয়াত কবুল করা উচিত।
- এক মেহমান অপর মেহমানের পাতে খাবার তুলে দিতে পারবে।
- মেজবান চাইলে মেহমানের সাথে খানায় ‘শরিক নাও হতে পারে। হাদিসের ঘটনায় দরজি খাবার পেশ করেছেন, কিন্তু তিনি সাথে আহার করেননি। রাসুল ؐ তার এ কাজে কোনো আপত্তি করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এমনটি করা বৈধ।^{৫৪৬}

৫৪৪. এক ধরনের খাবার।

৫৪৫. সহিহুল বুখারি : ২০৯২, সহিহ মুসলিম : ২০৪১।

৫৪৬. ফাতহুল বারি : ৯/৫২৯। ইমাম নববি ؒ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৩/২২৪।

ইহুদিদের মন আকৃষ্ট করার জন্য তাদের দাওয়াতও কবুল করতেন

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, ‘এক ইহুদি নবিজি عليه السلام-কে যবের রুটি ও তেলযুক্ত বাসি সালনের দাওয়াত দিলে তিনি তা গ্রহণ করলেন।’^{৫৪৭}

হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, আহলে কিতাবের দাওয়াত কবুল করা বৈধ।

দাওয়াতে অনিমন্ত্রিত কাউকে সঙ্গে নিতে চাইলে অনুমতি নিতেন

আবু মাসউদ আনসারি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, ‘আবু শুআইব নামক জনৈক আনসারি সাহাবি ছিল। তার একজন কসাই গোলাম ছিল। আবু শুআইব একদা রাসুল ﷺ-এর চেহারায় ক্ষুধার ছাপ দেখতে পেল। পরে তার গোলামকে বলল, “কী করছ! আমাদের পাঁচজনের জন্য তুমি খাবার প্রস্তুত করো। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত দিতে চাই। পাঁচজনের তিনি একজন হবেন।”

গোলাম খাবার প্রস্তুত করল। অতঃপর আনসারি সাহাবিটি নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে-সহ পাঁচজনকে দাওয়াত দিলেন। এক ব্যক্তি তাঁদের অনুগমন করল। দরোজা পর্যন্ত পৌঁছালে নবিজি ﷺ বললেন, “এ লোকটি আমাদের অনুসরণ করেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পারো, আর যদি চাও, তবে সে ফিরে যাবে।” লোকটি বললেন, “না, আমি বরং তাকে অনুমতি দেবো ইয়া রাসুলুল্লাহ।”^{৫৪৮}

► হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- কেউ অপরের জন্য খাবার তৈরি করলে, তা তার বাড়িতেও পাঠিয়ে দিতে পারবে অথবা নিজেই ঘরে এনেও খাওয়াতে পারবে।
- কাউকে দাওয়াত দিতে গেলে, তার কয়েকজন বিশেষ লোককেও দাওয়াত দেওয়া মুসতাহাব।
- নিমন্ত্রিতের সাথে অনিমন্ত্রিত কেউ আসলে নিমন্ত্রণকারী তাকে বাধা দিতে পারবে। বাড়িতে ঢুকে গেলে বের করে দিতে পারবে।^{৫৪৯}

৫৪৭. মুসনাদু আহমাদ : ১৩৭৮৯।

৫৪৮. সহিহুল বুখারি : ২৪৫৬, সহিহ মুসলিম : ২০৩৬। শব্দউৎস : সহিহ মুসলিম।

৫৪৯. ফাতহুল বারি : ৯/৫৬০।

কখনো দাওয়াত ছাড়াই মেহমান হতেন

আবু হুরাইরা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, ‘একদিন রাতে বা দিনে রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বের হলেন। পশ্চিমধ্যে দেখা হয়ে গেল আবু বকর ও উমরের সঙ্গে। তিনি বললেন, “এ সময় তোমরা ঘরের বাইরে কেন?”

তঁারা উভয়েই উত্তর দিল, “হে আল্লাহর রাসুল, ক্ষুধার কারণে।”

তিনি বললেন, “ওই সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মতো আমাকেও ক্ষুধাই ঘরের বাইরে টেনে এনেছে—চলো...। উভয়েই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে চললেন। হাঁটতে হাঁটতে তঁারা জনৈক আনসারি সাহাবির কাছে এলেন। দেখা গেল, তিনি বাড়িতে নেই। তঁার স্ত্রী তাঁদের দেখে বলল, “মারহাবান ওয়া আহলান! (স্বাগতম! আসুন, আসুন)”

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “ও কোথায়?”

সে উত্তর দিল, “আমাদের জন্য মিষ্টি পানির খোঁজে গেছেন। ইত্যবসরে আনসারি সাহাবি এসে পড়লেন; দুই সাখিসহ দাঁড়ানো রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে বলে উঠলেন, আলহামদুলিল্লাহ! মেহমান পেয়ে আজ আমার মতো সম্মানিত কেউ হতে পারেনি! তারপর তিনি (ভেতরে) গিয়ে খেজুরের একটি কাঁদি নিয়ে ফিরলেন—এতে কাঁচা, পাকা ও শুকনো সব ধরনের খেজুর ছিল। (তাঁদের সামনে রেখে) বললেন, “নিন, খেতে শুরু করুন আপনারা।” তারপর হাতে ছুরি নিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “সাবধান, দুখালো বকরি জবাই করে বসো না আবার!”

তিনি একটি বকরি জবাই করলেন। সবাই পরিতৃপ্ত হলেন গোশত, খেজুর ও পানি খেয়ে। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ও উমরকে বললেন, “সে সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই নিয়ামত সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধার যন্ত্রণা তোমাদের ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এসেছিল আর ঘরে ফেরার আগেই তোমরা এই নিয়ামত পেয়ে গেছ।”^{৫৫০}

► হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- রাসুল ﷺ ও অনেক বড় সাহাবিগণের নিকট পার্থিব প্রাচুর্য তেমন একটা ছিল না। অনেক সময় তাঁদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ত এবং তাঁরা ক্ষুধায় জর্জরিত হতেন।
- আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অভিযোগ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করার শর্তে অন্যকে নিজের কষ্টের কথা ব্যক্ত করা বৈধ।
- অভ্যর্থনামূলক বাক্য বলে মেহমানকে বরণ করে নেওয়া মুসতাহাব।
- প্রয়োজনের মুহূর্তে গাইরে মাহরাম মহিলার সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলা বৈধ।
- স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত এমন ব্যক্তিকে তার বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারবে, যার ব্যাপারে স্বামীর আপত্তি না থাকাটা স্পষ্ট।
- মিষ্টিজাতীয় ও উন্নতমানের খাবার খাওয়া বৈধ।
- নিয়ামত অর্জিত হলে এবং বিপদ বিদূরিত হলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা মুসতাহাব।
- মেহমানের আগমনে মেহমানের সামনে আনন্দ প্রকাশ করা এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা মুসতাহাব।
- মেহমানের সামনাসামনি তার প্রশংসা করা বৈধ। তবে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে কারও সামনাসামনি প্রশংসা করা ঠিক নয়।
- উক্ত আনসারির ফজিলত ও তার বাগ্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়।
- রুটি, গোশত ইত্যাদি পরিবেশন করার পূর্বে ফল-ফলাদি পেশ করা মুসতাহাব।
- মেহমান আসলে প্রথমে যা আছে, তা-ই দিয়ে দ্রুত মেহমানদারি করা মুসতাহাব। মূল খাবার তৈরি করা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা উচিত নয়। বিশেষ করে যদি মেহমান ক্ষুধার্ত হয়।
- পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়া বৈধ। যেসব হাদিসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা নিয়মিত পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে খাওয়া সম্পর্কে। কেননা,

নিয়মিত এভাবে খাবার খেলে কলব শক্ত হয়ে যায় এবং অভাবীদের অভাব অনুভূত হয় না।^{৫৫১}

লাকিত বিন সাবিরাহ রাঃ বলেন, ‘একটি প্রতিনিধি দলের সাথে আমরা রাসুল সাঃ-এর কাছে এলাম। কিন্তু তাঁকে তাঁর বাড়িতে পাইনি। বাড়িতে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাঃ ছিলেন। তিনি আমাদের আপ্যায়নের জন্য খাজিরা^{৫৫২} তৈরির আদেশ দিলে তা তৈরি করা হচ্ছিল। এদিকে আমাদের কাছে এক পাত্র খেজুর আনা হলো।

এ সময় রাসুল সাঃ তাশরিফ আনলেন। আমাদের বললেন, “তোমাদের আপ্যায়ন করা হয়েছে বা তোমাদের আপ্যায়নের জন্য বলা হয়েছে?”

আমরা বললাম, “হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ।”

এরপর আমরা রাসুল সাঃ-এর সাথে বসে রইলাম। তখন রাখাল রাসুল সাঃ-এর এক পাল ছাগল খোয়াড়ে রাখছিল। রাখালের সাথে একটি ছাগল আওয়াজ করছিল। রাসুল সাঃ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে অমুক, কী বাচ্চা জন্ম হয়েছে?”

রাখাল জবাব দিল, “একটি মাদি ছাগলছানা।”

রাসুল সাঃ বললেন, “তবে তার স্থানে একটি ছাগল জবাই করো।”

এরপর রাসুল সাঃ আমাদের বললেন, “মনে কোরো না যে, তোমাদের জন্য জবাই করছি। আমাদের একশ ছাগল আছে। ছাগলের সংখ্যা এর চেয়ে বাড়ুক, তা আমরা চাই না। তাই যখন কোনো ছাগল বাচ্চা দেয়, তখন আমরা সদ্যপ্রসূত বাচ্চার স্থলে একটি ছাগল জবাই করি।”^{৫৫৩}

এই হাদিস থেকে লোক-দেখানো মানসিকতা পরিহারের শিক্ষা পাওয়া যায়।

৫৫১. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৩/২১৩।

৫৫২. খাজিরা এক ধরনের খাবার, যা তৈরি হয় আটা ও গোশত দিয়ে। গোশতকে ছোট ছোট টুকরো করে পানিতে সিদ্ধ করা হয়। তারপর এর ওপর আটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

৫৫৩. সুনানু আবি দাউদ : ১৪২।

► হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- কোনো বাড়িতে এমন সময় মেহমান আসলো, যখন বাড়ির কর্তা বাড়িতে নেই—এমন অবস্থায় মুসতাহাব হলো, গিনি কর্তার অপেক্ষা না করেই মেহমানকে খেতে দেবে।
- মেহমানের সামনে সবচেয়ে উত্তম ও উন্নত খাবারটি পরিবেশন করা মুসতাহাব।

আতিথেয়তায় ইবরাহিম ؑ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন

ইবরাহিম ؑ-এর আতিথেয়তার ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন—

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا
سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ . فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ
فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ . فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ
وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

‘আপনার কাছে ইবরাহিমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম, তখন সে বলল, সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর সে গৃহে গেল এবং তাৎক্ষণিক একটি ঘৃতপক্ক মোটা গোবৎস নিয়ে হাজির হলো। সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বলল, তোমরা আহার করছ না কেন? অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হলো। তারা বলল, ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটু জ্ঞানীগুণী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।’^{৫৫৪}

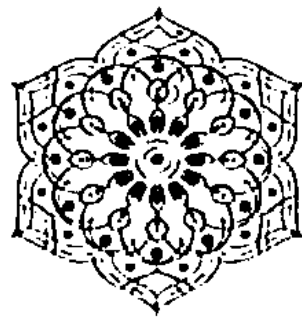
এই ঘটনায় মেহমানদারি-সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি আদব বিবৃত হয়েছে :

১. মেহমানকে খাবারের নিকট আসতে না বলে, তার সামনে খাবার নিয়ে যাওয়া।

২. যথাসম্ভব দ্রুত খাবার পরিবেশন করা।
৩. খাবার আনার ঘোষণা না দিয়েই খাবার নিয়ে আসা।
৪. সর্বোত্তম খাবারটি আনা।
৫. উত্তম পদ্ধতিতে খাবার পরিবেশন করা।
৬. মেহমান পরিচিত হোক বা অপরিচিত, প্রথমে তাকে সালাম করা।

এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে মেজবান ও মেহমান হিসেবে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ কেমন ছিল, তার একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা তাওফিক দান করুন। আমিন।





[সপ্তম পরিচ্ছেদ]

বিশিষ্ট সাহাবিদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

ইসলামে সাহাবিদের মর্যাদার কথা কারও অজানা নয়। তাঁরাই মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে নেককার ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা থেকে মুক্ত ছিল তাঁদের জীবন। মুমিনদের জন্য তাঁরা হিদায়াতের অগ্রপথিক। তাঁরা এমন এক জাতি, আল্লাহ তাআলা যাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে রাসুল ﷺ-এর সাথি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।

কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাহাবিদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

‘আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ—যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহাসাফল্য।’^{৫৫৫}

রাসুল ﷺ-এর সাহচর্যের সময়কাল অনুযায়ী সাহাবিগণ বিভিন্ন স্তরের ছিলেন। শাইখুল ইসলাম রহিমুল্লাহ বলেন, ‘সাহাবি একটি ইসমে জিনস বা জাতিবাচক বিশেষ্য। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যধন্য মুমিনকেই সাহাবি বলা হয়—চাই

সে সাহচর্য কম হোক বা বেশি। সুতরাং যিনি এক বছর বা এক মাস বা এক দিন বা এক ঘণ্টা রাসুল ﷺ-এর সাহচর্যে থেকেছেন কিংবা শুধু ইমান অবস্থায় তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা সবাই সাহাবি। তবে সাহচর্যের সময়কাল অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে তারতম্য রয়েছে।^{৫৫৬}

এ পরিচ্ছেদে আমরা রাসুল ﷺ-এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ সাহাবিদের সাথে তাঁর আচরণবিধি সম্পর্কে আলোচনা করব।

এই তালিকায় সবার আগে যাদের নাম আসে, তাঁদের কয়েকজন হলেন : আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, জুবাইর, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, হুজাইফা বিন ইয়ামান ও আব্দুর রহমান বিন আওফ রা প্রমুখ।

নবিজি রা-এর বিশেষ দুই সাহাবি আবু বকর ও উমর

আলি বিন আবু তালিব রা বলেন, ‘আমি প্রায়শ রাসুল রা-কে বলতে শুনতাম—

ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ،
وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ

“আমি, আবু বকর ও উমর গেলাম। আমি, আবু বকর ও উমর প্রবেশ করলাম। আমি, আবু বকর ও উমর বের হলাম।”^{৫৫৭}

মানুষের সামনে তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করতেন

আমর বিন আস রা থেকে বর্ণিত আছে, ‘রাসুল রা তাকে গাজওয়ায়ে জাতুস সালাসিল বা শিকলের যুদ্ধের সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। (তিনি বলেন) তখন আমি রাসুল রা-এর নিকট গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, “আপনার প্রিয় মানুষ কে?” তিনি উত্তর দিলেন, “আয়িশা।” আমি বললাম, “পুরুষদের মধ্যে কে?” তিনি বললেন, “তার (আয়িশার) পিতা।” আমি বললাম, “তারপর কে?” তিনি বললেন, “তারপর উমর বিন খাত্তাব।”^{৫৫৮}

৫৫৬. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৪/৪৬৪।

৫৫৭. সহিহুল বুখারি : ৩৬৮৫, সহিহ মুসলিম : ২৩৮৯।

৫৫৮. সহিহুল বুখারি : ৩৬৬২, সহিহ মুসলিম : ২৩৮৪।

কুরতুবি ﷺ বলেন, ‘এই হাদিস থেকে ভালোবাসার মানুষের নাম নেওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়, হোক সে পুরুষ অথবা নারী। ভালোবাসার মানুষ ভালো ও সৎকর্মশীল হলে তার নাম বলে দেওয়াতে দোষের কিছু নেই।

তিনি সর্বপ্রথম আয়িশার নাম এ জন্যই নিয়েছেন যে, তাঁর প্রতি জৈবিক ও দ্বীনি উভয় প্রকার ভালোবাসা ছিল। পক্ষান্তরে অন্যদের প্রতি দ্বীনি ভালোবাসা থাকলেও জৈবিক ভালোবাসা ছিল না।

কিন্তু তিনি যখন পুরুষদের মধ্যে প্রিয় ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন সর্বপ্রথম আবু বকর ﷺ-এর নাম উল্লেখ করলেন। এর কারণ হলো, আবু বকর ﷺ পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহ ও রাসুল ﷺ-এর একনিষ্ঠ কল্যাণকামী ছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের অনেক উপকার করেছেন। আল্লাহ ও রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য নিজের জানমাল কুরবান করেছেন।^{৫৫৯}

তাদের ব্যাপারে কেউ অসংলগ্ন কথা বললে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন

আবু সাইদ খুদরি ﷺ বলেন, ‘খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আব্দুর রহমান বিন আওফের মাঝে তর্ক বাধল। একপর্যায়ে খালিদ ﷺ আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ-কে গালি দিলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন :

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ
أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ

“আমার সাহাবিদের গালি দিয়ো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করো, তবে তাদের এক মুদ অথবা অর্ধ মুদের সমপরিমাণ সাওয়াব হবে না।”^{৫৬০}

‘মুদ’ একটি পাত্র, যা এক অঞ্জলির সমপরিমাণ এবং এক সা’-এর এক-চতুর্থাংশ।

৫৫৯. আল-মুফহিম : ৯/৯১, ফাইজুল কাদির : ১/২১৮।

৫৬০. সহিহুল বুখারি : ৩৬৭৩, সহিহ মুসলিম : ২৫৪১।

হাদিসের অর্থ হলো, আমার কোনো সাহাবি এক মুদ অথবা অর্ধ মুদ দান করে যে বিশাল সাওয়াব অর্জন করে, তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করেও তার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে না।

তাদের দানের ফজিলত ও সাওয়াব বেশি হওয়ার কারণ হলো, তাঁরা ইসলামের কঠিন ও প্রয়োজনের সময় দান করেছেন। তা ছাড়া তাঁদের দান ছিল রাসুল ﷺ-এর হিফাজত ও সাহায্য করার জন্য। শুধু সাদাকাই নয়, তাঁদের জিহাদ ও অন্যান্য ইবাদতও অন্যদের তুলনায় অধিক ফজিলতপূর্ণ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ أُولَئِكَ أَكْثَرُ
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

‘তোমাদের মধ্যে যে মক্কা-বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে, সে (তোমাদের) সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।’^{৫৬১}

এর কারণ হলো, মক্কা-বিজয়ের পূর্বে দান ও জিহাদ অনেক কঠিন ছিল। কারণ, তখন ধন-সম্পদের খুব প্রয়োজন ছিল এবং সৈন্যসংখ্যাও অপ্রতুল ছিল। মক্কা-বিজয়ের পর দান ও জিহাদ তুলনামূলক সহজ হয়ে যায়। কারণ, মক্কা-বিজয়ের পর মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তাই প্রাথমিক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করা মুসলমানদের মতো কঠিন পরিস্থিতি তাদের মোকাবেলা করতে হয়নি।

এসব ছাড়াও তাঁদের অন্তরে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, হৃদয়তা, নম্রতা, অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা ও আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ করার আগ্রহ ভরপুর ছিল।

আর কিছুক্ষণের জন্য হলেও যে ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁর মর্যাদা অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে। কারণ, কোনো আমলই রাসুল ﷺ-এর সুহবতের সমান হতে পারে না এবং অন্য কোনো উপায়ে ওই মর্যাদা অর্জন করাও সম্ভব নয়। আর ফজিলতের ব্যাপারে কোনো যুক্তি খাটে না; এটা আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা দান করেন।^{৫৬২}

হাদিসে ‘আমার সাহাবি’ বলে বিশেষ সাহাবিদের বোঝানো হয়েছে। তাঁরা হলেন সেই সকল সাহাবি, যারা মক্কা-বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ফলে দীর্ঘ সময় ধরে রাসুল ﷺ-এর সান্নিধ্যে থেকেছেন এবং তাঁর সাথে জিহাদ করেছেন, ইসলামের কল্যাণে ব্যয় করেছেন, হিজরত করেছেন এবং মুহাজিরদের সাহায্য করেছেন।

ফলে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অন্য সকল সাহাবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ একজন সাহাবি হওয়া সত্ত্বেও রাসুল ﷺ যেভাবে তার সাথে কথা বলেছেন, তা প্রাথমিক যুগের সাহাবিগণের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।

ইবনে হাজার রাঃ বলেন, ‘যাঁরা রাসুল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁদেরকে তাঁদের পূর্বে ইমান আনয়নকারী সাহাবিদের গালমন্দ করতে নিষেধ করেছেন এবং এই ব্যাপারে ভর্সনা করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, যাঁরা রাসুল ﷺ-এর সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁদেরকে গালমন্দ করার অধিকার অন্যদের নেই।’^{৫৬৩}

যেখানে খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো হুদাইবিয়ার সময় ইসলাম গ্রহণকারী মহান সাহাবিকে সাহাবিদের গালমন্দ করা থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন, সেখানে যারা সাহাবি নয়, তাদের অবস্থা কী হবে? কোনো একজন সাহাবিকেও গালমন্দ করার অধিকার কি তাদের থাকবে?

ইমাম নববি রাঃ বলেন, ‘জেনে রাখো, সাহাবিদের গালমন্দ করা ভয়াবহ রকমের হারাম। চাই উক্ত সাহাবি ফিতনার (সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন

৫৬২. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৬/৩৯।

৫৬৩. ফাতহুল বারি : ৭/৩৪।

ভ্রাতৃঘাতি লড়াই) সাথে সম্পৃক্ত হোক বা না হোক। কারণ, তারা নিজেদের ইজতিহাদ অনুযায়ী এসব যুদ্ধে জড়িয়েছেন। কোনো সাহাবিকে গালমন্দ করা কবির গুনাহ। জুমহুরের মাজহাব অনুযায়ী সাহাবিকে গালমন্দকারী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে; কতল করা হবে না। মালিকি মাজহাবের অনেক আলিম তাকে হত্যা করার মত ব্যক্ত করেছেন।’^{৫৬৪}

ইবনে কাসির رحمہ اللہ বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা প্রাথমিক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে যাঁরা উত্তম উপায়ে তাঁদের অনুসরণ করেছেন, তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং ধ্বংস সেই লোকদের জন্য, যারা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, অথবা তাঁদের গালি দেয়, অথবা তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে বা গালি দেয়। বিশেষ করে, রাসুল ﷺ-এর পর সকল সাহাবির সর্দার ও তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সিদ্ধিকে আকবার ও মহান খলিফা আবু বকর বিন আবু কুহাফা رضی اللہ عنہ-এর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাঁকে গালি দেয়।

কাজেই রাফিজি (শিয়া) সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবি ও অন্যান্য বড় সাহাবির সাথে শত্রুতা রাখে এবং তাঁদের গালমন্দ করে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও অন্তর রোগাক্রান্ত। আল্লাহ তাআলা তাদের কর্মকাণ্ড থেকে আমাদের হিফাজত করুন।’^{৫৬৫}

বিশেষ সাহাবিদের মর্যাদা মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিতেন

আবু দারদা رضی اللہ عنہ বলেন, ‘আবু বকর رضی اللہ عنہ ও উমর رضی اللہ عنہ-এর মাঝে কোনো বিষয়ে বাকবিতণ্ডা হলো। আবু বকর رضی اللہ عنہ উমর رضی اللہ عنہ-কে রাগিয়ে দিলেন। তখন উমর رضی اللہ عنہ রাগান্বিত হয়ে তার কাছ থেকে উঠে গেলেন। আবু বকর رضی اللہ عنہ তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে তার পিছু নিলেন। কিন্তু উমর رضی اللہ عنہ ক্ষমা তো করেননি, উল্টো তার মুখের ওপর দরোজা বন্ধ করে দিলেন।’

৫৬৪. ইমাম নববি رحمہ اللہ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৬/৯৩।

৫৬৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/২০৩।

আবু দারদা رضي الله عنه বলেন, ‘আমি নবিজি ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবু বকর رضي الله عنه পরনের কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে আসলেন যে তার দুই হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নবিজি ﷺ বললেন, “তোমাদের এ সাথি এইমাত্র কারও সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে।” তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আমার ও উমর বিন খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমিই প্রথমে কটু কথা বলেছি। অতঃপর আমি লজ্জিত হয়ে তার কাছে মাফ চেয়েছি। কিন্তু তিনি মাফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার নিকট হাজির হয়েছি।” নবিজি ﷺ তিনবার বললেন :

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ

“আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বকর!”

অতঃপর উমর رضي الله عنه লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবু বকর رضي الله عنه-এর বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “আবু বকর কি বাড়িতে আছেন?” তারা বলল, “না।” তখন উমর رضي الله عنه নবিজি ﷺ-এর নিকট চলে আসলেন। (তাকে দেখে) নবিজি ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আবু বকর رضي الله عنه ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আমিই প্রথমে অন্যায় করেছি।” এ কথাটি তিনি দুবার বললেন। তখন নবিজি ﷺ বললেন :

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذِبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَأَسَانِي
بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي

“আল্লাহ যখন আমাকে তোমাদের নিকট রাসুলরূপে প্রেরণ করেছেন তখন তোমরা সবাই বলেছ, “তুমি মিথ্যা বলছ” আর আবু বকর বলেছে, “আপনি সত্য বলছেন।” তাঁর জানমাল সবকিছু দিয়ে আমার প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছে। তোমরা কি আমার সম্মানে আমার সাথিকে অব্যাহতি দেবে?”

এ কথাটি তিনি দুবার বললেন। এরপর থেকে আবু বকর রাঃ-কে আর কখনো কষ্ট দেওয়া হয়নি।’^{৫৬৬}

► হাদিস থেকে শিক্ষা

- সকল সাহাবির ওপর আবু বকর রাঃ-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত।
- কোনো ফজিলতওয়ালা ব্যক্তির জন্য তার চেয়ে অধিক ফজিলতওয়ালা ব্যক্তির সাথে রাগ করা ঠিক নয়।
- সামনাসামনি প্রশংসা করা বৈধ, যদি প্রশংসার কারণে প্রশংসিত ব্যক্তি ফিতনা বা ধোঁকায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।
- অন্যায়কর্মে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। তবে উত্তম ব্যক্তির দ্রুত তাওবা করে ফিরে আসে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

‘যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।’^{৫৬৭}

- নবি ব্যতীত অন্যান্য মানুষ ফজিলতের শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে গেলেও কেউই নিষ্পাপ নয়।
- মজলুম থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা মুসতাহাব।
- হাঁটু সতরের ^{৫৬৮}অন্তর্ভুক্ত নয়।^{৫৬৯}

রাবিআ আসলামি রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসুল সঃ আমাকে ও আবু বকর রাঃ-কে একটি করে জমি দান করলেন। যখন আমাদের মনে দুনিয়ার

৫৬৬. সহিহুল বুখারি : ৩৬৬১।

৫৬৭. সূরা আল-আরাফ, ৭ : ২০১।

৫৬৮. হানাফি মাজহাব মতে, হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

৫৬৯. ফাতহুল বারি : ৭/২৬।

মোহ সৃষ্টি হলো, তখন খেজুরের একটি কাঁদি সম্পর্কে আমরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হলাম। আমি বললাম, “এটা আমার সীমানার মধ্যে।” আবু বকর রাঃ বললেন, “এটা আমার সীমানার মধ্যে।” এতে আমার ও তাঁর মাঝে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হলো। একপর্যায়ে আবু বকর রাঃ একটা অপছন্দনীয় বাক্য উচ্চারণ করে বসলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন, “হে রাবিআ, আমাকেও অনুরূপ একটি বাক্য বলো, যেন সমান সমান হয়ে যায়।”

আমি বলতে অস্বীকার করলাম। তখন আবু বকর রাঃ বললেন, “হয়তো তুমি আমাকে অনুরূপ বাক্য বলবে, নতুবা আমি এ ব্যপারে তোমার বিরুদ্ধে রাসুল সঃ-এর শরণাপন্ন হব।”

আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম।

আবু বকর রাঃ মাটিতে পদাঘাত করে রাসুল সঃ-এর দিকে রওনা হলেন। আমিও তাঁর পিছু নিলাম। তখন আসলাম গোত্রের একদল লোক এসে আমাকে বলল, “আল্লাহ তাআলা আবু বকরের ওপর রহম করুন! তিনি কোন মুখে তোমার বিরুদ্ধে রাসুল সঃ-এর শরণাপন্ন হচ্ছেন, অথচ তিনিই তোমাকে অসংগতিপূর্ণ কথা বলেছেন!?”

আমি তাদের বললাম, “তোমরা কি জানো, ইনি কে?” তিনি ছিলেন গুহা-অভ্যন্তরের দ্বিতীয়জন। তিনি মুসলমানদের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করতে এসো না। কেননা, তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে রাসুল সঃ-এর দরবারে যাবেন। আর তাঁর রাগ দেখে রাসুল সঃ-ও রাগান্বিত হবেন। অতঃপর তাঁদের দুজনের রাগ দেখে স্বয়ং আল্লাহ আমার ওপর রেগে যাবেন এবং রাবিআকে ধ্বংস করে দেবেন।”

তারা বলল, “তাহলে এখন আমাদের প্রতি আপনার কী নির্দেশ?”

আমি বললাম, “তোমরা ফিরে যাও।”

অতঃপর আবু বকর রাঃ রাসুল সঃ-এর দিকে রওনা হলেন। আমিও একাকী তাঁর অনুসরণ করলাম। একসময় আমরা নবিজি সঃ-এর নিকট পৌঁছে গেলাম।

আবু বকর ﷺ ঘটনার বৃত্তান্ত শোনালেন। রাসুল ﷺ আমার দিকে চেয়ে বললেন, “হে রাবিআ, তোমার এবং সিদ্দিকের মাঝে কী সমস্যা হয়েছে?”

আমি বললাম, “ইয়া রাসুল্লাহ, আমাদের মাঝে এই এই হয়েছে। তিনি আমাকে একটি অপছন্দনীয় বাক্য বললেন। তারপর আমাকে বললেন, “আমি তোমাকে যে রকম বলেছি, তুমিও আমাকে সে রকম বলো, যেন প্রতিশোধ হয়ে যায়।” কিন্তু আমি তা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি।”

রাসুল ﷺ বললেন, “হাঁ, তাকে প্রত্যুত্তরে ওই রকম কথা বোলো না, তবে বলো, “আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করুন, হে আবু বকর!”

তখন আমি বললাম, “আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করুন, হে আবু বকর!”

অতঃপর আবু বকর ﷺ কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন।^{৫৭০}

অনেক বিষয় কেবল তাদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখতেন

আবু সাইদ খুদরি ﷺ বলেন, ‘নবিজি ﷺ মৃত্যুরোগ চলাকালীন একটি খুতবায় বললেন :

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ

‘আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা আছে, এতদুভয়ের কোনো একটি গ্রহণ করার সুযোগ দান করলেন।

তখন তিনি আল্লাহর কাছে যা আছে, তা-ই গ্রহণ করলেন।’

এ কথা শুনে আবু বকর ﷺ অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করলেন।^{৫৭১} অতঃপর বললেন, “আপনার ওপর আমাদের পিতামাতা কুরবান হোক!”

আমি মনে মনে বললাম, “এ বৃদ্ধ লোকটা কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা আছে, এতদুভয়ের কোনো

৫৭০. মুসনাদু আহমাদ : ১৬১৪৩।

৫৭১. আবু বকর ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই কথায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের ইঙ্গিত আছে। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন অসুস্থ ছিলেন। (ফাতহুল বারি : ১২/৭)

একটি গ্রহণ করার ইচ্ছাধিকার দান করলেন আর তিনি আল্লাহর কাছে যা আছে, তা গ্রহণ করলেন (এতে কাঁদার কী আছে?)।”

আসলে রাসুল ﷺ-ই ছিলেন সেই বান্দা। বস্তুত আবু বকর ﷺ ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।

রাসুল ﷺ বললেন :

يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكُ، إِنَّ أَمَنَ النَّاسَ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ،
وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ
الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ، إِلَّا بَابُ أَبِي
بَكْرٍ

“হে আবু বকর, তুমি কেঁদো না। নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে যে আমাকে সবচাইতে বেশি ইহসান করেছে, সে হচ্ছে আবু বকর। আমি যদি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে তাঁর সাথে যে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য রয়েছে, সেটাই যথেষ্ট। আবু বকরের দরোজা ব্যতীত মসজিদের কোনো দরোজা অবশিষ্ট থাকবে না। সব বন্ধ করে দেওয়া হবে।”^{৫৭২}

এই হাদিসে আবু বকর ﷺ-এর বিশেষ ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

উমর বিন শাক্বাহ ﷺ ‘আখবারুল মাদিনা’ গ্রন্থে লেখেন, ‘আবু বকর ﷺ-এর সেই ঘর, যার দরোজা খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তা মসজিদের সাথে লাগোয়া ছিল। এই ঘরটি আবু বকর ﷺ-এর মালিকানাতেই ছিল, তবে একদিন তাঁর নিকট আসা একটি প্রতিনিধিদলকে কিছু দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি ঘরটি বিক্রি করে দিলেন। উম্মুল মুমিনিন হাফসা ﷺ চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে ঘরটি কিনে নিলেন। তারপর থেকে ঘরটি হাফসা ﷺ-এর হাতে ছিল। পরবর্তী সময়ে উসমান ﷺ-এর খিলাফতকালে মসজিদে নববি

সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হলে কর্তৃপক্ষ তাঁর থেকে ঘরটি নিতে চাইলেন। তিনি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, “তখন আমি মসজিদে কীভাবে যাব?” তাঁকে বলা হলো, “আমরা আপনাকে এর চেয়ে প্রশস্ত ঘর দেবো এবং সেটাতে এর মতো মসজিদে যাওয়ার রাস্তা করে দেবো।” তখন তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাতে সম্মত হলেন।^{৫৭৩}

► হাদিস থেকে যা বোঝা যায় :

- আবু বকর রাঃ বিশেষ ফজিলতের অধিকারী ছিলেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি রাসুল সঃ-এর খলিল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।
- উপকারকারীর গুণকরিয়া জ্ঞাপন করা ও তার প্রশংসা করা উচিত।
- মসজিদের বিশেষ দরোজাসমূহ ছাড়া বিভিন্ন মানুষের জন্য আলাদা ছোট ছোট দরোজা রাখা যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে রাখা যেতে পারে।^{৫৭৪}

তাদের এমন অনেক আচরণ সহ্য করতেন, যা অন্যদের ক্ষেত্রে করতেন না। উমর বিন খাত্তাব রাঃ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল মারা গেলে রাসুল সঃ-কে তার জানাজা পড়ানোর জন্য ডাকা হলো।

রাসুল সঃ জানাজা পড়ানোর উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে আমি দ্রুত তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, “ইয়া রাসুল্লাহ, আপনি ইবনে উবাইয়ের জানাজা পড়বেন, অথচ সে অমুক দিন এমন এমন কথা বলেছে?”—এভাবে আমি এক এক করে তার (ধৃষ্টতাপূর্ণ) কথাগুলো তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলাম।

তখন রাসুল সঃ মুচকি হাসলেন এবং বললেন, “আমার নিকট থেকে সরে যাও হে উমর!”

তারপরেও যখন আমি বারবার বলতে লাগলাম, তখন তিনি বললেন :

৫৭৩. ফাতহুল বারি : ৭/১৪।

৫৭৪. ফাতহুল বারি : ৭/১৪, ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১৫/১৫২।

إِنِّي خَيْرْتُ فَأُخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِن زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ
عَلَيْهَا

“আমাকে (জানাজা পড়া ও না পড়ার ব্যাপারে) স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমি জানাজা পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদি আমি জানতে পারতাম যে, তার জন্য সত্তরবারের অধিক ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, তবে আমি সত্তরবারের অধিক ক্ষমা চাইতাম।”

উমর রাঃ বলেন, ‘অতঃপর তিনি তার জানাজা পড়ে ফিরে গেলেন।

তারপর কিছু সময় অতিবাহিত হতে না হতেই সুরা বারাআতের (তাওবার) দুটি আয়াত নাজিল হলো :

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

“আর তাদের মধ্য থেকে কারও মৃত্যু হলে তার ওপর কখনো নামাজ পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসুলের প্রতিও। বস্তুত তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।” (সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৮৪)’

উমর রাঃ বলেন, ‘সেদিন রাসুল সঃ-এর সাথে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করার কারণে আমি নিজের প্রতি খুব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।’^{৫৭৫}

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ‘উমর বিন খাত্তাব রাঃ রাসুল সঃ-এর কাপড় ধরে বললেন, “আপনি তার জানাজা পড়তে যাচ্ছেন, অথচ সে একজন মুনাফিক আর আল্লাহ তাআলা আপনাকে মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন!?”

এখানে দেখুন, রাসুল ﷺ উমর ﷓-এর কাপড় টেনে ধরা এবং লোকসমাগমের মাঝে তাঁর সাথে এমনভাবে কথা বলাকে মেনে নিয়েছেন। এমনকি এতদসত্ত্বেও তার সাথে মুচকি হেসে কথা বলেছেন।^{৫৭৬}

ফায়দা : খাত্তাবি ﷓ বলেন, ‘দ্বীনের সাথে সামান্য পরিমাণ সম্পর্ক রাখা লোকদের প্রতিও রাসুলুল্লাহ ﷺ অত্যধিক ভালোবাসা পোষণ করতেন। তাই আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ব্যাপারেও তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তা ছাড়া এর মাধ্যমে তিনি তার নেককার ছেলে আব্দুল্লাহর মন জয় করতে চেয়েছেন এবং তার কওম খাজরাজের লোকদের মন আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন।

যদি তিনি তার সন্তান আব্দুল্লাহর আবেদনে সাড়া না দিতেন এবং স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আসার পূর্বে তার জানাজা পড়া থেকে বিরত থাকতেন, তখন তার সন্তান খুব কষ্ট পেতেন এবং তার গোত্রের লোকেরাও খুব লজ্জা পেত। এসব বিষয় বিবেচনা করে রাসুল ﷺ রাজনৈতিকভাবে উত্তম বিষয়টি অবলম্বন করলেন। পরে যখন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আসলো, তখন থেকে তিনি এ থেকে বিরত থাকেন।^{৫৭৭}

► হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- রাসুল ﷺ উন্নত চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। এই মুনাফিক তাঁকে এত কষ্ট দিয়েছে, তা জানা সত্ত্বেও তিনি উত্তম আচরণের মাধ্যমে তার প্রতিদান দিয়েছেন। তাকে নিজের কাপড় দিয়ে কাফন পরিয়েছেন। তার জানাজা পড়েছেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এ জন্যই তো আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।’^{৫৭৮}
- কেউ কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার জানাজা পড়া, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা এবং দোয়ার উদ্দেশ্যে তার কবরের পাশে দাঁড়ানো হারাম।^{৫৭৯}

৫৭৬. ফাতহুল বারি : ৮/৩৩৫।

৫৭৭. ফাতহুল বারি : ৮/৩৩৬।

৫৭৮. সুরা আল-কলাম, ৬৮ : ৪।

৫৭৯. ইমাম নববি ﷓ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৫/১৬৭।

বিশেষ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে তাদের ওপর বেশি ভরসা করতেন

যেমন, তাঁর ব্যয়-ব্যবস্থাপনার কাজের জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইমান আনয়নকারী সাহাবি বিলাল বিন রাবাহ রাঃ-এর ওপর ভরসা করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন হাওজানি রাঃ বলেন, ‘একদা হালব শহরে রাসুলুল্লাহ সঃ-এর মুয়াজ্জিন বিলাল রাঃ-এর সাথে আমার দেখা হলো। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “হে বিলাল, আপনি আমাকে বলুন—রাসুলুল্লাহ সঃ-এর ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা কীরূপ ছিল?” তিনি বললেন, “যখন থেকে আল্লাহ তাঁকে রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাজকর্মের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আমার ওপরই ন্যস্ত ছিল। যখনই তাঁর নিকট কোনো মুসলমান আসতেন এবং তিনি তাকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখতেন, তখন আমাকে তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতেন। তখন আমি কর্জ নিয়ে তার জন্য চাদর খরিদ করে তাকে পরাতাম এবং তাকে খানা খাওয়াতাম।

একদা জনৈক মুশরিক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল, “হে বিলাল, আমার কাছে অনেক ধন-দৌলত আছে। কাজেই তুমি আমি ছাড়া আর কারও থেকে ধার নিয়ো না।” এরপর থেকে আমি এরূপ করতে থাকলাম। একদিন আমি অজু করে যখন আজান দেওয়ার প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আমি দেখতে পেলাম, সেই মুশরিক লোকটি একদল ব্যবসায়ীকে সাথে নিয়ে আমার দিকে আসছে। আমাকে দেখেই সে বলে উঠল, “হে হাবশি!” আমি বললাম, “কী বলবেন, বলুন।” তখন সে উত্তেজিত হয়ে আমাকে গালমন্দ করতে লাগল এবং বলল, “তোমার কি জানা আছে, মাসের আর কতদিন বাকি আছে?” আমি বললাম, “মাস তো প্রায় শেষ।” সে বলল, “তোমার মাস পূর্ণ হতে আর মাত্র চার দিন বাকি আছে। তারপর আমি তোমাকে কর্জের জন্য পাকড়াও করব। আমি তোমাকে এই জন্য ধার দিই না যে, তোমাকে আমি সম্মান করি কিংবা তোমার সর্দারকে (রাসুল সঃ-কে) শ্রদ্ধা করি। আমি তোমাকে আমার গোলাম বানানোর জন্য ধার দিয়েছি। আমি তোমাকে আগের মতো ছাগল চরানোর কাজে নিয়ে যাব।”

বিলাল ﷺ বলেন, “তার এরূপ কথা শুনে আমি খুব মর্মান্বিত হলাম, যেমনটি এমন অবস্থায় অন্যান্য মানুষ মর্মান্বিত হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় শেষে যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি তাঁর নিকট আরজ করলাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আমি যে মুশরিক ব্যক্তির নিকট হতে ধার নিতাম, সে আমাকে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। এখন তো আপনার নিকট এমন কোনো সম্পদ নেই, যা দিয়ে আপনি আমার কর্জ পরিশোধ করতে পারেন। আমার কাছেও কিছু নেই। ওদিকে সে আমাকে বেইজ্জত করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সুতরাং আপনি আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি পালিয়ে গিয়ে এমন কোনো গ্রামে চলে যাই, যার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে; আর ততদিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করি, যতদিন না আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য এ পরিমাণ মালের ব্যবস্থা করে দেন, যা দিয়ে আমি আমার কর্জ পরিশোধ করতে পারি।” এ কথা বলে আমি আমার ঘরে ফিরে আসলাম এবং আমার তরবারি, মোজা, জুতো ও ঢাল আমার শিয়রে রাখলাম (যাতে অতি ভোরে আমি চলে যেতে পারি)।

যখন আমি অতি প্রত্যুষে পলায়ন করার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, এক ব্যক্তি দৌড়ে আমার কাছে এসে বলল, “হে বিলাল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে ডাকছেন।” তখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম যে, পিঠে মাল বোঝাই করা চারটি উট বসে আছে। এরপর আমি তাঁর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, “সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার কর্জ পরিশোধের জন্য আল্লাহ তাআলা এই মাল পাঠিয়ে দিয়েছেন।” আমি আল্লাহর প্রশংসা করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, “তুমি কি দেখছ না, চারটি মাল-বোঝাই উট বসে আছে? আমি বললাম, “হ্যাঁ, দেখছি।” তিনি বললেন, “এ পশুসমূহ এবং এদের পিঠে যে মালামাল আছে, সবই তোমার। এতে কাপড় ও খাদ্যশস্য আছে, যা ফিদাকের বিশিষ্ট ধনী নেতা হাদিয়াস্বরূপ আমার জন্য পাঠিয়েছেন। সুতরাং তুমি এসব বুঝে নাও এবং তোমার যাবতীয় দেনা পরিশোধ করো।”

আমি তা-ই করলাম। উটগুলোর ওপর থেকে মালের বোঝা নামিয়ে সেগুলোকে বেঁধে রাখলাম। তারপর ফজরের আজান দেওয়ার জন্য মসজিদে গমন করলাম। নামাজ শেষ হওয়ার পর বাকি কবরস্থানের নিকট গিয়ে কানে আঙুল দিয়ে (বড় আওয়াজে) ঘোষণা করলাম, “রাসুল ﷺ-এর নিকট কারও পাওনা থাকলে এখানে আসো।” তারপর আমি উক্ত মালগুলো বিক্রি করে এক এক করে রাসুল ﷺ-এর সকল কর্জ পরিশোধ করে দিলাম। এমনকি জমিনের বুকে রাসুল ﷺ-এর আর কোনো কর্জ রইল না। সব কর্জ পরিশোধ করার পর আমার নিকট দুই কি দেড় আওকিয়া অবশিষ্ট রইল।

অতঃপর আমি মসজিদে গেলাম। এতক্ষণে দিনের অনেক প্রহর অতিবাহিত হয়ে গেল। মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলাম, রাসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি যে সম্পদ পেয়েছ, তার কী করেছ?” আমি বললাম, “আল্লাহ তাআলা ওই সমস্ত দেনা পরিশোধ করে দিয়েছেন, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ছিল। আর কোনো দেনা অবশিষ্ট নেই।”

তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “ওই মাল হতে কিছু কি অবশিষ্ট আছে?” আমি বললাম, “হ্যাঁ।” তখন তিনি বললেন, “আমি চাই যে, তুমি অবশিষ্ট মাল হতেও আমাকে চিন্তামুক্ত করবে (অর্থাৎ অতিসত্ত্বর তা বিতরণ করে দেবে)। যতক্ষণ না তুমি আমাকে তা হতে চিন্তামুক্ত করবে, ততক্ষণ আমি আমার স্বজনদের কাছে ফিরে যাব না।”

সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের নিকট কেউই আসলো না। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় শেষে আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “অবশিষ্ট মালের কী করেছ?”

আমি বললাম, “তা আমার কাছেই আছে। তা গ্রহণের জন্য কেউ-ই আমার নিকট আসেনি।”

এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ সে রাত মসজিদেই কাটালেন। দ্বিতীয় দিন ইশার সালাত আদায় শেষে তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “অবশিষ্ট মালের

ব্যাপারে কী করেছ?” আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সেই মাল থেকে আপনাকে চিন্তামুক্ত করেছেন।” এ কথা শুনে তিনি “আল্লাহু আকবার” বললেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন। কারণ, তিনি সেই মাল তাঁর হাতে থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু এসে যাওয়ার ভয় করছিলেন।

এরপর তিনি ঘরে ফিরে গেলেন। আমি তাঁর পিছু পিছু সেখানে গেলাম। ঘরে যাওয়ার পর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীকে আলাদাভাবে সালাম করলেন, তারপর সে রাতে যেখানে রাত্রিযাপন করার পালা ছিল, সেখানে গেলেন। এ-ই ছিল তাঁর ব্যয়-সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা, যা তুমি আমার নিকট জানতে চেয়েছ।”^{৫৮০}

বিশেষ সাহাবিদের মধ্য থেকে কাউকে দেখতে না পেলে তার খোঁজ করতেন আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘যখন এই আয়াত নাজিল হলো :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا
لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا
تَشْعُرُونَ

“মুমিনগণ, তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।”^{৫৮১}

তখন সাবিত রাঃ নিজের ঘরে বসে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, “আমি জাহান্নামি।” এরপর থেকে তিনি রাসুল সঃ-এর নিকট যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

(তাকে দেখতে না পেয়ে) রাসুল সঃ সাদ বিন মুআজ রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আবু আমর, সাবিতের কী হলো? তার কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছে কি?”

৫৮০. সুনানু আবি দাউদ : ৩০৫৫।

৫৮১. সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ২।

সাদ বললেন, “সে তো আমার প্রতিবেশী আর আমি কোনো অসুখ হয়েছে বলে জানি না।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘অতঃপর সাদ ﷺ তার কাছে গেলেন এবং তার ব্যাপারে রাসুল ﷺ কী বলেছেন, তা জানালেন। তখন সাবিত ﷺ বললেন, “এই আয়াত নাজিল হয়েছে। আর তোমরা তো জানোই যে, রাসুল ﷺ-এর সামনে আমার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে বেশি উঁচু হয়ে যায়। সুতরাং আমি তো একজন জাহান্নামি।”

অতঃপর সাদ ﷺ রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে সাবিত ﷺ-এর কথাটি বললেন। তা শুনে রাসুল ﷺ বললেন, “না, বরং সে জান্নাতি।”^{৫৮২}

কুররা বিন ইয়াস ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘এক ব্যক্তি তার ছেলেকে সাথে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর নিকট আগমন করলেন।

রাসুল ﷺ তাকে বললেন, “তাকে কি ভালোবাসো?” তিনি বললেন, “আমি তাকে যে পরিমাণ ভালোবাসি, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সেই পরিমাণ ভালোবাসুন।”

একদিন ছেলেটি মারা গেল। তখন রাসুল ﷺ অনুপস্থিতি অনুভব করে তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিলেন। অতঃপর ছেলেটির পিতাকে বললেন :

مَا يَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ
لَكَ؟

“তুমি কি এতে খুশি হবে যে, তুমি জান্নাতের যে দরোজার পাশেই যাবে, সেখানেই তোমার সন্তানকে দৌড়ে গিয়ে তোমার জন্য দরোজা খুলে দিতে পাবে?”^{৫৮৩}

৫৮২. সহিহুল বুখারি : ৩৬১৩, সহিহ মুসলিম : ১১৯।

৫৮৩. সুনানুন নাসায়ি : ১৮৭০।

যুদ্ধ চলাকালীন তাদের ব্যাপারে একটু বেশিই খোঁজখবর নিতেন

জাইদ বিন সাবিত ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উহুদ যুদ্ধের দিন রাসুল ﷺ আমাকে সাদ বিন রাবি ؓ-এর খোঁজ করতে পাঠালেন এবং বললেন, “তাকে দেখলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম বলবে এবং বলবে, “তুমি কেমন বোধ করছ, তা রাসুল ﷺ জানতে চেয়েছেন।”

অতঃপর আমি নিহতদের সারিতে ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজতে লাগলাম। একপর্যায়ে তাকে পেয়ে গেলাম। তখন তিনি একদম মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন। তার শরীরে বর্শা, তরবারি ও তিরের আঘাত মিলিয়ে সত্তরটির মতো আঘাত ছিল।

আমি তাকে বললাম, “হে সাদ, রাসুল ﷺ আপনার জন্য সালাম পাঠিয়েছেন এবং আপনি কেমন বোধ করছেন, তা জানতে চেয়েছেন।”

তিনি বললেন, “রাসুল ﷺ ও তোমার প্রতি সালাম। রাসুল ﷺ-কে গিয়ে বলো, আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। আর আমার কওম আনসারদের বলো, “তোমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি বেঁচে থাকা অবস্থাতেও যদি রাসুল ﷺ নিহত হন, তখন আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।”—এই বলে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।’^{৫৮৪}

এই ঘটনা প্রমাণ করে, রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের প্রতি বেশ যত্নশীল ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে ও পরে তাদের খোঁজখবর নিতেন।^{৫৮৫}

(আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি) : হতে পারে, তখন আসলেই তিনি স্বাভাবিক সুগন্ধিসমূহের চেয়ে উন্নত কোনো সুঘ্রাণ পাচ্ছিলেন। ফলে তিনি বুঝতে পেরেছেন, এটাই জান্নাতি সুঘ্রাণ।

অথবা, জান্নাত লাভের দৃঢ় বিশ্বাস থেকে তিনি এমন কথা বলেছেন। যেহেতু দৃঢ় বিশ্বাস তার সামনে অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করে তুলেছিল।^{৫৮৬}

৫৮৪. বাইহাকি কৃত দালায়িলুন নুবুওয়াহ : ৩/২৫৯।

৫৮৫. আল-মুনতাকা : ৩/৬৮।

৫৮৬. সুবুলুল হদা ওয়ার রাশাদ ফি সিয়ারি খাইরিল ইবাদ : ৪/২৪৭।

তাদের কারও কারও জন্য নিজের পিতামাতাকে উৎসর্গ করার কথা বলতেন
সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘নবিজি ﷺ আমার
জন্য তাঁর তুণীর থেকে তির বের করে বললেন :

ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

“তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুবরান হোক, তুমি তির নিষ্ক্ষেপ
করতে থাকো।”^{৫৮৭}

এই বাক্যটি আরবরা উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। অর্থাৎ
যদি সম্ভব হতো, তবে তোমার জন্য আমি প্রিয় পিতামাতাকে কুবরান করতাম।

সহিহ মুসলিমে সাদ ؓ-থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘নবিজি ﷺ উহুদের দিন
তার জন্য তাঁর পিতামাতাকে একত্র করে উল্লেখ করেছিলেন।’

তিনি বলেন, ‘মুশরিকদের এক ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর আগুনের মতো
ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন রাসুল ﷺ বললেন, “তুমি তির নিষ্ক্ষেপ করো। তোমার
জন্য আমার মাতাপিতা কুবরান হোক।”

আমি তার উদ্দেশ্যে একটা তির বের করলাম, যাতে ফলা (ধারালো অংশটি)
ছিল না। সেটা গিয়ে তার পাঁজরে লাগলে সে পড়ে গেল। এতে তার লজ্জাস্থান
প্রকাশিত হয়ে গেল। তখন রাসুল ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, আমি তাঁর
মাড়ির দাঁত দেখতে পেলাম।’

রাসুল ﷺ-এর হাসার কারণ শত্রুর মৃত্যু; তার লজ্জাস্থান প্রকাশ পাওয়া নয়।^{৫৮৮}

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘খন্দক যুদ্ধের সময়
আমি ও উমর বিন আবু সালামা কিন্নায় মহিলাদের সাথে ছিলাম। কখনো সে
আমার জন্য পিঠ নিচু করে দিত, তখন আমি দেখতাম। আবার কখনো আমি
তার জন্য পিঠ নিচু করে দিতাম, তখন সে দেখত।

৫৮৭. সহিহুল বুখারি : ৪০৫৫, সহিহ মুসলিম : ২৪১২।

৫৮৮. ইমাম নববি ؒ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৫/১৮৫।

আমি দেখলাম, জুবাইর ؓ ঘোড়ায় চড়ে বনু কুরাইজার দিকে দুবার অথবা তিনবার গমন করলেন।

অতঃপর যখন আমরা ফিরে আসলাম, তখন আমি তাকে বললাম, “আবু, আমি আপনাকে (বনু কুরাইজার দিকে) আসা-যাওয়া করতে দেখেছি।” তিনি বললেন, “তুমি কি আমাকে দেখেছ, হে বৎস?” আমি বললাম, “জি, দেখেছি।” তিনি বললেন, “রাসুল ؐ বলেছিলেন, “কেউ যদি বনু কুরাইজার নিকট গিয়ে তাদের খবর আমাকে এনে দিত।”

তাঁর কথা শুনে সেখানে গেলাম। যখন ফিরে আসলাম, তখন রাসুল ؐ আমার জন্য তাঁর পিতামাতাকে একত্রে উল্লেখ করে বললেন :

فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

“তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক।”^{৫৮৯}

নববি ؓ বলেন, ‘এখানে প্রকৃত কুরবানি উদ্দেশ্য নয়। এটা ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত একটি বাক্য মাত্র।

এই হাদিস থেকে ইবনে জুবাইর ؓ-এর ফজিলত ও তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, তিনি হিজরতের বছর মদিনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর সঠিক মত অনুসারে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরি চতুর্থ বছরে। সুতরাং বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় তার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। এই ছোট বয়সেই তিনি পুরো ঘটনা স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন।’^{৫৯০}

সাহাবিদের মৃত্যুতে তিনি মর্মান্বিত ও অশ্রুসিক্ত হতেন

আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসুল ؐ মৃত্যুর যুদ্ধে জাইদ বিন হারিসা ؓ-কে সেনাপতি বানিয়ে প্রেরণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন :

إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

৫৮৯. সহিহুল বুখারি : ৩৭২০, সহিহ মুসলিম : ২৫১৬।

৫৯০. ইমাম নববি ؓ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৫/১৮৪।

“জাইদ নিহত হলে জাফর সেনাপতি হবে, জাফর নিহত হলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবে।”

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ বলেন, ‘সেই যুদ্ধে তাদের দলে আমিও ছিলাম। আমরা জাফর বিন আবু তালিব রাঃ-কে তালাশ করলাম। তখন নিহতদের মাঝে তাকে পেলাম। তার শরীরে নব্বইয়ের অধিক তরবারি ও তিরের আঘাতের দাগ ছিল।’^{৫৯১}

আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসুল সঃ খুতবা দিলেন। তখন তিনি বললেন :

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ - وَإِنَّ عَيْنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَتَذْرِفَانِ - ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فَفُتِحَ لَهُ

“জাইদ পতাকা ধারণ করল, অতঃপর সে নিহত হলো। তারপর জাফর পতাকা হাতে তুলে নিল। একপর্যায়ে সেও নিহত হলো। তারপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পতাকা হাতে নিল, অতঃপর সেও নিহত হলো।—এ কথা বলার সময় রাসুল সঃ-এর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তার পর নেতৃত্ব ছাড়া খালিদ বিন ওয়ালিদ পতাকা হাতে নিল এবং তার হাতে বিজয় অর্জিত হলো।”^{৫৯২}

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমি রাসুল সঃ-কে উসমান বিন মাজউন রাঃ-এর মরদেহে চুম্বন করতে দেখেছি। তখন তাঁর কপোল বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে দেখেছি।’

অপর বর্ণনায় আছে, ‘তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।’^{৫৯৩}

৫৯১. সহিহুল বুখারি : ৪২৬১।

৫৯২. সহিহুল বুখারি : ১২৪৬।

৫৯৩. সুনানু আবি দাউদ : ৩২০৬, সুনানুত তিরমিজি : ৯৮৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৪৫৬।

মুত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘যখন উসমান বিন মাজউন رضي الله عنه ইনতিকাল করলেন, তখন তাঁর মৃতদেহ আনা হলো এবং দাফন করা হলো। অতঃপর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনতে বললেন। লোকটি পাথর বহনে সক্ষম হলেন না। তখন রাসূল ﷺ পাথরের কাছে গেলেন এবং তা ওঠানোর জন্য জামার হাতা গুটালেন।’

মুত্তালিব رضي الله عنه বলেন, ‘যে সাহাবি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই ঘটনাটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, “আমি রাসূল ﷺ-এর হাতের শুভতার চমক এখনো অনুভব করি, যা তিনি জামার হাতা গুটানোর সময় প্রকাশ পেয়েছিল।”

অতঃপর রাসূল ﷺ পথরটি বহন করে এনে উসমান رضي الله عنه-এর মাথার দিকে রাখলেন। আর বললেন :

أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَذْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي

“এর মাধ্যমে আমি আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারব এবং আমার পরিবার থেকে কেউ মারা গেলে তাকে এর পাশে কবর দেবো।”^{৫৯৪}

উসমান বিন মাজউন : তিনি রাসূল ﷺ-এর দুধভাই ছিলেন। হাবশা ও মদিনা উভয় অঞ্চলে হিজরত করেছেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি জাহিলি যুগ থেকেই নিজের জন্য মদকে হারাম করে নিয়েছিলেন। হিজরতের পর মুহাজিরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেছিলেন। হিজরতের ত্রিশ মাসের মাথায় শাবান মাসে তার মৃত্যু হয়েছিল। তিনি আবিদ, মুজতাহিদ ও প্রথম সারির সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।^{৫৯৫}

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, মৃত্যুর পর মুসলমানকে চুম্বন করা এবং তার জন্য (বিলাপ না করে) কান্না করা বৈধ।

ইবনে কুদামা رضي الله عنه বলেন, ‘কোনো পাথর বা কাঠখণ্ড দ্বারা কবরকে চিহ্নিত করাতে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম আহমাদ رضي الله عنه বলেন, “কোনো বস্তু দ্বারা

৫৯৪. সুনানু আবি দাউদ : ৩২০৬।

৫৯৫. আল-ইসাবা : ৪/৪৬১।

কবরকে চিহ্নিত করে রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, রাসুল ﷺ উসমান বিন মাজউন ؓ-এর কবরকে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন।”^{৫৯৬}

নিকটাত্মীয়দের কবরসমূহ পাশাপাশি রাখা মুসতাহাব। কেননা, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘আমার পরিবার থেকে কেউ মারা গেলে তাকে এর (উসমান বিন মাজউন ؓ-এর কবর) পাশে কবর দেবো।’ তারপর সর্বপ্রথম রাসুল ﷺ-এর সন্তান ইবরাহিম ইনতিকাল করেন এবং তাকে তার পাশেই দাফন করা হয়।^{৫৯৭}

তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ‘কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।’^{৫৯৮}

ইবনে বাত্তাল ؒ বলেন, ‘পরামর্শ করা সুন্নাত। কেউই পরামর্শ থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। যদি কেউ পরামর্শ থেকে অমুখাপেক্ষী হতো, তবে রাসুল ﷺ-ই সর্বাধিক অমুখাপেক্ষী হতেন। কারণ, জিবরাইল ؑ আসমান থেকে সঠিক ও যথার্থ ফয়সালাটিই নিয়ে আসতেন।

তবে পরামর্শের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি কেবল ইমামই প্রদান করবেন। অন্য কোনো ব্যক্তি তাতে শরিক থাকবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।”^{৫৯৯}

এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে কেবল তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত করেছেন।^{৬০০}

৫৯৬. আল-মুগনি : ২/১৯১।

৫৯৭. মিরকাতুল মাফাতিহ : ৫/৪৫৭।

৫৯৮. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫৯।

৫৯৯. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫৯।

৬০০. ইবনে বাত্তাল ؒ কৃত শারহু সহিহিল বুখারি : ৫/৩৩৪।

হাসান বসরি رحمته الله বলেন, ‘যেকোনো সম্প্রদায়ের সামনে কোনো বিষয় আসলে, তারা যদি পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়, তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদের যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফিক দান করেন।’^{৬০১}

কবি বলেন :

الرأي قبل شجاعة الشجعان *** هو أول، وهي المحل الثاني

فإذا هما اجتماعا لنفس حرة *** بلغت من العلياء كل مكان

‘বাহাদুরের বাহাদুরি প্রদর্শনের পূর্বে পরামর্শ করতে হয়। পরামর্শ আগে, তারপর বাহাদুরি।

এ দুটি বিষয় যখন কোনো জানবাজ ব্যক্তির মাঝে একত্রিত হয়, তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে তার উন্নতি সুনিশ্চিত।’

তাদের রায় ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন

আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, ‘একদা আমরা কয়েকজন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ঘিরে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে আবু বকর ও উমর رضي الله عنه-ও ছিলেন। হঠাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং পুনরায় ফিরে আসতে এত বিলম্ব করলেন যে, এতে আমরা শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম, না জানি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আবার কোনো বিপদে পড়লেন কি না। আমরা ঘাবড়ে গেলাম এবং উঠে বের হয়ে পড়লাম। অবশ্য সকলের মধ্যে আমিই প্রথম ভীত হয়ে পড়েছিলাম। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধানে আমি সকলের আগে বের হলাম। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে আমি বনু নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনসারির প্রাচীরবেষ্টিত বাগানের নিকট পৌঁছালাম। ভেতরে প্রবেশ করার জন্য তার চারদিকে দরোজা খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি, বাইরের একটি কূপ হতে একটি ছোট নালা এসে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে।’

তিনি বলেন, ‘আমি জড়োসড়ো হয়ে তাতে প্রবেশ করলাম এবং ধীরে ধীরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে পৌঁছালাম। তিনি (আমাকে তাঁর সামনে দেখে

বিস্ময় প্রকাশ করে) বললেন, “আবু হুরাইরা নাকি!?” আমি বললাম, “জি, ইয়া রাসুল্লাহ!” তিনি বললেন, “কী ব্যাপার? (তুমি এখানে?)” আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদের মধ্যে বসা ছিলেন, হঠাৎ উঠে চলে আসলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আপনাকে ফিরে আসতে না দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, (আল্লাহ না করুন) আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনি কোনোরূপ বিপদের সম্মুখীন হলেন কি না। এ জন্য আমরা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং সকলের মধ্যে আমিই প্রথম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর (আপনাকে খোঁজ করতে করতে) এ বাগানের দিকে আসি এবং শিয়ালের ন্যায় খুব সরু হয়ে বাগানে প্রবেশ করি। আর অন্যরাও (আপনার খোঁজে) আমার পেছনে আসছে।”

রাসুল ﷺ তাঁর জুতোজোড়া আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, “হে আবু হুরাইরা, (তুমি যে আমার কাছে এসেছ, তার প্রমাণস্বরূপ) আমার জুতোদুটি সাথে নিয়ে যাও! আর বাগানের বাইরে যাদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তাদের মধ্যে যারা সত্য ও দৃঢ় মনে সাক্ষ্য দেয় যে, “আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই”, তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও।”

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, (রাসুল ﷺ-এর এ নিদর্শন নিয়ে বাইরে আসার পর) প্রথমেই উমর ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “হে আবু হুরাইরা, এ জুতোজোড়া কার?” আমি বললাম, “এগুলো রাসুল ﷺ-এর। তিনি এ জুতোজোড়া আমার হাতে দিয়ে বলেছেন, “যে ব্যক্তি সত্য ও দৃঢ় মনে এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি যেন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিই।”

এ কথা শোনামাত্রই উমর ﷺ আমার বুকের ওপর এমন ঘুষি মারলেন যে, আমি চিত হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর উমর ﷺ আমাকে বললেন, “ফিরে যাও, হে আবু হুরাইরা!” তাই আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসুল ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলাম।

পেছনে ফিরে দেখি, উমর ﷺ-ও আমার সাথে এসে পৌঁছেছেন। রাসুল ﷺ (আমাকে কাঁদতে দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, “কী হলো, হে আবু হুরাইরা?”

আমি বললাম, “(এখান থেকে যাওয়ার পর) উমরের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তখন আমি তাকে সেই কথা বললাম, যা নিয়ে আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তা শুনে তিনি আমার বুকের ওপর এমন জোরে ঘুষি মারলেন যে, আমি চিত হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর তিনি আমাকে ফিরে আসতে বললেন।”

তখন রাসুল ﷺ উমর ﷓-কে বললেন, “হে উমর, এমন করলে কেন?” উমর ﷓ বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আপনি কি আপনার জুতোজোড়া দিয়ে আবু হুরাইরাকে এই বলে পাঠিয়েছেন—যে ব্যক্তি অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই”, তাকে যেন সে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়?” রাসুল ﷺ বললেন, “হ্যাঁ।” উমর ﷓ বললেন, “(হে আল্লাহর রাসুল, অনুগ্রহ করে) এরূপ বলবেন না। আমার আশঙ্কা হয় যে, (এমন কথা শুনে) পরবর্তী লোকেরা এর ওপর নির্ভর করে বসবে (আমল করা ছেড়ে দেবে)। সুতরাং তাদের যথাযথভাবে আমল করতে দিন।”

এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “ঠিক আছে, তাদের আমল করতে দাও।”^{৬০২}

লক্ষ করুন, উমর ﷓ রাসুল ﷺ-এর কথার বিপরীত একটি প্রস্তাব পেশ করলেন আর সেটাকে রাসুল ﷺ গ্রহণ করে নিলেন।

উমর ﷓-এর উক্ত কর্ম রাসুল ﷺ-এর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা বা প্রত্যাখ্যান ছিল না। তবে তিনি দেখতে পেলেন যে, রাসুল ﷺ যে কথা দিয়ে আবু হুরাইরা ﷓-কে প্রেরণ করেছেন, তাতে মুসলমানদের জন্য অন্তরের প্রশান্তি ও সুসংবাদ ছাড়া অন্য কোনো কল্যাণ নেই। তদুপরি, এ কথা শুনে তারা (মুক্তিলাভের ব্যাপারে) অতিমাত্রায় ভরসাপ্রবণ হয়ে পড়ার এবং ভালো কর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তিনি রাসুল ﷺ-এর নিকট প্রস্তাব পেশ করলেন যেন এই কথাটি গোপন রাখা হয়। রাসুল ﷺ তার প্রস্তাবকে যথার্থ মনে করলেন এবং তা মেনে নিলেন।^{৬০৩}

৬০২. সহিহ মুসলিম : ৩১।

৬০৩. ইমাম নববি ﷓ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১/২৩৮।

► এই হাদিস থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হলো :

- আলিম কর্তৃক তার ছাত্র-শিষ্য ও জিজ্ঞাসাকারীদের সাথে নিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা ও ফতোয়া প্রদানের মজলিস কায়ম করা।
- বড় একটি দলের আলোচনা করার সময় প্রত্যেকের নাম না নিয়ে তাদের মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকজনের নাম নিয়ে বাকিদের জন্য ইত্যাদি বা প্রমুখ বলে দেওয়া।
- সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم রাসুল ﷺ-এর প্রতি খুব যত্নশীল ছিলেন এবং তাঁর প্রতি তাঁদের সম্মানবোধ অব্যক্ত মাত্রায় ছিল। আর প্রত্যাশিত জায়গায় তিনি আসতে দেরি করলে অস্বস্তিবোধ করতেন এবং ভীত হয়ে পড়তেন।
- অনুসারীরা তাদের সর্দারের হুক আদায়ে সচেষ্টি থাকবে এবং তার উপকার সাধনে ও ক্ষতি দূরীকরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।
- অপরের মালিকানাধীন জায়গায় অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা বৈধ, যদি দুজনের মাঝে বন্ধুত্ব থাকার কারণে বা অন্য কোনো কারণে তাতে মালিকের নীরব অনুমতি থাকে। কেননা, আবু হুরাইরা رضي الله عنه প্রাচীরবেষ্টিত বাগানটিতে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ এর জন্য তাকে কোনোরূপ দোষারোপ করেননি।

এই বিধান কেবল মালিকানাধীন জায়গায় প্রবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং কারও আসবাবপত্র ব্যবহার করা, কারও খানা খাওয়া, কারও ঘর থেকে নিজের বাড়িতে খানা নিয়ে আসা, কারও বাহনে আরোহণ করা ইত্যাদি বিষয়ে বিনা অনুমতিতে করতে পারবে, যদি জানা থাকে যে, এতে মালিক বিরক্ত হবে না।

- যে ইমান চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তার জন্য অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি আবশ্যিক।
- বিশেষ কোনো প্রয়োজন বা উপকারিতা না থাকলে কিংবা ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে কিছু কিছু জ্ঞান গোপন রাখা বৈধ।
- অনুসারী তার নেতা বা ইমামের সিদ্ধান্তের বিপরীত কোনো বিষয়ে কল্যাণ দেখতে পেলে অনুসৃতকে তা জানাতে পারবে এবং অনুসৃতের

জন্যও উচিত যে, অনুসারীর কথা যৌক্তিক ও উপকারী হলে তা মেনে নেওয়া এবং নিজের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া।

- এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ‘তোমার জন্য আমার মাতাপিতা কুরবান হোক’ বলা বৈধ।^{৬০৪}

বদর যুদ্ধে জনৈক সাহাবির পরামর্শে ছাউনি স্থাপন করেছিলেন

রাসুল ﷺ বদরে পৌঁছে তাতে ছাউনি স্থাপন করলেন। তখন হুবাব বিন মুনজির ﷺ বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই জায়গাটা কি আপনি আল্লাহর নির্দেশেই বাছাই করেছেন, যার থেকে আমরা একচুল এদিক-ওদিক সরতে পারি না, না এটা আপনার নিজের রণকৌশলগত সিদ্ধান্ত?’ রাসুল ﷺ বললেন, ‘এটা নেহাত একটা রণকৌশল এবং আমার নিজস্ব চিন্তা।’

হুবাব ﷺ বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, জায়গাটি সুবিধার মনে হচ্ছে না। আপনি বরং সৈন্যদলকে এখান থেকে এগিয়ে নিয়ে যান। আমরা ওই কূপের নিকট গিয়ে ছাউনি স্থাপন করব, যা কুরাইশদের অতি নিকটে। এরপর আমরা সেই জায়গার আশপাশে যে কূপ আছে, সেগুলো বন্ধ করে দেবো। অতঃপর সেখানে একটি হাউজ তৈরি করে তাতে পানি ভরে রাখব। পরে যখন আমরা শত্রুদের সাথে লড়াই করব, তখন আমরা পানি পান করতে পারব, কিন্তু ওরা পারবে না।’ এ কথা শুনে রাসুল ﷺ বললেন, ‘তুমি ঠিকই বলেছ।’

এরপর তিনি সবাইকে নিয়ে উঠলেন এবং কুরাইশদের নিকটে অবস্থিত কূপের কাছে পৌঁছালেন আর সেখানে তাঁর ফেললেন। তারপর নবিজি ﷺ-এর নির্দেশে অন্যান্য কূপ বন্ধ করে দেওয়া হলো। তিনি যে কূপের কাছে তাঁর ফেললেন, তার কাছে একটি হাউজ তৈরি করে পানি ভরে রাখলেন এবং তাতে পানির পাত্র ফেলে রাখলেন।^{৬০৫}

৬০৪. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১/২৩৮।

৬০৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/১৬৭।

উহুদ যুদ্ধে নিজের রায় থেকে সরে সাহাবিদের রায় গ্রহণ করেছিলেন

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসুল ﷺ তাঁর “জুল-ফাকার” নামক তলোয়ারটি বদর যুদ্ধে গনিমত হিসেবে পেয়েছিলেন। উহুদ যুদ্ধের দিন এটাকে জড়িয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন।

উহুদের দিন মুশরিকরা যখন আক্রমণ করতে আসলো, তখন রাসুল ﷺ-এর রায় ছিল, তিনি মদিনায় থেকে তাদের মুকাবিলা করবেন। কিন্তু বদর যুদ্ধে শরিক ছিল না, এমন কতক লোক বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদেরকে তাদের ওখানে নিয়ে চলুন, উহুদেই আমরা তাদের সাথে লড়াই করব। এতে আমরা সেই ফজিলত লাভের আশা করছি, যা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ পেয়েছিলেন।”

তারা রাসুল ﷺ-কে বারবার এই অনুরোধ করতে থাকলে একপর্যায়ে তিনি বর্ম পরিধান করে নিলেন। কিন্তু যখন তিনি বর্ম পরিধান করলেন, তখন তারা লজ্জিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, এখানেই অবস্থান করুন। আপনার রায় অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক।” তখন রাসুল ﷺ বললেন :

مَا يَنْبَغِي لِيَّ أَنْ يَضَعَ أَدَاتَهُ بَعْدَ أَنْ لَبِسَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ عَدُوِّهِ

“কোনো নবির জন্য উচিত নয় যে, তিনি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে তা শত্রু ও তার মাঝে আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করে দেওয়ার পূর্বেই খুলে ফেলবেন।”^{৬০৬}

আয়িশা ؓ-এর ওপর অপবাদ আরোপের ঘটনায়ও তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন।

আয়িশা ؓ বলেন, ‘আমার সম্পর্কে যখন অপবাদ রটানো হচ্ছিল, অথচ এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না, এমন সময় একদিন রাসুল ﷺ আমার প্রসঙ্গটি

নিয়ে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। অতঃপর প্রথমে তিনি তাশাহুদ পাঠ করলেন এবং আল্লাহর যথাযথ হামদ ও সানা পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন :

أَمَّا بَعْدُ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنْاسٍ أَبْنُوا أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ
سُوءٍ قَطُّ وَأَبْنُوا بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلَا دَخَلَ
بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيَ

“হামদ ও সালাতের পর : এইসব লোকের ব্যাপারে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, যারা আমার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদ রটাচ্ছে। অথচ আল্লাহর কসম, আমার স্ত্রীর ব্যাপারে কখনো মন্দ কিছু আমি জানি না। এরা এমন মানুষকে জড়িয়ে অপবাদ রটাচ্ছে, আল্লাহর কসম, তার সম্পর্কেও আমি মন্দ বলতে কখনো কিছু জানি না। আর আমার উপস্থিতি ব্যতীত সে আমার ঘরে কোনোদিন আসেনি। কোনো সফরে যাওয়ার কারণে আমি যখন অনুপস্থিত থেকেছি, সেও আমার সঙ্গেই অনুপস্থিত থেকেছে।”^{৬০৭}

সাহাবিদের দুঃখ-কষ্টের খেয়াল রাখতেন

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, রাসুল ﷺ-এর সাহাবিগণ ইসলামের জন্য অনেক দুঃসহ কষ্ট সহ্য করেছেন। বিশেষ করে যারা একদম গুরু দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা কঠিন দুঃখ-দুর্দশাময় একটি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এই যেমন মুসআব বিন উমাইর রাঃ। তিনি পার্শ্বিক ভোগবিলাস ও চাকচিক্য পরিত্যাগ করে এবং মমতাময়ী মা ও পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ ও রাসুল ﷺ-এর প্রতি হিজরত করেছিলেন।

মুহাম্মদ বিন কাব কুরাজি রাঃ বলেন, ‘আলি রাঃ-কে বলতে শুনেছেন এমন এক ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আলি বিন আবু তালিব রাঃ বলেন, “আমি এক শীতের দিনে রাসুলুল্লাহ সঃ-এর ঘর থেকে বের হলাম। এর পূর্বে আমি একটি লোমহীন চামড়া নিয়ে তা মাঝামাঝি কেটে গলায় ঢুকালাম এবং খেজুরের পাতা দিয়ে কোমরে শক্ত করে বাঁধলাম। তখন আমি খুবই ক্ষুধার্ত

ছিলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে কোনো খাবার থাকলে আমি খেয়ে নিতাম। আমি খাবারের সন্ধানে বের হলাম। জনৈক ইহুদির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে চরকির সাহায্যে বাগানে পানি সেচ করছিল। আমি প্রাচীরের একটি ছিদ্র দিয়ে তাকে দেখলাম। সে বলল, “হে বেদুইন, কী চাও? প্রতি বালতির বিনিময়ে তুমি একটি খেজুর পাবে—আমাকে পানি তুলে দেবে?” আমি বললাম, “ঠিক আছে। দরোজা খোলো, আমি ভেতরে আসি।” সে দরোজা খুললে আমি ভেতরে গেলাম। সে আমাকে বালতি দিল। প্রতি বালতি পানি তুলতেই সে আমাকে একটি করে খেজুর দিতে লাগল। এভাবে আমার মুঠি খেজুরে ভরে গেল। তারপর বালতি রেখে দিয়ে তাকে বললাম, “আমার যথেষ্ট হয়েছে। এরপর খেজুর খেয়ে পানি পান করলাম এবং মসজিদে চলে এলাম। সেখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলাম।

আমরা রাসুল ﷺ-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় চামড়ার তালিযুক্ত একটি ছেঁড়া চাদর গায়ে জড়িয়ে মুসআব বিন উমাইর এসে আমাদের সামনে হাজির হলেন। রাসুল ﷺ তাঁর বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে এবং তাঁর পূর্বের সচ্ছল অবস্থার কথা মনে করে কেঁদে ফেললেন। তারপর রাসুল ﷺ বললেন :

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَرَاحَ فِي حُلَّةٍ وَوَضَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةً وَرُفِعَتْ أُخْرَى وَسَرَّتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسَرُّ الْكُغْبَةُ؟

“সে সময় তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদের কেউ সকালে এক জোড়া পোশাক পরবে আর বিকেলে পরবে আরেক জোড়া। আর তার সামনে খাদ্যভর্তি একটি পেয়ালা রাখা হবে আর অন্যটি উঠিয়ে নেওয়া হবে। তোমরা তোমাদের ঘরগুলো এমনভাবে পর্দায় ঢেকে রাখবে, যেভাবে কাবা ঘরকে গিলাফে ঢেকে রাখা হয়?”

সাহাবিগণ আরজ করলেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তো তখন বর্তমানের চাইতে অনেক ভালো থাকব। বিপদাপদ ও অভাব-অনটন হতে নিরাপদ থাকব। ফলে ইবাদত-বন্দেগির জন্য যথেষ্ট অবসর পাব।” রাসুল ﷺ বললেন :

لَأَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ

“না, সেদিনের তুলনায় তোমরা আজ অনেক ভালো আছ।”^{৬০৮}

বিশেষ কারণে অনুদান না দিলে অন্য উপায়ে তাদের মন জয় করে নিতেন

আবু সাইদ খুদরি রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রকে বড় অঙ্কের অনুদান দিলেন, কিন্তু আনসারদের কিছুই দিলেন না। এতে আনসাররা মনে মনে কষ্ট পেলেন, এমনকি তাঁদের মাঝে এর প্রতি আপত্তিসুলভ কথাবার্তাও শুরু হয়ে গেল। তাঁদের একজন তো বলেই বসলেন যে, “রাসুল সঃ স্বজনপ্রীতি করেছেন।”

এমন পরিস্থিতিতে সাদ বিন উবাদা রাঃ রাসুল সঃ-এর নিকট গিয়ে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই লোকদের (আনসারদের) মনে আপনার প্রতি অভিযোগ সৃষ্টি হয়েছে যে, আপনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে আপনার নিজের কওমকে দিয়েছেন এবং এর বিরাট অংশ আরবের বিভিন্ন কবিলার মাঝেও বণ্টন করেছেন, কিন্তু আনসারদের জন্য কোনো অংশ রাখেননি।”

রাসুল সঃ বললেন, “হে সাদ, এ সম্পর্কে তোমার অবস্থান কী?”

সাদ রাঃ বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমিও তো আমার কওমের একজন সদস্য। আমার অবস্থান কি ভিন্ন হতে পারে?”

রাসুল সঃ বললেন, “তোমার কওমকে হাদিরায় (সংরক্ষিত প্রাঙ্গণ) একত্রিত করো।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘অতঃপর সাদ রাঃ বের হয়ে লোকদের ওই প্রাঙ্গণে একত্র করলেন। সেখানে কিছু মুহাজিরও একত্রিত হলে সাদ রাঃ বাধা দিলেন না। কিন্তু পরে আরও কিছু মুহাজির আসতে চাইলে তিনি তাদের বাধা দিলেন।

অতঃপর সবাই যখন একত্রিত হলো, তখন সাদ রাঃ রাসুল সঃ-এর নিকট এসে বললেন, “আপনার জন্য আনসারদের একত্র করেছি।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘অতঃপর রাসুল ﷺ তাঁদের কাছে আসলেন এবং আল্লাহর যথাযথ হামদ ও সানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন :

“হে আনসার সম্প্রদায়, আমি এসব কী শুনতে পাচ্ছি যে, তোমরা নাকি মনের ভেতর এমন আপত্তি ধারণ করে আছ? আমি কি এমন অবস্থায় তোমাদের নিকট আসিনি, যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন; তোমরা নিঃস্ব ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রাচুর্য দান করেছেন; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছেন?”

তাঁরা বললেন, “সত্যিই, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অনেক দয়ালু ও মেহেরবান।”

রাসুল ﷺ বললেন, “হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা কি আমার প্রস্তাবে সাড়া দেবে না?”

তাঁরা বললেন, “আমরা কীভাবে সাড়া না দিয়ে পারি, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদের প্রতি কত দয়া করেছেন?”

রাসুল ﷺ বললেন, “আল্লাহর কসম, যদি তোমরা বলো যে, “আপনি অন্যদের কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন, আমরা আপনাকে সত্যায়ন করেছি; আপনি লাঞ্চিত হয়ে এসেছিলেন, আমরা আপনাকে সহযোগিতা করেছি; আপনি বিতাড়িত হয়ে এসেছিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি; আপনি নিঃস্ব অবস্থায় এসেছিলেন, আমরা আপনাকে প্রাচুর্য দান করেছি”—তাহলে তোমাদের কথা পুরোপুরি সত্য হবে। কিন্তু হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা কি দুনিয়ার সম্পদ না পাওয়ার দুঃখে মনের ভেতর অভিযোগ লালন করবে, যে সম্পদের মাধ্যমে আমি তাদের অন্তরসমূহকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছি, যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তোমাদের ক্ষেত্রে তোমাদের ইসলামের ওপর ভরসা করেছি?

সেই সত্তার শপথ—যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি হিজরত না হতো, তাহলে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। যদি লোকেরা এক পথ দিয়ে চলে এবং আনসাররা অন্য পথ দিয়ে চলে, তখন আমি অবশ্যই আনসারদের পথ দিয়ে

চলব। হে আল্লাহ, আপনি আনসারদের প্রতি রহম করুন। তাঁদের সন্তানদের প্রতি রহম করুন। তাঁদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতি রহম করুন।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর কথা শুনে তাঁরা এমনভাবে কাঁদলেন যে, তাঁদের দাড়ি ভিজে গেল। তারা বললেন, “রাসুল ﷺ যেভাবে বণ্টন করেছেন, তার ওপর আমরা সন্তুষ্ট।”

অতঃপর রাসুল ﷺ চলে গেলেন এবং আমরাও যে যার মতো চলে গেলাম।’^{৬০৯}

তিনি সাহাবিদের বিশেষ গুণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন

প্রত্যেক সাহাবির মাঝে যে বিশেষ গুণ ও যোগ্যতা ছিল, যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করত, সে সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ অবহিত ছিলেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন :

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ
حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِي
بُنْ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ
بُنْ ثَابِتٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ
الْجُرَّاحِ

‘আমার উম্মাহর প্রতি সর্বাধিক দয়ালু ব্যক্তি হলো আবু বকর।
আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সর্বাধিক কঠোর ব্যক্তি হলো উমর।
সর্বাধিক লজ্জাশীল ব্যক্তি উসমান। সবচেয়ে বিচক্ষণ বিচারক আলি
বিন আবু তালিব। সর্বোত্তম কুরআন পাঠকারী উবাই বিন কাব।
হালাল-হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হলো মুআজ বিন
জাবাল। ফারায়িজ-সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি হলো
জাইদ বিন সাবিত। আর শুনে রাখো, প্রত্যেক উম্মাহর একজন

বিশ্বস্ত মানুষ থাকে, আর এই উম্মাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলো আবু
উবাইদা বিন জাররাহ।’^{৬১০}

এখানে রাসুল ﷺ প্রত্যেক বড় সাহাবিকে বিশেষ একটি গুণের মাধ্যমে
বিশেষায়িত করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন যে, উক্ত গুণ সেই সাহাবির মধ্যে
অন্যদের তুলনায় অধিক হারে বিদ্যমান আছে। যেমন : উসমান রাঃ-এর মাঝে
লজ্জাশীলতা এবং আলি রাঃ-এর মাঝে বিচার-ফয়সালার যোগ্যতা ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে আবু জার রাঃ-এর ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেন :

مَا أَظَلَّتِ الْخَضِرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغُبَرَاءُ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ وَلَا أَوْفَى
مِنْ أَبِي ذَرٍّ شَبَّهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

‘সত্যভাষণ ও অঙ্গীকার পালনে আবু জারের চেয়ে উত্তম কোনো
ব্যক্তিকে আসমান ছায়া দান করেনি এবং পৃথিবী তার বুকে ধারণ
করেনি। ইসা রাঃ-এর সঙ্গে তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়।’

তখন উমর রাঃ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বললেন, ‘তার এই গুণের ব্যাপারে কি
আপনি সম্যক অবগত?’

তিনি বললেন, ‘হাঁ, তোমরাও তা জেনে নাও।’

তিনি আরও বললেন :

وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى تَوَاضُعِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي ذَرٍّ

‘কেউ যদি ইসা রাঃ-এর বিনম্রতাকে দেখতে চায়, সে যেন আবু
জারকে দেখে।’^{৬১১}

তিনি প্রত্যেক সাহাবির বিশেষ গুণের মূল্যায়ন করতেন

তিনি উমর রাঃ-এর আত্মমর্যাদাবোধের মূল্যায়ন করেছিলেন। আবু হুরাইরা
রাঃ বলেন, ‘একদা আমরা রাসুল ﷺ-এর পাশে ছিলাম। তিনি বললেন :

৬১০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৯০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১২২৪।

৬১১. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৩২৯৩৩।

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ فَقُلْتُ:
لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ
مُذْبِرًا

“আমি যখন ঘুমে ছিলাম, তখন স্বপ্নে নিজেকে আবিষ্কার করলাম জান্নাতে। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটি মেয়ে একটি বালাখানার পাশে অজু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “এই বালাখানাটি কার?” তারা বলল, “উমর বিন খাত্তাবের।” তখন তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা মনে পড়ে গেল আমার। তাই (প্রবেশ না করে) ফিরে আসলাম।”

এ কথা শুনে উমর রাঃ কেঁদে দিলেন এবং বললেন :

أَعْلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

“ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি কি আপনার ওপরও আত্মমর্যাদাবোধ দেখাতে যাব?”^{৬১২}

- এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাসুল সঃ সাহাবিদের মূল্যায়ন করতেন।
- এই হাদিস থেকে উমর রাঃ-এর ফজিলত প্রমাণিত হয়।
- এই হাদিস থেকে আরও বোঝা যায়, প্রত্যেক মানুষের স্বভাব বিবেচনা করে তার সাথে আচরণ করতে হয়।^{৬১৩}

অনুরূপভাবে তিনি উসমান রাঃ-এর লজ্জাশীলতার মূল্যায়ন করেছিলেন।

আয়িশা রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ আমার ঘরে শোয়া ছিলেন। তাঁর উরুদ্বয় অথবা পায়ের গোছা অনাবৃত ছিল। এমন সময় আবু বকর রাঃ তাঁর কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন এবং পূর্বের অবস্থায়

৬১২. সহিহুল বুখারি : ৩২৪২, সহিহ মুসলিম : ২৩৯৫।

৬১৩. ফাতহুল বারি : ৭/৪৫, ইবনে বাত্তাল রাঃ কৃত শারহ সহিহিল বুখারি : ৯/৫৪৪।

বহাল থেকে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর উমর রাঃ অনুমতি চাইলেন। তিনি পূর্বের অবস্থায় বহাল থেকে তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং কথাবার্তা বলতে লাগলেন। অতঃপর উসমান রাঃ প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন রাসুল সঃ উঠে বসলেন এবং কাপড়-চোপড় ঠিক করলেন। তারপর উসমান রাঃ প্রবেশ করলেন এবং কথাবার্তা বললেন।’

বর্ণনাকারী বলেন, ‘অতঃপর উসমান রাঃ কথা বলে চলে যাওয়ার পর আয়িশা রাঃ বললেন, “আবু বকর রাঃ প্রবেশ করলেন, আপনি পরিবর্তিত হলেন না এবং বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করলেন না। উমর রাঃ প্রবেশ করলেন, আপনি পরিবর্তিত হলেন না এবং বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করলেন না। কিন্তু উসমান রাঃ প্রবেশ করতেই আপনি উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। কেন এমন করলেন?”

তখন রাসুল সঃ বললেন :

أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ

“আমি কি সেই ব্যক্তিকে লজ্জা করব না, যাকে ফেরেশতাগণও লজ্জা পান?”^{৬১৪}

এই হাদিস থেকে উসমান রাঃ-এর ফজিলত প্রমাণিত হয় এবং আরও বোঝা যায় যে, তিনি ফেরেশতাকুলের নিকট অনেক সম্মানিত ছিলেন। সাথে সাথে প্রতীয়মান হয় যে, লজ্জাশীলতা একটি উত্তম গুণ ও ফেরেশতাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।^{৬১৫}

তাদের উত্তম পরিণামের সুসংবাদ দিতেন

আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘নবিজি সঃ আবু বকর, উমর ও উসমান রাঃ-কে সাথে নিয়ে উহ্দের আরোহণ করলেন। (তাঁদের ধারণ করতে পেরে আনন্দে) উহ্দের নড়তে শুরু করল। তখন রাসুল সঃ বললেন :

৬১৪. সহিহ মুসলিম : ২৪০১।

৬১৫. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৮/১৪১।

اثْبُتْ أَحَدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ

“স্থির হও, উহুদ! তোমার ওপর একজন নবি, একজন সিদ্দিক ও দুজন শহিদ রয়েছে।”^{৬১৬}

সিদ্দিক হলেন আবু বকর রাঃ। আর শহিদদ্বয় হলেন উমর ও উসমান রাঃ। উহুদ চারজন মহান ব্যক্তিকে একসাথে ধারণ করতে পারার গর্বে নড়ে উঠেছিল।

তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন

আবু মুসা আশআরি রাঃ থেকে বর্ণিত যে, ‘তিনি একদিন ঘরে অজু করে বের হলেন এবং (মনে মনে স্থির করলেন যে,) আমি আজ সারা দিন রাসুলুল্লাহ সঃ-এর সাথে কাটাব, তাঁকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

তিনি মসজিদে গিয়ে নবিজি সঃ-এর খবর নিলেন। সাহাবিগণ বললেন, “তিনি এদিকে বেরিয়ে গেছেন।” তিনি বলেন, “আমিও ওই পথ ধরে তাঁর অনুগমন করলাম। তাঁর খোঁজে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। যেতে যেতে রাসুল সঃ আরিস কূপের (বাগানে) প্রবেশ করলেন। আমি তার দরোজার নিকট বসে পড়লাম। দরোজাটি খেজুরের শাখা দিয়ে তৈরি ছিল। রাসুলুল্লাহ সঃ যখন তাঁর প্রয়োজন (ইসতিনজা) সেরে অজু করলেন, তখন আমি তাঁর নিকটে দাঁড়লাম এবং দেখতে পেলাম, তিনি আরিস কূপের কিনারার বাঁধের মাঝখানে বসে হাঁটু পর্যন্ত পা দুটি খুলে কূপের ভেতরে ঝুলিয়ে রেখেছেন।

আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং ফিরে এসে দরোজায় বসে রইলাম এবং মনে মনে স্থির করে নিলাম যে, আজ আমি রাসুল সঃ-এর দারোয়ানরূপে (পাহারাদারের) দায়িত্ব পালন করব।

এ সময় আবু বকর রাঃ এসে দরোজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি কে?” তিনি বললেন, “আবু বকর।” আমি বললাম, “থামুন (আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি)!” আমি গিয়ে বললাম, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আবু বকর রাঃ ভেতরে আসার অনুমতি চাইছেন।” তিনি বললেন :

اِذْنُ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ

“তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।”

আমি ফিরে এসে আবু বকর রাঃ-কে বললাম, “ভেতরে আসুন। রাসুলুল্লাহ সঃ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।” তখন তিনি আল্লাহর হামদ পাঠ করলেন।

আবু বকর রাঃ ভেতরে আসলেন এবং রাসুল সঃ-এর ডানপাশে কূপের কিনারায় বসে দু’পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়ে নবিজি সঃ-এর ন্যায় কূপের ভেতরে পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন।

আমি ফিরে এসে (দরোজার পাশে) বসে পড়লাম। আমি যখন ঘর থেকে বের হচ্ছিলাম, তখন আমার ভাই অজু করছিল। তারও আমার সাথে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। তাই আমি (মনে মনে) বলতে লাগলাম, “আল্লাহ যদি তার কল্যাণ চান, তবে তাকে নিয়ে আসুন!”

এমন সময় এক ব্যক্তি দরোজা নাড়তে লাগলেন। আমি বললাম, “কে?” তিনি বললেন, “আমি উমর বিন খাত্তাব।” আমি বললাম, “অপেক্ষা করুন (আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি)।” তারপর রাসুলুল্লাহ সঃ-এর খিদমতে সালাম পেশ করে আরজ করলাম, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, উমর বিন খাত্তাব (ভেতরে আসার) অনুমতি চাইছেন।’ তিনি বললেন :

اِذْنُ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ

“তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।”

আমি এসে তাঁকে বললাম, “ভেতরে আসুন। রাসুলুল্লাহ সঃ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।” তিনি আল্লাহর হামদ পাঠ করলেন। অতঃপর ভেতরে আসলেন এবং রাসুলুল্লাহ সঃ-এর বামপাশে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে কূপের ভেতরে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে গেলেন।

আমি আবার ফিরে আসলাম এবং বলতে থাকলাম, “আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের কল্যাণ চান, তবে যেন তাকে নিয়ে আসেন।”

এরপর আরেক ব্যক্তি এসে দরোজা নাড়তে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কে?” তিনি বললেন, “আমি উসমান বিন আফফান।” আমি বললাম, “থামুন (আমি অনুমতি নিয়ে আসছি)।” তারপর নবিজি ﷺ-এর খিদমতে গিয়ে জানালাম। তিনি বললেন :

اُذِّنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ

“তাকে ভেতরে আসতে বলো এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও। তবে (দুনিয়াতে তার ওপর) কঠিন পরীক্ষা হবে।”

আমি এসে বললাম, “ভেতরে আসুন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন; তবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে।”

তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন, “আল্লাহই সাহায্যকারী।”

তিনি ভেতরে এসে দেখলেন, কূপের কিনারায় খালি জায়গা নেই। তাই তিনি নবিজি ﷺ-এর সম্মুখে অপর এক স্থানে বসে পড়লেন।

সাইদ বিন মুসাইয়িব ؓ বলেছেন, ‘আমি এর দ্বারা (পরবর্তীকালে) তাঁদের কবর এরূপ হবে এই অর্থ করছি।’^{৬১৭}

► হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে কারও মুখোমুখি প্রশংসা করা বৈধ।
- আবু বকর, উমর ও উসমান ؓ-এর ফজিলত এবং তাঁরা জান্নাতি হওয়ার প্রমাণ। পাশাপাশি আবু মুসা আশআরি ؓ-এর ফজিলতও প্রমাণিত হয়।
- উসমান ؓ-এর মতো অবস্থার সম্মুখীন হলে ‘আল্লাহই সাহায্যকারী’ বলা মুসতাহাব।

- রাসুল ﷺ-এর একটি মুজিজা। কারণ, তিনি উসমান রা. -এর বিপদ এবং প্রথম সারির তিন সাহাবির ইমান ও হিদায়াতের ওপর অটল থাকার হুবহু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।^{৬১৮}

অনুরূপভাবে নির্দিষ্টসংখ্যক সাহাবির ব্যাপারে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন : ‘দশজন সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবির হাদিস’ নামে প্রসিদ্ধ হাদিসটিতে স্পষ্ট ভাষায় কয়েকজনের নাম বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি হলো, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ،
وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي
الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ

‘আবু বকর জান্নাতি, উমর জান্নাতি, উসমান জান্নাতি, আলি জান্নাতি, তালহা জান্নাতি, জুবাইর বিন আওয়াম জান্নাতি, সাদ বিন মালিক জান্নাতি, আব্দুর রহমান বিন আওফ জান্নাতি এবং সাইদ বিন জাইদ জান্নাতি।’^{৬১৯}

আরেক হাদিসে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

الْحُسَيْنُ، وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

‘হাসান ও হুসাইন জান্নাতি যুবকদের নেতা।’^{৬২০}

আরেক হাদিসে ইরশাদ করেছেন :

أَرَيْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةً أَبِي طَلْحَةَ، ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي
فَإِذَا بِلَالٍ

৬১৮. ইমাম নববি রহ. কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১৫/১৭০।

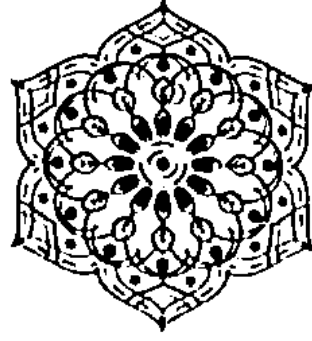
৬১৯. সুনানু আবি দাউদ : ৪২৪৯, সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৪৮, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৩৪। সাইদ বিন জাইদ রহ. থেকে বর্ণিত।

৬২০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৬৮। আবু সাইদ খুদরি রহ. থেকে বর্ণিত।

‘আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে। সেখানে আমি আবু তালহার
স্ত্রীকে দেখেছি। অতঃপর আমার সামনে একজনের পায়ের খসখস
আওয়াজ শুনতে পেলাম, হঠাৎ দেখি সে বিলাল।’^{৬২১}

এভাবে হাদিসের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিদের সংখ্যা অনেক
রয়েছে। তাঁদের সবার নাম বলে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয় বিধায় সবার
নাম উল্লেখ করা হয়নি।





অষ্টম পরিচ্ছেদ

দাস-দাসী ও চাকর-বাকরদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসুল ﷺ খাদিম-খাদিমা ও দাস-দাসীদের সাথে উত্তম আচার-ব্যবহার ও আদর-ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং উম্মতকেও এই বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন—যা তাঁর অনুপম চরিত্রের পরিচয় বহন করে।

খাদিম ও দাসদের সাথে তাঁর আচরণবিধি

রাসুল ﷺ তাঁর খাদিমের সাথে এমন স্নেহসুলভ আচরণ করতেন, যা একজন স্নেহশীল পিতা তার সন্তানের সাথে করে এবং একজন মেহেরবান ভাই তার ভাইয়ের সাথে করে। স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রে গোলাম, মজদুর ও স্বেচ্ছাসেবী খাদিমের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করতেন না তিনি। যার ফলে জাইদ বিন হারিসা ﷺ তার পিতা ও পরিবারের লোকদের ছেড়ে রাসুল ﷺ-এর সাথেই থেকে গিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, জাইদ বিন হারিসা ﷺ-এর মা সু'দা বিনতে সা'লাবা ﷺ জাইদ ﷺ-কে সাথে নিয়ে নিজের কওমের সাথে দেখা করতে আসলেন। তখন একদল অশ্বারোহী বনি মাতানের ঘরবাড়িসমূহে হানা দিল। তারা বালক জাইদ ﷺ-কে উঠিয়ে নিয়ে গেল। অতঃপর তারা তাকে বিক্রি করার জন্য উকাজ বাজারে তুলল। অতঃপর হাকিম বিন হিজাম তার ফুফু খাদিজা ﷺ-এর জন্য চারশ দিরহাম দিয়ে তাকে ক্রয় করে নিল।

পরে রাসুল ﷺ-এর সাথে খাদিজা ﷺ-এর বিয়ে হলে তিনি গোলাম জাইদকে রাসুল ﷺ-এর হাতে হাদিয়া হিসেবে তুলে দিলেন।

তার পিতা হারিসা সন্তান হারিয়ে বিয়োগগাথা গেয়ে বললেন :

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ أَذْرِ مَا فَعَلَ *** أَحْيَيْ فَيُرْجَى أُمُّ أَيْ ذُوْنَهُ الْأَجَلُ
فَوَاللّٰهِ مَا أَذْرِي وَإِنِّي لَسَائِلُ *** أَغَالِكَ سَهْلُ الْأَرْضِ أُمُّ غَالِكَ الْجَبَلُ

‘জাইদের শোকে আমি কেঁদে চলি নিরন্তর। আমি জানি না, সে কি জীবিত আছে আর আমি তার আশায় দিন গুনব, না মৃত্যু তাকে গ্রাস করে নিয়েছে? আল্লাহর কসম, আমি জানি না। তাই আমি জানতে চাইছি, আমার অনুপস্থিতিতে সমতল ভূমি তাকে শেষ করে দিয়েছে, না পাহাড় তাকে গ্রাস করে নিয়েছে?’

এরপর কালব গোত্রের কিছু মানুষ হজ করতে আসলো। জাইদ ؑ-এর সাথে তাদের দেখা হলো। তারা তাকে চিনল এবং তিনিও তাদের চিনলেন। অতঃপর তিনি তাদের বললেন, ‘আমার বাড়ির লোকদের নিকট এই কবিতাটি পাঠিয়ে দিয়ো :

أَحِنُّ إِلَى أَهْلِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِيًا
بِأَنِّي قَطِينُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ
فَكُفُّوا مِنَ الْوَجْدِ الَّذِي قَدْ شَجَاكُمْ
وَلَا تَعْمَلُوا فِي الْأَرْضِ نَصَّ الْأَبَاعِرِ

‘যত দূরেই থাকি, পরিবারের প্রতি আমার ভালোবাসা চির অটুট। তবে আমি হজের পবিত্র স্থানের নিকটবর্তী একটি বাড়ির বাসিন্দা। তাই তোমরা আমার ব্যাপারে চিন্তা কোরো না এবং উট হাঁকিয়ে আমায় নিয়ে যেতে এসো না।’

তারা ফিরে গেল। গিয়ে তার পিতাকে তার ব্যাপারে সংবাদ দিল এবং তার বাসস্থানের সার্বিক অবস্থার বিবরণ দিল। তখন পিতা হারিস ও চাচা কাব তার মুক্তিপণ নিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওনা হলো। মক্কায় পৌঁছে তারা রাসুল ؑ-এর ব্যাপারে জানতে চাইল। লোকেরা জানাল, তিনি মসজিদের ভেতর আছেন। ফলে তারা মসজিদে রাসুল ؑ-এর কাছে গেল।

তারা তাঁকে বলল, ‘হে আব্দুল মুত্তালিবের বেটা, হে কওমের সর্দারের পুত্র, আপনারা আল্লাহর (ঘরের) প্রতিবেশী। আপনারা বন্দীদের মুক্ত করেন। ক্ষুধার্তদের আহার দান করেন। আমরা আপনার নিকট আমাদের সন্তান ও আপনার গোলামের মুক্তির আবেদন নিয়ে এসেছি, যেন আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাকে মুক্তি দান করেন।’

তিনি বললেন, ‘এ ছাড়া অন্য পস্থা অবলম্বন করলে কী হয়?’ তারা বলল, ‘কী সেটা?’ তিনি বললেন, ‘আমি তাকে ডেকে এনে ইচ্ছাধিকার দান করব। যদি সে তোমাদের সাথে যেতে চায়, তাহলে তা-ই হবে। আর যদি আমার সাথে থাকতে চায়, তাহলে আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি আমাকে বেছে নেয়, আমি তাকে কারও কাছে সোপর্দ করি না।’

তারা বলল, ‘আপনি আমাদেরকে অর্ধেকের চেয়ে বেশি দিয়ে দিয়েছেন।’

অতঃপর রাসুল ﷺ তাকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ দুই ব্যক্তি কে?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘ইনি হচ্ছেন আমার পিতা হারিসা বিন শুরাহিল আর ইনি হচ্ছেন আমার চাচা কাব বিন শুরাহিল।’

রাসুল ﷺ বললেন, ‘আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিচ্ছি, তুমি চাইলে এ দুজনের সাথে চলে যেতে পারো, আর চাইলে আমার কাছে থেকে যেতে পারো।’

জাইদ ؓ বললেন, ‘আমি বরং আপনার সাথে থাকব।’

তখন তার পিতা বললেন, ‘হে জাইদ, তুমি দাসত্বকে স্বাধীনতা, নিজের পিতামাতা, শহর ও কওমের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছ!?’

তিনি বললেন, ‘আমি এই মহান লোকটির মাঝে যা খুঁজে পেয়েছি—আমি কক্ষনো তাঁর সঙ্গ ছাড়ব না।’

এ কথা বলার সাথে সাথেই রাসুল ﷺ তার হাত ধরলেন এবং কুরাইশের বড় একটি দলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘তোমরা সাক্ষী থাকো যে, এ হচ্ছে আমার সন্তান। আমরা একে অপরের উত্তরাধিকারী।’

তা দেখে তার পিতার মনও খুশিতে ভরে গেল। সেদিনের পর থেকে জাইদ رضي الله عنه নিজেকে জাইদ বিন মুহাম্মাদ হিসেবে পরিচয় দিতেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন :

‘তাদেরকে তাদের (আসল) পিতার নাম ধরে ডাকো।’^{৬২২-৬২৩}

চিন্তা করে দেখুন, রাসুল ﷺ মালিকানাধীন খাদিমদের সাথে কী পরিমাণ উত্তম আচরণ করতেন, যার ফলে তারা তাঁকে এমন গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং নিজেদের ঘরবাড়ি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিয়ে তাঁর সাথে থেকে যাওয়াকে প্রাধান্য দিতেন!

খাদিম অথবা দাসীর সাথে কোথাও যেতে কুণ্ঠিত হতেন না

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বলেন, ‘মদিনার যেকোনো দাসী রাসুল ﷺ-এর হাত ধরে তাঁকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত।’^{৬২৪}

অন্য বর্ণনায় আছে, ‘যদি মদিনার কোনো ছোটো মেয়ে (দাসী) এসে রাসুল ﷺ-এর হাত ধরে কোথাও নিয়ে যেতে চাইত, তখন তিনি হাত ছাড়িয়ে নিতেন না; বরং সে যেখানে নিয়ে যেতে চাইছে, সেখানে চলে যেতেন।’^{৬২৫}

ইবনে হাজার رحمته الله বলেন, ‘এখানে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, কোনো দাসী রাসুল ﷺ-এর কাছে তার প্রয়োজন পূরণ করিয়ে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি তাতে সাড়া দিতে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এমনকি, তার প্রয়োজন যদি মদিনার বাইরের কোনো জায়গায় হয়, তিনি সেখানে গিয়ে তার প্রয়োজন মেটাতে। এটা প্রমাণিত করে, রাসুল ﷺ অত্যধিক বিনয়ী ও নম্র ছিলেন এবং সব ধরনের অহংকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।’^{৬২৬}

৬২২. সূরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৫।

৬২৩. তাবাকাতু কুবরা লি-ইবনি সাদ : ৩/৪২।

৬২৪. মুসনাদু আহমাদ : ১১৫৩০। ইমাম বুখারিও তালিক হিসেবে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিস নং : ৬০৭২।

৬২৫. মুসনাদু আহমাদ : ১২৩৬৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১৭৭।

৬২৬. ফাতহুল বারি : ১০/৪৯০।

ফায়দা : এই হাদিস থেকে বোঝা যায় দাসী রাসুল ﷺ-এর হাত ধরেছে, অথচ অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল ﷺ কোনো (গাইরে মাহরাম) মহিলার হাত স্পর্শ করেননি—এ বিরোধের নিরসন কী?

উলামায়ে কিরাম এর কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন :

১. এখানে হাত ধরার কথা বলে রাসুল ﷺ-এর অত্যধিক বিনয়-নম্রতা বোঝানো হয়েছে। যেমনটি ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন।^{৬২৭}
২. অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন মহিলার হুকুমের সাথে দাসীর হুকুমের ভিন্নতা রয়েছে। দাসীকে ক্রয় করা যায়, বিক্রয় করা যায়। এ জন্য গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে দাসীর পর্দা করা জরুরি নয়।
৩. সম্ভবত ওই দাসী সাবালিকা ছিল না।^{৬২৮}

মুসনাদে আহমাদের রিওয়ায়াত থেকে তৃতীয় জবাবটি প্রমাণিত হয়।

খাদিমদের সঙ্গে খাবার খেতে কুণ্ঠিত হতেন না

আবু হুরাইরা রাযি থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَهُ
أَوْ أَكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَّ حَرِّهِ وَعِلَاجُهُ

‘তোমাদের কারও খাদিম যখন তার খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকে সাথে বসানো সম্ভব না হলে অন্তত এক-দুই লুকমা খাবার যেন তাকে দিয়ে দেয়। কারণ, সে এর গরম ও ক্লেশ সহ্য করেছে।’^{৬২৯}

সহিহ মুসলিমে হাদিসটি এই শব্দে এসেছে—

إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ
وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا،

৬২৭. ফাতহুল বারি : ১০/৪৯০।

৬২৮. বলেছেন শাইখ আব্দুল আজিজ আর-রাজিহি। ইসলাম ওয়েব।

৬২৯. সহিহুল বুখারি : ৫৪৬০।

فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ

‘যখন তোমাদের কোনো খাদিম খাবার রান্না করে তার (মনিবের) কাছে নিয়ে আসে। এমন খাবার যার তাপ ও ধোঁয়া সে সহ্য করেছে, তখন তার উচিত হবে, তাকে কাছে বসিয়ে তা থেকে কিছু খাবার প্রদান করা। আর যদি খাবারের পরিমাণ অতি অল্প হয়, তবে সে যেন তার হাতে অন্তত একগ্রাস অথবা দুইগ্রাস খাবার তুলে দেয়।’^{৬৩০}

(কারণ, সে এর গরম ও ক্রেশ সহ্য করেছে) : অর্থাৎ রান্না করার পূর্বে খাবারের উপাদান সংগ্রহ করার সময় সে কষ্ট-ক্রেশ সহ্য করেছে এবং চুলায় রান্না চড়িয়ে দেওয়ার পর তার গরম সহ্য করেছে।

নববি رحمته বলেন, ‘এই হাদিসে উন্নত চরিত্র অবলম্বন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও এই হাদিসে খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষ করে যে ব্যক্তি খাবার তৈরি করেছে বা খাবার বহন করে এনেছে, তাকে খাবারে শরিক করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ, সে খাবার তৈরি করার সময় আগুন ও ধোঁয়া সহ্য করেছে এবং তার ঝাঁঝালো গন্ধ শুঁকেছে।’^{৬৩১}

খাদ্য ও বস্ত্রে খাদিম ও মালিকের মাঝে সমতা রক্ষার কথা বলেছেন

মারুর বিন সুয়াইদ رحمته বলেন, ‘রাবজায় (এলাকার নাম) আবু জার رحمته-এর সাথে আমার দেখা হলো। তখন তার গায়ে একসেট পোশাক (লুঙ্গি ও চাদর) পরিহিত ছিল এবং তার গোলামের শরীরেও একই মানের পোশাক ছিল। আমি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, “একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন রাসুল ﷺ আমাকে বললেন :

يَا أَبَا ذَرٍّ أَعْيَرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِيَّاهُكُمْ خَوْلُكُمْ،
جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ

৬৩০. সহিহ মুসলিম : ১৬৬৩।

৬৩১. ইমাম নববি رحمته কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১১/১৩৫।

مِمَّا يَأْكُلُ، وَلِيُلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ
كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

“আবু জার, তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে এখনো জাহিলি যুগের স্বভাব রয়ে গেছে। জেনে রাখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার অধীনে তার কোনো ভাই থাকবে, সে যেন নিজে যা খায়, তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে, তাকে তা-ই পরায়। তাদের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দিয়ো না, যা তাদের জন্য খুব কষ্টকর। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করবে।”^{৬৩২}

‘সে যেন নিজে যা খায়, তাকে তা-ই খাওয়ায়’—অর্থাৎ নিজে যে মানের খাবার খায়, সে একই মানের খাবার তাদের খাওয়ায়।^{৬৩৩}

নববি رحمته বলেন, ‘এই হাদিসে মালিক যে মানের খাবার খায় এবং যে মানের পোশাক পরিধান করে, গোলামকেও সে একই মানের খাবার ও পোশাক পরিধান করার যে নির্দেশ এসেছে, এ ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত যে, তা মুসতাহাব, ওয়াজিব নয়।

আবু জার رحمته মুসতাহাবের ওপর আমল করেছেন। কারণ, মালিকের ওপর ওয়াজিব হলো, ব্যক্তি ও শহরের নিয়মনীতি অনুযায়ী গোলাম ও খাদিমদের জন্য পরিমিত খাবার ও মানসম্মত পোশাকের ব্যবস্থা করা। তা মালিকের খাবার ও পোশাকের চেয়ে নিম্নমানের হোক বা উচ্চমানের হোক।

সুতরাং কোনো মালিক যদি দুনিয়াবিমুখতা বা কৃপণতাবশত তার সমকক্ষদের চেয়ে নিম্নমানের খাবার খায় বা পোশাক পরিধান করে, তখন খাদিম ও

৬৩২. সহিহুল বুখারি : ৩০, সহিহ মুসলিম : ১৬৬১।

৬৩৩. ফাতহুল বারি : ৫/১৭৪।

গোলামদের সম্মতি ব্যতীত তাদের জন্যও অনুরূপ নিম্নমানের পোশাক ও খাবারের ব্যবস্থা করা জায়িজ হবে না।^{৬৩৪}

► হাদিস থেকে শিক্ষা

- দাস-দাসী ও চাকর-বাকরদের গালিগালাজ করা এবং তাদেরকে তাদের মা-বাবা সম্পর্কে লজ্জা দেওয়া নিষেধ।
- মা-বাবা সম্পর্কে কাউকে লজ্জা দেওয়া নিষেধ এবং এটি একটি জাহিলি স্বভাব।
- কোনো মুসলমানের মাঝে জাহিলি স্বভাব থাকা উচিত নয়।
- দাস-দাসী, খাদিম-খাদিমা ও চাকর-বাকরদের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহ।
- কোনো মুসলমানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো ও তাকে অবজ্ঞা করা যাবে না।
- সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের গুরুত্ব।
- দাস ও খাদিমদের সাথেও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে।^{৬৩৫}

সামর্থ্যের অধিক কাজ চাপিয়ে দিতে নিষেধ করতেন

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

‘অন্ন ও বস্ত্র গোলামের অধিকার। আর তার ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা তার সাধ্যের বাইরে।’^{৬৩৬}

নববি রাঃ বলেন, ‘উলামায়ে কিরাম এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, গোলাম বা চাকরকে তার সাধ্যের অধিক কাজ ও দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া

৬৩৪. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/১৩৩।

৬৩৫. ফাতহুল বারি : ৫/১৭৫, ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/১৩৩।

৬৩৬. সহিহ মুসলিম : ১৬৬২।

যাবে না। যদি একান্তই তার প্রয়োজন হয়, তবে নিজে অথবা অন্য কারও মাধ্যমে তার সাহায্য করা আবশ্যিক।”^{৬৩৭}

অসুস্থ কাফির খাদিমকেও দেখতে যেতেন

আনাস রাঃ বলেন, ‘এক ইহুদি বালক রাসুল সাঃ-এর খিদমত করত। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন রাসুল সাঃ তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার শিয়রে বসে বললেন, “ইসলাম কবুল করো।” বালকটি তার পাশে থাকা পিতার দিকে তাকালে তিনি বললেন, “আবুল কাসিমের কথা মেনে নাও।” তখন বালকটি মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর রাসুল সাঃ এই বলতে বলতে সেখান থেকে বের হলেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

“সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।”^{৬৩৮}

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো, রাসুল সাঃ তাঁর খাদিমদের দেখতে যাওয়া এবং তাদের দাওয়াত দিয়ে কল্যাণের পথে নিয়ে আসার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন।

খাদিমের জানাজা পড়তে না পারলে কবর জিয়ারত করতেন

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘জনৈক হাবশি মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। একদিন রাসুল সাঃ তাকে দেখতে না পেয়ে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবিগণ বললেন, “তিনি মারা গেছেন।”

রাসুল সাঃ বললেন, “তোমরা আমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে পারতে না?”

বর্ণনাকারী বলেন, “আসলে তার মৃত্যুকে তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করেননি বলে সাহাবিরা রাসুল সাঃ-কে সে ব্যাপারে অবহিত করেননি।”

৬৩৭. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/১৩৩।

৬৩৮. সহিহুল বুখারি : ১৩৫৬।

রাসুল ﷺ বললেন, “আমাকে তার কবরের নিকট নিয়ে চলো।”

সাহাবিগণ তাঁকে তার কবরে নিয়ে গেলেন। তিনি তার জানাজা পড়লেন।
অতঃপর বললেন :

“এই কবরসমূহ তার বাসিন্দাদের জন্য অন্ধকারচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু আমি তাদের জানাজা পড়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের কবরসমূহকে আলোকিত করে দিয়েছেন।”^{৬৩৯}

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘তিনি সাহাবিদের নিয়ে বের হলেন, তারপর তার কবরের নিকট দাঁড়িয়ে তাকবির বললেন। মানুষজন তাঁর পেছনে ছিলেন। তারপর তিনি তার জন্য দোয়া করে ফিরে আসলেন।’^{৬৪০}

এই মহান নেতার অবস্থা দেখুন! তিনি মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া একজন মহিলার অনুপস্থিতি লক্ষ করেছেন। কী মহান সেই নেতা! কত সুন্দর তাঁর আদর্শ!

► হাদিস থেকে বোঝা যায় :

- উম্মাহর প্রতি রাসুল ﷺ-এর দয়া ও কোমলতা, তাদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া, তাদের অধিকার বাস্তবায়ন করা এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করা।
- খাদিম বা বন্ধু অনুপস্থিত থাকলে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা।
- দোয়ার মাধ্যমে উপকারের বিনিময় প্রদান করা।
- ভালো মানুষদের জানাজায় অংশগ্রহণের প্রতি উৎসাহ।
- সদ্য দাফনকৃত মৃত ব্যক্তির কবরে জানাজা পড়া ওই ব্যক্তির জন্য মুসতাহাব, যে তার জানাজা পড়েনি।
- মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা।

৬৩৯. সহিহ মুসলিম : ৯৬৫।

৬৪০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৫৩৩।

খাদিমের জন্য দোয়া করতেন

আনাস বিন মালিক   বলেন, ‘একবার রাসুল   আমাদের কাছে আসলেন। তখন ঘরে তিনি, আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মে হারাম ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি বললেন, “দাঁড়াও, তোমাদের সাথে নিয়ে আমি নামাজ পড়ব।” অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে (নফল) নামাজ আদায় করলেন। তারপর আমাদের পরিবারের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণের দোয়া করলেন।

তখন আমার মা বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, এ আপনার ছোট খাদিম। ওর জন্য দোয়া করুন।”

রাসুল   আমার জন্য সব ধরনের কল্যাণের দোয়া করলেন। দোয়ার শেষাংশে তিনি বললেন :

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ

“হে আল্লাহ, ওর ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং এতে বরকত দান করুন।”

আনাস   বলেন, (এই দোয়ার বরকতে) “আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী হয়ে উঠলাম। আর আমার মেয়ে উমাইনা আমাকে জানিয়েছে যে, হাজ্জাজ (বিন ইউসুফ) বসরা আসার পূর্বেই আমার একশত বিশের অধিক সন্তানসন্ততি মারা গেছে।”^{৬৪১}

তঁার খাদিমদের খোঁজখবর নিতেন

বনু মাখজুমের আজাদকৃত দাস জিয়াদ বিন আবু জিয়াদ রাসুল  -এর জনৈক খাদিম বা খাদিমা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ‘রাসুল   তঁার খাদিমকে জিজ্ঞেস করতেন, “তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে?”’^{৬৪২}

৬৪১. সহিহুল বুখারি : ১৯৮২, সহিহ মুসলিম : ৬৬০।

৬৪২. মুসনাদু আহমাদ : ১৫৬৪৬।

খাদিমের সব ইচ্ছা পূরণ করতেন

রাবিআ বিন কাব আসলামি ﷺ বলেন, ‘আমি রাসুল ﷺ-এর সাথে রাত্রি যাপন করলাম। তারপর অজু ও প্রয়োজন সারার জন্য পানি এনে দিলাম। তখন রাসুল ﷺ বললেন, “চাও আমার কাছে।” আমি বললাম, “আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই।” তিনি বললেন, “এ ছাড়া অন্য কিছু চাও।” আমি বললাম, “আমি এটাই চাই।” তিনি বললেন, “তাহলে অধিক সিজদার মাধ্যমে তোমার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো।””^{৬৪৩}

রাবিআ ﷺ বলেন, ‘আমি রাসুল ﷺ-এর খিদমত করতাম এবং সারা দিন তাঁর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখতাম। এমনকি যখন তিনি ইশার নামাজ পড়ার পর বাড়িতে প্রবেশ করে দরোজায় দাঁড়াতে, তখন আমি মনে মনে চাইতাম, রাসুল ﷺ-এর কোনো প্রয়োজন দেখা দিক (যেন আমি তা পূরণ করতে পারি)। তবে তখন তাঁকে শুধু “সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি” বলতে শুনতাম। এতে একসময় আমার বিরক্তি এসে যেত, ফলে আমি ফিরে আসতাম। অথবা আমার চোখ লেগে আসত, ফলে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।’

তিনি বলেন, ‘রাসুল ﷺ তাঁর খিদমতের প্রতি আমার আত্মহ অনুধাবন করতে পারতেন বিধায় একদিন তিনি আমাকে বললেন, “হে রাবিআ, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দান করব।” আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি একটু ভেবে দেখি, তারপর আপনাকে এ ব্যাপারে জানাব।”

এরপর আমি চিন্তাভাবনা করে বুঝতে পারলাম যে, দুনিয়া অস্থায়ী আর এখানে যা রিজিক পাই, তা আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, রাসুল ﷺ-এর কাছে আখিরাতে সফলতা চাইব। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

অতঃপর তাঁর কাছে আসলে তিনি জানতে চাইলেন, কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বললাম, “ইয়া রাসুল্লাহ, আপনার কাছে আমি এটা চাই যে, আপনি আপনার প্রভুর কাছে আমার জন্য সুপারিশ করবেন, তিনি যেন আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।”

তিনি বললেন, “হে রাবিআ, তোমাকে এটি কে শিখিয়ে দিয়েছে?”

আমি বললাম, “সেই সত্তার কসম—যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। কিন্তু আপনার মতো আল্লাহর দরবারে মর্যাদাশীল ব্যক্তি যখন আমাকে বললেন, “আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দান করব”, তখন আমি চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, দুনিয়া যেহেতু অস্থায়ী আর এখানে যা রিজিক পাই, তা আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, তাই রাসুল ﷺ-এর কাছে আখিরাতের সফলতাই চাইব।”

তখন রাসুল ﷺ চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, “আমি তা করব, তবে অধিক সিজদার (অধিক নামাজ পড়ার) মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা করতে হবে।”^{৬৪৪}

চাকর-মজুরদের পারিশ্রমিক দ্রুত দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ বলেন, ‘রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তাকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।”^{৬৪৫}

অর্থাৎ কাজ শেষ হওয়ার পর কাজ করার ফলে তার শরীরে যে ঘাম এসেছে, তা শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তাকে পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দিতে হবে।^{৬৪৬}

৬৪৪. মুসনাদু আহমাদ : ১৬১৪৩।

৬৪৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৪৪৩।

৬৪৬. হাশিয়াতুস সিনদি : ৫/১২৮।

শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে সতর্ক করতেন

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“কিয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেণির লোকের প্রতিপক্ষ হব : ১. যে ব্যক্তি আমার নামে কসম করে তা ভঙ্গ করে। ২. যে কোনো আজাদ মানুষকে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে। এবং ৩. যে মজুরকে খাটিয়ে তার পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার মজুরি দেয় না।”^{৬৪৭}

ইবনে তিন রাঃ বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জালিমের বিপক্ষে অবস্থান নেবেন। তবে এই তিন শ্রেণির লোকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, তিনি এদের প্রতি অন্যদের তুলনায় বেশি কঠোর হবেন।’

‘যে ব্যক্তি আমার নামে কসম করে তা ভঙ্গ করে’—অর্থাৎ কোনো অঙ্গীকার করে তা রক্ষা করার ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম খেল, কিন্তু অঙ্গীকার পূরণ করল না।

‘যে মজুরকে খাটিয়ে তার পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার মজুরি দেয় না’—এটাও স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সে বিনিময় ছাড়া তার থেকে উপকার আদায় করে নিয়েছে অথবা বিনিময় ছাড়া তাকে বেগার খাটিয়েছে। নিশ্চয় এটা শ্রমিককে গোলাম বানিয়ে তার মূল্য ভক্ষণ করার নামান্তর।^{৬৪৮}

কিয়ামতের দিন খাদিমদের ওপর কৃত জুলুমের বদলা নেওয়া হবে

আয়িশা রাঃ বলেন, ‘এক ব্যক্তি রাসুল সঃ-এর সামনে এসে বসে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার কিছু গোলাম আছে। তারা আমার সাথে মিথ্যা

৬৪৭. সহিহুল বুখারি : ২২২৭।

৬৪৮. ফাতহুল বারি : ৬/৩৪৯।

বলে, আমার সাথে খিয়ানত করে। আমার নাফরমানি করে। (শাস্তিস্বরূপ) আমি এদের গালমন্দ করি এবং মারধর করি। সুতরাং আমার কাজটি কেমন?”

তিনি বললেন :

يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوُكَ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ
إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا، لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ
إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ
ذُنُوبِهِمْ اقْتَصَصَ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ

“তোমার সঙ্গে তারা যে খিয়ানত করেছে, নাফরমানি করেছে এবং মিথ্যা বলেছে—আর তুমি এসবের জন্য তাদের যে শাস্তি দিয়েছ, তা হিসাব করা হবে। তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের সমপরিমাণ হয়ে থাকে, তবে তা বরাবর হয়ে গেল, তুমিও কিছু পাবে না এবং তোমার কোনো ক্ষতিও হবে না। আর তোমার শাস্তি যদি এদের অপরাধের চেয়ে কম পরিমাণের হয়, তবে অতিরিক্ত তোমার পাওনা থাকবে। আর তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে, তবে যা অতিরিক্ত হয়েছে, তোমার নিকট থেকে তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘তখন লোকটি একপাশে সরে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। রাসূল ﷺ বললেন, “তুমি কি আল্লাহর কিতাব পাঠ করো না :

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

“আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।” ৬৪৯

লোকটি বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, এদের পৃথক করে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার ও তাদের (কল্যাণের) জন্য অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, এদের সবাই স্বাধীন।”^{৬৫০}

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ‘আবুল কাসিম রাঃ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّانَا، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُذُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ
كَمَا قَالَ

“যে ব্যক্তি আপন গোলামকে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করল, কিয়ামত দিবসে তার ওপর এই মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু গোলাম যদি সত্যিই অপরাধী হয় (তবে অভিযোগকারী আর শাস্তি পাবে না)।”^{৬৫১}

তাদের ছোটখাটো অপরাধ ক্ষমা করার পরামর্শ দিতেন

আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন খাত্তাব রাঃ বলেন, ‘এক ব্যক্তি রাসুল সাঃ-এর নিকট এসে আরজ করলেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার একজন খাদিম আছে। সে অপরাধ করে এবং অবিচার করে। আমি কি তাকে মারতে পারব?” [অপর বর্ণনায় : “আমি কতবার তাকে ক্ষমা করব?”]

রাসুল সাঃ চুপ রইলেন। লোকটি প্রশ্নটি পুনরায় করলেন। রাসুল সাঃ আগের মতোই চুপ রইলেন। তৃতীয়বার প্রশ্নটি করলে রাসুল সাঃ বললেন :

اغْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

“তাকে প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমা করবে।”^{৬৫২}

‘রাসুল সাঃ চুপ রইলেন’—তঁার চুপ থাকাটা সম্ভবত ওহির অপেক্ষার কারণে ছিল। অথবা, লোকটির প্রশ্ন অপছন্দ করছিলেন বলেই রাসুল সাঃ চুপ ছিলেন।

৬৫০. সুনানুত তিরমিজি : ৩১৬৫।

৬৫১. সহিহুল বুখারি : ৬৮৫৮, সহিহ মুসলিম : ১৬৬০।

৬৫২. সুনানু আবি দাউদ : ৫১৬৪, সুনানুত তিরমিজি : ১৯৪৯, মুসনাদু আহমাদ : ৫৬০৩।

কারণ, ক্ষমা করে দেওয়াটা সব সময় মুসতাহাব। তা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

‘তাকে প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমা করবে’—এর দ্বারা অধিকবার ক্ষমা করা বোঝানো হয়েছে; নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়।^{৬৫৩}

খাদিমকে সম্বোধনে সম্মানজনক শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন

খাদিমদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর দয়া ও করুণা এত ব্যাপক ছিল যে, তিনি তাদের ‘আমার গোলাম, আমার বাঁদি’ বলে ডাকতে নিষেধ করেছেন। বরং এর পরিবর্তে সম্মানজনক শব্দ ‘আমার ছেলে, আমার মেয়ে’ বলে সম্বোধন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ:
فَتَايَ، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي

‘তোমাদের কেউ (নিজের গোলামকে) “আমার গোলাম” বলবে না। কেননা, তোমাদের সবাই আল্লাহর গোলাম। বরং এর স্থলে বলবে, “আমার ছেলে”। অনুরূপভাবে কোনো গোলাম তার মনিবকে “আমার প্রভু” বলবে না। বরং বলবে, “আমার অভিভাবক”।^{৬৫৪}

সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে—

لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمُ رَبِّي وَصَيُّ رَبِّي، اسْقِ رَبِّي، وَلِيَقُلْ: سَيِّدِي
مَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَّتِي، وَلِيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَايَ
وَعُغْلَامِي

‘তোমাদের কেউ যেন না বলে, তোমার প্রভুকে খাবার খাওয়াও, তোমার প্রভুর জন্য অজুর পানি আনো, তোমার প্রভুকে পানি পান

৬৫৩. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৬/৬৯।

৬৫৪. সহিহ মুসলিম : ২২৪৯।

করাও। আর যেন (গোলাম-বাঁদিরা তাদের মনিবকে) বলে, আমার মনিব, আমার অভিভাবক। তোমাদের কেউ যেন (তার গোলাম-বাঁদিকে) আমার গোলাম, আমার বাঁদি না বলে। বরং বলবে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার খাদিম।’^{৬৫৫}

এই হাদিস প্রমাণ করে, গোলাম-বাঁদিকে ‘আমার দাস বা আমার দাসী’ বলা মাকরুহ। বরং ‘আমার খাদিম, আমার খাদিমা বা আমার ছেলে, আমার মেয়ে’ বলবে। মনিবকে প্রভু বলে ডাকবে না। কারণ, সত্যিকার দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যই। এ ছাড়াও এতে মাখলুকের প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন করা হয়, যার যোগ্য সে নয়।

খাদিম কাজে দেরি করলে শাস্তি দিতেন না

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ ছিলেন সর্বাধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী। একদিন তিনি আমাকে কোনো কাজে পাঠালেন। আমি বললাম, “আল্লাহর কসম, আমি যাব না”, কিন্তু আমার অন্তরে ছিল, যে কাজে যাওয়ার জন্য আল্লাহর নবি ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, সে কাজে আমি যাবই।

তাই আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং বাজারে খেলায় রত ছেলেপেলেদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন রাসুল ﷺ পেছন থেকে এসে আমার ঘাড় ধরলেন।’

আনাস ؓ বলেন, ‘আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম। তিনি হাসছিলেন। বললেন, “হে উনাইস, তুমি কি ওখানে গিয়েছিলে, যেখানে তোমাকে যেতে বলেছিলাম?” আমি বললাম, “জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি এম্মুগি যাচ্ছি।”’^{৬৫৬}

খাদিমের প্রতি খুবই উদার ছিলেন

আনাস বিন মালিক ؓ বর্ণনা করেন, ‘রাসুল ﷺ যখন মদিনায় আসলেন, তখন তাঁর কোনো খাদিম ছিল না। আবু তালহা ؓ আমার হাত ধরে রাসুল ﷺ-এর নিকট আমাকে নিয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আনাস খুব বিচক্ষণ বালক। তাকে আপনার খাদিম হিসেবে গ্রহণ করুন।”’

৬৫৫. সহিহুল বুখারি : ২৫৫২।

৬৫৬. সহিহ মুসলিম : ২৩১০।

আনাস রাঃ বলেন, ‘এরপর থেকে নয় বছর বা দশ বছর পর্যন্ত ঘরে বা সফরে আমি তাঁর খিদমত করেছি। তিনি কখনো আমাকে “উফ” বলেননি। আমি কোনো (ভুল) কাজ করলে কখনো বলেননি, “তুমি এমন কাজ কেন করেছ?” আর কোনো কাজ না করলে আমাকে বলেননি, “এই কাজ কেন করোনি?”

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘আমার থেকে কোনো কাজ ছুটে গেলে তিনি কখনো বলেননি, “এটা ছুটে গেছে কেন?”’^{৬৫৭}

দশ বছর নিছক কয়েকটি দিন বা মাসের সমষ্টি নয়; বরং অনেক দীর্ঘ একটা সময়। এ সময়ে মানুষের মানসিক অবস্থার কত পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসুল সঃ কখনো তাকে ধমকাননি কিংবা শাসাননি।

► লক্ষণীয় বিষয়

- রাসুল সঃ ছিলেন সহনশীলতা, ক্ষমা ও সকল উন্নত গুণাবলির মূর্তপ্রতীক।
- খাদিমের কোনো ভুল হয়ে গেলে তাকে শাস্তি না দেওয়া উচিত। কারণ, শাস্তি দিলে ভবিষ্যতে সে আপনার কথা মানতে চাইবে না।
- খাদিমের ভুলের কারণে তাকে শাস্তি না দিয়ে তার মন জয় করে নেওয়া ভালো। তবে শরিয়তের আবশ্যকীয় বিষয়াবলির ক্ষেত্রে অবহেলা করলে ক্ষমা করা যাবে না। কেননা, তখন বিষয়টা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের আওতায় পড়ে।^{৬৫৮}

খাদিম ভুল করলে কাউকে ধমকাতেও দিতেন না

আনাস বিন মালিক রাঃ বলেন, ‘দশ বছর যাবৎ আমি রাসুল সঃ-এর খিদমত করেছি। এ দীর্ঘ সময়ে কখনো এমন হয়নি যে, তিনি আমাকে কোনো কাজের আদেশ করেছেন আর আমি তাতে শিথিলতা করেছি বা তা বরবাদ করে দিয়েছি, ফলে তিনি আমাকে গালি দিয়েছেন।

৬৫৭. সহিহুল বুখারি : ২৭৬৮, সহিহ মুসলিম : ২৩০৯।

৬৫৮. ফাতহুল বারি : ১০/৪৬০।

তদুপরি, আমার পরিবারের কেউ আমাকে গালি দিলে তিনি বলতেন, “তাকে ছেড়ে দাও। তাকদিরে যা হওয়ার ছিল, তা-ই হয়েছে (এতে তার কী দোষ)।”^{৬৫৯}

খাদিম অপছন্দ হলে জুলুম হওয়ার ভয়ে তাকে ছেড়ে দিতে বলতেন

আবু জার রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ لَاءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِكُمْ، فَأُطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَمَنْ لَمْ يُلَايِمْكُمْ مِنْهُمْ، فَبَيْعُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ

‘দাস-দাসীদের মধ্যে যার কাজকর্ম তোমাদের পছন্দ হয়, তাকে সেই মানের খাবার খাওয়াও, যেই মানের খাবার তোমরা খাও এবং সেই মানের পোশাক পরিধান করাও, যেই মানের পোশাক তোমরা পরিধান করো। আর তাদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো না লাগে, তাকে বিক্রি করে দাও এবং আল্লাহর মাখলুককে (অনর্থক) শাস্তি দিয়ো না।’^{৬৬০}

সুতরাং কোনো ড্রাইভার বা কর্মচারী যদি মনমতো না হয় বা তার সাথে কোনোভাবে মানিয়ে চলা সম্ভব না হয়, তবে তাকে বিদায় করে দেওয়া ভালো। এতে তার প্রতি অন্যায় ও তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা যাবে।

খাদিমকে কখনো মারধর করেননি

আয়িশা রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ তাঁর কোনো খাদিম বা স্ত্রীকে কখনো প্রহার করেননি।’^{৬৬১}

অন্যদেরকেও মারধর করতে নিষেধ করতেন

আবু মাসউদ বদরি রাঃ বলেন, ‘একদা আমি আমার এক গোলামকে বেত দিয়ে পেটাচ্ছিলাম। তখন পেছন থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলাম, “জেনে রাখো হে আবু মাসউদ!” রাগের কারণে শব্দটি আমি বুঝতে পারিনি।

৬৫৯. মুসনাদু আহমাদ : ১৩০০৫।

৬৬০. সুনানু আবি দাউদ : ৫১৬১।

৬৬১. সহিহ মুসলিম : ২৩২৮।

যখন তিনি আমার আরও কাছে চলে আসলেন, তখন বুঝতে পারলাম, এ তো রাসুল ﷺ-এরই শব্দ। তিনি বলছিলেন, “জেনে রাখো হে আবু মাসউদ! জেনে রাখো হে আবু মাসউদ...!”

আমি বেতটি হাত থেকে ফেলে দিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন :

اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ

“জেনে রাখো হে আবু মাসউদ, এই গোলামের ওপর তুমি যে পরিমাণ শক্তি রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর তার চেয়ে অধিক শক্তি রাখেন।”

আমি বললাম, “আজকের পর থেকে আমি কোনো গোলামকে প্রহার করব না।”

অপর বর্ণনায় এসেছে, ‘আমি বললাম, “ইয়া রাসুল্লাহ, আল্লাহর জন্য একে আজাদ করে দিলাম।”

তখন রাসুল ﷺ বললেন :

أَمَّا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتُكَ النَّارَ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ

“যদি তুমি তা না করতে, তবে জাহান্নাম তোমাকে জ্বালিয়ে দিত অথবা (বললেন,) আগুন তোমাকে গ্রাস করত।”^{৬৬২}

নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এই হাদিসে দাস-দাসীর প্রতি নম্রতা অবলম্বন, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া ও রাগ সংবরণ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যেকোনো তাঁর বান্দাদের ওপর কর্তৃত্ব চালান, সেরূপ কর্তৃত্ব নিজের মালিকানাধীন দাস-দাসীর ওপর চালানোর ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।’^{৬৬৩}

অধীনস্থ চাকর-বাকর ও শ্রমিকের ওপর জুলুম করা, তাদের গায়ে হাত তোলা, কটু কথা বলা বা অবজ্ঞা করা কোনো বাহাদুরি নয়। তাই তাদের প্রতি এ

৬৬২. সহিহ মুসলিম : ১৬৫৯।

৬৬৩. ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১১/১৩০।

ধরনের কোনো জুলুম প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সাথে সাথে আপনার ওপর আল্লাহর কর্তৃত্বের কথা স্মরণ করুন।

বর্তমান সময়ে সমাজে অধীনস্থ চাকর-বাকর ও শ্রমিকদের প্রতি যে রুঢ় আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে, তা স্পষ্ট জুলুম। মানুষ ইনসারফ ও ন্যায় থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে এসব প্রকাশ পাচ্ছে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, রাসূল ﷺ এত শক্তিদর ও সাহসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অধীনস্থ খাদিম ও স্ত্রী প্রভৃতির প্রতি কখনো অবজ্ঞা প্রদর্শন করেননি এবং কখনো তাদের প্রহার করেননি।

গোলামকে প্রহার করার কাফফারা নির্ধারণ করেছেন তাকে স্বাধীন করে দেওয়া আবু উমর ؓ বলেন, ‘একদা আমি ইবনে উমর ؓ-এর কাছে গিয়ে দেখি, তিনি একটি গোলামকে আজাদ করে দিয়েছেন। এরপর তিনি জমিন থেকে একটি কাষ্ঠখণ্ড বা অন্য কিছু উঠিয়ে বললেন, “তাকে আজাদ করার মধ্যে এই বস্তুর সমতুল্য পুণ্যও নেই। তবে আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

“যে ব্যক্তি স্বীয় গোলামকে চপেটাঘাত করল বা প্রহার করল, এর কাফফারা হলো তাকে আজাদ করে দেওয়া।”^{৬৬৪}

উলামায়ে কিরাম বলেন, ‘এই হাদিসে গোলামদের প্রতি নম্রতা অবলম্বন, তাদের সাথে উত্তম আচার-আচরণ এবং তাদের কষ্টদান থেকে বিরত থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আর সকল মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, গোলামকে প্রহার করার ফলে তাকে আজাদ করে দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং এটা মুসতাহাব। এর মাধ্যমে গোলামের ওপর জুলুম করার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাওয়ার আশা করা যায়।’^{৬৬৫}

মুআবিয়া বিন সুয়াইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমি আমাদের এক গোলামকে চড় মেরে পালিয়ে গেলাম। অতঃপর জোহরের নামাজের কিছুক্ষণ

৬৬৪. সহিহ মুসলিম : ১৬৫৭।

৬৬৫. ইমাম নববি ؓ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১১/১২৭।

পূর্বে ফিরে আসলাম এবং আবার পেছনে নামাজ আদায় করলাম। অতঃপর তিনি গোলাম ও আমাকে ডাকলেন। তারপর বললেন, “এর থেকে প্রতিশোধ নাও।” তখন সে আমাকে ক্ষমা করে দিল।’

এরপর তিনি বললেন, ‘রাসুল ﷺ-এর সময়ে আমাদের বনু মুকাররিন গোত্রের কাছে কেবল একটি খাদিমা ছিল। আমাদের একজন তাকে চড় মেয়ে বসল। এই খবর রাসুল ﷺ-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, “তাকে আজাদ করে দাও।” গোত্রের লোকেরা বলল, “সে ছাড়া আমাদের কোনো খাদিম নেই।” রাসুল ﷺ বললেন :

فَلْيَسْتَحْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا، فَلْيُخْلَوْا سَبِيلَهَا

“তাহলে তোমরা তার কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করতে থাকো। তারপর যখনই তার (সেবা) থেকে অমুখাপেক্ষী হবে, তখনই তাকে মুক্ত করে দেবে।”^{৬৬৬}

‘তার থেকে প্রতিশোধ নাও’—এই কথা গোলামের মনস্ত্বষ্টির জন্য বলেছেন। নাহলে সামান্য চপেটাঘাতের কারণে কিসাস বা বদলা নেওয়া ওয়াজিব হয় না। এ ক্ষেত্রে সাধারণত তাজির বা শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব হয়। তবে মুসতাহাব হিসেবে তিনি গোলামকে কিসাস গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন।

এই হাদিসে দাস-দাসীর প্রতি নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।^{৬৬৭}

লক্ষ্য করুন, সন্তান খাদিমের শরীরে আঘাত করার পরপরই বুঝতে পেরেছেন যে, এর কারণে তার পিতা তাকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করবেন। এ জন্য মারার সাথে সাথে তিনি পালিয়ে গেলেন। ফিরে আসলেন নামাজের সময়ে, যেন নামাজ পিতার নিকট তার পক্ষে সুপারিশ করে।

হিলাল বিন ইয়াসাফ ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘এক বৃদ্ধ লোক (রাগের মাথায় চিন্তাভাবনা না করে) তড়িঘড়ি করে তার খাদিমার গালে চপেটাঘাত

৬৬৬. সহিহ মুসলিম : ১৬৫৮।

৬৬৭. ইমাম নববি ؒ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১১/১২৮।

করে বসলেন। তখন সুয়াইদ বিন মুকাররিন   তাকে বললেন, “আপনি কি মারার জন্য তার মূল্যবান চেহারা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না?

আমি বনু মুকাররিনের সাত সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের একজন সদস্য ছিলাম। আমাদের কাছে কেবল একটি খাদিমা ছিল। একদিন আমাদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য তাকে চড় মারলে রাসুল   তাকে আজাদ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন আমাদের।”^{৬৬৮}

মৃত্যুশয্যায় নামাজ ও দাস-দাসীদের ব্যাপারে নসিহত করেছেন

আনাস বিন মালিক   বলেন, ‘মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে রাসুলুল্লাহ শেষ নসিহত ছিল, “নামাজ ও দাস-দাসীদের ব্যাপারে যত্নবান হও।”^{৬৬৯}

‘নামাজ’—অর্থাৎ নামাজকে আঁকড়ে ধরো, নামাজের প্রতি যত্নবান হও এবং তাতে কখনো গাফিলতি করো না।

‘দাস-দাসী’—অর্থাৎ তাদের অধিকারসমূহ আদায় করে দাও এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।^{৬৭০}

আলি বিন আবু তালিব   বলেন, ‘রাসুল  -এর সর্বশেষ কথা ছিল :

الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“নামাজের প্রতি যত্নবান হও এবং তোমাদের মালিকানাধীন বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।”^{৬৭১}

‘তোমাদের মালিকানাধীন বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো’—নিহায়া (৪/৭৮৯) গ্রন্থে বলা হয়েছে, এই হাদিসে দাস-দাসীদের সাথে নম্র ব্যবহার ও তাদের দায়িত্ব সহজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর কেউ

৬৬৮. সহিহ মুসলিম : ১৬৫৮।

৬৬৯. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৬৯৭।

৬৭০. হাশিয়াতুস সিনদি : ৩/৩৯৭।

৬৭১. সুনানু আবু দাউদ : ৫১৫৬।

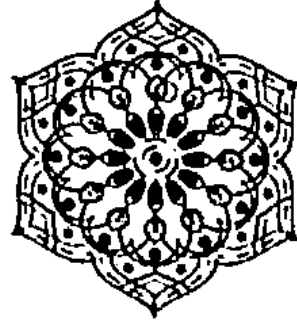
কেউ বলেছেন, এই হাদিসে মালিকানাধীন সম্পদ থেকে জাকাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে প্রসিদ্ধ মত হলো, এখানে মালিকানাধীন বিষয়সমূহ বলতে দাস-দাসীদের বোঝানো হয়েছে। আর তাদের আলোচনাকে নামাজের আলোচনার সাথে মিলিয়ে আনার কারণ হলো, যেন এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নামাজ ত্যাগ করার কোনো অবকাশ যেমন নেই, অনুরূপ দাস-দাসীদের খোরপোশ না দেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। কোনো কোনো আলিম এই বিধানে দাস-দাসীদের সাথে অবুঝ চতুষ্পদ জন্তুদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^{৬৭২}



—...○ তৃতীয় অধ্যায় ○—

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে
রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি



প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

আল্লাহ তাআলা মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তাদের রূপ ও আকৃতিতে যেভাবে বৈচিত্র রেখেছেন, তেমনই শরীর, বর্ণ ও শক্তিমত্তার ক্ষেত্রেও পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

কিছু মানুষকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন শারীরিক নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রেখেছেন—যা অন্যদের মাঝে যথাযথরূপে বিদ্যমান আছে। এ ধরনের মানুষ আবার কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত : দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, অবশ, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ইত্যাদি।

সাধারণত, কোনো সমাজই এ শ্রেণির লোকদের থেকে মুক্ত হয় না। বিপদ ও নিয়ামত-বঞ্চনার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আবার তারতম্য আছে। যেমন : অন্ধের চেয়ে কানার বিপদ ও কষ্ট কম এবং অবশের চেয়ে খোড়ার বিপদ ও বঞ্চনা কম। সুতরাং যার বিপদ ও বঞ্চনা কম, সে বেশি বিপদ ও বঞ্চনায়ুক্তকে দেখে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি এই শ্রেণির সবাইকে দেখে উপদেশ গ্রহণ করবে।

তবে মানুষ পূর্ণ সুস্থ হোক বা প্রতিবন্ধী হোক, প্রত্যেকের মাঝে কিন্তু আল্লাহর অসংখ্য ও অগণিত নিয়ামত রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করা আবশ্যিক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

‘যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তবে গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।’^{৬৭৩}

যারা প্রতিবন্ধী, তাদের আল্লাহ তাআলা অন্য কোনো নিয়ামতের মাধ্যমে তার প্রতিবন্ধিত্বের বদলা দিয়েছেন। এ কারণেই অন্ধ ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় অধিক মেধাবী, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির অধিকারী হয়ে থাকে।

মূর্খরা বলে, প্রতিবন্ধীদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান বা তাদের চিকিৎসা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে কী এমন উপকারিতা রয়েছে?

আমরা বলি, এমন মানসিকতা কেবল এমন ব্যক্তিরই থাকতে পারে, যার মাঝে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও প্রতিদানের আশা করে না, সে-ই কেবল এমন মানসিকতা লালন করতে পারে। বরং এমন মানসিকতা যে লালন করে, তার মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাও চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।

যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা জানে এবং বিশ্বাস করে, আমাদের মাঝে প্রতিবন্ধীদের উপস্থিতিতে রয়েছে অনেক বড় হিকমত ও সূক্ষ্ম উপকারিতা। প্রতিবন্ধিত্ব আক্রান্তদের জন্য নানাবিধ উপকারিতা বয়ে আনে এবং সুস্থ-সবলদের জন্য অনেক বড় উপদেশ।

প্রতিবন্ধী ও স্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে রাসুল ﷺ-এর আচরণবিধির আলোচনা অনেক ব্যাপক।

তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন

আনাস বিন মালিক রাঃ বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِيهِ فَصَبِرَ، عَوَّضْتُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ

‘আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, “যদি আমি আমার বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তু দ্বারা (দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করার মাধ্যমে) পরীক্ষা করি, অতঃপর সে তার ওপর ধৈর্যধারণ করে, তখন তার বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করব।”’^{৬৭৪}

‘দুটি প্রিয় বস্তু’ অর্থ দুই চোখ। কারণ, এ দুটিই মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। যার চোখ নেই, সে ভালো ও উপকারী বস্তু দেখে তা অর্জন করতে পারে না এবং মন্দ ও ক্ষতিকর বস্তু দেখে তা থেকে বাঁচতে পারে না—এ আফসোস তাকে সর্বদা তাড়িয়ে ফেরে।

‘অতঃপর সে তার ওপর ধৈর্যধারণ করে’—হাদিসের এ অংশটির ব্যাখ্যা অন্য রিওয়াযাতে বিদ্যমান আছে—

مَنْ أَذْهَبَتْ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ

‘যার দুটি প্রিয় বস্তু আমি নিয়ে নিয়েছি, অতঃপর সে তার ওপর ধৈর্যধারণ করেছে এবং (আমার নিকট) তার প্রতিদান কামনা করেছে, তাকে এর প্রতিদান হিসেবে জান্নাত না দিয়ে আমি সন্তুষ্ট হব না।’^{৬৭৫}

এখান থেকে বোঝা গেল, এখানে ধৈর্যধারণ করার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের জন্য যে প্রতিদান রেখেছেন, অন্তরে তার প্রতি আশ্রয় ও আশা রেখে ধৈর্যধারণ করা। এমনি সবর করে থাকলে প্রতিদান পাওয়া যাবে না। কেননা, সকল আমলের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে বিপদে আক্রান্ত করেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এগুলো বান্দার প্রতি তাঁর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এগুলো হয়তো তার কোনো বড় বিপদকে রহিত করার জন্য অথবা গুনাহ ক্ষমা করার জন্য অথবা তার সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য।

বান্দা যদি সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়, তাহলে তার উদ্দেশ্য সফল। অন্যথায় তার অবস্থা এমন হবে, যেমনটি সালমান রাঃ-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتَبًا، وَإِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أُرْسِلُوهُ، فَلَا يَذْرِي لِمَ عُقِلَ وَلِمَ أُرْسِلَ

‘আল্লাহ তাআলা মুমিনের রোগকে তার গুনাহসমূহের কাফফারা এবং জরিমানাস্বরূপ গ্রহণ করেন। আর পাপী ব্যক্তির রোগ হলো সেই উটের মতো—যাকে তার মালিক বাঁধল, অতঃপর ছেড়ে দিল, অথচ সে জানল না যে, কেন তাকে বাঁধা হলো আর কেনই-বা তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।’^{৬৭৬}

‘তখন তার বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করব’—এটাই সবচেয়ে বড় বিনিময়। কারণ, দৃষ্টিশক্তির দ্বারা যে স্বাদ উপভোগ করা যায়, তা পৃথিবী ধ্বংসের সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু জান্নাতের স্বাদ অনন্তকাল ধরে উপভোগ করা যাবে।

জান্নাতের এই সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে চোখ হারিয়েছে এবং উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী তাতে ধৈর্য ধরেছে।^{৬৭৭}

ইবনে বাত্তাল رحمته বলেন, ‘এই হাদিসটি এ কথা প্রমাণ করে যে, বিপদে ধৈর্যধারণ করলে তার বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যায়।

আর চোখ ও দৃষ্টিশক্তি নিঃসন্দেহে বান্দার প্রতি আল্লাহর অন্যতম সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কিন্তু কাউকে তা না দিয়ে তার বিনিময়ে জান্নাত দান করা দুনিয়ার দৃষ্টিশক্তির নিয়ামতের চেয়ে অনেক উত্তম। কারণ, দৃষ্টিশক্তির স্বাদ পৃথিবী ধ্বংসের সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু জান্নাতের স্বাদ চিরকাল বাকি থাকবে।’^{৬৭৮}

জাবির বিন আব্দুল্লাহ رحمته বলেন, ‘রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ
جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيطِ

৬৭৬. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৪৯৩।

৬৭৭. ফাতহুল বারি : ১০/১১৬।

৬৭৮. ইবনু বাত্তাল رحمته কৃত শারহু সহিহিল বুখারি : ৯/৩৭৭।

“কিয়ামতের দিন যখন বিপদগ্রস্ত লোকদের প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন বিপদমুক্ত লোকেরা কামনা করবে, যদি দুনিয়াতে তাদের চামড়াসমূহ কেঁচি দিয়ে কাটা হতো!”^{৬৭৯}

তাদের জন্য দোয়া করতেন

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল সঃ কোনো রোগীর কাছে গেলে বা কোনো রোগীকে তাঁর নিকট আনা হলে তিনি বলতেন :

أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ،
شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

“হে মানুষের প্রভু, তার কষ্ট দূর করে দিন, আপনিই শিফা দানকারী। আপনি ব্যতীত কেউই শিফা দান করতে পারে না। আপনি তাকে এমন শিফা দান করুন, যেন কোনো রোগ বাকি না থাকে।”^{৬৮০}

ফায়দা : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রাঃ বলেন, ‘এখান থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে অসুস্থতার কারণে গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং সাওয়াব দান করা হয়, তা সত্ত্বেও রোগীর জন্য শিফার দোয়া কেন?

এর উত্তর হলো, দোয়া হচ্ছে ইবাদত, এটি গুনাহ ক্ষমা করা ও সাওয়াব প্রদান করার প্রতিবন্ধক নয়। কেননা, এ দুই প্রতিদান রোগের শুরু অবস্থায় এবং রোগের ওপর সবার করার কারণে অর্জিত হয়।

আর যে দোয়া করে তার দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না। দুটি উপকারের কোনো একটি অবশ্যই সে অর্জন করে। হয়তো তার উদ্দেশ্য সফল হয়, নয়তো অন্য দিক দিয়ে তার কোনো উপকার সাধিত হয় কিংবা তার কোনো বিপদ দূর হয়ে যায়।^{৬৮১}

৬৭৯. সুনাতুত তিরমিজি : ২৪০২।

৬৮০. সহিহুল বুখারি : ৫৬৭৫, সহিহ মুসলিম : ২১৯১।

৬৮১. ফাতহুল বারি : ১০/১৩২।

আতা বিন রাবাহ রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমাকে ইবনে আব্বাস রা বলেন, “আমি কি তোমাকে এক জান্নাতি মহিলা দেখাব না?” আমি বলি, “অবশ্যই দেখাবেন।” তিনি বলেন, “এই কৃষ্ণ বর্ণের মহিলাটি, যে রাসূলুল্লাহ স-এর কাছে এসে বলেছিল, “আমি অতর্কিত মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং আমার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে পড়ে। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।”

তিনি বললেন :

إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكَ

“তুমি যদি চাও, সবর করে জান্নাত লাভ করতে পারো। আর যদি চাও আরোগ্য লাভ করতে, আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি।”

সে বলল, “আমি সবর করব। তবে, আপনি দোয়া করুন, যেন লজ্জাস্থান না খোলে।”^{৬৮২}

‘আমি অতর্কিত মৃগীরোগে আক্রান্ত হই’—মৃগীরোগ দুই প্রকার : ১. ব্রেইনের স্নায়ুতে ক্রটির কারণে সৃষ্ট রোগ। তার পরিচিত ও অপরিচিত বিভিন্ন কারণ রয়েছে।

২. জিনের প্রভাবে সৃষ্ট। জিন মানুষের ওপর ভর করে তাকে নিয়ে খেলে। ফলে সে বিভ্রান্তের মতো উঠে, বসে, দৌড়ায়, এদিক-ওদিক গড়াগড়ি খায়, আরও অনেক ধরনের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে।

কারণ যা-ই হোক, এ রোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন এক পরীক্ষা। এতে যে ধৈর্যধারণ করে, তার জন্য আল্লাহর কাছে অনেক বড় পুরস্কার রয়েছে।

‘আমার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে পড়ে’—মুসলমান মহিলার জন্য অনাত্মীয় পুরুষের সামনে লজ্জাস্থান খুলে যাওয়া অনেক কষ্টদায়ক। কিন্তু মৃগীরোগ

রাস্তায়, বাজারে বা অন্য যেকোনো পাবলিক প্লেসে হঠাৎ আসতে পারে। এর ওপর রোগীর কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেই।

এ জন্য তিনি মৃগীরোগের কষ্টের ওপর সবর করলেও লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার ওপর ধৈর্য ধরতে রাজি হননি। অথচ এই সতর খুলে যাওয়া তার নাগালের বাইরে হওয়ায় শরিয়ত তাকে কোনোরূপ দোষারোপ করছে না। কী পুণ্যবতী ছিলেন সেই মহীয়সী!

‘তিনি বললেন, ‘আমি সবর করব’—তার সামনে দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল—

১. রাসূল ﷺ তার জন্য দোয়া করবেন আর তিনি আরোগ্য লাভ করবেন। ২. তিনি সবর করবেন, বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করা হবে।

তিনি কোনো রকম চিন্তাভাবনা না করে তাৎক্ষণিকভাবে অস্থায়ী সুস্থতার পরিবর্তে স্থায়ী জান্নাতকে বেছে নিলেন। এটিই প্রমাণ করে, তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি কী মজবুত ইমান ছিল এবং আল্লাহর রহমত ও প্রতিদানের প্রতি কীরূপ আশ্রয় ছিল!

কিন্তু কিছু মানুষ আছে, যাদের সামনে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের আলোচনা করলে এমন ভাব দেখায় যেন এসবের প্রতি তাদের কোনো গুরুত্ব নেই এবং এ বিষয়ের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

ইবনে হাজার رحمه বলেন, ‘এই হাদিসে মৃগীরোগের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং দুনিয়ার বিপদাপদের ওপর সবর করার বিনিময়ে জান্নাত লাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই হাদিস থেকে আরও বোঝা যায়, কেউ যদি দুটি ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলক কঠিন বিষয় সহ্য করার শক্তি রাখে, তাহলে তার জন্য সহজ বিষয়ের চেয়ে কঠিন বিষয়টাকে গ্রহণ করা উত্তম।

এই হাদিস থেকে আরও প্রতীয়মান হয়, দোয়া ও আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়ার মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা জাগতিক উপায়ে চিকিৎসা করার চেয়ে অধিক উপকারী ও কার্যকর। রোগ নিরাময়ে প্রকাশ্য ও মুখপাতির চেয়ে দোয়ার প্রভাব অনেক গুণ বেশি। তবে তার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে—

প্রথম শর্ত রোগীর জন্য—তার অন্তরে প্রকৃত বিশ্বাস থাকতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত চিকিৎসকের জন্য—তার ভেতর গভীর মনোযোগ, শক্তিশালী তাকওয়া ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকতে হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।”^{৬৮৩}

উসমান বিন হানিফ রাঃ থেকে বর্ণিত, দৃষ্টিশক্তিহীন এক ব্যক্তি রাসুল সঃ-এর নিকট এসে বললেন, ‘আমার সুস্থতার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। তিনি বললেন :

إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

“তুমি চাইলে দোয়া করতে পারি। তবে তুমি যদি সবর করো, সেটাই তোমার জন্য ভালো হবে।”

তিনি বললেন, “আপনি দোয়া করুন।” তখন রাসুল সঃ তাকে ভালোমতো অজু করে এ দোয়াটি পড়তে নির্দেশ দিলেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ
بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ

“হে আল্লাহ, আমি আপনার দরবারে প্রার্থনা করছি, রহমতের নবি মুহাম্মাদের অসিলা নিয়ে আপনার প্রতি মনোযোগী হয়েছি। (হে নবি) আপনার অসিলায় আমি আমার এই প্রয়োজন আল্লাহর দরবারে পেশ করছি, যেন তিনি আমার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। হে আল্লাহ, আপনি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করুন।”^{৬৮৪}

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা

হাদিসের অর্থ রাসুল সঃ-এর সত্তাকে অসিলা বানানো নয়; বরং তাঁর দোয়াকে অসিলা বানানো উদ্দেশ্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাঃ বলেন, ‘অন্ধ ব্যক্তিটি রাসুল সঃ-এর নিকট তার জন্য দোয়া করার আবেদন করলেন, যেভাবে সাহাবিগণ তাঁর নিকট বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া করতে আবেদন করতেন।

৬৮৩. ফাতহুল বারি : ১০/১১৫।

৬৮৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৭৮।

তিনি যে বললেন, “রহমতের নবি মুহাম্মাদের অসিলা নিয়ে আপনার প্রতি মনোযোগী হয়েছি।”—এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর দোয়া ও সুপারিশের অসিলায়। এ জন্যই হাদিসের শেষে বলা হয়েছে, “হে আল্লাহ, আপনি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করুন।”^{৬৮৫}

তাদের অনুভূতির মূল্যায়ন করতেন এবং সুন্দর শব্দে সম্বোধন করতেন জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বর্ণনা করেন, রাসুল সঃ ইরশাদ করেন :

انْظِلُّوا بِنَا إِلَى الْبَصِيرِ الَّذِي فِي بَنِي وَاقِفٍ نَعُوذُهُ. وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى

“আমাকে বনু ওয়াকিফের দৃষ্টিসম্পন্ন লোকটির নিকট নিয়ে চলো, আমি তাকে দেখব।” লোকটি অন্ধ ছিলেন।^{৬৮৬}

সুফইয়ান রাঃ বলেন, ‘বনু ওয়াকিফ হলো আনসারদের একটি কবিলা।’

রাসুল সঃ তার ব্যাপারে সূক্ষ্ম একটি শব্দ ব্যবহার করলেন, যেন তার অনুভূতিতে আঘাত না লাগে।

অন্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন বলার রহস্য : তাহাবি রাঃ বলেন, ‘এই হাদিসে রাসুল সঃ অন্ধ লোকটিকে দৃষ্টিসম্পন্ন কেন বললেন, তার কারণ বের করতে আমরা গভীর চিন্তা-ফিকির করলাম। কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআনের মধ্যে অন্ধ ব্যক্তিকে অন্ধই বলেছেন। যেমন :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ

“অন্ধের জন্য দোষ নেই।”^{৬৮৭}

অন্য আয়াতে :

عَبَسَ وَتَوَلَّى. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى

৬৮৫. কাইদাতুন জালিলাহ ফিত তাওয়াসসুল ওয়াল অসিলাহ : ২/৩০০।

৬৮৬. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : ২০৮৫১।

৬৮৭. সুরা আন-নুর : ৬১।

“তিনি অকুণ্ঠিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল।”^{৬৮৮}

চিন্তা-ফিকির করে পেলাম, আল্লাহ তাআলা অন্ধত্বযুক্ত ব্যক্তিকে অন্ধ ব্যতীত অন্য নামেও অভিহিত করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

“বস্তুত, চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বন্ধস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।”^{৬৮৯}

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল, অন্ধকে তার অন্তর্দৃষ্টির কারণে দৃষ্টিসম্পন্ন বলা বৈধ।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো, অন্ধকে তার বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি না থাকার কারণে অন্ধ বলা যেমন বৈধ, তেমনই তার অন্তর্দৃষ্টির কারণে তাকে দৃষ্টিসম্পন্ন বলাও বৈধ। রাসুল ﷺ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠটাকে বেছে নিলেন। যদিও তাঁর জন্য তাকে অন্ধ বলারও অবকাশ ছিল।^{৬৯০}

শুভ ও শালীন শব্দ প্রয়োগ করার আরেকটি উদাহরণ হলো : দংশিত ব্যক্তির জন্য সুস্থতার শুভ উদ্দেশ্য কামনা করে তাকে ‘সালিম’ বা সুস্থ বলা হয়।^{৬৯১} অনুরূপভাবে ধ্বংসশীল মরুভূমিকে মরুবাসীর জন্য সফলতা ও মুক্তির শুভ উদ্দেশ্য কামনা করে ‘মাফাজাহ’ বা সফলতার স্থান বলা হয়।^{৬৯২}

তাদের মনঃকষ্ট দূর করতে সচেষ্ট থাকতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের আশ্বস্ত করতেন যে, শরীর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নয়। ইবনে মাসউদ ؓ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একটি কাঁটাওয়ালা বৃক্ষ থেকে মিসওয়াক সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর উভয় পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি

৬৮৮. সূরা আবাসা : ১-২।

৬৮৯. সূরা আল-হাজ : ৪৬।

৬৯০. শারহ মুশকিলির আসার : ১০/২১৯।

৬৯১. ইবনে দুরাইক কৃত আল-ইশতিকাক : ১/৩৬।

৬৯২. ইবনুল আনবারি কৃত আজ-জাহির ফি মাআনি কালিমাতিন নাস : ১/৩৩১।

পর্যন্ত অংশটি খুব চিকন ছিল। ফলে বাতাস তাকে ফেলে দিচ্ছিল। তা দেখে উপস্থিত লোকজন হেসে উঠলেন। রাসুল ﷺ বললেন :

مِمَّ تَضْحَكُونَ؟

“কী ব্যাপার, তোমরা হাসছ কেন?”

তারা বললেন, “ওর চিকন জাং দেখে হাসছি।” তখন রাসুল ﷺ বললেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ

“সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি—যার হাতে আমার প্রাণ, তার জাং দুটি (আমল পরিমাপের) পাল্লায় উল্হদ পাহাড়ের চেয়ে ভারী হবে।”^{৬৯৩}

আব্দুল্লাহ ﷺ-এর দুর্বলতা ও রুগ্নতা তার জন্য ক্ষতিকর হয়নি। কেননা, ছিপছিপে জাংওয়ালা লোকটিকে আল্লাহ এমন ফজিলত দান করেছেন, যা আমল পরিমাপের পাল্লায় অনেক ভারী হবে। তিনি ছিলেন উন্নত আখলাক ও স্বচ্ছ আধ্যাত্মিকতায় অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ ﷺ বর্ণনা করেন, ‘আমরা হুজাইফা ﷺ-কে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে অনুরোধ করলাম, যার আকার-আকৃতি, চালচলন, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্রে নবিজি ﷺ-এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য আছে, আমরা তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। হুজাইফা ﷺ বললেন :

مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدًيًا وَذَلًّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ

“আকার-আকৃতি, চালচলন, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্রে নবিজি ﷺ-এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য রাখেন—এমন ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ ব্যতীত অন্য কাউকে আমি জানি না।”^{৬৯৪}

৬৯৩. মুসনাদু আহমাদ : ৩৯৯১।

৬৯৪. সহিহুল বুখারি : ৩৭৬২।

অন্য রিওয়াযাতে এসেছে—

قَالَ: كَانَ أَقْرَبُ النَّاسِ هَدْيًا وَدَلًّا وَسَمْتًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى يَتَوَارَى مِنَّا فِي بَيْتِهِ، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُخْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ هُوَ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى.

‘হুজাইফা রাঃ বলেন, “আচার-আচরণে ও চালচলনে ব্যক্তিদের মাঝে রাসুল সাঃ-এর অনেক বেশি নিকটবর্তী হলেন ইবনে মাসউদ রাঃ। তিনি আমাদের মাঝ হতে অন্তরাল হয়ে তাঁর ঘরে অবস্থান করতেন। রাসুল সাঃ-এর বিশ্বস্ত সাহাবিগণ ভালোভাবে অবগত আছেন যে, ইবনে উম্মে আবদ (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ) রাঃ তাঁদের প্রত্যেকের তুলনায় আল্লাহ তাআলার বেশি নৈকট্যলাভকারী।”^{৬৯৫}

আল্লাহর নিকট সুন্দর আকৃতি ও সুদর্শন চেহারা দিয়ে মানুষকে মাপা হবে না; বরং উত্তম গুণাবলি ও আমলের মাধ্যমে পরিমাপ করা হবে।

ইবনে মাসউদ রাঃ খাটো ও ছিপছিপে গড়নের লোক ছিলেন।

জাইদ বিন ওয়াহাব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি উমর বিন খাত্তাব রাঃ-এর সাথে বসা ছিলাম, তখন সেখানে ইবনে মাসউদ রাঃ আগমন করলেন। খাটো হওয়ার কারণে উপস্থিত লোকজনের মাঝে তাকে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। তাঁকে দেখে উমর রাঃ হাসলেন। অতঃপর উমর রাঃ তাঁর সাথে প্রফুল্ল চিত্তে কথা বললেন। একটি বিষয়ের ওপর পরস্পর বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে দুজনে হাসাহাসি করলেন। অতঃপর তিনি চলে গেলেন। উমর রাঃ তাঁর যাত্রাপথে তাকিয়ে রইলেন। দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে যাওয়ার পর বললেন :

كُنَيْفٌ مُلِيَ عِلْمًا

“লোকটি ইলম ও জ্ঞানে ভরপুর একটি পাত্র।”^{৬৯৬}

৬৯৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮০৭।

৬৯৬. সিয়াকু আলামিন নুবালা : ১/৪৩৬।

তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের আবদার রক্ষা করতেন

মাহমুদ বিন রাবি আনসারি রাঃ থেকে বর্ণিত—

أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي، وَأَنَا أَصْلِي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ عِثْبَانُ: فَعَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ (زاد مسلم في رواية: ومن شاء الله من أصحابه) حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَتْ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ: فَأَبَى فِي الْبَيْتِ، رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذُوو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِ أَوْ ابْنُ الدُّخَيْشِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

‘ইতবান বিন মালিক ؓ—যিনি রাসুল ؐ-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসারগণের অন্যতম—রাসুল ؐ-এর কাছে হাজির হয়ে আরজ করলেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে নামাজ আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের বাসস্থানের নিম্নভূমিতে পানি জমে যাওয়াতে তা আর পার হয়ে তাদের মসজিদে পৌঁছাতে এবং তাদের নিয়ে নামাজ আদায় করতে সমর্থ হই না। আর ইয়া রাসুল্লাহ, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে তাশরিফ এনে কোনো এক স্থানে নামাজ আদায় করেন এবং আমি সেই স্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই।” বর্ণনাকারী বলেন, ‘তাকে রাসুল ؐ বললেন, “ইনশাআল্লাহ, অচিরেই আমি তা করব।”

ইতবান ؓ বলেন, ‘পরদিন সূর্যোদয়ের পর রাসুল ؐ ও আবু বকর ؓ (সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় : আরও কয়েকজন সাহাবি) আমার ঘরে তাশরিফ আনেন। রাসুল ؐ ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসেই জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার ঘরে কোন স্থানে নামাজ আদায় করা পছন্দ করো?” তিনি বলেন, “আমি তাঁকে ঘরের এক প্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করলাম।” তারপর রাসুল ؐ দাঁড়ালেন এবং তাকবির বললেন। তখন আমরাও দাঁড়ালাম এবং কাতারবন্দী হলাম। তিনি দুই রাকআত নামাজ আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।’

তিনি (ইতবান) বলেন, ‘আমরা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বসালাম এবং তাঁর জন্য তৈরি “খাজিরা” নামক খাবার তাঁর সামনে পেশ করলাম।’ বর্ণনাকারী বলেন, ‘ওই সময় মহল্লার কিছু লোক ঘরে ভিড় জমালেন। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, “মালিক বিন দুখাইশিন কোথায়?” অথবা বললেন, “ইবনে দুখশুন কোথায়?” তখন একজন জবাব দিলেন, “সে মুনাফিক। সে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে না।” তখন রাসুল ؐ বললেন, “এরূপ বলো না। তুমি কি দেখছ না যে,

সে আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশায় “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলেছে?” তখন সে ব্যক্তি বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আমরা তো মনে করি, মুনাফিকদের সাথেই তার যত সম্পর্ক ও কল্যাণকামিতা।” রাসূল ﷺ বললেন, “আল্লাহ তাআলা তো এমন ব্যক্তির প্রতি জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে।”^{৬৯৭}

খাজিরা : একপ্রকার খাদ্য। ইবনে কুতাইবা رحمه الله বলেন, ‘এই খাবার তৈরির পদ্ধতি হলো, গোশতকে ছোট ছোট করে কুটে বেশি করে ঝোল দিয়ে রান্না চড়ানো হয়, রান্না হওয়ার পর তাতে আটা ঢেলে দেওয়া হয়। গোশত না থাকলে তাকে “আছিদা” বলা হয়।’^{৬৯৮}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- অন্ধের ইমামতি জায়িজ।
- নিজের অসুস্থতা ও বিপদের সংবাদ দেওয়া যায়। এটা অধৈর্যসুলভ অভিযোগের পর্যায়ে পড়ে না।
- মদিনাতে মসজিদে নববি ছাড়াও আরও অনেক মসজিদ ছিল।
- বৃষ্টি, অন্ধকার ইত্যাদি সমস্যার কারণে মসজিদের জামাআতে না যাওয়ার অনুমতি আছে।
- তুলনামূলক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তার নিম্নমানের ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেওয়া।
- ওয়াদা দেওয়ার সময় ইনশাআল্লাহ বলা।
- বাড়ির নির্দিষ্ট কোনো এক স্থানকে নামাজের জন্য নির্দিষ্ট করলে তা ওয়াকফ করা আবশ্যিক নয়; যদিও তার নাম মসজিদ দেওয়া হোক।
- রাসূল ﷺ কখনো কখনো নফল নামাজ জামাআতসহকারে আদায় করেছেন।

৬৯৭. সহিহুল বুখারি : ৪১৫, সহিহ মুসলিম : ১০৫২।

৬৯৮. ফাতহুল বারি : ১/৫২১।

- দাওয়াতদাতার অসম্মতি না থাকলে দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার কিছু সঙ্গীকে সাথে নিয়ে যেতে পারবে।
- আগন্তকের ইমামতি মাকরুহ হওয়ার বিধান তখন প্রযোজ্য হবে না, যখন আগন্তক সবচেয়ে বড় ইমাম হয়। অনুরূপভাবে ঘরওয়ালা অনুমতি দিলে ইমামতি মাকরুহ হবে না।
- কোনো বড় ইমাম বা বড় আলিম কারও বাড়িতে গেলে তার পাড়া-প্রতিবেশী তার ঘরে একত্র হতে পারবে।
- দলের মধ্য থেকে কেউ বিনা কারণে অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ নেওয়া।
- অন্তরের বিশ্বাস ব্যতীত কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তি ইমানের জন্য যথেষ্ট নয়।
- একত্ববাদের বিশ্বাস নিয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে না।
- একমাত্র আল্লাহর জন্য কৃত ইবাদত বান্দাকে মুক্তি দেবে, যদি তা আল্লাহ কবুল করেন।
- কোনো প্রকাশ্য মুসলমানকে তার বিভিন্ন কর্মের কারণে কেউ মুনাফিক বললে সে কাফির সাব্যস্ত হবে না। তাকে ফাসিকও বলা যাবে না। বরং ইতিবাচক ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাকে অবস্থার শিকার হিসেবে ধরা হবে।^{৬৯৯}

ফায়দা : ঘরের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি জায়গাকে নামাজের জন্য ঠিক করা আব্দুর রহমান বিন শিবিল رحمته-এর হাদিসের বিরোধী মনে হচ্ছে। যাতে বলা হয়েছে—

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ،
وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبْعِ، وَأَنْ يُوْطَنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا
يُوْطَنُ الْبَعِيرُ

‘রাসূল ﷺ তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন : নামাজের সিজদায় কাকের মতো ঠোঁকর মারতে, হিংস্র জন্তুর ন্যায় বাহুদ্বয় জমিনের ওপর বিছিয়ে দিতে এবং (মসজিদে) কোনো লোকের নামাজ পড়ার স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে, যেমন উট আস্তাবলে স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।’^{৭০০}

উত্তর : হাদিসদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। নামাজের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করার হাদিসটি ঘরের মধ্যে জায়গা নির্দিষ্ট করার বেলায় প্রযোজ্য এবং নিষিদ্ধ হওয়ার হাদিসটি মসজিদের বেলায় প্রযোজ্য। কারণ, মসজিদ আল্লাহর মালিকানাধীন। সেখানে কারও একক মালিকানা চলে না।

এ ছাড়াও এর কারণে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, কেউ নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে জায়গা নির্দিষ্ট করে নিলে ওই ব্যক্তির আগে কেউ এসে ওই জায়গায় দাঁড়ালে স্বাভাবিকভাবে তার রাগ আসবে। এতে পরস্পর কথা কাটাকাটি ও মসজিদে শোরগোল সৃষ্টি হবে। অনেক সময় ঝগড়া ও মারামারিও সংঘটিত হতে পারে।

তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক দেখিয়ে দিতেন

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন :

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى، دَعَا، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ»

‘এক অন্ধ ব্যক্তি (আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাঃ) রাসূল সঃ-এর নিকট এসে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো লোক নেই।” তারপর তিনি রাসূল সঃ-এর নিকট নিজ ঘরে নামাজ পড়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি

তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি চলে যেতে উদ্যত হলে রাসূল ﷺ ডেকে বললেন, “তুমি কি নামাজের আজান শুনতে পাও?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” রাসূল ﷺ বললেন, “তাহলে তুমি আজানে সাড়া দেবে (জামাআতে হাজির হবে)।”^{৭০১}

এই হাদিস প্রমাণ করে, জামাআতে হাজির হওয়া ওয়াজিব। যদি ওয়াজিব না হতো, তবে ইবনে উম্মে মাকতুম রضى الله عنه-এর মতো অন্ধ লোকদের জামাআতে না আসার অবকাশ দেওয়া হতো।^{৭০২}

ইবনে রজব রضى الله عنه বলেন, ‘ইবনে উম্মে মাকতুম রضى الله عنه-এর হাদিস ও ইতবান বিন মালিক রضى الله عنه-এর হাদিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। কারণ, ইতবান বিন মালিক রضى الله عنه-কে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইবনে উম্মে মাকতুম রضى الله عنه-কে দেওয়া হয়নি।

এর সমাধানকরণে কেউ কেউ বলেছেন, ইবনে উম্মে মাকতুম রضى الله عنه-এর বাড়ি মসজিদের নিকটবর্তী ছিল আর ইতবান বিন মালিক রضى الله عنه-এর বাড়ি অনেক দূরে ছিল। এ জন্যই ইবনে উম্মে মাকতুমের ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি ইকামত শুনতে পেতেন।

আবার এটাও হতে পারে যে, ইতবান রضى الله عنه-এর বাড়ির যে স্থানে রাসূল ﷺ নামাজ পড়েছেন, ওই স্থানকে তিনি গতানুগতিক মসজিদে রূপান্তর করেছিলেন, তাতে যথারীতি আজান ও ইকামতের মাধ্যমে বাড়ির লোকজন ও আশপাশের লোকদের নিয়ে নামাজের জামাআত অনুষ্ঠিত হতো। সুতরাং বাড়ির মসজিদ হলেও সেটি নিয়মিত একটি জামাআতের মসজিদের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

পক্ষান্তরে, ইবনে উম্মে মাকতুম রضى الله عنه নিজ বাড়িতে একাকী নামাজ পড়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। ফলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। হাদিসদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনে এই মতটিই অধিক যথার্থ মনে হয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।^{৭০৩}

৭০১. সহিহ মুসলিম : ৬৫৩।

৭০২. আওনুল মাবুদ : ২/২৫৭।

৭০৩. ইবনুল আনবারি কৃত ফাতহুল বারি : ২/৩৯২।

অনুরূপভাবে বলা যায়, ইতবান ﷺ একে তো দুর্বল দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, তদুপরি তাকে পানি জমে যাওয়া একটি নিম্নভূমি অতিক্রম করে মসজিদে গমন করতে হতো। ফলে তাতে শুধু ক্ষতির আশঙ্কা ছিল তা নয়; বরং নিম্নভূমিটি অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ-এর বাড়ি থেকে মসজিদে যাওয়া সে তুলনায় অনেক সহজ ছিল।

তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত—

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: «يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السَّككِ شِئْتَ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكَ حَاجَتَكَ» فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، حَتَّى فَرَعَتْ مِنْ حَاجَتِهَا

‘এক মহিলার বুদ্ধিতে কিছুটা ত্রুটি ছিল। তিনি বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, আপনার সাথে আমার প্রয়োজন আছে।” রাসুল ﷺ বললেন, “হে অমুকের মা, তুমি যেকোনো গলি দেখে নাও, (তুমি ডাক দিলে সেখানে) আমি তোমার কাজ করে দেবো।” তারপর তিনি কোনো পথে মহিলাটির সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করে তাকে প্রয়োজনমুক্ত করে দিলেন।’^{৭০৪}

(তিনি কোনো পথে মহিলাটির সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করলেন) : হাদিসের এই অংশের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি ﷺ বলেন, ‘তিনি চলার পথে মহিলাটির জন্য দাঁড়ালেন, যেন তার প্রয়োজন পূরণ করে দিতে পারেন এবং গোপনে তাকে সমাধান শুনিতে পারেন।

এটা গাইরে মাহরাম মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বনের পর্যায়ে পড়ে না। কেননা, এই সাক্ষাৎ সংঘটিত হয়েছে মানুষের চলার পথে। মানুষজন রাসুল ﷺ ও মহিলাটিকে দেখতে পাচ্ছিল। শুধু তাদের কথা শোনা যাচ্ছিল না এই যা! কারণ, মহিলার উক্ত ব্যাপারটি প্রকাশ করার মতো ছিল না। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।’^{৭০৫}

৭০৪. সহিহ মুসলিম : ২৩২৬।

৭০৫. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৫/৮৩।

এই ঘটনা রাসুল ﷺ-এর সহনশীলতা ও বিনয়ের প্রমাণ বহন করে এবং প্রয়োজনস্থদের প্রয়োজন পূরণে তাঁর অতুলনীয় ধৈর্যের সাক্ষ্য দেয়।

অন্ধ ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সতর্ক করেন

একাধিক মুফাসসির উল্লেখ করেছেন, ‘রাসুল ﷺ একদিন কুরাইশের এক শীর্ষস্থানীয় লোকের সাথে কথা বলছিলেন এবং তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। তখনই সেখানে ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ আগমন করলেন। তিনি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এসেই তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন এবং উত্তর জানতে খুব পীড়াপীড়ি করলেন। এদিকে রাসুল ﷺ কুরাইশ লোকটার হিদায়াতের আশা করছিলেন বিধায় তিনি চাইছিলেন ইবনে উম্মে মাকতুম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুক, যাতে তিনি লোকটার সাথে স্থিরমনে কথা বলতে পারেন। ফলে ইবনে উম্মে মাকতুমের আচরণে তাঁর দ্রুত ক্ষোভ হলো এবং তিনি মুখ ফিরিয়ে লোকটার প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করলেন :

عَبَسَ وَتَوَلَّى - أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى - وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى - أَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى - أَمَّا مَنْ اسْتَعْجَى - فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى - وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا
يَزَّكَّى - وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى - وَهُوَ يَخْشَى - فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى

“তিনি দ্রুত ক্ষোভ করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো (তার আত্মিক পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জিত হতো), অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ তার উপকার হতো (এই উপকার তাকে হারাম কর্ম থেকে বিরত রাখত)। পরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগুল (যেন সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়)। সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দোষ নেই (তার পরিশুদ্ধি না হলে আপনি জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন না)। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে (অর্থাৎ আপনার

কথার দ্বারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আসলো), আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।”^{৭০৬}

সেদিন থেকে আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-কে নির্দেশ দিলেন, কাউকে যেন বিশেষভাবে ভীতিপ্রদর্শন না করেন। বরং উপদেশদান ও ভীতিপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে অভিজাত বংশ ও নিম্ন বংশ, ধনী ও গরিব, মনিব ও গোলাম, পুরুষ ও মহিলা, ছোট ও বড়—সবার মাঝে যেন সমতা বিধান করেন। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সিরাতে মুসতাকিমের ওপর পরিচালিত করবেন। তাঁর কাছেই আছে চূড়ান্ত প্রজ্ঞা ও অকাট্য দলিল।^{৭০৭}

এর পর থেকে রাসুল ﷺ তাকে সম্মান করতেন।

আয়িশা রাঃ বলেন :

أُنْزِلَ: {عَبَسَ وَتَوَلَّى} فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْشِدْنِي، وَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخِرِ، وَيَقُولُ: أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا؟ فَيَقُولُ: لَا، فَبِي هَذَا أُنْزِلَ.

““আবাসা” সুরাটি ইবনে উম্মে মাকতুম রাঃ প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছিল। তিনি একবার রাসুল সঃ-এর কাছে এসে বলতে লাগলেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, আমাকে সঠিক পথ-নির্দেশ দান করুন। তখন রাসুল সঃ-এর কাছে মুশরিকদের শীর্ষস্থানীয় এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তাই তিনি তাকে উপেক্ষা করে অন্য একজনের দিকে মনোযোগী হয়ে লোকটিকে বলেছিলেন, “আপনি আমার বক্তব্যে দোষের কিছু দেখেছেন কি?” লোকটি বলেছিল, “না।” এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুরাটি নাজিল হয়।”^{৭০৮}

৭০৬. সুরা আবাসা, ৮০ : ১-১০।

৭০৭. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/৫৬৮।

৭০৮. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৩১।

তাদের জন্য সব বিষয় সহজ করে দিতেন

জাইদ বিন সাবিত রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ তাকে দিয়ে ওহির এই অংশটুকু লেখান : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...) : ‘যেসব মুমিন ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, তারা সমান নয় ... ।’ রাসুলুল্লাহ সঃ যখন আমাকে দিয়ে এই আয়াতটি লেখাচ্ছিলেন, তখন ইবনে উম্মে মাকতুম সেখানে এলেন। তিনি বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, সামর্থ্য থাকলে আমি অবশ্যই জিহাদ করতাম।” তিনি অন্ধ ছিলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা রাসুল সঃ-এর ওপর ওহি নাজিল করলেন। তখন তাঁর উরু ছিল আমার উরুর ওপর। তাঁর উরু মুবারক আমার এতটা ভারী অনুভূত হলো— আমার আশঙ্কা হলো যে, আমার উরু থেঁতলে যাবে। তারপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো (অর্থাৎ ওহি অবতরণ শেষ হলো)। আল্লাহ তাআলা নাজিল^{৭০৯} করলেন : (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) — “যাদের কোনো ওজর নেই।”^{৭১০}

বিশেষ বিশেষ সমস্যাগ্রস্তদের জন্য বিধান কিছুটা সহজ করে আল্লাহ ইরশাদ করেন :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

‘অন্ধের জন্য, খোঁড়ার জন্য ও রুগ্নের জন্য কোনো অপরাধ নেই এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত্য করবে, তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।’^{৭১১}

৭০৯. এই অংশটুকু নাজিল হওয়ার পর পুরো আয়াতটি দাঁড়ালো—(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...) (الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...) ‘যেসব ইমানদার অক্ষম নয়, অথচ ঘরে বসে থাকে, তারা এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা সমান হতে পারে না ... ।’ (অনুবাদক)

৭১০. সহিহুল বুখারি : ২৮৩২, সহিহ মুসলিম : ১৮৯৮।

৭১১. সূরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ১৭।

সুতরাং জিহাদের বাধ্যবাধকতা তাদের জন্য আর প্রযোজ্য রইল না। তবে তাদের কেউ স্বেচ্ছায় জিহাদ করতে চাইলে রাসুল ﷺ বারণ করতেন না।

বনু সালামার কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, ‘আমর বিন জামুহ ﷺ মারাত্মক পর্যায়ে খোঁড়া ছিলেন। তার সিংহের মতো চারজন ছেলে ছিলেন, যারা রাসুল ﷺ-এর সাথে বিভিন্ন অভিযানে শরিক হতেন। উহুদ যুদ্ধের ডাক এলে তার সন্তানরা তাকে যুদ্ধে যেতে বাধা দিতে চাইল। তারা বললেন, “আল্লাহ তাআলা আপনাকে সামর্থ্য দেননি।” তখন তিনি রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, “আমার ছেলেরা আমাকে এই অভিযান ও আপনার সাথে বের হতে বাধা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহর কসম, আমি আমার এই খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতের দিকে এগোতে চাই।” তখন রাসুল ﷺ বললেন :

أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ عَذَرَكَ اللَّهُ، فَلَا جِهَادَ عَلَيْكَ

“তোমাকে আল্লাহ তাআলা অপারগ করেছেন, সুতরাং তোমার ওপর জিহাদ করা বাধ্যতামূলক নয়।”

আর তার ছেলদের বললেন :

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَمْنَعُوهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ

“তাকে বাধা না দিলে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না। হয়তো আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাত নসিব করবেন।”

অতঃপর তিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে বের হলেন এবং উহুদ যুদ্ধে শহিদ হলেন।^{৭১২}

আবু কাতাদাহ ﷺ বর্ণনা করেন, ‘আমর বিন জামুহ ﷺ রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যদি আল্লাহর পথে কিতাল করে শহিদ হয়ে যাই, তখন জান্নাতে সুস্থ পা (তিনি খোঁড়া ছিলেন) নিয়ে চলতে পারব?” রাসুল ﷺ বললেন, “হ্যাঁ।” অতঃপর উহুদের দিনে তিনি তার ভাইপো ও গোলামসহ শহিদ হয়ে গেলেন। এরপর তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আমি যেন তোমাকে সুস্থ পা নিয়ে জান্নাতে বিচরণ করতে দেখছি।”^{৭১৩}

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা সমাজের লোকদেরকে তাদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ, সমাজ যদি খাওয়া-দাওয়া ও মেলামেশা করার ক্ষেত্রে তাদের এড়িয়ে চলে, তখন তারা মানসিকভাবে কষ্ট পাবে। এ জন্য তাদের সাথে মেলামেশা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ...

‘অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে...’^{৭১৪}

ইবনে জারির رحمته বলেন, ‘এই আয়াতের তাফসিরে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারও মতে, এই আয়াতে মুসলমানদেরকে অন্ধ, খোঁড়া, রোগী ইত্যাদি শ্রেণির সাথে খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কারণ, মুসলমানরা তাদের সাথে খাওয়া থেকে বিরত থাকত এই ভেবে যে, তাদের সাথে খেলে তাদের অংশের খানাও খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা কুরআনে নিষেধ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“হে ইমানদারগণ, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ।”^{৭১৫-৭১৬}

৭১৩. মুসনাদু আহমাদ : ২২৬০।

৭১৪. সূরা আন-নুর : ৬১।

৭১৫. সূরা আন-নিসা : ২৯।

৭১৬. তাফসিরু ইবনি জারির : ১৯/২১৯।

জাহহাক ﷺ বলেন, ‘নবুওয়াতের পূর্বে মদিনাবাসী অন্ধ ও রোগীদের সাথে একসাথে বসে খাবার খেত না। কেউ কেউ বলত, তাদের সাথে ময়লা-আবর্জনা ও ঘৃণিত বিষয় থাকে (তাই তাদের সাথে খাওয়া যাবে না)। আর কেউ বলত, ‘অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির মতো পূর্ণভাবে খাবার খেতে পারে না, খোঁড়া ব্যক্তি খাওয়া-দাওয়ার সময়কার ভিড় সহ্য করতে পারে না এবং অন্ধ ব্যক্তি ভালো খাবার দেখতে পায় না (এ জন্য তাদের সাথে একসাথে খেলে খাবারের পরিমাণে তারতম্য হয়ে তাদের ওপর জুলুম হতে পারে)।

তখন আব্বাহ তাআলা নাজিল করলেন :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

“তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই।”^{৭১৭}

অর্থাৎ অসুস্থ, অন্ধ ও খোঁড়াদের সাথে একসাথে খেতে কোনো সমস্যা নেই।^{৭১৮}

তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতেন

উহুদ যুদ্ধের সময় রাসুল ﷺ মদিনার বাইরে গিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, না মদিনার ভেতর থেকে তাদের প্রতিহত করবে—এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। অতঃপর এক হাজার সাহাবি নিয়ে মদিনার বাইরে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন মদিনায় যারা অবশিষ্ট ছিলেন, তাদের নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব অর্পণ করলেন আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ﷺ-এর কাঁধে।^{৭১৯}

রাসুল ﷺ একাধিকবার আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ﷺ-কে মদিনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন, যেন তিনি মদিনার লোকদের নিয়ে ইমামতি করেন।

৭১৭. সুরা আন-নুর : ৬১।

৭১৮. তাফসিরু ইবনি জারির : ১৯/২১৯।

৭১৯. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৬৩।

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বর্ণনা করেন, ‘রাসুল ﷺ ইবনে উম্মে মাকতুম رضي الله عنه-কে দুবার মদিনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন, যেন তিনি লোকদের নিয়ে নামাজ পড়েন। অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ।’^{৭২০}

রমাজান মাসে আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুমকে দ্বিতীয় আজানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন

আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بَلِيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

‘বিলাল রাতে আজান দেয়। তাই (সে আজান দিলেও) তোমরা খানাপিনা করতে পারবে, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আজান দেয়।’ অতঃপর ইবনে উমর رضي الله عنه বলেন, ‘তিনি (ইবনে উম্মে মাকতুম) ছিলেন অন্ধ। এবং তিনি তখনই আজান দিতেন, যখন তাকে বলা হতো, “ফজর হয়েছে, ফজর হয়েছে।”’^{৭২১}

আয়িশা رضي الله عنها বলেন, ‘ইবনে উম্মে মাকতুম رضي الله عنه রাসুল ﷺ-এর জন্য আজান দিতেন। আর তিনি ছিলেন অন্ধ।’^{৭২২}

আরেক রিওয়াযাতে আছে, ‘ইবনে উম্মে মাকতুম رضي الله عنه রাসুল ﷺ-এর মুয়াজ্জিন ছিলেন। আর তিনি ছিলেন অন্ধ।’^{৭২৩}

প্রতিবন্ধীদের শক্তি কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া দেখুন। একজন অন্ধ ব্যক্তি আজান দিয়েছেন, ইমামতি করেছেন এবং ইমারতের শাসনভার সামলেছেন।

৭২০. সুনানু আবি দাউদ : ২৯৩১, মুসনাদু আহমাদ : ১১৯৩৫।

৭২১. সহিহুল বুখারি : ৬১৭, সহিহ মুসলিম : ১০৯২।

৭২২. সহিহ মুসলিম : ৩৮১।

৭২৩. সুনানু আবি দাউদ : ৫৩৫।

তাদের কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করতেন

ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণিত, রাসূল স ইরশাদ করেছেন :

مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ،
مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تَحُومَ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ،
مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

‘যে নিজের পিতাকে গালি দেয়, সে অভিশপ্ত; যে নিজের মাতাকে গালি দেয়, সে অভিশপ্ত; যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য পশু জবাই করে, সে অভিশপ্ত; যে জমিনের চিহ্ন ও সীমা পরিবর্তন করে, সে অভিশপ্ত; যে অন্ধকে ভুল পথ দেখায়, সে অভিশপ্ত; যে জন্তুর সাথে ব্যভিচার করে, সে অভিশপ্ত এবং যে লুত রা-এর সম্প্রদায়ের মতো কাজ (সমকামিতা) করে, সে অভিশপ্ত।’^{৭২৪}

প্রতিবন্ধীদের অসিলায় আল্লাহর সাহায্য আসে

সাদ রা অধীনস্থদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে রাসূল স তাকে বললেন :

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ

‘তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং রিজিক দেওয়া হয় কেবল তোমাদের দুর্বল শ্রেণির লোকদের বদৌলতে।’^{৭২৫}

এ হাদিস থেকে বোঝা গেল, সমাজে দুর্বল, নিঃস্ব ও অসহায় লোকদের উপস্থিতি সমাজের জন্য বিরাট রহমত ও আশীর্বাদ। তারা সমাজে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ প্রবেশ করার দরোজাস্বরূপ। তাদের সাথে সদাচরণ, তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও তাদের সহায়তা করার মাধ্যমে এ কল্যাণ অর্জিত হয়। এ ছাড়াও এই দুর্বল শ্রেণির দোয়া মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রহমত, সাফল্য ও মর্যাদা বয়ে আনে।

৭২৪. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৭৫।

৭২৫. সহিহুল বুখারি : ২৮৯৬।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বোকামি ক্ষমা করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষমা ও সহনশীলতার অনুপম নুমনা পাওয়া যায় এই ঘটনায় :

‘একদা সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাসুল ﷺ কোনো অভিযানে যাচ্ছিলেন। মারবাবিন কাইজি নামক জনৈক অন্ধ মুনাফিকের শস্যখেত হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। তার দেওয়াল অতিক্রম করার সময় সে বলল, “হে মুহাম্মাদ, তুমি যদি নবি হও (নবি হওয়ার দাবি করো), তবে তোমাকে আমার দেওয়াল অতিক্রম করার অনুমতি দেবো না।” একমুষ্টি মাটি নিয়ে সে বলল, “আল্লাহর কসম, আমি যদি জানতাম, এই মাটি শুধু তোমার ওপরই পড়বে, তখন আমি তা তোমার প্রতি ছুড়ে মারতাম।”

তার এ ঔদ্ধত্য দেখে সাহাবিগণ তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন :

دعوه، فهذا الأعمى، أعمى القلب، أعمى البصيرة

“তাকে ছেড়ে দাও। বেচারার কলব ও চোখ দুটোই অন্ধ।”^{৭২৬}

রাসুল ﷺ তাকে হত্যা করার আদেশ দেননি। এমনকি, তাকে সামান্য কষ্টও দেননি। অথচ তখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তাদের মাঝে জিহাদি জজবা ও উত্তেজনা তখন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

এর কারণ হলো, প্রতিবন্ধী ও দুর্বল শ্রেণির লোকদের ওপর শক্তি প্রদর্শন করা মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর শান নয়।

প্রতিবন্ধীদের দেখে শিক্ষাগ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন

রাসুল ﷺ উম্মাহকে শিক্ষা দিয়েছেন, যখন কোনো প্রতিবন্ধী ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি চোখের সামনে পড়বে, তখন নিজের সুস্থতার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে।

উমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه বর্ণনা করেন, ‘রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্তকে দেখে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে, আল্লাহ তাকে ওই বিপদ থেকে মুক্ত রাখবেন—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ
تَفْضِيلًا

“প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে সেই বিপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যে বিপদে তুমি পতিত হয়েছ এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।”^{৭২৭}

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে সেই বিপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যে বিপদে তুমি তুমি পতিত হয়েছ’—শুকরিয়া করার কারণ হলো, নিরাপত্তা দুর্দশার চেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ, দুর্দশায় অস্থিরতা ও ফিতনার আশঙ্কা থাকে। তখন বিপদটি আরও বড় বিপদের রূপ নেয়। এ ছাড়াও আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন প্রিয়।

‘আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন’—অর্থাৎ দীন, দুনিয়া, হৃদয় ও দেহের দিক দিয়ে অনেকের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।^{৭২৮}

উলামায়ে কিরাম বলেন, ‘এই দোয়া নিম্ন আওয়াজে পড়া উচিত, যেন বিপদগ্রস্ত লোক তা শুনতে না পায়।’^{৭২৯}

তবে বিপদটা যদি দীন-সম্পর্কিত হয়, যেমন : কেউ পাপিষ্ট ব্যক্তিকে পাপাচারে লিপ্ত দেখলে তখন দোয়াটি তার সামনে উচ্চ আওয়াজে পড়বে। এটা তাকে তিরস্কার করা ও মন্দকর্ম থেকে বাধা দেওয়ার পর্যায়ভুক্ত হবে।

আমাদের অবশ্যই জানতে হবে—প্রকৃত প্রতিবন্ধী হলো আল্লাহকে অস্বীকারকারী কাফির।

৭২৭. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৩১।

৭২৮. তুফফাতুল আহওয়াজি : ৯/২৭৫।

৭২৯. আল্লামা মুনাবি কৃত ফাইজুল কাদির : ৬/১৩০।

কেননা, আল্লাহ তাআলা তাকে কান, চোখ ও অন্তর দান করেছেন, যেন আল্লাহর প্রতি ইমান আনে, তাঁর ইবাদত করে এবং সিরাতে মুসতাকিমের ওপর চলে। কিন্তু সে সবকিছুকে বেকার করে দিয়ে সেই আল্লাহকে অস্বীকার করে বসেছে, যিনি তাকে যথার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন; তাকে কান, চোখ ও অন্তর দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ
كَأَلَّا نَعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

‘আর আমি সৃষ্টি করেছি দোজখের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না; তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না; আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফিল।’^{৭৩০}

কাফিরের অবস্থাও ঠিক এমনই। তার কান, চোখ ও অন্তর সবই বেকার। এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে সে পশুর মতো পানাহার ও যৌনসংগম ছাড়া কিছুই করতে পারে না।

পক্ষান্তরে মুমিন তার আল্লাহ-প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করে।

তাই তো বলি, প্রকৃত অন্ধ সে নয়, যার দৃষ্টিশক্তি নেই। বরং প্রকৃত অন্ধ তো সে, যার মাঝে অন্তর্দৃষ্টি ও ইমান নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

‘বস্তুত, চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বন্ধস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।’^{৭৩১}

৭৩০. সূরা আল-আরাফ, ৭ : ১৭৯।

৭৩১. সূরা আল-হাজ, ২২ : ৪৬।

এ অন্ধত্ব দ্বীন সম্পর্কে অন্ধত্ব। সত্যকে দেখতে না পাওয়ার অন্ধত্ব। যেভাবে অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু দেখতে পায় না, তেমনই অন্তর্দৃষ্টিহীন ব্যক্তি দ্বীনের সত্যতা দেখতে পায় না। পক্ষান্তরে যার চোখ অন্ধ, সে পার্থিব উপকার থেকে কিছুটা বঞ্চিত থাকলেও (দ্বীন গ্রহণ করলে) আখিরাতের সমূহ উপকার লাভ করতে পারে।^{৭৩২}

إذا أبصر القلب المروءة والتقى * فإن عمى العينين ليس يضير

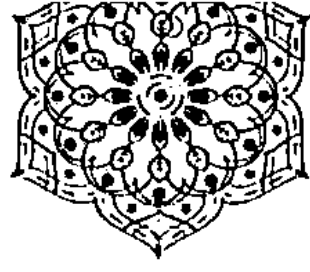
‘অন্তরে যদি মনুষ্যত্ব ও তাকওয়ার দৃষ্টি থাকে, তখন চোখের দৃষ্টিহীনতা কোনো সমস্যাই নয়।’

খোঁড়া ও অচল ব্যক্তি সেই ব্যক্তির চেয়ে হাজার গুণ বেশি উত্তম, যার হাত-পা সুস্থ ও সবল, কিন্তু তার সাহায্যে সে আল্লাহর নাফরমানি করে এবং শয়তানকে সহায়তা করে।

আমরা যদি দৃষ্টিহীন ও ভদ্রতাহীন মানুষের মাঝে এবং হাত-পাবিহীন ও চরিত্রহীন মানুষের মাঝে তুলনা করি, তখন উভয়ের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য দেখতে পাব।

শারীরিক প্রতিবন্ধী এই ভেবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারে যে, আল্লাহ তাকে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বানানটি, ইমান থেকে মাহরুম করেননি।





❖ [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ] ❖

বিপদগ্রস্তদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

আল্লাহর অসীম প্রজ্ঞার দাবি হলো, মানুষের পার্থিব জীবন কষ্ট ও দুর্দশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে না। কেননা,

طبع على كدر، وأنت تريدها ** صفوا من الأقداء والأكدار

‘দুঃখ-দুর্দশাকে মানুষের স্বভাবের অংশ করা হয়েছে, অথচ তুমি তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে চাও। এ কী করে সম্ভব?’

যে ব্যক্তি দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকতে চায়, সে আসলে আল্লাহর হুকুমের সামনে বাধ্য হওয়া ও তাঁর তাকদিরের প্রতি সমর্পিত হওয়ার বিষয়টি বোঝে না।

যাহোক, মানুষ বলতে সে অবশ্যই বিপদের সম্মুখীন হবে। এ বিপদ আসতে পারে তার সম্পদের ওপর, তার শরীরের ওপর কিংবা তার সন্তানসন্ততির ওপর।

আর বিপদগ্রস্তের জন্য সবচেয়ে উপকারী বিষয় হলো, অন্যান্য বিপদগ্রস্তকে দেখে সান্ত্বনা অনুভব করা এবং এটা জানা যে, প্রত্যেক বাড়িতে বিপদগ্রস্ত রয়েছে। চোখ বোলালেই দেখতে পাওয়া যায় কোনো না কোনো বিপদগ্রস্তকে। কেউ প্রিয় বস্তু হারিয়ে ফেলে বিপদে, কেউ অপ্রিয় বিষয়ে জড়িত হওয়ায় বিপদে।

فيوم علينا، ويوم لنا *** ويوم نساء، ويوم نسر

‘একদিন আমাদের বিরুদ্ধে যায়, আরেকদিন যায় আমাদের পক্ষে। একদিন আমরা দুঃখভারাক্রান্ত থাকি, আরেকদিন থাকি আনন্দে আটখানা হয়ে।’

এ জন্য আমাদের জন্য অত্যধিক জরুরি হলো, রাসুল ﷺ বিপদগ্রস্তদের সাথে কীরূপ আচরণ করতেন, তা জেনে নেওয়া।

আল্লাহ তাআলা কারও কল্যাণ চাইলে তাকে বিপদে ফেলেন

আবু হুরাইরা রা থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

‘আল্লাহ তাআলা কারও কল্যাণ চাইলে তাকে বিপদ দেন।’^{৭৩৩}

আবু ওয়ালিদ সুলাইমান আল-বাজি রা বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা রোগ দান করেন, যা তার সুস্থতার ওপর প্রভাব ফেলে; তার সম্পদ নিয়ে নেন, যা তার প্রাচুর্যের ওপর প্রভাব ফেলে; তাকে চিন্তা দান করেন, যা তার খুশির ওপর প্রভাব ফেলে; তাকে অসচ্ছলতা দান করেন, যা তার সচ্ছলতার ওপর প্রভাব ফেলে। এরপর যখন সে সবর করে এবং আল্লাহর নিকট তার বিনিময়ের আশা রাখে, তখন এটাই সেই কল্যাণের কারণ হয়, যা তার জন্য আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেছেন।’^{৭৩৪}

আনাস বিন মালিক রা থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ،
فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

‘বিপদ যত বড়, প্রতিদানও তত বড়। আর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদের বিপদে আক্রান্ত করেন। যে বিপদের ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে; আর যে তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করবে।’^{৭৩৫}

৭৩৩. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪৫।

৭৩৪. আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা : ৪/৩৫৭।

৭৩৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৩১।

অর্থাৎ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিপদের প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করবে, সে প্রতিদান হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বড় সাওয়াব লাভ করবে। আর যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিপদকে অপছন্দ করবে, অস্থিরতা প্রকাশ করবে এবং আল্লাহর ফয়সালার ওপর অসন্তুষ্ট হবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ, কেউ খারাপ কাজ করলে তার কর্মফল ভোগ করতে হয়।

হাদিসে বিপদে পতিত হওয়ার পর সবর করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।^{৭৩৬}

হারাবি رحمہ اللہ বলেন, ‘অন্যতম নেক আমল হলো বিপদকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখা, যেন মানুষ মনে করে তার ওপর কখনো কোনো বিপদই আসেনি।’^{৭৩৭}

বিপদগ্রস্ত হওয়ার প্রথম দিনেই বুদ্ধিমান লোক সেই কাজটি (সবর) করে, যা নির্বোধ কয়েকদিন পরে করে। আর যে বুদ্ধিমানদের মতো (প্রথম দিনেই) ধৈর্য ধরে না, সে চতুষ্পদ জন্তুদের মতো বিপদ কেটে যাওয়ার মানসিক সুখ ছাড়া আর কিছুই পায় না।^{৭৩৮}

أتصبر للبلوى عزاء وحسبة *** فتؤجر، أم تسلو سلو البهائم؟

‘বিপদের প্রতিদান চেয়ে যদি সবর করো, তবে তোমাকে সাওয়াব দেওয়া হবে। অন্যথায় (বিপদ কেটে যাওয়ার পর) চতুষ্পদ জন্তুদের মতো সন্তুষ্টি লাভ করা ছাড়া কিছুই পাবে না তুমি।’

বিপদাপন্ন ব্যক্তির সহমর্মী হতেন এবং সবরের উপদেশ দিতেন

উসামা বিন জাইদ رحمہ اللہ বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক কন্যা (জাইনাব) তাঁর কাছে এই খবর দিয়ে লোক পাঠালেন—আমার এক পুত্র মরণাপন্ন; আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাঁকে) আমার সালাম দেবে এবং বলবে :

৭৩৬. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/৬৬।

৭৩৭. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ১৭।

৭৩৮. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৯।

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. فَلْتَصْبِرْ
وَلْتَحْتَسِبْ

“আল্লাহ যা কেড়ে নেন আর যা দান করেন—সব তাঁরই অধিকারে।
তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। কাজেই, সে
যেন ধৈর্যধারণ করে এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখে।”

তিনি (জাইনাব) আল্লাহর কসম দিয়ে আবার লোক পাঠালেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ
যেন তার কাছে অবশ্যই আগমন করেন। এবার রাসুলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন।
তাঁর সাথে ছিলেন সাদ বিন উবাদা, মুআজ বিন জাবাল, উবাই বিন কাব,
জাইদ বিন সাবিত ؓ-সহ আরও কতিপয় সাহাবি। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে
শিশুটিকে তুলে দেওয়া হলো। সে তখন অস্থির হয়ে হাত-পা ছুড়ছিল। তার
শ্বাস পুরাতন মশকে পানি ঢালার মতো শব্দ করছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুচোখ
বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। সাদ ؓ বললেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, এ কী? আপনি
কাঁদছেন!” তিনি বললেন :

هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ
الرُّحَمَاءَ

“এ হলো রহমত! যা আল্লাহ তার বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রাখেন।
আর আল্লাহ তো কেবল তাঁর দয়ালু বান্দাদেরই রহম করেন।”^{৭৩৯}

‘আল্লাহ যা কেড়ে নেন আর যা দান করেন—সব তাঁরই অধিকারে। তাঁর
কাজেই, সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখে।’—এই কথাগুলো বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ
জাইনাব ؓ-কে সবরের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি
সন্তুষ্ট থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

রাসুল ﷺ-এর কথার মর্মার্থ হচ্ছে, ‘তোমাদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে, তা
মূলত তোমাদের নয়। তাই আল্লাহর নিয়ামত আল্লাহ নিয়ে নিয়েছেন। তাই

কারও কাছে রাখা আমানত বা ধারের বস্তু মূল মালিক ফেরত চাইলে দুঃখবোধ করা বা অধৈর্য হওয়ার কিছু নেই।^{৭৪০}

► হাদিসের কতিপয় লক্ষণীয় বিষয় :

- মৃত্যুপথযাত্রী লোকের শিয়রে কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তিকে ডেনে আনা বৈধ।
- উপস্থিত হওয়ার জন্য আল্লাহর নামে কসম দেওয়াও বৈধ।
- স্বজনহারাকে সান্ত্বনা দিতে এবং রোগী দেখার জন্য নিমন্ত্রণ ব্যতীত যাওয়া বৈধ। তবে অলিমার দাওয়াতে নিমন্ত্রণ ছাড়া যাওয়া জায়িজ নয়।
- কেউ কসম দিয়ে আবেদন করলে তা পূরণ করা মুসতাহাব।
- বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু আসার পূর্বে সবার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে।
- কাউকে ডাকলে তাকে ডাকার কারণ জানিয়ে দেওয়া।
- কথা বলার পূর্বেই সালাম দিতে হবে।
- রোগী নিম্ন স্তরের হোক বা ছোট বাচ্চা হোক, তাকে দেখতে যাওয়া।
- অনুসারীর মনে সর্দার বা নেতার কোনো কথা বা কাজে সন্দেহ হলে তা জিজ্ঞেস করা।
- প্রশ্ন করার সময় আদব বজায় রাখা। কেননা, প্রশ্ন করার পূর্বে তিনি ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ’ বলে শুরু করেছেন।
- আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও করুণা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।
- হৃদয়ের কঠোরতা ও চোখ অশ্রুহীন হওয়ার প্রতি অনুৎসাহিত করা হয়েছে।
- বিলাপ না করে কান্না করা বৈধ।^{৭৪১}

৭৪০. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৬/২২৬।

৭৪১. ফাতহুল বারি : ৩/১৫৮।

তাদের সবরের পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বর্ণনা করেন :

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى»

‘নবিজি ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। রাসুল ﷺ বললেন, “তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং সবর করো।” মহিলাটি বলল, “আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনার ওপর তো আমার মতো মুসিবত আসেনি।” সে নবিজি ﷺ-কে চিনতে পারেনি (বিধায় এমন কথা বলেছে)। পরে তাকে বলা হলো, তিনি নবিজি ﷺ। তখন সে নবিজির দরোজায় হাজির হলো। সেখানে কোনো পাহারাদার পেল না। সে আরজ করল, “আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।” নবিজি ﷺ বললেন, “সবর তো বিপদের প্রথম অবস্থাতেই।”^{৭৪২}

খাত্তাবি رضي الله عنه বলেন, ‘এর অর্থ হলো, যে সবরের কারণে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি প্রশংসিত হয়, তা হচ্ছে সেই সবর, যা বিপদ আসার সাথে সাথে করা হয়। পরে সবর করলে তা প্রশংসিত সবর হবে না। কেননা, দিন কয়েক অতিবাহিত হলে এমনিতেই মানুষ সবর করতে শুরু করে।’^{৭৪৩} এ জন্যই বলা হয়, ‘প্রত্যেক বিষয় ছোট অবস্থায় শুরু হয়ে পরে বড় হয়; কিন্তু মুসিবত বড় অবস্থায় শুরু হয়ে আস্তে আস্তে ছোট হয়।’

لا تجزعن إذا بليت بشدة *** إن الشدائد لا يدوم مقامها

৭৪২. সহিহুল বুখারি : ১২৮৩, সহিহ মুসলিম : ৯২৬।

৭৪৩. ফাতহুল বারি : ৩/১৫০।

كم شدة نام الفتى لورودها *** ما هب حتى أدبرت أيامها

فاصبر على نوب الزمان فإنها *** تمضى، ويبقى بردها وسلامها

‘কঠিন বিপদে আক্রান্ত হলে অস্থির হয়ে পড়ো না। কেননা, বিপদ স্থায়ী হয় না। অনেক বিপদ যুবক ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। বিপদের দিনসমূহ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত জাঘত হয় না। সুতরাং সময়ের বিপদ ও দুর্দশার ওপর ধৈর্য ধরো। কারণ, তা শেষ হয়ে যাবে। বাকি থাকবে তার স্নিগ্ধতা ও নিরাপত্তা।’

জাইন বিন মুনির  বলেন, ‘মহিলাকে এই বলে উত্তর দেওয়ার ফায়দা হলো, তিনি যখন রাসুল -এর তাকওয়া ও সবর অবলম্বনের নির্দেশ মানার জন্য এবং পূর্বের কথার অজুহাত পেশ করতে এলেন, তখন রাসুল  তাকে জানিয়ে দিলেন, সবর প্রথম অবস্থাতেই করা উচিত ছিল। তাহলেই সবরের কারণে সাওয়াব দান করা হতো।’^{৭৪৪}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- রাসুল -এর বিনয় এবং মূর্খদের প্রতি তাঁর কোমলতা।
- বিপদগ্রস্তকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং তার কৈফিয়ত কবুল করা।
- প্রত্যেককে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা বাধ্যতামূলক।
- মর্যাদাবান ব্যক্তির সাথে অনিচ্ছায় বেয়াদবি হয়ে গেলে কৈফিয়ত পেশ করা।
- বিচারকের জন্য বাসার দরোজায় এমন কাউকে রাখা উচিত নয়, যার কারণে সাধারণ মানুষের বিচার নিয়ে আসতে সমস্যা হয়। জনসাধারণ যেন সহজেই বিচারকের কাছে মুকাদামা পেশ করতে পারে।
- কেউ সৎ কাজের আদেশ করলে তা মানা উচিত, যদিও আদেশকারী অপরিচিত হয়।

- বিপদের সময় অস্থিরতা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। এ জন্য রাসুল ﷺ মহিলাকে সবরের সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।
- নসিহত করার সময় কষ্ট সহ্য করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া চাই।

বিপদগ্রস্তকে সবরের পুরস্কারের কথা জানিয়ে দিতেন

কুররা বিন ইয়াস ﷺ বর্ণনা করেন, ‘রাসুল ﷺ যখন মজলিসে বসতেন, তখন সাহাবিদের অনেকে তাঁর কাছে এসে বসতেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অল্লবয়স্ক একটি ছেলে ছিল। তিনি ছেলেটিকে পিঠের ওপর করে নিয়ে আসতেন এবং নিজের সামনে বসাতেন। রাসুল ﷺ তাকে বললেন, “তাকে কি ভালোবাসো?” তিনি বললেন, “আমি তাকে যে পরিমাণ ভালোবাসি, সে পরিমাণ আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসুন।” একদিন ছেলেটি মৃত্যুবরণ করল। এরপর থেকে তিনি মজলিসে উপস্থিত হতে পারতেন না। কেননা, মজলিসে সন্তানের কথা মনে পড়ত আর তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়তেন। রাসুল ﷺ তাকে না দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “অমুক ব্যক্তিকে কেন দেখছি না?” সাহাবিগণ বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি তার যে ছোট ছেলেটিকে দেখতেন, তার মৃত্যু হয়েছে।” পরে তার সাথে সাক্ষাৎ করে রাসুল ﷺ তার ছেলের ব্যাপারে জানতে চাইলে তাঁকে জানালেন, ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন :

يَا فُلَانُ، أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمْرَكَ، أَوْ لَا تَأْتِيَ غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ

“হে অমুক, তোমার কাছে কোনটি পছন্দনীয়—ছেলেটির মাধ্যমে তোমার পার্থিব জীবন সুখময় করা, না কাল কিয়ামতের দিন তুমি জান্নাতের যে দরোজা দিয়েই প্রবেশ করবে, তাকে সেখানে উপস্থিত হয়ে তোমার জন্য দরোজা খুলে দিতে পাওয়া?”

তিনি বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, বরং সে আমার পূর্বে জান্নাতের দরোজায় গিয়ে আমার জন্য দরোজা খুলে দেবে, এটাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।” তিনি বললেন, “তাহলে তা-ই তোমার জন্য হবে।” তখন অন্য

এক ব্যক্তি বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, এই সংবাদ কি বিশেষভাবে তার জন্য, না আমাদের সবার জন্য?” তিনি বললেন, “বরং তোমাদের সবার জন্য।”^{৭৪৫}

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةً
مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلَّا الْجَنَّةَ

‘আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার কোনো নিঃস্বার্থ আপনজনকে যখন আমি মৃত্যু দান করি, আর সে (তার ওপর ধৈর্য ধরে) প্রতিদানের আশা রাখে, তখন আমার কাছে জান্নাতই তার একমাত্র প্রতিদান।”^{৭৪৬}

‘নিঃস্বার্থ আপনজন’—যেমন : সন্তান, ভাই ও সকল প্রিয়জন।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيَّةٍ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ
فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، وَقَالَ: مَا أَمْرِي بِهِ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ

‘পৃথিবীর কোনো প্রিয়জন মারা যাওয়ার পর যখন মুমিন ধৈর্যধারণ করে, সাওয়াবের আশা রাখে এবং আল্লাহ যা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা-ই বলে—তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোনো পুরস্কার দিয়ে সন্তুষ্ট হন না।’^{৭৪৭}

মুআজ বিন জাবাল রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السَّقَطَ، لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا
احْتَسَبَتْهُ

৭৪৫. সুনানুন নাসায়ি : ২০৮৮, মুসনাদু আহমাদ : ১৫১৬৮।

৭৪৬. সহিহুল বুখারি : ৬৪২৪।

৭৪৭. সুনানুন নাসায়ি : ১৮৭১।

‘সেই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ, গর্ভপাত হওয়া মা যদি সন্তান-বিয়োগের কষ্টে সাওয়াবের আশা রাখে, তবে ওই সন্তান তার নাড়ি ধরে তাকে জান্নাতে টেনে নিয়ে যাবে।’^{৭৪৮}

গুরাইহ রাঃ বলেন, ‘আমি যখন কোনো বিপদে পড়ি, তখন চারবার আল্লাহর প্রশংসা করি—

১. যখন বিপদ অধিকতর কঠিন হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হালকা হয়।
২. যখন বিপদের ওপর সবার করার তাওফিকপ্রাপ্ত হই।
৩. যখন ইন্নালিল্লাহ পড়ার তাওফিকপ্রাপ্ত হই, কারণ এর মাধ্যমে সাওয়াবের আশা করা যায়।
৪. যখন বিপদটি আমার দ্বীনের ওপর না হয়।^{৭৪৯}

তাদের গুনাহ মাফের সুসংবাদ দিতেন

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন—

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُؤْمِنُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا

‘মুমিনের জীবনে যত বিপদ আসে, প্রতিটি বিপদের বিনিময়ে তার গুনাহ মাফ করা হয়। এমনটি কাঁটা ফুটলেও।’^{৭৫০}

উম্মুল আলা রাঃ বলেন, ‘আমি অসুস্থ হলে রাসুল সঃ আমাকে দেখতে আসলেন। তখন তিনি বললেন :

أُبَشِّرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ، فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يَذْهَبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ، كَمَا تَذْهَبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

৭৪৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৬০৯।

৭৪৯. গুআবুল ইমান : ৯৯৮০।

৭৫০. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪০, সহিহ মুসলিম : ২৫৭২।

“হে আলার মা, সুসংবাদ গ্রহণ করো, কেননা আগুন যেভাবে সোনা-রূপার ময়লা দূর করে দেয়, তদ্রূপ মহান আল্লাহ রোগের দ্বারা মুমিনের গুনাহসমূহ দূর করে দেন।”^{৭৫১}

মুনজিরি রাঃ বলেন, ‘উম্মে আলা রাঃ হলেন হাকিম বিন হিজাম রাঃ-এর ফুফু। মদিনার যেসব মহিলাগণ রাসুল সঃ-এর হাতে বাইআত হয়েছিলেন, তিনি সেই সৌভাগ্যবতী মহিলাগণের অন্যতম ছিলেন।’^{৭৫২}

তাদের পুরস্কারের সুসংবাদ শোনাতেন

আবু সাইদ খুদরি রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى
وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

‘মুসলমানের ওপর যে সকল যাতনা, রোগব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকর্ষা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।’^{৭৫৩}

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ বলেন, ‘আমি রাসুল সঃ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর শরীরে হাত বুলালাম এবং বললাম, “ইয়া রাসুল্লাহ, আপনার তো খুব জ্বর!” তখন রাসুল সঃ বললেন, “হাঁ, আমি এমন কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হই, যা তোমাদের দুজনের হয়ে থাকে।” আমি বললাম, “এটা কি এ জন্য যে, আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে?” রাসুল সঃ বললেন :

أَجَلٌ، ذَلِكَ كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا
كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

৭৫১. সুনানু আবি দাউদ : ২৬৮৮।

৭৫২. আত-তারগিব ওয়াত তারহিব : ৪/১৪৮।

৭৫৩. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪২, সহিহ মুসলিম : ২৫৭৩।

“হাঁ, ব্যাপারটি এমনই। কেননা, মুসলমান যখন বিপদে আক্রান্ত হয়, চাই একটি কাঁটা বিদ্ধ হওয়া কিংবা আরও ক্ষুদ্র কোনো বিপদই হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মুছে দেন, যেভাবে গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরে যায়।”^{৭৫৪}

বিপদে সবরের বিনিময়ে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আমাদের رضي الله عنه ও তার পরিবারের লোকদের ওপর যখন অত্যাচার চালানো হচ্ছিল, তখন রাসুলুল্লাহ তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন :

أَبْشُرُوا آلَ عِمَارٍ وَآلَ يَاسِرٍ (وَفِي رِوَايَةٍ : صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ) فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةَ

‘আম্মার ও ইয়াসিরের পরিবার, সুসংবাদ গ্রহণ করো (অন্য বর্ণনায় : ইয়াসিরের পরিবার, সবর করো), কেননা এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আছে।’^{৭৫৫}

আতা বিন রাবাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমাকে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, “আমি কি তোমাকে এক জান্নাতি মহিলা দেখাব না?” আমি বলি, “অবশ্যই দেখাবেন।” তিনি বলেন, “এই কৃষ্ণ বর্ণের মহিলাটি, যে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেছিল, “আমি অতর্কিত মৃগীরোগে আক্রান্ত হই এবং আমার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে পড়ে। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।”

তিনি বললেন :

إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكَ

“তুমি যদি চাও, সবর করে জান্নাত লাভ করতে পারো। আর যদি চাও আরোগ্য লাভ করতে, আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি।”

৭৫৪. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪৮, সহিহ মুসলিম : ২৫৭১।

৭৫৫. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৫৬৬৬।

সে বলল, “আমি সবার করব। তবে, আপনি দোয়া করুন, যেন লজ্জাস্থান না খোলে।”

তখন রাসুল ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন।^{৭৫৬}

এ ছাড়াও অন্য এক হাদিসে আছে, ‘দুনিয়ার বিপদাপদের ওপর ধৈর্য ধরলে জান্নাত অর্জিত হয়।’^{৭৫৭}

কবি বলেন :

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت *** ويبتلى الله بعض القوم بالنعم

‘বিপদ যত বড়ই হোক এর মাধ্যমে কখনো আল্লাহ অনুগ্রহ করে থাকেন। আবার কখনো নিয়ামতের মাধ্যমেও আল্লাহ কাউকে পরীক্ষা করেন।’

পুরস্কারের সুসংবাদ শুনিয়ে সান্ত্বনা দান করতেন

আবু সাইদ খুদরি ؓ বলেন, ‘এক মহিলা নবিজি ؓ-এর কাছে এসে বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, আপনার হাদিস তো কেবলমাত্র পুরুষরা শুনে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন, যেদিন আমরা আপনার নিকট আসব, আল্লাহ আপনাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে আপনি আমাদের শিক্ষা দেবেন।” তিনি বললেন, “তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক স্থানে সমবেত হবে।” তারপর (নির্দিষ্ট দিনে) তারা সমবেত হলেন এবং রাসুল ﷺ তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে তাদের শিক্ষা দিলেন এবং বললেন :

مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تَقْدَمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا
مِنَ النَّارِ

৭৫৬. সহিহুল বুখারি : ৫৬৫২. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৬।

৭৫৭. ফাতহুল বারি : ১০/১১৫।

“তোমাদের কেউ যদি তার সন্তানদের মধ্য থেকে তিন সন্তান আগে পাঠিয়ে দেয় (মৃত্যুবরণ করে), তাহলে এ সন্তানরা তার জাহান্নামে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।”

তাদের মধ্য থেকে একজন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, যদি দুজন হয়?” বর্ণনাকারী বলেন, “মহিলা কথাটি পরপর দুবার জিজ্ঞেস করলেন।” তারপর নবিজি ﷺ বললেন, “দুজন হলেও, দুজন হলেও, দুজন হলেও।”^{৭৫৮}

আবু হাসসান ﷺ বলেন, ‘আমি আবু হুরাইরা ﷺ-কে বললাম, “আমার দুটি পুত্র সন্তান মারা গেছে। আপনি কি রাসুল ﷺ-এর তরফ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করবেন, যাতে আমরা মৃতদের ব্যাপারে অন্তরে সান্ত্বনা পেতে পারি?” তিনি বললেন :

نَعَمْ، «صَغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ - فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ قَالَ بِيَدِهِ -، كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنْفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى - أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهِي - حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ»

“হাঁ, তাদের জন্য তাদের ছোট সন্তানরা জান্নাতের প্রজাপতি তুল্য। তাদের কেউ তার পিতার সঙ্গে মিলিত হবে, অথবা (তিনি বলেছেন,) পিতামাতা উভয়ের সাথে মিলিত হবে। এরপর তার পরিধানের বস্ত্র কিংবা হাত ধরবে, যেভাবে এখন আমি তোমার কাপড়ের আঁচল ধরছি। এরপর আর বিরত হবে না, অথবা (তিনি বলেছেন,) এরপর আর ছাড়বে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে এবং তার পিতামাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।”^{৭৫৯}

আবু মুসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبِضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبِضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ

৭৫৮. সহিহুল বুখারি : ১০২, সহিহ মুসলিম : ২৬৩৪।

৭৫৯. সহিহ মুসলিম : ২৬৩৫।

عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمْدَكَ وَاسْتَرجِعْ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

‘যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, “তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করে নিয়ে এসেছ?” তারা বলেন, “হাঁ।” আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা তার হৃদয়ের ফসল কেড়ে নিয়ে এসেছ?” তারা বলেন, “হাঁ।” আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দা কী বলেছে?” তারা বলেন, “সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” পড়েছে।” আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করো এবং তার নামকরণ করো বাইতুল হামদ বা প্রশংসালয়।””^{৭৬০}

বিপদগ্রস্তকে অপেক্ষাকৃত কঠিন বিপদের কথা বলে সান্ত্বনা দিতেন

আয়িশা রা বলেন, ‘রাসুল সা তাঁর ও লোকদের মাঝখানের দরোজা খুলে অথবা পর্দা তুলে দেখলেন যে, লোকজন আরু বকর রা-এর পেছনে নামাজ পড়ছে। তিনি তাদের উক্ত অবস্থায় দেখে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং আশা করলেন যে, আল্লাহ যেন আরু বকর রা-কে তাদের প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন, যেভাবে তিনি তাদের দেখতে পেয়েছেন। এরপর তিনি বললেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ،
فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِإِ عَنِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ
أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي

“হে লোকসকল, কোনো লোকের ওপর অথবা কোনো মুমিনের ওপর বিপদ আসলে সে যেন অপরের ওপর আপতিত বিপদের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে; বরং আমার ওপর আপতিত বিপদের কোনো কথা স্মরণ করে সান্ত্বনা লাভ করে। কেননা, আমার পরে

আমার কোনো উম্মতের ওপর আমার বিপদের তুলনায় কঠিন বিপদ আপতিত হবে না।”^{৭৬১}

কবি বলেন :

واعلم بأن المرأ غير مخلد *** اصبر لكل مصيبة وتجد

فاذكر مصابك بالنبي محمد *** فإذا ذكرت مصيبة تسلوبها

‘প্রতিটি বিপদে ধৈর্য ধরো এবং মনোবল অটুট রাখো। মনে রাখো, কোনো মানুষই এখানে চিরস্থায়ী থাকার জন্য আসেনি। বিপদের স্মরণ বিপদের সময় সাহুনা দেয়। এ ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর ওপর আপতিত বিপদের কথা স্মরণ করাই সবচেয়ে কার্যকর।’

বিপদের সময় কী পড়তে হবে, তা শিক্ষা দিতেন

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ

‘আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, “নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।” তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াতপ্রাপ্ত।’^{৭৬২}

৭৬১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৫৯৯।

৭৬২. সুরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৫৫-১৫৭।

উম্মে সালামা   বলেন, “আমি রাসুল  -কে বলতে শুনেছি—

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: ١٥٦]، اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا

“কোনো মুসলমান যখন বিপদে পতিত হয়, তখন সে যদি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী “ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” বলে এবং এবং এ দোয়া পাঠ করে, “হে আল্লাহ, আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণের সাওয়াব দান করুন এবং এর চেয়ে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করুন।” তবে আল্লাহ তাকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দিয়ে ধন্য করবেন।”

এরপর উম্মে সালামা   বলেন, ‘যখন আবু সালামা  -এর মৃত্যু হলো, তখন আমি বললাম, “আবু সালামা   থেকে উত্তম আর কে হতে পারে? তার পরিবারই প্রথম পরিবার, যারা রাসুল  -এর সাথে হিজরত করেছিল।” কিন্তু তবুও আমি উক্ত দোয়া পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে তার স্থলে রাসুল  -কে দান করলেন।’^{৭৬৩}

বিপদের সময় নিজের ওপর বদদোয়া করতে নিষেধ করতেন

নিজের ও নিজের পরিবারের ওপর বদদোয়া করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। জাবির বিন আব্দুল্লাহ   থেকে বর্ণিত, রাসুল   ইরশাদ করেছেন :

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُؤَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةً نَيْلٌ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ

‘তোমরা নিজেদের ওপর বদদোয়া করো না, তোমাদের সন্তানদের ওপর বদদোয়া করো না, তোমাদের খাদিমদের ওপর বদদোয়া করো না এবং তোমাদের ধনসম্পদের ওপর বদদোয়া করো না।

কেননা, ওই সময়টি আল্লাহর পক্ষ হতে দোয়া কবুলের মুহূর্তও হতে পারে, ফলে তা কবুল হয়ে যাবে।”^{৭৬৪}

বিপদের সময় নিজের জন্য বদদোয়া করা সর্বাবস্থায় তো নিষিদ্ধই, বিপদের সময় বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে উম্মে সালামা রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘রাসুল সঃ আবু সালামা রাঃ-এর নিকট আসলেন। তখন তার চোখদুটো খোলা ছিল। রাসুল সঃ সেগুলো বন্ধ করে দিয়ে বললেন, “রুহ যখন চলে যায়, তখন চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকে।” এ কথা শুনে তার পরিবারের লোকেরা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন। তখন রাসুল সঃ বললেন :

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ

“তোমরা নিজদের জন্য অমঙ্গলজনক কোনো দোয়া কোরো না। কেননা, ফেরেশতাগণ তোমাদের কথার ওপর আমিন বলে থাকেন।”

অতঃপর তিনি বললেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

“হে আল্লাহ, আবু সালামাকে ক্ষমা করে দিন, হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন এবং তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করুন। হে রাব্বুল আলামিন, আমাদের ও তার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দিন এবং তার কবরকে আলোকিত করে দিন।”^{৭৬৫}

৭৬৪. সহিহ মুসলিম : ৩০০৯, সুনানু আবি দাউদ : ১৫৩২।

৭৬৫. সহিহ মুসলিম : ৯২০।

► হাদিস থেকে যা বোঝা যায় :

- মৃত্যুর পর মৃতের চোখ বন্ধ করে দেওয়া মুসতাহাব। এর ওপর সকল মুসলমান ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কারণ, মৃত ব্যক্তির চোখ খোলা থাকলে দৃশ্যটা খুব খারাপ ও ভয়ানক দেখায়।
- মৃত্যুর পরপরই মৃত ও তার পরিবার-পরিজনের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দোয়া করা মুসতাহাব।^{৭৬৬}

বিলাপ করা এবং তাকদিরের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে নিষেধ করতেন

জাবির বিন আতিক রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল সঃ আব্দুল্লাহ বিন সাবিত রাঃ-কে রোগশয্যায় দেখতে আসলেন। তাকে রোগে কাহিল অবস্থায় পেলেন। তিনি তাকে ডাকলেন, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। তখন রাসুল সঃ ইন্নালিল্লাহ পাঠ করলেন এবং বললেন, “হে আবু রাবি, তোমার ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালাই বাস্তবায়িত হলো।” মহিলারা তখন চিৎকার করে উঠল এবং কাঁদতে লাগল। জাবির বিন আতিক রাঃ তাদের নিষেধ করতে লাগলেন। তখন রাসুল সঃ বললেন, “তাদের ছেড়ে দাও (এভাবে কাঁদতে দাও)। যখন সময় আসবে, তখন যেন কোনো ক্রন্দনকারিণী ক্রন্দন না করে।” তারা বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, সময় আসার অর্থ কী?” রাসুল সঃ বললেন, “যখন মৃত্যু হবে।” এ কথা শুনে তার কন্যা মৃত পিতাকে বললেন, “আল্লাহর কসম, আমি আশা করেছিলাম আপনি শহিদ হবেন। কারণ, আপনি (জিহাদের) আসবাব প্রস্তুত করেছিলেন।” রাসুল সঃ বললেন, “তার নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তার জন্য সাওয়াব নির্ধারণ করেছেন। তোমরা শহিদ হওয়া বলতে কী বোঝো?” তারা বললেন, “আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের ময়দানে) নিহত হওয়াকে।” রাসুল সঃ বললেন, “আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়াও আরও সাত প্রকারের শহিদ আছে : মহামারিতে মৃত ব্যক্তি শহিদ, পানিতে ডুবে মরা ব্যক্তি শহিদ, অভ্যন্তরীণ রোগে মৃত ব্যক্তি শহিদ, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহিদ, যে পুড়ে মরেছে সে শহিদ, কোনো কিছু চাপা পড়ে যে মরেছে সে শহিদ এবং অন্তঃসত্ত্বায় মৃত মহিলা শহিদ।”^{৭৬৭}

৭৬৬. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৬/২২৩।

৭৬৭. মুয়াত্তা মালিক : ৫৫২, সুনানুন নাসায়ি : ১৮৫৪, সুনানু আবি দাউদ : ৩১১১।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُذُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

‘যারা শোকে চেহারায়ে আঘাত করে, জামা ছিঁড়ে এবং জাহিলি যুগের মতো চিৎকার করে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।’^{৭৬৮}

আবু মালিক আশআরি রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন :

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالتَّيَاحَةُ. وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

‘আমার উম্মতের মধ্যে জাহিলিয়াতের চারটি কুপ্রথা রয়ে গেছে, যেগুলো তারা পরিত্যাগ করবে না—১. বংশগৌরব। ২. অপর বংশকে তুচ্ছ করা। ৩. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা। ও ৪. উচ্চস্বরে বিলাপ। বিলাপকারী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার জামা পরিয়ে, খোসপাঁচড়ার ওড়না জড়িয়ে ওঠানো হবে।’^{৭৬৯}

রোগের সময় অস্থিরতা প্রকাশ করতে এবং গালমন্দ করতে নিষেধ করতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘রাসূল ﷺ উম্মে সায়েব রাঃ-এর নিকট গিয়ে বললেন, “কী হলো সায়েবের মা, এত কাঁপছেন কেন?” তিনি বললেন, “ভীষণ জ্বর, একে আল্লাহ বরকত না দিন।” রাসূল ﷺ বললেন:

لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

৭৬৮. সহিহুল বুখারি : ১২৯৭, সহিহ মুসলিম : ১০৩। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত।

৭৬৯. সহিহ মুসলিম : ৯৩৪।

“তুমি জ্বরকে গালি দিও না। কেননা, এটি আদম-সন্তানের পাপরাশি মোচন করে, কামারের চুল্লি যেভাবে দূর করে লোহার মরিচা।”^{৭৭০}

লোহাকে যখন আগুনে পোড়ানো হয়, তখন তার মরিচা দূর হয়ে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে জ্বরের তাপ মানুষকে গুনাহের কদর্য থেকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করে তোলে।

ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল সঃ এক বেদুইনকে রোগশয্যা দেখতে গিয়ে বললেন :

لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“দুশ্চিন্তার কারণ নেই, এই জ্বর তোমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে তুলবে ইনশাআল্লাহ।”

বেদুইন লোকটি বললেন :

طَهُورٌ؟ كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، أَوْ تَثُورُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ

“আপনি জ্বরকে গুনাহ থেকে পবিত্রকারী বলছেন? তা কক্ষনো নয়; বরং এ তো এমন জ্বর, যা বয়োবৃদ্ধের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং তাকে কবরের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে ছাড়বে।”

তখন রাসুল সঃ বললেন, “তবে তা-ই হোক।”^{৭৭১}

মামার রাঃ জাইদ বিন আসলাম রাঃ থেকে বর্ণনা করেন, ‘এর পরে লোকটি মারা গেলেন।’^{৭৭২}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- শাসক তার শাসিতদের মধ্যে একদম গ্রাম্য লোককেও তার রোগশয্যা দেখতে যেতে পারেন। একইভাবে আলিম ব্যক্তি মূর্খ লোককে দেখতে

৭৭০. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৫।

৭৭১. সহিহল বুখারি : ৩৬১৬।

৭৭২. ইবনে বাত্তাল রাঃ কৃত শারহ সহিহল বুখারি : ১৭/৪৮৩।

যেতে পারেন, যাতে তাকে তার জন্য উপকারী বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন এবং সবর করার প্রতি উৎসাহিত করতে পারেন। কারণ, তা না হলে আল্লাহর তাকদিরের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাঁর ক্রোধের শিকার হতে পারে সে।

- অসুস্থ ব্যক্তির উচিত, কেউ উপদেশ দিলে তা উত্তমরূপে গ্রহণ করা এবং উপদেশদাতাকে উত্তম ভাষায় প্রত্যুত্তর করা।
- অসুস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় অসুস্থতার কারণে গুনাহ ক্ষমা হওয়া ও যথাসময়ে তা সেরে যাওয়ার কথা বলা সুন্নাত। এবং তাকে শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়ে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থেকে বারণ করতে হবে। কেননা, অনেক সময় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার কারণেই আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিয়ে থাকেন।^{৭৭৩}

ইবনুল জাওজি رحمہ اللہ বলেন, ‘প্রিয় মানুষের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। কেউ কাপড় ছিঁড়ে, কেউ শরীরে আঘাত করে এবং কেউ আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করে এ শাস্তি পায়।

আমি আশি ছুঁই ছুঁই এক বৃদ্ধকে দেখেছি। তিনি নিয়মিত জামাআত সহকারে নামাজ আদায় করতেন। একদিন তার মেয়ের ঘরের নাতি মারা গেল। তখন তিনি বললেন, “কাউকেই ডাকা উচিত নয়; কেননা, কেউই ডাকে সাড়া দেয় না।” অতঃপর বললেন, “আল্লাহ আমাদের প্রতি চরম অবিচার করেছেন। আমাদের কোনো সন্তানই তিনি বাকি রাখেননি।”

তার এ কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম, এই ব্যক্তি নামাজ-দোয়া ও সকল ভালো কাজ আল্লাহর মারিফাত ও ইমানের তাড়নায় করে না; বরং তা নিজের অভ্যাস হিসেবে করে। এরাই সেই লোক, যারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে।^{৭৭৪}

৭৭৩. ফাতহুল বারি : ১০/১১৯।

৭৭৪. আস-সুবাতি ইনদাল মামাত : ১/৪১।

বিপদগ্রস্তকে মৃত্যুর কামনা করতে নিষেধ করতেন

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضَرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا،
فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ
خَيْرًا لِي

‘কোনো বিপদে আক্রান্ত হলে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। একান্ত তা করতে হলে সে যেন বলে, “হে আল্লাহ, আমাকে ততক্ষণ জীবিত রাখুন, যতক্ষণ জীবন আমার জন্য উপকারী হয়; আর তখন মৃত্যু দান করুন, যখন মৃত্যু আমার জন্য উপকারী হয়।”’^{৭৭৫}

‘কোনো ব্যক্তি বিপদে আক্রান্ত হলে’—সালাফের একদলের মতে এখানে দুনিয়াবি বিপদ উদ্দেশ্য। কারণ, তখন মৃত্যু কামনা করলে এটা আল্লাহর ফয়সালার প্রতি একপ্রকার অভিযোগের পর্যায়ে পড়ে।

সুতরাং যদি আখিরাত-বিষয়ক কোনো বিপদে আক্রান্ত হয় বা দ্বীনের ওপর কোনো ফিতনার আশঙ্কা হয়, তখন মৃত্যু কামনা অবৈধ নয়।^{৭৭৬}

ইমাম নববি رحمته الله বলেন, ‘হাদিসে স্পষ্টরূপে ক্ষুধা, শত্রুর যাতনা ইত্যাদি দুনিয়াবি কষ্টের কারণে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করাকে মাকরুহ বলা হয়েছে। তবে কেউ দ্বীনের ব্যাপারে বিপদ বা ফিতনার আশঙ্কা করলে তখন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতে কোনো সমস্যা নেই। এই হাদিসের মর্ম এটাই প্রমাণ করে।’^{৭৭৭}

এ জন্যই সালাফের মধ্য থেকে কেউ কেউ দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কায় মৃত্যু কামনা করেছেন। যেমন উমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه তাঁর জীবনের শেষের দিকে বলেন :

৭৭৫. সহিহুল বুখারি : ৫৬৭১, সহিহ মুসলিম : ২৬৮০।

৭৭৬. ফাতহুল বারি : ১০/১২৮।

৭৭৭. ইমাম নববি رحمته الله কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৭/৮।

اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي، وَضَعُفَتْ قُوَّتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ
غَيْرَ مُضَيِّعٍ، وَلَا مُفَرِّطٍ

‘হে আল্লাহ, আমার বয়স অনেক হয়েছে, শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আমার প্রজাবৃন্দের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সুতরাং আপনি আমাকে আপনার সান্নিধ্যে ডেকে নিন, যাতে আমার দ্বারা আপনার কোনো আদেশ অমান্য না হয় এবং আপনার ইবাদতের প্রতি শৈথিল্য না আসে।’^{৭৭৮}

আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান রাঃ বলেন, ‘আমি আবু হুরাইরা রাঃ-কে তার মৃত্যুশয্যায় দেখতে গেলাম এবং তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। অতঃপর বললাম, “হে আল্লাহ, আবু হুরাইরা রাঃ-কে শিফা দান করুন।” তখন আবু হুরাইরা রাঃ বললেন, “হে আল্লাহ, এই রোগ ফিরিয়ে নিয়েন না।” অতঃপর বললেন, “আবু সালামা, মৃত্যুর সুযোগ পেলে তা বরণ করে নেওয়াই শ্রেয়।” আমি বললাম, “হে আবু হুরাইরা, আমরা তো জীবনকে ভালোবাসি।” তিনি বললেন, ‘সেই সত্তার শপথ—যার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ, আলিমদের ওপর এমন একটি সময় আসবে, যখন মৃত্যু তাদের নিকট চকচকে স্বর্ণের চেয়ে প্রিয় হবে। তারা অন্য ভাইয়ের কবরের নিকট গিয়ে বলবে, “হায়, এর জায়গায় যদি আমিই হতাম এই কবরে!”’^{৭৭৯}

ইবনে আব্বাস রাঃ কর্তৃক বর্ণিত একটি মারফু হাদিসে এই মতের সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে আছে—

وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

‘আপনি যখন বান্দাদের ফিতনায় নিপতিত করতে চান, তখন আমাকে ফিতনায় নিপতিত না করে মৃত্যু দেবেন।’^{৭৮০}

৭৭৮. মুয়াত্তা মালিক : ১৫৬০।

৭৭৯. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৫৮১।

৭৮০. সুনানুত তিরমিজি : ৩২৩৩।

মুসলমানকে জানিয়ে দিতেন, অসুস্থতায় কাটলেও দীর্ঘ জীবন নিয়ামত

দীর্ঘ জীবন মুমিনের জন্য মঙ্গলজনক। কারণ, জীবন দীর্ঘ হলে নেক আমলের পরিমাণও বেশি হয়। এ সম্পর্কে আবু বাকরা রাঃ-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ‘এক ব্যক্তি রাসুল সঃ-এর নিকট জানতে চাইলেন, “সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?” তিনি উত্তরে বললেন :

مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ

“যার বয়স বেশি হয় এবং আমল উত্তম হয়।”

অতঃপর জানতে চাইলেন, “সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি কে?” তিনি বললেন :

مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ

“যার বয়স বেশি হয় এবং আমল মন্দ হয়।”^{৭৮১}

সুতরাং কোনো মুসলমান দুর্দশাগ্রস্ত হলে বা রোগাক্রান্ত হলে সে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে না, যেন নেক আমলের ধারা বন্ধ হয়ে না যায়।

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتَبُ

‘তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর কামনা না করে। কেননা, হয়তো সে সৎকর্মশীল হবে; ফলে তার সৎকর্ম আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশা আছে। অথবা সে মন্দ-কর্মশীল হবে, তখন সে তাওবা-ইসতিগফার করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সম্ভাবনা আছে।’^{৭৮২}

৭৮১. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৩০।

৭৮২. সহিহুল বুখারি : ৭২৩৫।

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে—

لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمرَهُ إِلَّا خَيْرًا

‘তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে এবং তা আসার পূর্বেই তাকে না ডাকে। কেননা, মৃত্যুর পর আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; আর মুমিনের বয়স তার জন্য কেবল উপকারই বৃদ্ধি করে।’^{৭৮৩}

ইবনে হাজার رحمته বলেন, ‘এই হাদিসে সৎকর্মশীলকে তার সৎকর্মকে আরও বাড়ানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং মন্দকর্মশীলকে মন্দকর্মের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। যেন বলেছেন, ‘যে সৎকর্ম করে তার উচিত, মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে আপন সৎকর্মের ওপর অটল থাকা এবং তাকে আরও সমৃদ্ধ করা। আর যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করে তার উচিত, মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা এবং মন্দকর্ম থেকে ফিরে আসা, যেন মন্দকর্মের ওপর তার মৃত্যু না হয়।’^{৭৮৪}

অস্থির হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে মৃত স্বজনের চেহারা না দেখতে বলেছেন সাফিয়্যা رضي الله عنها-কে তার ভাই হামজা رضي الله عنه-এর মৃতদেহ দেখতে দেওয়া হয়নি।

উরওয়া رضي الله عنها বর্ণনা করেন, আবু জুবাইর رضي الله عنه আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ‘উহুদের দিন এক মহিলা যুদ্ধে নিহতদের দেখতে দৌড়ে আসলেন। তিনি নিহতদের দেখতে পান, তা রাসুল ﷺ অপছন্দ করলেন এবং বললেন, “মহিলাটিকে থামাও, মহিলাটিকে থামাও।” জুবাইর رضي الله عنه বলেন, “আমি চিনতে পারলাম, মহিলাটি আমার মাতা সাফিয়্যা رضي الله عنها। আমি দ্রুত তার দিকে ছুটে গেলাম এবং নিহতদের নিকট যাওয়ার পূর্বেই তাকে ধরে ফেললাম। তিনি বেশ শক্তিশালী মহিলা ছিলেন। আমার বক্ষে শক্ত একটা আঘাত করে বললেন, “সর সামনে থেকে!” আমি বললাম, “রাসুল ﷺ আপনাকে রুখতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন।” এ কথা শুনে তিনি থেমে গেলেন এবং দুটি কাপড়

৭৮৩. সহিহ মুসলিম : ২৬৮২।

৭৮৪. ফাতহুল বারি : ১৩/২২২।

বের করে বললেন, “এ কাপড়দুটি আমার ভাই হামজার জন্য এনেছি। আমি শুনেছি, সে নিহত হয়েছে। সুতরাং কাপড়দুটি দিয়ে তাকে কাফন দাও।” আমরা কাপড়দুটি দিয়ে তাকে কাফন পরানোর জন্য নিয়ে এলাম। এসে দেখতে পেলাম, তার পাশে আরেক আনসারি সাহাবির লাশ। তার সাথেও তা-ই ঘটেছে, যা হামজা ﷺ-এর সাথে ঘটেছে। আমরা হামজা ﷺ-কে দুই কাপড়ে কাফন দিয়ে আনসারি সাহাবিকে কাফনবিহীন রাখতে চরম লজ্জা অনুভব করলাম। কাজেই একটি হামজা ﷺ-কে এবং অপরটি আনসারি সাহাবিকে পরানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। কাপড়দুটি একটি অপরটির চেয়ে বড় ছিল। সুতরাং যার জন্য যেটা মাপে খাটে, তাকে সেটাতেই কাফন দেওয়া হলো।”^{৭৮৫}

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উহুদের দিন (যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর) রাসুল ﷺ হামজা ﷺ-এর নিকট এসে দেখতে পেলেন, তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। তখন তিনি বললেন :

لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةً فِي نَفْسِهَا، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ، حَتَّى يُحْشَرَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بَطُونِهَا

“যদি সাফিয়্যার মনে কষ্টবোধ না হতো, তবে আমি তাঁর লাশ এভাবেই ছেড়ে রাখতাম। হিংস্র জন্তুরা এসে তা খেয়ে ফেলত, ফলে কিয়ামতের দিন তিনি এদের পেট থেকে উদ্ধৃত হতেন।”

অতঃপর তিনি সাদা-কালো ডোরাকাটা একটি চাদর আনালেন এবং তাতেই হামজা ﷺ-এর কাফন দিলেন। চাদরটি এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানলে তাঁর দুই পা খুলে যেত আর পায়ের দিকে টানলে মাথা খুলে যেত।^{৭৮৬}

রাসুল ﷺ হামজা ﷺ-এর লাশ কাফন-দাফন না করে বিকৃত অবস্থায় রেখে দেওয়ার ইচ্ছা এ জন্য পোষণ করেছিলেন যে, যেন তাঁর প্রতিদান পূর্ণাঙ্গ হয় এবং পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তাঁর পুরো শরীর আল্লাহর পথে ব্যস্ত থাকে।

৭৮৫. মুসনাদু আহমাদ : ১৪২১।

৭৮৬. সুনানুত তিরমিজি : ১০১৬।

অথবা এ বলে তিনি এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, কাফিররা তাঁর শরীরকে বিকৃত করার কারণে তাঁর আজাব রহিত হয়ে গেছে। ফলে তাঁকে দাফন করা এবং না করা উভয়ই সমান।^{৭৮৭}

সান্ত্বনা দিয়ে বিপদগ্রস্তের কষ্ট সহনীয় করে তুলতেন

আসমা বিনতে উমাইস রাঃ বলেন, ‘যেদিন জাফর রাঃ ও তাঁর সঙ্গীরা নিহত হলেন, সেদিন আমি রাসুল সঃ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। এর পূর্বে আমি চল্লিশটি চামড়া পাকা করলাম, আঠার তাল তৈরি করলাম এবং বাচ্চাদের গোসল করিয়ে তাদের মাথায় তেল মেখে দিলাম এবং তাদের পরিপাটি করে দিলাম। রাসুল সঃ বললেন, “জাফরের বাচ্চাদের আমার কাছে আনো।” আমি তাদের নিয়ে এলাম। তিনি তাদের ঝুঁকলেন এবং তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি জাফর আর তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে কোনো খারাপ সংবাদ পেয়েছেন?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তারা আজ নিহত হয়েছে।” এরপর রাসুল সঃ তাঁর পরিবারের লোকদের নিকট গিয়ে বললেন :

لَا تُغْفِلُوا آلَ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمْ

“জাফরের পরিবারের জন্যও খাবার তৈরি করো। কারণ, তারা পরিবারের কর্তার মৃত্যুর শোকে ব্যস্ত হয়ে আছে।”^{৭৮৮}

আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘তিনি বলেন, যখন জাফর রাঃ-এর মরদেহ এসে পৌঁছাল, তখন রাসুল সঃ বললেন :

اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

“জাফরের পরিবার-পরিজনের জন্য খাবার তৈরি করো, কারণ তারা শোকে অধীর হয়ে আছে।”^{৭৮৯}

মুবারকপুরি رحمہ اللہ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘অর্থাৎ চিন্তা ও শোকের কারণে তারা খাবারদাবার তৈরিতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। খেতে না পেয়ে তাদের কষ্ট আরও বেড়ে যাবে, যা তারা বুঝতেও পারবে না।’

তিবি رحمہ اللہ বলেন, ‘এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, মৃতের পরিবারের জন্য খাবার রান্না করা আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের জন্য মুসতাহাব।’^{৭৯০}

অনেক সময় বিপদগ্রস্তের দায়িত্ব ও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতেন

আব্দুল্লাহ বিন জাফর رحمہ اللہ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুল ﷺ জাইদ বিন হারিসা رحمہ اللہ-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করলেন এবং বললেন :

فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ - أَوْ اسْتُشْهِدَ - فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ - أَوْ اسْتُشْهِدَ - فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

“জাইদ যদি নিহত হয় অথবা শহিদ হয়, তবে জাফর তোমাদের আমির হবে। সেও যদি নিহত হয় অথবা শহিদ হয়, তবে তোমাদের আমির হবে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা।”

অতঃপর রাসুল ﷺ-এর নিকট তাদের ব্যাপারে সংবাদ আসলো। তখন তিনি লোকদের নিকট গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন :

«إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوَّ، وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - أَوْ اسْتُشْهِدَ - ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - أَوْ اسْتُشْهِدَ -، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - أَوْ اسْتُشْهِدَ - ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سَيْوفِ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ»

৭৮৯. সুনানুত তিরমিজি : ৯৯৮, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৬১০।

৭৯০. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৪/৬৭।

“তোমাদের ভাইয়েরা শত্রুর মোকাবেলা করেছে। প্রথমে জাইদ পতাকা নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শহিদ হয়ে গেল। তারপর জাফর বিন আবু তালিব পতাকা হাতে তুলে নিয়ে কিতাল করতে করতে শহিদ হয়ে গেল। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পতাকা হাতে নিয়ে লড়াই চালিয়ে গেল। একপর্যায়ে সেও শহিদ হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহর তরবারি খালিদ বিন ওয়ালিদ পতাকা হাতে নিল এবং তার হাতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করলেন।”

এরপর তিন দিন পর্যন্ত জাফর ﷺ-এর পরিবারকে কাঁদতে ও শোক প্রকাশ করতে দিলেন। অতঃপর (তিন দিন পর) তাদের নিকট গিয়ে বললেন :

لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ أَوْ بَعْدَ غَدٍ، اذْعُوا إِلَيَّ ابْنِي أَخِي

“আজকের পর থেকে অথবা আগামীকাল থেকে আমার ভাইয়ের জন্য কাঁদবে না। আর আমার কাছে আমার ভাইয়ের ছেলের উপস্থিত করো।”

এরপর আমাদের ডাকা হলো। আমাদের চুল দেখে মনে হচ্ছিল যেন এগুলো পাখির সদ্যগজানো পালক। রাসুল ﷺ বললেন, “নাপিতকে ডাকো।”

নাপিতকে ডেকে আনা হলো। আমাদের সকলের মাথা মুগুন করা হলো।^{৭৯১} এরপর রাসুল ﷺ বললেন :

أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيهُ عَمَّنَا أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَشَبِيهُ خَلْقِي وَخُلُقِي

“মুহাম্মাদ বিন জাফর হচ্ছে আমাদের চাচা আবু তালিবের মতো। আর আব্দুল্লাহর অবয়ব ও চরিত্র আমার মতো।”

এতটুকু বলে রাসুল ﷺ আমার হাত উঁচু করে ধরে বললেন, “হে আল্লাহ আব্দুল্লাহকে পরিবারে জাফরের স্থলাভিষিক্ত করুন। তাকে ব্যবসায় বরকত দিন।” এ কথা তিনি তিনবার বললেন।

৭৯১. জাফর ﷺ-এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস স্বামীর শোকে কাতর ছিলেন। তাই ছোট ছেলে-মেয়েদের মাথা চিরুনি করা, তাদের পরিপাটি রাখার প্রতি নজর দিতে পারেননি। ফলে তাদের মাথায় উকুন হয়ে যায়। তাই নাপিত ডেকে তাদের মাথা মুগুন করে উকুন মুক্ত করা হয়।

এরপর আমাদের মা এলেন। আমাদের এতিম হয়ে যাওয়ার কথা তুলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দুঃখভারাক্রান্ত করে দিলেন। রাসুল ﷺ বললেন, “তুমি তাদের অভাবের ব্যাপারে ভয় করছ? তবে শুনে নাও, দুনিয়া-আখিরাতে আমিই তাদের অভিভাবক।”^{৭৯২}

বিধবা ও এতিমদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন

সাহল বিন সাদ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুলের মাধ্যমে ইশারা করে ইরশাদ করেছেন :

وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

‘আমি ও এতিমের অভিভাবক জান্নাতে এভাবে (এ দুই আঙুলের মতো পাশাপাশি) থাকব।’^{৭৯৩}

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَأَخْسِبُهُ
قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْئُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ

‘বিধবা ও নিঃস্বদের (ভরণপোষণের) পেছনে যে মেহনত করে, সে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মতো। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর ধারণা, তিনি আরও বলেছেন) বিরামহীন নফল নামাজ আদায়কারীর মতো এবং প্রতিদিন রোজা রাখে এমন ব্যক্তির মতো।’^{৭৯৪}

কষ্ট লাঘব করতে বিপদগ্রস্তকে অর্থ-সম্পদ দান করতেন

তায়িফ বিজয়ের পর মক্কাবাসীকে তিনি অনেক মাল দান করেছিলেন। যার ফলে আনসারদের মনে কিছুটা অসন্তোষভাবও এসেছিল।

৭৯২. মুসনাদু আহমাদ : ১৫৫৩।

৭৯৩. সহিহুল বুখারি : ৫৩০৪।

৭৯৪. সহিহুল বুখারি : ৫৩৫৩, সহিহ মুসলিম : ২৯৮২।

আনাস বিন মালিক ؓ বর্ণনা করেন, ‘রাসুল ﷺ আনসারদের কিছু লোককে একত্র করে বললেন :

إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْزَهُمْ
وَأَتَأَلَّفَهُمْ

“কুরাইশরা সদ্য জাহিলিয়াত পরিত্যাগকারী এবং দুর্দশাগ্রস্ত ।
(যেমন : তাদের প্রিয়জনদের হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের দেশ
জয় করা হয়েছে) তাই আমি তাদের অনুদান দিয়ে তাদের মন জয়
করার ইচ্ছা করেছি ।”^{৭৯৫}

আল্লাহর রাস্তায় সমুদয় সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেছে—এমন লোককে সান্ত্বনা
দিতেন

সুহাইব রুমি ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ মদিনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন । তাঁর
সাথে আবু বকর ؓ-ও বের হলেন । আমার তাঁর সাথে বের হওয়ার ইচ্ছা
ছিল, কিন্তু কুরাইশের একদল যুবক আমাকে বাধা দিল । ওই রাতটি আমি
একদম না বসে দাঁড়িয়ে থেকে কাটালাম । তারা বলল, “আল্লাহ তাআলা
তাকে তার পেটের কল্যাণে তোমাদের থেকে নির্লিপ্ত রেখেছেন ।” আমি
তাদের কাছে কষ্টের অভিযোগ করিনি । অতঃপর তারা ঘুমিয়ে পড়লে আমি
বেরিয়ে পড়লাম । কিন্তু যাত্রা শুরু করতেই কিছু লোক এসে আমাকে ফিরিয়ে
নিয়ে যেতে চাইল । আমি তাদের বললাম, “আমি যদি তোমাদের কয়েক
আউস স্বর্ণ দিই, তোমরা কি আমার পথ ছেড়ে দেবে?” তারা সম্মত হলো,
ফলে আমি তাদের সাথে মক্কায় ফিরে গেলাম । তারপর বললাম, “চৌকাঠের
নিচে খনন করো, এখানে কয়েক আউস আছে; তারপর অমুক মেয়ের কাছে
গিয়ে তার গহনা নিয়ে নাও ।”

এই বলে আমি বেরিয়ে পড়লাম । রাসুল ﷺ কুবা থেকে রওনা দেওয়ার পূর্বেই
আমি সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলাম । আমাকে দেখে তিনি বললেন,
“আবু ইয়াহইয়া, তোমার এ বিক্রি খুব লাভজনক হয়েছে ।”

আমি বললাম, “আমার পূর্বে তো আপনার কাছে কেউই আসেনি। তাহলে নিশ্চয় জিবরিল ﷺ-ই আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন।”

তখন আল্লাহ তাআলা সুহাইব রضى الله عنه সম্পর্কে আয়াত নাজিল করলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণির লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।”^{৭৯৬-৭৯৭}

আর্থিকভাবে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাদাকা দিতে নির্দেশ করতেন

আবু সাইদ খুদরি রضى الله عنه বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি ফল ব্যবসায় চরম মার খেলেন। এতে তার কর্জ অনেক বেড়ে গেল। রাসুল ﷺ বললেন :

تَصَدَّقُوا عَلَيَّ

“ওকে সাদাকা দাও।”

লোকজন তাকে সাদাকা দান করলেন, কিন্তু তা তার পুরো ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হয়নি। তখন রাসুল ﷺ তার পাওনাদারদের বললেন :

خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

“যা পেয়েছ, তা নিয়ে নাও। এর চেয়ে বেশি পাবে না।”^{৭৯৮}

অর্থাৎ এই মুহূর্তে এগুলো ছাড়া আপাতত আর পাবে না। আর যতদিন তার সচ্ছলতা আসছে না, তোমাদের জন্য তাকে ঋণ আদায়ে চাপ দেওয়া বৈধ নয়।^{৭৯৯}

৭৯৬. সূরা আল-বাকারা, ২ : ২০৭।

৭৯৭. মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৫৭০৬।

৭৯৮. সহিহ মুসলিম : ১৫৫৬।

৭৯৯. ইমাম নববি রضى الله عنه কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১০/২১৭।

► হাদিস থেকে শিক্ষা

- সংকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা করা।
- অভাবী ও ঋণগ্রস্তের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন ও তাকে সাদাকা দেওয়া।
- অভাবগ্রস্ত লোককে ঋণ আদায়ের জন্য চাপ দেওয়া ও বন্দী করা বৈধ নয়।
- অভাবী ঋণগ্রস্তের সকল সম্পদ—পরনের কাপড় ও এ ধরনের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যতীত—পাওনাদারদের সোপর্দ করে দিতে হবে, যতক্ষণ না তাদের ঋণ পরিপূর্ণ পরিশোধ হয়।^{৮০০}

সুসংবাদ শুনিয়ে তাদের বিপদ সহনীয় করে তুলতেন

আনাস বিন মালিক রাঃ বর্ণনা করেন, ‘হারিসা বিন সুরাকা রাঃ-এর মাতা উম্মে রাবি বিনতে বারা রাঃ রাসুল সঃ-এর কাছে এসে বললেন, “হে আল্লাহর নবি, আমাকে হারিসার ব্যাপারে সংবাদ দিন (হারিসা রাঃ বদরের যুদ্ধে এক অজ্ঞাত তিরের আঘাতে নিহত হয়েছিলেন), সে যদি জান্নাতে থাকে, তাহলে আমি সবার করব; আর যদি তা না হয়, তাহলে আমি তার জন্য খুব কাঁদব।’ রাসুল সঃ বললেন :

وَيُحْكِي، أَوْهَبِلْتُ، أَوْجَنَّةً وَاحِدَةً هِيَ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّةِ
الْفِرْدَوْسِ

“কী বলো এসব? বোকা হয়ে গেছ নাকি তুমি? জান্নাত কি ওই একটাই আছে? জান্নাত অনেক রয়েছে, আর সে জান্নাতুল ফিরদাওসের মধ্যে রয়েছে।”^{৮০১}

হাফিজ ইবনে হাজার রাঃ বলেন, ‘এটি বিলাপ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। কারণ, বিলাপ নিষিদ্ধ হয়েছিল উহুদ যুদ্ধের পরে, আর এটি বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা।’^{৮০২}

৮০০. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১০/২১৮।

৮০১. সহিহুল বুখারি : ৬৫৫০।

৮০২. ফাতহুল বারি : ৬/২৭।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, “কী হে জাবির, তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে যে?” আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, উহুদ যুদ্ধে আমার পিতা শহিদ হয়ে গেছেন এবং পরিবার-পরিজন ও ঋণ রেখে গেছেন।” রাসুল ﷺ বললেন :

أَفَلَا أَبَشَّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟

“আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার সাথে কীভাবে মিলিত হয়েছেন, আমি কি তোমাকে সেই সুসংবাদ দেবো না?”

আমি বললাম, “অবশ্যই দেবেন ইয়া রসুলাল্লাহ!” তিনি বললেন :

“আল্লাহ তাআলা কখনো কারও সাথে তার পর্দার অন্তরাল ব্যতীত (সরাসরি) কথা বলেননি, কিন্তু তিনি তোমার পিতাকে জীবন দান করে তার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। তাকে তিনি বললেন :

مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَخِيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا. فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً. قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا

“তুমি আমার নিকট যা ইচ্ছা চাও, আমি তোমাকে তা দান করব।” সে বলল, “হে আমার রব, আপনি আমাকে জীবন দান করুন, যাতে আমি আবার আপনার রাস্তায় শহিদ হতে পারি।” আল্লাহ তাআলা বললেন, “আমার পক্ষ থেকে আগে থেকেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে আছে যে, তারা আবার (দুনিয়ায়) ফিরে যাবে না। এ প্রসঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ হয় : “আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।” ৮০৭-৮০৮

৮০৩. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৬৯।

৮০৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩০১০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯০।

দুঃখবোধ শিথিলকারী খাবার দেখিয়ে দিতেন

আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘তার পরিবারের কেউ মৃত্যুবরণ করলে অনেক মহিলা তার পাশে একত্রিত হতেন। অতঃপর তার পরিবারের লোকজন ও বিশেষ ঘনিষ্ঠ মহিলাগণ ছাড়া বাকিরা চলে গেলে তিনি ডেগে তালবিনা (যবের আটা ও তার কুড়া দিয়ে তৈরি একপ্রকার ঝোলজাতীয় খাবার) পাকাতে নির্দেশ দিতেন। তারপর সারিদ (গোশতের মধ্যে রুটি টুকরো করে দিয়ে তৈরি খাবার) তৈরি করে তালবিনা তার ওপর ঢেলে দেওয়া হতো। এরপর তিনি বলতেন, “এটা থেকে আহার করো। কেননা, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

التَّالِبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بَعْضَ الْحُزَنِ

“তালবিনা রোগীর অন্তর প্রশান্ত করে এবং দুঃখ কিছুটা প্রশমিত করে।”^{৮০৫}

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, শোকাহত ও ব্যথিতদের জন্য তালবিনা খাওয়া মুসতাহাব।

তালবিনার উপকারিতা : ড. জগলুল আন-নাজ্জার বলেন, ‘যবের স্যুপ (তালবিনা) শরীরের পিপাসা নিবারণ করে, পেশাব বৃদ্ধি করে, হজমশক্তি বাড়ায়, গলার খসখসে ভাব ও সর্দি-কাশি উপশম করে, শ্বাসকষ্ট নিরাময় করে, পাকস্থলী পরিষ্কার রাখে, মূত্রথলির বিভিন্ন রোগ দমন করে, শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখে এবং শরীরে শক্তি বর্ধন করে।’^{৮০৬}

এ ছাড়াও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যব রক্তের কোলেস্টেরল কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

১৯৭৫ সালে ‘জার্নাল অব লিপিড রিসার্চ’ কোলেস্টেরল কমানোয় যব ও অন্যান্য উদ্ভিদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমেরিকার কৃষিবিজ্ঞানীরা যব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা

৮০৫. সহিহুল বুখারি : ৫৪১৭, সহিহ মুসলিম : ২২১৬।

৮০৬. আল-ইজাজুল ইলমি ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়াহ : ২/৯।

চালিয়েছেন। গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, যবের মধ্যে এমন তিনটি উপাদান রয়েছে, যা রক্তের কোলেস্টেরল কমানোয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ড. জগলুল আন-নাজ্জার বলেন, ‘আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করে যে, যবের মধ্যে যে রাসায়নিক উপাদান রয়েছে, তা দেহকোষের রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ফলে মানুষ বিষণ্ণতা ও অবসাদগ্রস্ততা থেকে মুক্ত থাকে এবং হৃদয় প্রশান্ত ও স্থির থাকে।

মানবদেহে রাসায়নিক ক্রটির কারণেই বিষণ্ণতা ও অবসাদগ্রস্ততা সৃষ্টি হয়। সুতরাং তার কার্যকরী প্রতিষেধক হলো, এমন খাদ্য গ্রহণ করা যা সেই ক্রটিকে সংশোধন করে। যেমন : যবের স্যুপ—যা এ রোগের অনেক উপকারী ওষুধের কাজ করে।’^{৮০৭}

বিপদগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন

আনাস বিন মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুল সঃ কোনো মহিলার কাছে সরাসরি যেতেন না। প্রয়োজন হলে তাদের স্বামীদের মাধ্যমে যেতেন। তবে উম্মে সুলাইম রাঃ-এর ব্যতিক্রম—তিনি সরাসরি তার কাছে যেতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :

إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِيَ

“আমি তার প্রতি করুণা করি, কারণ তার ভাই আমার সাথে (যুদ্ধ করতে গিয়ে) নিহত হয়েছে।”^{৮০৮}

উম্মে সুলাইম রাঃ-এর নাম সাহলা বা রামিলা বা মুলাইকা বিনতে মিলহান আনসারি। তিনি আনাস বিন মালিক রাঃ-এর মাতা। উপনামে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে তার মূল নাম নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

তার ভাই হারাম বিন মিলহান বিরে মাউনার যুদ্ধে নিহত হন। সে যুদ্ধে রাসুল সঃ ছিলেন না। কিন্তু রাসুল সঃ-এর নির্দেশক্রমেই যেহেতু তিনি যুদ্ধে

৮০৭. শাইখ উসমান আল-খামিসের আল-মানহাজ ওয়েবসাইট থেকে।

৮০৮. সহিহুল বুখারি : ২৮৪৪, সহিহ মুসলিম : ২৪৫৫।

অংশগ্রহণ করেছিলেন, এ জন্য তিনি ‘আমার সাথে’ বলেছেন। অর্থাৎ ‘আমার প্রেরিত লশকরের সাথে বা আমার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে বা আমার আনুগত্য করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন।’

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, ভাই-বন্ধুদের মৃত্যুর পর তাদের ভাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা এবং তাদের পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করা উচিত।

রাসুল ﷺ উম্মে সুলাইম ؓ-কে দেখতে যাওয়ার মাধ্যমে তার মনের ব্যথা উপশম করতেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, উম্মে সুলাইমের ভাই তাঁর নির্দেশক্রমে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, রাসুল ﷺ তার মৃত্যুর পর তার পরিবারের দেখাশোনা করতেন। আর এটি ছিল ভাতৃত্বের দাবি আদায়ে রাসুল ﷺ-এর আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ।^{৮০৯}

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ইমাম নববি ؒ বলেন, ‘ইতিপূর্বে কিতাবুল জিহাদে উম্মে সুলাইম ؓ-এর বোন উম্মে হারাম ؓ-এর আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, তারা দুজন রাসুল ﷺ-এর দুধ-সম্পর্কিত অথবা নসব-সম্পর্কিত খালা ছিলেন। সুতরাং তারা রাসুল ﷺ-এর মাহরাম ছিলেন বিধায় তাদের সাথে একাকী মিলিত হওয়া রাসুল ﷺ-এর জন্য সম্পূর্ণ বৈধ ছিল। এ জন্য তিনি এ দুজন মহিলার সাথে সরাসরি দেখা করতেন, যেখানে তিনি অন্য মহিলাদের নিকট সরাসরি না গিয়ে তাদের স্বামীদের নিকট যেতেন।

উলামায়ে কিরাম বলেন, এ হাদিস মাহরাম মহিলার নিকট মাহরাম পুরুষের যাওয়ার বৈধতা প্রমাণ করে। সাথে সাথে গাইরে মাহরাম মহিলার নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সাক্ষাৎকারী পুরুষ নেককার হলেও।

এ ছাড়াও ইতিপূর্বে গাইরে মাহরাম মহিলার সাথে একাকী মিলিত হওয়ার অবৈধতা সম্পর্কে একাধিক সহিহ ও প্রসিদ্ধ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে।^{৮১০}

৮০৯. ফাতহুল বারি : ৬/৫১।

৮১০. ইমাম মুসলিম কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৬/১০।

বিপদে পরস্পরকে সাহায্য দেওয়া এবং সহমর্মিতার শিক্ষা দিয়েছেন

আমর বিন হাজম ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلِّ
الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘যেকোনো মুমিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিপদে তাকে সাহায্য দান করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন।’^{৮১১}

সাহায্য দেওয়ার সময় কী বলবে, তা শিখিয়ে দিয়েছেন

উসামা বিন জাইদ ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূল ﷺ-এর মেয়ে আমাকে এই সংবাদ নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট পাঠালেন যে, তার ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় আছে, সুতরাং তিনি যেন তার নিকট যান। তখন রাসূল ﷺ সালাম জানিয়ে বলে পাঠালেন :

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ،
وَلْتَحْتَسِبْ

“যা নিয়ে নিয়েছেন তা একান্ত আল্লাহর, আর যা দান করেছেন তাও তাঁর। তাঁর কাছে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট একটা সময়সীমা আছে। সুতরাং সে যেন ধৈর্য ধরে এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখে।”^{৮১২}

সাহাবীগণের কেউ রোগাক্রান্ত হলে বা ব্যথা পেলে তাকে ঝাড়ফুক করতেন

ইয়াজিদ বিন আবু উবাইদ ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি সালামা ؓ-এর পায়ের জজ্বায় একটি ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেলাম। তাই তাকে বললাম, “হে আবু মুসলিম, এটি কীসের আঘাত?” তিনি বললেন :

৮১১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৬০১।

৮১২. সহিহুল বুখারি : ১২৮৪, সহিহ মুসলিম : ৯২৩।

هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةٌ، فَأَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اسْتَكَيْتُهَا
حَتَّى السَّاعَةِ»

“এটি খাইবারের যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতের চিহ্ন। (যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর) লোকজন বলাবলি শুরু করে দিল যে, সালামা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তখন আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি আঘাতের ওপর তিনবার ফুঁ দিয়ে দিলেন। ফলে আজ পর্যন্ত এতে আমি কোনো ব্যথা অনুভব করিনি।”^{৮১৩}

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল ﷺ কতিপয় স্ত্রীকে সুরা নাস ও সুরা ফালাক পড়ে ডান হাত দ্বারা বুলিয়ে দিতেন এবং বলতেন :

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا
شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

“হে আল্লাহ, হে মানুষের রব, তার কষ্ট দূর করে দিন, আপনিই শিফা দানকারী। আপনি ব্যতীত কেউই শিফা দান করতে পারে না। আপনি তাকে এমন শিফা দান করুন, যেন কোনো রোগ বাকি না থাকে।”^{৮১৪}

মুহাম্মাদ বিন হাতিব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমার হাতের ওপর গরম ঝোল পড়ে তা পুড়ে গেল। তখন আমার মা আমাকে রাসুল ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন। আমরা যখন তাঁর কাছে পৌঁছাই, তখন তিনি একটি খোলা মাঠে ছিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, তিনি বললেন :

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ

“কষ্ট দূর করুন, হে মানুষের প্রতিপালক!”

৮১৩. সহিহুল বুখারি : ৪২০৬।

৮১৪. সহিহুল বুখারি : ৫৭৪৩, সহিহ মুসলিম : ২১৯১।

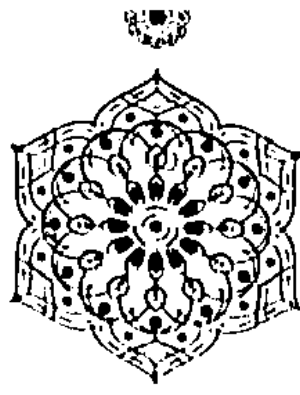
আর আমার প্রবল ধারণা যে, তিনি এও বলেছেন :

أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ

“আপনিই শিফাদাতা, আপনি ছাড়া আর কোনো শিফাদাতা নেই।”^{৮১৫}

.





• [তৃতীয় পরিচ্ছেদ] •

গরিবদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

ইসলামি শরিয়তে দারিদ্র্য বলা হয়, মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে অসমর্থ হওয়াকে। সুতরাং প্রত্যেক ওই ব্যক্তি, যার নিকট এতটুকু সম্বল নেই যে, সে নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারে, সে ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে দরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।^{৮১৬}

রাসুল ﷺ অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্র ও নিঃস্বদের দিয়ে দিতেন

উমর বিন খাতাব ﷺ বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ،
وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ

‘রাসুল ﷺ স্বীয় মাল পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করার পর অবশিষ্ট অংশ সাদাকা করে দিতেন।’^{৮১৭}

খাইবার বিজয় করার পর সেখান থেকে তিনি গনিমতের যে এক-পঞ্চমাংশ পেয়েছিলেন, তা থেকেও পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করার পর অবশিষ্ট অংশ সাদাকা করে দিলেন। উমর ﷺ বলেন :

وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ،
جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ، فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ
جَعَلَهُ بَيْنَ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

৮১৬. মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৮/৫৭০।

৮১৭. সুনানু আবু দাউদ : ২৯৭৫।

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ খাইবারের আয়কে তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন : দুইভাগ মুসলিম জনসাধারণের জন্য এবং একভাগ নিজের পরিবার-পরিজনের খোরপোশের জন্য। এরপরও পরিবারের খরচ মিটিয়ে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তা দরিদ্র মুহাজিরদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন।’^{৮১৮}

আর রাসুল ﷺ বলেছেন :

كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَدَقَةٌ، إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ، وَكَسَاهُمْ إِنَّا لَا نُورَثُ

‘নবির যাবতীয় সম্পদ তাঁর পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের খরচ বাদে বাকি সবই সাদাকা। আমাদের (নবিদের) সম্পদের কোনো ওয়ারিশ থাকে না।’^{৮১৯}

চেহারা ও বেশভূষায় অভাবের ছাপ দেখলে ব্যথিত হতেন

জারির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা একবার শুরুর বেলা রাসুল ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় কিছু (প্রায়) নগ্নদেহ এবং নগ্নপদের লোক ডোরাকাটা চাদর জড়িয়ে^{৮২০} কিংবা জীর্ণ আলখাল্লা পরে (কাঁধে) তলোয়ার ঝুলিয়ে আমাদের কাছে এল। তাদের অধিকাংশ বরং সবাই মুদার গোত্রের ছিল। তাদের অবয়বে ক্ষুধা ও অনাহারের ছাপ দেখে রাসুল ﷺ-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বাড়ির ভেতর গেলেন এবং বের হয়ে এসে বিলাল ﷺ-কে আজান দিতে নির্দেশ দিলেন। বিলাল ﷺ আজান দিলেন। অতঃপর রাসুল ﷺ জামাআতে নামাজ আদায় করে ভাষণ দিলেন এবং বললেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

৮১৮. সুনানু আবি দাউদ : ২৯৬৭।

৮১৯. সহিহুল বুখারি : ২৯০৪, সহিহ মুসলিম : ১৭৫৭, সুনানু আবি দাউদ : ২৯৭৫। শব্দউৎস : সুনানু আবি দাউদ।

৮২০. চাদরের মাঝে ছিদ্র করে মাথা ও হাত গলিয়ে তারা পরিধান করেছিল।

“হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট থেকে আপন আপন হক চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।”^{৮২১}

এবং সূরা হাশর থেকে একটি আয়াত পড়লেন :

اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

“তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্য সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাকো।”^{৮২২}

“প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ দিনার, দিরহাম, কাপড়, এক সা’ গম ও এক সা’ খেজুর হতেও দান করো।” বলতে বলতে রাসুল ﷺ এতটুকু পর্যন্ত বললেন যে, “এক টুকরো খেজুর থাকলেও তা থেকে দান করো।”

তখন একজন আনসারি সাহাবি একটি থলি নিয়ে আসলেন। (সেটি এত ভারী ছিল যে,) তার হাত তা বহন করতে অপারগ হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল তা নয়, অপারগই হয়ে পড়েছিল। অতঃপর অপর সাহাবিগণও তার অনুসরণ করলেন। আমি সেখানে কাপড় ও খাদ্যের দুটি স্তুপ দেখতে পেলাম এবং রাসুল ﷺ-এর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল ও তাঁকে প্রফুল্ল দেখতে পেলাম। এরপর তিনি বললেন :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ

৮২১. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১।

৮২২. সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ১৮।

سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ، كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَزَرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম প্রথা চালু করবে, সে তার সাওয়াব তো পাবেই উপরন্তু ওই প্রথার ওপর আমলকারীর সমপরিমাণ সাওয়াবও পাবে। এবং এতে আমলকারীর সাওয়াবের পরিমাণ কিঞ্চিৎ পরিমাণও হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি খারাপ প্রথা প্রচলন করবে, তার জন্য তার গুনাহ তো রয়েছেই, উপরন্তু খারাপ প্রথার ওপর আমলকারীদের সমপরিমাণ গুনাহও সে পাবে। এতে আমলকারীদের গুনাহ থেকেও বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না।”^{৮২৩}

ইমাম নববি رحمته বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর আনন্দিত হওয়ার কারণ হলো, তিনি দেখতে পেলেন যে, মুসলমানরা আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাঁর পথে সম্পদ ব্যয় করতে, রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ মান্য করতে, অভাবীদের অভাব ঘোচাতে এবং মুসলমানদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।

অনুরূপভাবে মুসলমানদেরও উচিত হলো, এ ধরনের কোনো কিছু দেখলে তারা যেন আনন্দিত হয় এবং প্রফুল্লতা প্রকাশ করে।^{৮২৪}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- কল্যাণের কাজে অগ্রগামী হওয়া ও উত্তম প্রথা চালু করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।
- খারাপ প্রথা ও কুসংস্কার চালু করার ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

উত্তম সুন্নাত বা প্রথা দুই প্রকার :

১. শরিয়তপ্রবর্তিত সুন্নাত বা প্রথা—যার আমল বাদ দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর কেউ তা নতুনভাবে চালু করল। যেমন : রমাজানে জামাআত সহকারে তারা পড়া।

৮২৩. সহিহ মুসলিম : ১০১৭।

৮২৪. ইমাম নববি رحمته কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৭/১০৩।

২. শরিয়তের নির্দেশ পালনে সবার অগ্রগামী হওয়া—যা দেখে অন্যরাও তার অনুসরণ করে। যেমন : হাদিসের ঘটনায় জনৈক আনসারি ব্যক্তি সাদাকা প্রদানে অগ্রগামী হয়েছেন এবং তাকে দেখে অন্যরাও তার পথ অনুসরণ করেছে।^{৮২৫}

অভাবস্থদের প্রতি অনুগ্রহ ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতেন

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘সেই সত্তার কসম—যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, ক্ষুধার জ্বালায় আমি আমার পেটকে মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কোনো সময় ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম।’

সহিহ বুখারির আরেক বর্ণনায় এসেছে, ‘আমাকে রাসুল সঃ-এর মিস্বর ও আয়িশা রাঃ-এর কামরার মধ্যবর্তী স্থানে বেঁধে পড়ে থাকতে দেখা যেত। আগন্তুকরা এসে (মৃগীরোগী) পাগল মনে করে আমার গর্দানে পা রাখত। অথচ আমার তিলমাত্র পাগলামি ছিল না। ক্ষুধার যন্ত্রণাই ছিল এর কারণ।’^{৮২৬}

‘একদিন আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে নবিজি সঃ ও সাহাবিগণের বের হওয়ার পথে বসে থাকলাম। আবু বকর রাঃ যেতে লাগলে আমি কুরআনের একটা আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি (আমার অবস্থা বুঝতে পেরে) আমাকে পরিতৃপ্ত করে কিছু খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন; কিছুই করলেন না। কিছুক্ষণ পর উমর রাঃ যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। এবারেও আমি প্রশ্ন করলাম এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। আমার কোনো ব্যবস্থা করলেন না।

তার পরক্ষণে আবুল কাসিম রাঃ যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই মুচকি হাসলেন এবং আমার প্রাণে কী অস্থিরতা বিরাজ করছে, আমার চেহারার অবস্থা দেখেই তিনি তা আঁচ করতে পারলেন। আমাকে বললেন, “হে আবু

৮২৫. ইবনে উসাইমিন কৃত শারহ রিয়াদিস সালিহিন : ১/১৯৯। (কিছুটা পরিবর্তন করে উপস্থাপিত)

৮২৬. সহিহল বুখারি : ৭৩২৪।

হির!” আমি বললাম, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি হাজির আছি।” তিনি বললেন, “আমার সঙ্গে আসো।” এ বলে তিনি চললেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন এবং আমাকে ঢোকার অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ঘরের ভেতর গিয়ে একটি পেয়ালার মধ্যে কিছু পরিমাণ দুধ পেলেন। তিনি বললেন, “এ দুধ কোথা থেকে এসেছে?” পরিবারের লোকজন বললেন, “এটা আপনার জন্য অমুক পুরুষ অথবা (বললেন) অমুক মহিলা হাদিয়া পাঠিয়েছে।” তখন তিনি বললেন, “হে আবু হির!” আমি বললাম, “জি, ইয়া রাসুলুল্লাহ!” তুমি সুফফাবাসীদের কাছে গিয়ে তাদের আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘সুফফাবাসীরা ছিলেন ইসলামের মেহমান। তাদের কোনো পরিবার ছিল না এবং তাদের কারও ওপর নির্ভরশীল হওয়ারও সুযোগ ছিল না। কোনো সাদাকা এলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এর থেকে কিছুই তিনি গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোনো হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদের দিয়ে দিতেন এবং নিজের জন্যও কিছু রাখতেন এবং এতে তাদের শরিক করতেন।’

(আবু হুরাইরা রাঃ বলেন,) ‘এ আদেশ শুনে আমার মনে কিছুটা হতাশা এল। মনে মনে ভাবলাম, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফফাবাসীর কী হবে? এ সামান্য দুধ আমার জন্যই যথেষ্ট হতো। এটা পান করে আমি শরীরে কিছুটা শক্তি পেতাম। তিনি যেহেতু ওদের ডাকার জন্য আমাকে পাঠাচ্ছেন, তাদের মাঝে দুধ বণ্টন করার দায়িত্বও আমাকে দেবেন। এতে আমি আর ভাগে দুধ পাওয়ার আশা নেই। যদিও প্রথমে ভেবেছিলাম, তৃপ্তিভরে আমি খেতে পারব।

কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ না মেনে উপায় নেই। তাই তাদের কাছে গিয়ে তাদের ডেকে আনলাম। তারা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদের অনুমতি দিলেন। তারা ঘরে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, “হে আবু হির!” আমি বললাম, “আমি হাজির ইয়া রাসুলুল্লাহ!” তিনি বললেন, “তুমি পেয়লাটি নাও আর তাদের দাও।” আমি পেয়লা নিয়ে একজনকে দিলাম। তিনি তা পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়লাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি আরেকজনকে পেয়লাটি দিলাম। তিনিও তৃপ্তিভরে পান করে

পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমনকি আমি এভাবে সবাইকে তৃপ্তিভরে পান করিয়ে নবিজি ﷺ পর্যন্ত পৌঁছালাম।

তারপর নবিজি ﷺ পেয়ালাটি নিজ হাতে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। আর বললেন, “আবু হির!” আমি বললাম, “লাব্বাইক ইয়া রাসুলাল্লাহ!” তিনি বললেন, “এখন তো আমি আর তুমি আছি।” আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি ঠিক বলেছেন।” তিনি বললেন, “এখন তুমি বসে পান করো।” তখন আমি বসে কিছু পান করলাম। তিনি বললেন, “তুমি আরও পান করো।” আমি আরও পান করলাম। তিনি বারবার আমাকে পান করার নির্দেশ দিতে লাগলেন (আর আমিও বারবার পান করতে লাগলাম)। এমনকি আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, “আর না। যে সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীন নিয়ে পাঠিয়েছেন—তাঁর কসম খেয়ে বলছি, আমার পেটে আর পান করার মতো জায়গা নেই।” তিনি বললেন, “তাহলে আমাকে দাও।” আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিলাম। তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে বাকি দুধ পান করলেন।’

আবু হুরাইরা র.ব. বলেন, ‘তারপর আমি উমর র.ব.এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে পুরো ঘটনার বিবরণ শোনালাম আর বললাম, “আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির মাধ্যমে এর বন্দোবস্ত করেছেন, যিনি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে বেশি উপযুক্ত। আল্লাহর কসম, আমি আপনার কাছে আয়াতটির পাঠ শুনতে চেয়েছি অথচ আমি আপনার চেয়ে তা ভালো পাঠ করতে পারি।” উমর র.ব. বললেন, “আল্লাহর কসম, আপনাকে আপ্যায়ন করা আমার নিকট লাল বর্ণের উটের চেয়েও অধিক প্রিয়।”’^{৮২৭}

এভাবে রাসুল ﷺ অভাবহস্তের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বুঝতে পারতেন এবং তাদের ক্ষুধার জ্বালা আঁচ করতে পারতেন। অতঃপর যথাসাধ্য সহানুভূতি দেখাতেন।

► হাদিস থেকে শিক্ষা

- কওমের খাদিম যখন একটি পাত্র থেকে সবাইকে পান করাবে, তখন নিয়ম হলো, তার ডান পাশ থেকে পান করানো শুরু করবে। মাঝখানে

কাউকে বাদ দিয়ে নিজের বন্ধুকে পান করাবে না। কেননা, এতে মেহমানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়।

- এ হাদিসে একটি মহান মুজিজা উল্লেখিত হয়েছে—যা রাসুল ﷺ-এর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। তা হলো, রাসুল ﷺ-এর বরকতে খানা ও পানীয় বৃদ্ধি পাওয়া।
- পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করা বৈধ। কেননা, আবু হুরাইরা রা বলেছিলেন, ‘পেটে আর জায়গা নেই।’ আর তাতে রাসুল ﷺ মৌনসম্মতি প্রকাশ করেছেন। তবে পূর্ণ তৃপ্তিভরে আহার করাকে অভ্যাস বানিয়ে ফেলা ঠিক নয়। কেননা, এতে ইবাদতে অলসতাসহ আরও বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
- অভাব লুকানো এবং একান্ত প্রয়োজন হলে সরাসরি প্রকাশ না করে ইশারা-ইঙ্গিতে বোঝানো।
- নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজন ও খাদিমের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর মহানুভবতা।
- রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় অনেক সাহাবি দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন।
- কঠিন অভাবের সময়েও প্রকাশ্যে হাতপাতা থেকে বিরত থাকা এবং নিজ স্বার্থের ওপর রাসুল ﷺ-এর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আবু হুরাইরা রা-এর অতুলনীয় ফজিলত।
- নিমন্ত্রিত ব্যক্তিও নিমন্ত্রণকারীর অনুমতি ব্যতীত তার বাড়িতে প্রবেশ করবে না।^{৮২৮}

আবু হুরাইরা রা বলেন, ‘তিনটি দিন আমার এমন কাটল যে আমি কিছুই খেতে পাইনি। আমি সুফফার দিকে যাওয়ার মনস্থ করলাম। (অত্যধিক দুর্বলতায়) আমি বারবার টলে পড়ছিলাম। বাচ্চাকাচ্চারা চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, “আবু হুরাইরা পাগল হয়ে গেছে।” এরপর আমি উচ্চস্বরে “বরং তোমরাই পাগল” বলতে বলতে সুফফায় পৌঁছালাম।

এরপর রাসুল ﷺ-এর নিকট এক গামলা সারিদ আনা হলে তিনি সুফফাবাসীকে ডেকে আনলেন এবং তারা খানা শুরু করলেন। ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। আমি ইতিউতি করতে লাগলাম যেন তারা আমাকে ডাকেন। কিন্তু গামলার তলায় অল্প কিছু অবশিষ্ট রেখে তারা সবাই খানা শেষ করে উঠে গেলেন। রাসুল ﷺ অবশিষ্ট খাদ্য একত্র করে একটি লুকমা তৈরি করলেন। সেটাকে আঙুলের ওপর নিয়ে আমাকে বললেন, “বিসমিল্লাহ বলে এটা আহার করো।” আল্লাহর শপথ করে বলছি, ওই একটি লুকমা খেয়েই আমি সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম।^{৮২৯}

এই হাদিসে আবু হুরাইরা র.গ. গরিব সাহাবিদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর একটি স্বভাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো, যখন কোনো সাদাকা আসত, তখন রাসুল ﷺ তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এর থেকে কিছুই তিনি গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোনো হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদের দিয়ে দিতেন এবং নিজের জন্যও কিছু রাখতেন এবং এতে তাদের শরিক করতেন।

সালমান র.গ.-এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, সালমান র.গ. বলেন, ‘আমি কিছু জিনিস জমা করে সন্ধ্যায় রাসুল ﷺ-এর দিকে রওনা হলাম। তিনি তখন কুবায়ে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, “আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি একজন ভালো মানুষ এবং আপনার সাথে কতিপয় অভাবগ্রস্ত সঙ্গী আছে। আর আমার কাছে কিছু সাদাকার মাল আছে, আমার মনে হয়েছে আপনারাই এর উপযুক্ত হকদার।” সালমান ফারসি র.গ. বলেন, “আমি তা (সাদাকার মাল) রাসুল ﷺ-এর সামনে রাখলাম। তখন তিনি সঙ্গীদের বললেন, “আহার করো।” কিন্তু তিনি হাত গুটিয়ে রাখলেন। তা থেকে আহার করেননি। আমি মনে মনে বললাম, “(নবুওয়াতের) একটি প্রমাণ পেলাম।” অতঃপর তাঁর কাছ থেকে চলে আসলাম এবং আরও কিছু জিনিস জমা করলাম। ততদিনে রাসুল ﷺ মদিনায় চলে গিয়েছেন। অতঃপর তাঁর কাছে এসে বললাম, “আমি দেখলাম যে, আপনি সাদাকা খান না; তাই

৮২৯. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৬৫৩৩ (শাইখ আলবানি র.গ. হাদিসটিকে জইফ বলেছেন। তালিকাভুক্ত হিসান : ৬৪৯৯)

আপনার সমীপে এগুলো হাদিয়া দিচ্ছি।” তখন রাসুল ﷺ তা থেকে খেলেন এবং সঙ্গীদেরও তাঁর সাথে খাওয়ার নির্দেশ দিলে তাঁরাও তাঁর সাথে খেলেন। তখন আমি মনে মনে বললাম, “(নবুওয়াতের) দুটি প্রমাণ পেলাম...।”^{৮৩০}

সচ্ছল সাহাবীদেরকে নিঃস্বদের সাহায্য করার নির্দেশ দিতেন

ইবনে সিরিন রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুল ﷺ সন্ধ্যাবেলা সুফফাবাসীদেরকে সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। কেউ একজন নিয়ে যেতেন, কেউ দুজন, কেউ তিনজন... এভাবে দশজন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে।’^{৮৩১}

হাসান রাঃ বলেন, ‘এভাবে সবাই নিয়ে যাওয়ার পর যারা থেকে যেতেন, রাসুল ﷺ তাদের নিজের ঘরে নিয়ে যেতেন এবং ঘরে যা আছে, তা দিয়ে আপ্যায়ন করতেন।’^{৮৩২}

ইয়াইশ বিন তিখফা গিফারি রাঃ বলেন, ‘আমার পিতা আসহাবে সুফফার সদস্য ছিলেন। রাসুল ﷺ সাহাবীদেরকে আসহাবে সুফফার লোকদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কেউ একজন, কেউ দুজন... এভাবে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো। অবশেষে আমরা পাঁচজন রয়ে গেলাম। রাসুল ﷺ আমাদের বললেন, “চলো।” আমরা তাঁর সাথে আয়িশা রাঃ-এর ঘরে গেলাম। তিনি বললেন, “আয়িশা, আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো।” তিনি হাশিশা (আটার তৈরি একপ্রকারের খাদ্য, যেটার সাথে খেজুর বা গোশত মিশিয়ে দেওয়া হয়) পরিবেশন করলেন এবং আমরা খেলাম। অতঃপর তিনি কবুতরের মতো^{৮৩৩} সামান্য হায়সা (খেজুর, ময়দা, পনির ও ঘিয়ের মিশেলে তৈরি একপ্রকার খাবার) নিয়ে আসলেন আর আমরা খেলাম। অতঃপর রাসুল ﷺ বললেন, “আয়িশা, এবার আমাদের পান করাও।” তিনি একটি বড় পাত্রে দুধ নিয়ে আসলেন আর আমরা পান করলাম। অতঃপর তিনি দুধভর্তি একটি ছোট পেয়ালা নিয়ে আসলেন আর আমরা তা পান করলাম।

৮৩০. মুসনাদু আহমাদ : ২৩২২৫।

৮৩১. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৭১৫৪।

৮৩২. শুআবুল ইমান : ১০৩৩৩।

৮৩৩. কবুতরের মতো বলার দ্বারা হায়সার পরিমাণ কম হওয়া উদ্দেশ্য।

অতঃপর রাসুল ﷺ বললেন, “তোমরা চাইলে এখানে রাত কাটাতে পারো অথবা মসজিদে ফিরে যেতে পারো।” আমরা বললাম, “আমরা বরং মসজিদেই ফিরে যাই।”^{৮৩৪}

অভাবগ্রস্তদের দান করতে সাহাবিগণকে উৎসাহিত করতেন

আব্দুর রহমান বিন আবু বকর ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত যে, ‘আসহাবে সুফফার সদস্যরা খুবই দরিদ্র লোক ছিলেন। একদিন রাসুল ﷺ বললেন :

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ
أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ

“যার কাছে দুজনের খাবার আছে, সে তিনজন নিয়ে যাও; আর যার কাছে চারজনের খাবার আছে, সে পাঁচ কি ছয়জন নিয়ে যাও।”

রাসুল ﷺ দশজন সাথে নিয়ে আসেন এবং আবু বকর ﷺ তিনজন নিয়ে আসেন।’

আব্দুর রহমান ﷺ বলেন, ‘আমাদের ঘরে ও আবু বকর ﷺ-এর ঘরে আমি, আমার পিতা, মাতা, আমার স্ত্রী ও খাদিম ছিলাম।

আমার পিতা রাতে রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলতেন। তিনি সেখানে চলে গেলেন আর আমাকে বলে গেলেন, “হে আব্দুর রহমান, আমি ফেরার পূর্বেই মেহমানদের আপ্যায়ন সম্পন্ন করে নিয়ো।”

সন্ধ্যা হলে আমি মেহমানদের খাবারের ব্যবস্থা করলে তারা খেতে অসম্মতি জানালেন। তারা বললেন, “বাড়ির কর্তা আসুক, তারপর একসাথে খাব।”

আমি তাদের বললাম, “তিনি খুব কড়া মানুষ, আপনারা না খেলে তিনি আমাকে মারবেন।” কিন্তু তারা তবুও খেতে অস্বীকৃতি জানালেন।’

আব্দুর রহমান ﷺ বলেন, ‘আবু বকর ﷺ ওই রাতে রাসুল ﷺ-এর বাড়িতে রাতের খাবার খেয়ে নিলেন এবং ইশার নামাজ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান

করলেন। ইশার নামাজের পর পুনরায় রাসুল ﷺ-এর ঘরে গমন করলেন। রাসুল ﷺ-এর তন্দ্রা আসা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। অবশেষে অনেক রাত পর বাড়িতে আসলেন।

স্ত্রী (উম্মে আব্দুর রহমান ؓ) বললেন, “মেহমান পাঠিয়ে এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?” তিনি বললেন, “তাদের এখনো খানা দাওনি?” স্ত্রী বললেন, “আপনাকে ছাড়া তারা খাবেন না। অনেক অনুরোধ করা হয়েছে, কিন্তু তারা আপন সিদ্ধান্তে অনড়।”

আব্দুর রহমান ؓ বলেন, ‘আমি (অবস্থা বেগতিক দেখে) তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম।’

তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে “ওহে নির্বোধ, মাথামোটা!” এ বলে আমাকে অনেক শাসালেন আর বললেন, “ওহে নির্বোধ, তোমাকে আমি কসম দিয়ে বলছি, এখানে আসো, আমার কথা শোনো।” আমি এসে বললাম, “আমার কোনো অপরাধ নেই। আপনার মেহমানদের জিজ্ঞেস করেই দেখুন যে, আমি তাদের খাবার পরিবেশন করেছিলাম, কিন্তু তারাই আপনাকে ছাড়া খেতে অস্বীকার করেছেন।”

মেহমানগণ বললেন, “ও আপনাকে সত্য কথাই বলেছে।”

তিনি বললেন, “আপনাদের অবশ্যই আমার মেহমানদারি কবুল করতে হবে, তবে কসম আল্লাহর, আজ রাতে আমি আর খাব না।”

তারা বললেন, “আল্লাহর কসম, আপনি না খেলে আমরা খাবার মুখে দেবো না।”

আবু বকর ؓ বললেন, “(আমার শপথ) শয়তানের পক্ষ থেকে এসেছে।” অতঃপর তিনি খানা আনলেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। মেহমানরাও তাঁর সাথে খেলেন।’

আব্দুর রহমান বলেন, ‘আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা পাত্র থেকে একটি লুকমা নিলেই নিচ থেকে তার চেয়ে খাবার বেড়ে যেতে লাগল। এমনকি

আমরা সবাই যখন পরিতৃপ্ত হলাম, তখনও পূর্বের চেয়ে অধিক খাবার অবশিষ্ট রয়ে গেল।

আবু বকর রাঃ খাবারের প্রতি তাকালেন। তখন তাঁর কাছে খাবার পূর্বের ন্যায় অবশিষ্ট আছে বা তার চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে মনে হলো।

তা দেখে স্ত্রীকে বললেন, “কী ব্যাপার, হে বনু ফিরাসের বোন?”

তিনি বললেন, “আমার চোখের প্রশান্তির কসম, এখন এ তো খেতে শুরু করার আগের চেয়ে অনেক বেশি!”

অতঃপর তিনি তা রাসুল সঃ-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তখনও খাবারের পাত্র পূর্বের মতো পূর্ণ ছিল।

আবু বকর রাঃ বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, (এ খাবার খেয়ে) তারা পুণ্য অর্জন করেছে, কিন্তু আমি শপথ ভঙ্গ করেছি।”

রাসুল সঃ বললেন, “না, বরং তুমিই তাদের চেয়ে পুণ্যবান ও উত্তম। কারণ, তুমি তোমার সেই শপথ ভঙ্গ করেছ, যা ভঙ্গ করা তোমার জন্য উচিত ও কল্যাণকর ছিল। সুতরাং এ দিক দিয়ে তুমি তাদের চেয়ে উত্তম কাজ করেছ।”

আব্দুর রহমান রাঃ বলেন, ‘আমাদের (মুসলমানদের) ও অন্য একটি গোত্রের মধ্যে সন্ধি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে তাদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের বারোজনকে নেতা মনোনীত করা হলো। প্রত্যেক নেতার অধীনে আবার কয়েকজন করে লোক ছিল। আল্লাহই ভালো জানেন, তাদের প্রত্যেকের সাথে কতজন করে দেওয়া হয়েছিল। এ খাবার তাদের নিকট পাঠানো হলে তাদের প্রত্যেকেই তা থেকে আহার করলেন।’^{৮৩৫}

► হাদিস থেকে শিক্ষা

- তৃপ্তিভরে খাওয়ার ক্ষেত্রে গরিবদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা মুসতাহাব। এ জন্য যার কাছে দুজনের খাবার

৮৩৫. পুরা ঘটনাটি সহিহ বুখারির কয়েকটি রিওয়ায়াত (৬০২, ৩৫৮১, ৬১৪১); সহিহ মুসলিমের ২০৭৫ ও মুসনাদে আহমাদের ১৭১৪ নং রিওয়ায়াতের সমন্বয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আছে, তাকে তিনজন নিয়ে যেতে এবং যার কাছে চারজনের খাবার আছে, তাকে পাঁচজন নিয়ে যেতে আদেশ করেছেন।

- আল্লাহর বন্ধুদের প্রতি তাঁর অসীম করুণার প্রমাণ।
- অগ্রাধিকার দেওয়া ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করার ফজিলত। আর যখন মেহমানের সংখ্যা বেশি হয়, তখন সমাজের লোকদের উচিত হলো, মেহমানদের ভাগ করে নেওয়া এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়িতে মেহমান নিয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে সমাজের নেতা তার জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন এবং তিনিও যথাসাধ্য মেহমান নিয়ে যাবেন।
- গরিবদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়লে মসজিদে আশ্রয় নেবে। তবে শর্ত হলো, এতে মুসল্লিদের ওপর সাহায্য করার ওপর কোনো প্রকার চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।
- কঠিন ক্ষুধার মধ্যেও দায়িত্ব পালন করা।
- স্ত্রী, সন্তান ও মেহমানদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাবারের ব্যবস্থা করে তাদের নিকট থেকে অনুপস্থিত থাকা বৈধ।
- (গৃহকর্তার সাধারণ অনুমতি থাকলে) গৃহকর্তা গৃহকর্তার বিশেষ অনুমতি ব্যতীত মেহমানের জন্য খাবার পরিবেশন করতে পারবে।
- শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং ভালো কাজের অনুশীলন করানোর স্বার্থে পিতা তার সন্তানদের শাসাতে পারবে।
- বৈধ কাজ না করার ওপর শপথ করা জায়েজ।
- সত্যবাদী পুরুষ শপথের মাধ্যমে তার সংবাদকে পোক্ত করে।
- শপথের পর তা ভঙ্গ করা বৈধ।
- বরকত প্রকাশ পাওয়া খাদ্য বড়দের সমীপে পাঠানো এবং তারা তা গ্রহণ করা।
- প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে কাজ করা। কারণ আবু বকর রাঃ প্রবল ধারণা করেছিলেন যে, আব্দুর রহমান রাঃ মেহমানদারি করার ক্ষেত্রে

শিথিলতা করেছেন। তাই বাড়িতে এসেই তাকে বকলেন। আব্দুর রহমান -এর চুপিসারে কেটে পড়া তার ধারণাকে আরও প্রবল করেছিল।

- রাসুল  অধিক ফজিলতপূর্ণ বিষয় অবলম্বন করতেন এবং বদান্যতার প্রতি সবার আগে অগ্রসর হতেন। ওই রাতে রাসুল -এর বাড়িতে মেহমানের সংখ্যা তাঁর পরিবারের সদস্যসংখ্যার প্রায় সমান ছিল।^{৮৩৬}

দরিদ্রদের মাঝে নিজের খাবার ভাগ করে দিতেন

মিকদাদ বিন আমর  বলেন, ‘আমি ও আমার এক বন্ধু (মদিনায়) এলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। আমরা মানুষের কাছে নিজেদের পেশ করতে লাগলাম। কেউই আমাদের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করল না। অতঃপর আমরা রাসুল -এর নিকট এলাম। বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা খুবই ক্ষুধার্ত। লোকদের নিকট গিয়েছিলাম, কেউ আমাদের মেহমানদারি করতে রাজি হয়নি। তাই আপনার নিকট আসলাম।”

তখন তিনি আমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনটি মেষ ছিল। নবিজি  বললেন, “তোমরা দুধ দোহন করবে। এ দুধ আমরা ভাগ করে পান করব।” এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ পান করত। আর আমরা নবিজি -এর জন্য তাঁর অংশ তুলে রাখতাম।’

মিকদাদ বলেন, ‘তিনি রাতে আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন, যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হয় আর জাগ্রত ব্যক্তি শুনতে পায়। এরপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করতেন এবং ফিরে এসে দুধ পান করতেন। এক রাতে আমার কাছে শয়তান এল। আমি তখন আমার অংশ পান করে ফেলেছিলাম। সে বলল, “মুহাম্মাদ আনসারিদের কাছে গেলে তারা তাকে হাদিয়া দিয়ে থাকে এবং তাদের কাছে তিনি খেয়েও থাকেন। তার এ সামান্য দুধের প্রয়োজন নেই।” তখন আমি এসে সেটুকুও পান করে ফেললাম। দুধ

^{৮৩৬}. ফাতহুল বারি (ইবনে হাজার) : ৬/৬০০, ফাতহুল বারি (ইবনে রজব) : ৪/১৭৫, ইমাম নববি  কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১৪/১৮।

যখন ভালোভাবে আমার পেটে প্রবেশ করল এবং আমি বুঝলাম, এ দুধ বের করার আর কোনো উপায় নেই, তখন শয়তান আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বলল, “তোমার সর্বনাশ হোক তুমি কী কাণ্ড করলে! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুধ পান করে ফেলেছ? তিনি এসে যখন তা পাবেন না, তখন তোমার ওপর বদদোয়া করবেন। তাতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে।”

আমার গায়ে ছিল একটা চাদর। এটি এত ছোট যে পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে আবার মাথা আবৃত করতে গেলে পা দেখা যায়। আমার ঘুম আসছিল না। আমার সঙ্গীদ্বয় ঘুমাচ্ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি।

এরপর নবিজি ﷺ এসে যেভাবে সালাম দিতেন, সেভাবেই সালাম দিলেন। তারপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করলেন। এরপর দুধের কাছে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি তাঁর মাথা আসমানের দিকে তুললেন। আমি তখন (মনে মনে) বললাম, “এখনই তিনি আমার ওপর বদদোয়া করবেন, আর আমি ধ্বংস হয়ে যাব।” তিনি বললেন, “হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি আমাকে আহার করায়, তাকে তুমি আহার করাও। আর যে আমাকে পান করায়, তাকে তুমি পান করাও।”

মিকদাদ ﷺ বলেন, ‘এ সময় আমি চাদরটি নিয়ে শরীরে বাঁধলাম, আর একটি ছুরি নিলাম, তারপর (এই ভেবে) মেষগুলির কাছে গেলাম যে, এগুলোর মাঝে যেটি সবচেয়ে মোটাতাজা, আমি সেটি রাসূল ﷺ-এর জন্য জবাই করব। গিয়ে দেখলাম, সেটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্য সব মেষও দুধে পরিপূর্ণ। এরপর আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের একটি পাত্র নিয়ে এলাম, যাতে তাঁরা দুধ দোহানোর কথা ভাবতেন না (পাত্রটি বড় হওয়ার কারণে)।

আমি তাতেই দুধ দোহন করলাম, এমনকি পাত্রের ওপরিভাগে ফেনা ভেসে উঠল। এরপর আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি বললেন, “তোমরা কি রাতের দুধ পান করেছ?” আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি পান করুন।” তিনি পান করলেন, এরপর আমাকে দিলেন। আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি পান করুন।” তিনি পান করে আবার আমাকে দিলেন।

যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, নবিজি ﷺ পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং আমি তাঁর দোয়া পেয়ে গেছি, তখন আমি হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে গেলাম।

নবিজি ﷺ বললেন, “হে মিকদাদ, এটি তাহলে তোমার কাজ?” তখন আমি বললাম, “ইয়া রাসুল্লাহ, আমি এই এই কাজ করেছি।” তখন নবিজি ﷺ বললেন, “এটা একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানি। তুমি কেন আমাকে অবহিত করলে না? আমরা আমাদের সাথিদ্বয়কে জাগ্রত করতাম, তাহলে তারাও এর ভাগ পেত।”

আমি তখন বললাম, “সে মহান সত্তার শপথ—যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আপনি যখন পেয়েছেন এবং আমি যখন আপনার সাথে ভাগ পেয়েছি, তখন অন্য কোনো লোক পেয়েছি কি পায়নি, তার পরোয়া করি না।”^{৮৩৭}

সালমান ফারসি ؓ-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনিতেও বর্ণিত হয়েছে যে, ‘যখন তিনি রাসুল ﷺ-কে কিছু খাবার হাদিয়া দিলেন, তখন রাসুল ﷺ সেখান থেকে খেলেন এবং সাহাবিদেরকেও তাঁর সাথে খাওয়ালেন।’^{৮৩৮}

নিজে সাহায্য করতে না পারলে অন্যের কাছে পাঠাতেন

আবু হুরাইরা ؓ বলেন, ‘এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, “আমি খুব ক্ষুধার্ত।” তিনি তাঁর কোনো এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন, “সেই সত্তার শপথ—যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই।” তিনি অন্য এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনিও একই কথা বললেন। এভাবে তাঁরা সকলে একই কথা বললেন, ‘সেই সত্তার শপথ—যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আমার নিকট পানি ছাড়া আর কিছুই নেই।’

তখন রাসুল ﷺ বললেন :

أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ

৮৩৭. সহিহ মুসলিম : ২০৫৫।

৮৩৮. মুসনাদু আহমাদ : ২৩২২৫।

“কোনো ব্যক্তি কি নেই, যে আজ রাতে লোকটির মেহমানদারি করবে? আল্লাহ তার ওপর রহম করবেন।”

এ সময় জনৈক আনসারি ব্যক্তি উঠে বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, আমি করব।” এ বলে তিনি মেহমানকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, “রাসুল ﷺ-এর মেহমানকে সম্মান করো।” স্ত্রী বললেন, “বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত আমাদের ঘরে তো আর কিছুই নেই।” আনসারি বললেন, “তুমি আহার প্রস্তুত করো এবং চেরাগ জ্বালিয়ে রাখো। আর বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর যখন মেহমান প্রবেশ করবেন, তখন চেরাগ সেখানে রাখবে। তাকে বোঝাবে যে, আমরাও আহার করছি। মেহমান যখন খাওয়া শুরু করবে, তখন তুমি চেরাগের কাছে গিয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে।”

(স্বামীর কথা অনুযায়ী) স্ত্রী চেরাগ জ্বালালেন, বাচ্চাদের ঘুম পাড়ালেন এবং সামান্য খাবার যা ছিল, তা উপস্থিত করলেন। (তারপর মেহমানসহ তারা খেতে বসলেন।) তখন চেরাগ ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে তা নিভিয়ে দিলেন এবং মেহমানকে বোঝাতে থাকলেন যে, তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন।

এভাবে তারা উভয়ে (বাচ্চারাসহ) সারা রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকলেন।

সকালে যখন রাসুল ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, “আল্লাহ তাআলা তোমাদের গতকালের কার্যকলাপ দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা (বলেছেন) খুশি হয়েছেন।” এবং আয়াত নাজিল করেছেন :

{وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

“(আনসারদের অন্যতম গুণ হলো এই) তারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর যাদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।”^{৮৩৯-৮৪০}

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর কাছে অভিন্ন প্রয়োজন নিয়ে দুই ব্যক্তি আগমন করলেন। তাদের একজন কথা বললেন। তখন রাসুল ﷺ তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ পেলেন। তিনি বললেন, “তুমি কি মিসওয়াক করো না?” লোকটি বললেন, “অবশ্যই করি, কিন্তু (দুর্গন্ধ বের হওয়ার কারণ হলো) আমি তিন দিন ধরে খানা খাইনি।”

তখন রাসুল ﷺ একজন সাহাবিকে নির্দেশ দিলে তিনি তাদের নিয়ে গেলেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিলেন।”^{৮৪১}

তাদের কষ্ট ভাগ করে নিতেন

সিমাক বিন হারব ؓ বলেন, ‘নুমান ؓ-কে বক্তৃতারত অবস্থায় আমি বলতে শুনেছি, উমর ؓ বলেছেন :

مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ دَقْلًا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ»

“মানুষ কী পরিমাণ দুনিয়া কামাই করেছে। অথচ রাসুল ﷺ-কে আমি দেখেছি যে, তিনি ক্ষুধার তাড়নায় সারা দিন অস্থির থাকতেন। পেট ভরার মতো নিম্নমানের একটি খেজুরও তিনি (খেতে) পেতেন না।”^{৮৪২}

আবু হাজিম ؓ বলেন, ‘আমি আবু হুরাইরা ؓ-কে তাঁর আঙুল দ্বারা কয়েকবার ইশারা করে বলতে শুনেছি—

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

“সেই সত্তার কসম—যার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ, লাগাতার তিন দিন পর্যন্ত আল্লাহর নবি ﷺ ও তাঁর পরিবার গমের রুটি দ্বারা

৮৪১. মুসনাদু আহমাদ : ২৪০৫।

৮৪২. সহিহ মুসলিম : ২৯৭৮।

কখনো পরিতৃপ্ত হননি। এমতাবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।”^{৮৪৩}

সহিহ বুখারির বর্ণনায় আছে—

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ

‘মৃত্যু পর্যন্ত কখনো রাসুল ﷺ-এর পরিবার লাগাতার তিন দিন পরিপূর্ণ তৃপ্তিভরে খাবার খাননি।’^{৮৪৪}

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘তিনি উরওয়া রাঃ-কে বললেন :

ابْنُ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ

“ভাগিনা, আমরা (মাসের) নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দুই মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রাসুল ﷺ-এর কোনো ঘরেই (চুলায়) আগুন জ্বালানো হতো না।”

উরওয়া রাঃ বলেন, ‘আমি জিজ্ঞেস করলাম, “খালা, আপনারা তাহলে কী খেয়ে জীবনযাপন করতেন?” তিনি বললেন :

الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَانِهِمْ، فَيَسْقِينَا

“দুটি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর আর পানি খেয়েই আমরা জীবনযাপন করতাম। অবশ্য কয়েক ঘর আনসারি পরিবার রাসুল ﷺ-এর প্রতিবেশী ছিল। তাঁদের কিছু হাদিয়ার উটনী ও বকরি ছিল।

৮৪৩. সহিহ মুসলিম : ২৯৭৬।

৮৪৪. সহিহল বুখারি : ৫৩৭৪।

তারা রাসুল ﷺ-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত। তিনি আমাদের তা পান করতে দিতেন।”^{৮৪৫}

‘হাদিয়ার পশু’ বলে বোঝানো হচ্ছে, এমন সব পশু যেগুলোকে মালিক কিছুদিনের জন্য অন্যকে হাদিয়াস্বরূপ দিয়ে দেয়। আর সে পশুর দুধ, বাচ্চা ও পশম থেকে লোকটি উপকৃত হয়। তারপর নির্দিষ্ট সময় পর মালিককে আবার ফেরত দেয়।

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

لَقَدْ تُوِّفِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ، حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكَلَّتُهُ فَفَنَيْتُ

‘যখন নবিজি ﷺ ইনতিকাল করেন, তখন আমার পাত্রে সামান্য কিছু যব ব্যতীত কোনো কলিজাধারী (প্রাণী) খেতে পারে—এমন কিছু ছিল না। আমি তা থেকে (পরিমাপ না করে) খেতাম। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমি তা পরিমাপ করে দেখলাম। ফলে তা শেষ হয়ে গেল।’^{৮৪৬}

আয়িশা রা. বলেন :

مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمُرٌّ

‘মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের লোকেরা একদিনে দুবেলা খাবার খেলে একবেলায় কেবল খেজুর থাকত।’^{৮৪৭}

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা.এর সূত্রে খন্দক খনন করার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, ‘খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা পরিখা খনন করেছিলাম।

৮৪৫. সহিহুল বুখারি : ৫৩৭৪, সহিহ মুসলিম : ২৯৭২।

৮৪৬. সহিহুল বুখারি : ৬৪৫১, সহিহ মুসলিম : ২৯৭৩।

৮৪৭. সহিহুল বুখারি : ৬৪৫৫।

এ সময় একখণ্ড শক্ত পাথর বেরিয়ে আসলে (যা ভাঙা যাচ্ছিল না) সকলেই রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, “খন্দকের মাঝে একখণ্ড শক্ত পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা ভাঙতে পারছি না)।” এ কথা শুনে তিনি বললেন, “আমি নিজেই খন্দকে অবতরণ করব।” এরপর তিনি দাঁড়ালেন। এ সময় তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত অনাহারী ছিলাম। কোনো কিছুর স্বাদও গ্রহণ করিনি। তখন রাসুল ﷺ একখানা কোদাল হাতে নিয়ে প্রস্তরখণ্ডে আঘাত করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হলো...।’^{৮৪৮}

আবু তালহা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা রাসুল ﷺ-এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং আমাদের পেটের কাপড় সরিয়ে প্রত্যেকের পেটে একটি করে পাথর (বাঁধা) দেখালাম। তখন রাসুল ﷺ তাঁর পেটের কাপড় সরিয়ে দুটি পাথর (বাঁধা) দেখালেন।’^{৮৪৯}

গরিবদের সাথে মিলেমিশে থাকতে নির্দেশ দিতেন

বিশিষ্ট তাবি তাবিয়ি উসমান বিন ইয়ামান রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘মদিনাতে যখন মুহাজিরদের সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন তাঁদের অনেকে থাকার জন্য ঘর বা স্থান পাননি। তখন রাসুল ﷺ মসজিদে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং তাঁদের নামকরণ করলেন “আসহাবে সুফফা”। রাসুল ﷺ তাঁদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার সাথে ওঠাবসা ও মেলামেশা করতেন।’^{৮৫০}

তাঁদের সাথে রাসুল ﷺ-এর আন্তরিক ওঠাবসা তাঁদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ। এটা মূলত আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত নির্দেশের আনুগত্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

৮৪৮. সহিহুল বুখারি : ৪১০১, সহিহ মুসলিম : ২০৩৯।

৮৪৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৭১।

৮৫০. বাইহাকি : ৪১৩৫।

‘আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ডাকে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।’^{৮৫১}

সাদি  বলেন, ‘এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি মুহাম্মাদ  এবং তাঁর সকল উম্মতকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নিজেদেরকে সৎকর্মশীল মুমিন বান্দাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখেন, যারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদতে মাশগুল থাকে। হোক তারা গরিব, তবুও তাদের সাথে উত্তমরূপে মেলামেশা ও ওঠাবসা বজায় রাখতে হবে। কারণ, তাদের সংসর্গে অগণিত উপকারিতা রয়েছে।

‘তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না’—অর্থাৎ সর্বদা তাদের প্রতি খেয়াল রাখবেন এবং কখনো তাদের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করা বাদ দেবেন না।

‘আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে’—কারণ, পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে একনিষ্ঠ সৎকর্মশীল মুমিনদের সংসর্গ পরিত্যাগ করলে অনেক অপকারিতা বয়ে আনে এবং অনেক দ্বীনি ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা, তা অন্তরকে দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে বিধায় সকল ধ্যান-জ্ঞান দুনিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এবং কলব থেকে আখিরাতে প্রতি আগ্রহ চলে যায়। কারণ, দুনিয়ার চাকচিক্য চোখ অন্ধ করে দেয়, বিবেককে অকেজো করে দেয়; ফলে হৃদয় আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল হয়ে পড়ে এবং অবৈধ স্বাদ ও আসক্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ফলে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, স্থায়ীভাবে লজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

‘যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে’—অর্থাৎ প্রবৃত্তি যা চায়, তা-ই করে; যদিও তাতে ধ্বংস ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। প্রবৃত্তিকেই সে নিজের মাবুদ বানিয়ে নেয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

‘আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনেগুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা করো না?’^{৮৫২}

‘যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা’—অর্থাৎ যার পার্থিব ও দ্বীনি সকল বিষয় কল্যাণবঞ্চিত।

এ ধরনের লোকের আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তার আনুগত্য তার অনুসরণের দিকে নিয়ে যায় এবং সে তার অনুগত ব্যক্তিকেও তারই মতো করার চেষ্টা করে।^{৮৫৩}

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا
عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

‘আর তাদের বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাকে, তাঁর সম্ভ্রুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।’^{৮৫৪}

৮৫২. সূরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ২৩।

৮৫৩. তাফসিরুস সাদি : ১/৪৭৫।

৮৫৪. সূরা আল-আনআম, ৬ : ৫২।

সাদি   বলেন, ‘অর্থাৎ অন্য লোকদের আপনার মজলিসে জায়গা দেওয়ার জন্য আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদতকারী লোকদের আপনার মজলিস থেকে বিতাড়িত করবেন না। কেননা, তারা ইবাদত, জিকির, নামাজ ইত্যাদির মাধ্যমে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে ডাকে। তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করে; ইবাদতের মাধ্যমে তারা পার্থিব স্বার্থ অন্বেষণ করে না।

কাজেই তাদের এড়িয়ে চলা ও বিতাড়ন করা যাবে না; বরং তাদের ভালোবাসতে হবে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে এবং তাদের কাছাকাছি রাখতে হবে। কারণ, তারা গরিব হতে পারে, কিন্তু তারা সৃষ্টির সেরা ও বাছাই করা জীব। মানুষের দৃষ্টিতে তারা নিম্নশ্রেণির লোক হলেও বাস্তবে তারা উচ্চশ্রেণির লোক।

“তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয়”—অর্থাৎ যার যার ভালো-মন্দের হিসাব তার তার থেকে নেওয়া হবে। তাই তাদের বিতাড়িত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবুও যদি আপনি তা করেন, তাহলে আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।

আল্লাহর এই নির্দেশ রাসুল   অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তিনি যখন দরিদ্র শ্রেণির মুমিনদের সাথে বসতেন, তখন ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতেন। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করতেন। তাদের প্রতি উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন এবং তাদের তাঁর কাছাকাছি বসাতেন। শুধু তা-ই নয়, রাসুল  -এর মজলিসে গরিব শ্রেণির লোকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।’^{৮৫৫}

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পটভূমি হলো, আরবের উচ্চবিত্ত লোকদের এক দল ইসলামের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। এর কারণ হিসেবে তারা জানাল, ‘মুহাম্মাদ  -এর কাছে বিলাল, সুহাইব, আম্মার, খাব্বাব, সালমান ও ইবনে মাসউদ প্রমুখের মতো নিতান্ত দরিদ্র শ্রেণির

লোকদের আসা-যাওয়া আছে। দারিদ্র্যের কারণে তাদের শরীরের কাপড় থেকে ঘামের দুর্গন্ধ বের হয়। এমন লোকদের সাথে কুরাইশের মহান মহান নেতারা কী করে একই মজলিসে বসতে পারে!?’

তাই তারা রাসুল ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করল, তিনি যেন এই দরিদ্র শ্রেণির লোকদের তাঁর কাছ থেকে তাড়িয়ে দেন। রাসুল ﷺ তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দিলেন এবং বললেন :

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

‘আমি কিন্তু ইমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার সাক্ষাৎ লাভ করবে। বরং তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় হিসেবে দেখছি।’^{৮৫৬}

তখন তারা সুর পালটিয়ে অনুরোধ করল, ‘তাহলে তাদের জন্য আলাদা মজলিসের ব্যবস্থা করা হোক এবং উচ্চবিত্ত লোকদের জন্য আলাদা মজলিসের ব্যবস্থা করা হোক, যেখানে দরিদ্র শ্রেণির লোক থাকবে না। যেন জাহিলি সমাজের মতো ইসলামি সমাজেও কুরাইশ নেতাদের আভিজাত্য, বিশেষত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।’

রাসুল ﷺ তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার আশায় তাদের অনুরোধে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। তখন আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হলো :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

‘আর তাদের বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও

তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।”^{৮৫৭}

ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন, ‘কুরাইশের একটি দল রাসুল সঃ-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসুল সঃ-এর পাশে সুহাইব, বিলাল, আম্মার, খাব্বাব রাঃ-সহ আরও কয়েকজন গরিব মুসলমান বসা ছিলেন। তা দেখে তারা বলল, “হে মুহাম্মাদ, তোমার সম্প্রদায় থেকে এই (নিম্নশ্রেণির) লোকদের নিয়েই কি তুমি সন্তুষ্ট? এরাই কি সেই লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন? আমাদের কি এমন লোকদের অনুসরণ করতে হবে? তুমি তাদের তাড়িয়ে দাও, তখন আমরা তোমাকে অনুসরণ করার কথা ভেবে দেখব।”

তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করলেন :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ...

“আর তাদের বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।...”^{৮৫৮}

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ বর্ণনা করেন, ‘একদা রাসুল সঃ-এর সাথে আমি, ইবনে মাসউদ, হুজাইল গোত্রের এক ব্যক্তি, বিলাল, আরও দুজন লোক যাদের নাম আমি জানি না—মোট ছয়জন ছিলাম। তখন মুশরিকরা নবিজি সঃ-কে বলল, “এদের তাড়িয়ে দাও; আমাদের ওপর স্পর্ধা দেখানোর অধিকার তাদের নেই।”

তখন রাসুল সঃ মনে মনে কী যেন ভাবছিলেন, তখনই আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করলেন :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ...

“আর তাদের বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।...”^{৮৫৯}

৮৫৭. সূরা আল-আনআম, ৬ : ৫২।

৮৫৮. তাফসিরুত তাবারি : ১১/৩৭৪।

৮৫৯. সহিহ মুসলিম : ২৪১৩।

আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, ‘একদা দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, “ধনী লোকেরা উচ্চ মর্যাদা ও নিয়ামত নিয়ে গেল।” তিনি বললেন, “তা কেমন করে?” তারা বললেন, “তারা নামাজ আদায় করে যে রূপ আমরা নামাজ আদায় করি, তারা রোজা রাখে যে রূপ আমরা রোজা রাখি। কিন্তু তারা সাদাকা করে, আমরা সাদাকা করতে পারি না। তারা (দাস-দাসী) আজাদ করে, আমরা আজাদ করতে পারি না।” (সহিহ বুখারির বর্ণনায় : “তাদের সম্পদ বেশি, তাই তারা হজ করতে পারে, উমরা করতে পারে, জিহাদ করতে পারে এবং সাদাকা করতে পারে।”)

রাসূল ﷺ বললেন :

أَفَلَا أَعَلَّمَكُم شَيْئًا تَذَرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ
بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا
صَنَعْتُمْ؟

“আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিক্ষা দেবো না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রগামীদের মর্যাদা লাভ করবে এবং অন্যদের থেকে অগ্রগামী থাকবে; আর তোমাদের অপেক্ষা কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না—অবশ্য যারা তোমাদের মতো করবে, তাদের কথা ভিন্ন?”

তারা বললেন, “নিশ্চয়ই, ইয়া রাসুলাল্লাহ!” তিনি বললেন :

تَسْبِحُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتُحَمِّدُونَ، ذُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً

“প্রত্যেক (ফরজ) নামাজের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার এবং তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ বলবে।”

এরপর দরিদ্র মুহাজিররা রাসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে এলেন এবং বললেন, “আমাদের ধনী ভাইয়েরা আমাদের আমলের বিষয়টি শুনে ফেলেছেন এবং তারাও আমাদের মতো আমল করা শুরু করেছেন। তিনি বললেন :

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

“এটা আল্লাহর দান—তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।”^{৮৬০}

আল্লাহর কাছে গরিব ও নিঃস্বদের ভালোবাসা কামনা করতেন

নামাজের মধ্যে তিনি দোয়া করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ،
وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সৎকর্ম করা ও মন্দকর্ম পরিত্যাগ করার তাওফিক কামনা করছি। আপনার কাছে নিঃস্বদের ভালোবাসা কামনা করছি। আর আপনি যখন আপনার বান্দাদের সাথে ফিতনার ইচ্ছা করবেন, তখন আমাকে আপনার কাছে তুলে নিয়েন, যেন ফিতনায় জড়িয়ে না পড়ি।’^{৮৬১}

নিঃস্বদের ভালোবাসতে ও তাদের পাশে রাখতে নির্দেশ দিতেন

আবু জার গিফারি  বলেন :

أَمَرَنِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: « أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ،
وَالدُّنُو مِنْهُمْ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ
فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرْتُ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا
شَيْئًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي
اللَّهِ لَوْمَةً لَا ئِيمٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ،
فَإِنَّهُمْ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ

‘আমার বন্ধু আমাকে সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন : ১. গরিবদের ভালোবাসতে ও তাদের পাশে থাকতে। ২. আমার চেয়ে নিম্ন স্তরের

৮৬০. সহিহুল বুখারি : ৮৪৩, সহিহ মুসলিম : ৫৯৫।

৮৬১. সুনানুত তিরমিজি : ৩২৩৩।

লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে এবং উচ্চ স্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করতে । ৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে—যদিও অন্যরা তা ভঙ্গ করে । ৪. কারও কাছে হাত না পাততে । ৫. সত্য বলতে—তা যতই তিক্ত হোক । ৬. আল্লাহর বিধান মানতে গিয়ে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া না করতে । ৭. অধিক হারে “লা হাওয়া ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” পড়তে—কেননা, এটি আরশের নিচে অবস্থিত গুপ্তধনের অংশ ।’^{৮৬২}

গরিবদের স্মরণ করতেন এবং খোঁজখবর নিতেন

আবু উমামা সাহল বিন হানিফ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘এক অসহায় মহিলা অসুস্থ হলে রাসুল ﷺ-কে তার অসুস্থতা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হলো । রাসুল ﷺ অসহায় ও নিঃস্বদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন ।

রাসুল ﷺ বললেন, “যদি সে (অসহায় মহিলা) মারা যায়, তবে আমাকে সংবাদ দিয়ো ।”

(অতঃপর সে মারা গেলে) রাতেই তার জানাজা পড়া হলো । সাহাবায়ে কিরাম রাসুল ﷺ-কে জাগানো সমীচীন মনে করলেন না । সকালে রাসুল ﷺ-কে ঘটনা জানানো হলে তিনি বললেন, “আমি কি তোমাদের আমাকে সংবাদ দিতে বলিনি?”

তাঁরা বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা আপনাকে রাতে জাগানো সমীচীন মনে করিনি ।”

অতঃপর রাসুল ﷺ তার কবরের পাশে গিয়ে লোকজন নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং চারটি তাকবির বললেন (জানাজার নামাজ পড়লেন) ।’^{৮৬৩}

৮৬২. মুসনাদু আহমাদ : ২১৪১৫ ।

৮৬৩. মুয়াত্তা মালিক : ৫৩১, সুনানুন নাসায়ি : ১৯০৭ । এমন ঘটনা সহিহ বুখারিতে (৪৮৫) ও সহিহ মুসলিমে (৯৫৬) আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে ।

একেবারে রিঙহস্ত গরিব যারা, তাদের গুরুত্ব দিতেন

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর সাথে তাবুক অভিযানের সময় একদিন মধ্যরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

সেনাছাউনির একপার্শ্বে আগুন জ্বলতে দেখে আমি সেদিকে গেলাম। সেখানে রাসুল ﷺ, আবু বকর ؓ ও উমর ؓ-কে দেখতে পেলাম। আরও দেখতে পেলাম যে, আব্দুল্লাহ জুল বিজাদাইন আল-মুজানি ؓ ইনতিকাল করেছেন এবং তাঁরা তার জন্য কবর খনন করেছেন। রাসুল ﷺ কবরে অবতরণ করলেন আর আবু বকর ও উমর ؓ তাকে তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছিলেন। রাসুল ﷺ বললেন, “তোমাদের ভাইকে আমার হাতে দাও।” তাঁরা তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

অতঃপর তাকে একপার্শ্বের ওপর কবরে রাখার পর বললেন, “হে আল্লাহ, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রাখলাম; আপনিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।”

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ বললেন, ‘ইশ্, যদি আমিই ওই কবরের ব্যক্তিটি হতাম!’^{৮৬৪}

ইবনে হিশাম বলেন, ‘তাকে “জুল বিজাদাইন” নামকরণ করার কারণ হলো, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহী হলেন, তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল এবং তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে তার শরীরের একটিমাত্র “বিজাদ” (একপ্রকার মোটা ও খসখসে চাদর) ছাড়া তার সবকিছু কেড়ে নিল।

সেটি নিয়েই তিনি সেখান থেকে পালিয়ে রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশে রওনা দিলেন। যখন কাছাকাছি আসলেন, তখন চাদরটিকে দুই টুকরা করে একটি নিম্নবস্ত্র হিসেবে পরলেন এবং অপরটি ওপরের অংশে পরিধান করলেন। অতঃপর রাসুল ﷺ-এর নিকট আসলেন। এই কারণেই তাকে “জুল বিজাদাইন” বলা হয়।’^{৮৬৫}

৮৬৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৫২৭।

৮৬৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৫২৭।

তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন

আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যখন জুবাইরের সাথে আমার বিয়ে হয়, তখন তার কাছে কোনো ধনসম্পদ ছিল না। দাস-দাসীও ছিল না। শুধু কুয়ো থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তার ঘোড়াটি চরাতাম এবং পানি পান করাতাম।

ঘোড়াটি পরিচর্যা করার চাইতে কোনো কাজ আমার কাছে অধিক কঠিন ছিল না। আমি তার জন্য ঘাস সংগ্রহ করতাম এবং তার পরিচর্যা ও দেখাশোনা করতাম। (...)

বর্ণনাকারী বলেন, ‘অতঃপর রাসুল সঃ-এর নিকট কিছু যুদ্ধবন্দী আনা হলে তিনি তাকে একটি দাসী দিলেন।’

আসমা রাঃ বলেন, ‘দাসীটি ঘোড়ার দেখাশোনায় আমার জন্য যথেষ্ট হলো এবং আমি দায়িত্বমুক্ত হলাম।’^{৮৬৬}

আরেক রিওয়াযাতে আছে, ‘অতঃপর আবু বকর রাঃ ঘোড়া দেখাশোনা করার জন্য আমার সাহায্যার্থে একজন খাদিম পাঠালেন। তখন আমি যেন রেহাই পেলাম।’^{৮৬৭}

ইবনে হাজার রাঃ বলেন, ‘উভয় রিওয়াযাতের মাঝে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, যখন রাসুল সঃ-এর নিকট যুদ্ধবন্দীদের আনা হলো, তখন তিনি সেখান থেকে একটি খাদিম আবু বকর রাঃ-কে দিলেন, যেন তিনি মেয়ে আসমা রাঃ-এর কাছে তা পাঠিয়ে দেন। সুতরাং এ কথা সত্য যে, রাসুল সঃ-ই মূল দাতা, তবে তিনি আবু বকর রাঃ-এর মাধ্যমে তা প্রদান করেছেন।’^{৮৬৮}

তাদের জিজ্ঞেস করতেন কোনো প্রয়োজন আছে কি না

রাসুল সঃ-এর কোনো এক মহিলা বা পুরুষ খাদিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুল সঃ খাদিমকে বলতেন, “তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে?”

৮৬৬. সহিহুল বুখারি : ৪৮২৩, সহিহ মুসলিম : ২১৮২।

৮৬৭. সহিহুল বুখারি : ৫২২৪, সহিহ মুসলিম : ২১৮২।

৮৬৮. ফাতহুল বারি : ৯/৩২৪।

একদিন খাদিম উত্তর দিলেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার প্রয়োজন আছে।”

তিনি বললেন, “বলো, কী প্রয়োজন তোমার?”

খাদিম বললেন, “আমার প্রয়োজন হলো, আপনি কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করবেন।”

তিনি বললেন, “এমন প্রয়োজনের কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে তোমাকে?”

খাদিম বললেন, “আমার রব।”

তিনি বললেন, “হাঁ, এই প্রয়োজন ধরে রেখো। তবে (তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য) তুমি অধিক সিজদার মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা কোরো।”^{৮৬৯}

রাবিআ -এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, ‘আমি রাসুল -এর খিদমত করতাম এবং সারা দিন তাঁর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখতাম। এমনকি যখন তিনি ইশার নামাজ পড়ার পর বাড়িতে প্রবেশ করে দরোজায় দাঁড়াতে, তখন আমি মনে মনে চাইতাম, রাসুল -এর কোনো প্রয়োজন দেখা দিক (যেন আমি তা পূর্ণ করতে পারি)। তবে তখন তাঁকে শুধু “সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি” বলতে শুনতাম। এতে একসময় আমার বিরক্তি এসে যেত, ফলে আমি ফিরে আসতাম। অথবা আমার চোখ লেগে আসত, ফলে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।’

তিনি বলেন, ‘রাসুল  তাঁর খিদমতের প্রতি আমার আগ্রহ অনুধাবন করতে পারতেন বিধায় একদিন তিনি আমাকে বললেন, “হে রাবিআ, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দান করব।” আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি একটু ভেবে দেখি, তারপর আপনাকে এ ব্যাপারে জানাব।”

এরপর আমি চিন্তাভাবনা করে বুঝতে পারলাম যে, দুনিয়া অস্থায়ী আর এখানে যা রিজিক পাই, তা আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, রাসুল -এর কাছে আখিরাতের সফলতা চাইব। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

অতঃপর তাঁর কাছে আসলে তিনি জানতে চাইলেন, কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বললাম, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার কাছে আমি এটা চাই যে, আপনি আপনার প্রভুর কাছে আমার জন্য সুপারিশ করবেন, তিনি যেন আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।”

তিনি বললেন, “হে রাবিআ, তোমাকে এটি কে শিখিয়ে দিয়েছে?”

আমি বললাম, “সেই সত্তার কসম—যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। কিন্তু আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদাবান আপনার মতো মহান ব্যক্তি যখন আমাকে বললেন, “আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দান করব”, তখন আমি চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, দুনিয়া যেহেতু অস্থায়ী আর এখানে যা রিজিক পাই, তা আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়—তাই রাসুল ﷺ-এর কাছে আখিরাতের সফলতাই চাইব।”

তখন রাসুল ﷺ চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, “আমি তা করব, তবে অধিক সিজদার (অধিক নামাজ পড়ার) মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা করতে হবে।”^{৮৭০}

গরিবদের মর্যাদার কথা বলতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ গরিবদের ফজিলত এবং আল্লাহর কাছে তাদের বিশাল মর্যাদার কথা প্রকাশ করতেন, যেন দারিদ্র্যের কারণে কোনো মানুষ তাদের অবজ্ঞা না করে।

সাহল বিন সাদ আস-সায়িদি রাঃ বলেন, ‘এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর নিকট দিয়ে গমন করছিল, তখন তিনি বললেন, “এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা?” তারা উত্তর দিলেন :

حَرِيٌّ إِنْ خَظَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ

“যদি কোনো মহিলার প্রতি এ লোকটি বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে, তার সাথে বিয়ে দেওয়া যায়। যদি সে সুপারিশ করে, তাহলে

সুপারিশ গ্রহণ করা যায়। যদি কথা বলে, তবে কান লাগিয়ে শোনা উচিত।”

অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সেখান দিয়ে একজন গরিব মুসলমান অতিক্রম করতেই রাসুল ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা?” তারা জবাব দিলেন :

حَرِيٌّ إِنْ خَظَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ

“যদি এ ব্যক্তি কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাকে বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। যদি কারও জন্য সুপারিশ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কোনো কথা বলে, তা শোনা হবে না।”

তখন রাসুল ﷺ বললেন :

هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا

“পৃথিবী-ভর্তি ওই রকম ধনীর চেয়ে এই গরিব লোকটি উত্তম।”^{৮৭১}

ইবনে হাজার رحمه الله বলেন, ‘এই হাদিস প্রমাণ করে, কেবল দুনিয়ার জীবনের নেতৃত্ব ও প্রাচুর্যের কোনো মূল্য নেই; আখিরাতের নেতৃত্ব ও প্রাচুর্যই মূল। আর কেউ দুনিয়ার প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত হলে আখিরাতের সাওয়াব দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করা হয়।’^{৮৭২}

আবু জার رحمه الله বলেন, ‘রাসুল ﷺ বললেন, “আবু জার, তুমি কি মনে করো যে, ধনসম্পদের আধিক্যই ধনাঢ্যতা?” আমি বললাম, “হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ!” তিনি বললেন, “তুমি কি মনে করো, ধনসম্পদ কম হওয়াই দারিদ্র্য?” আমি বললাম, “হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ!” তিনি বললেন, “ধনাঢ্যতা হলো হৃদয়ের ধনাঢ্যতা; আর দারিদ্র্য হলো হৃদয়ের দারিদ্র্য।”

৮৭১. সহিহুল বুখারি : ৫০৯১।

৮৭২. ফাতহুল বারি : ১/২৭৮।

অতঃপর আমাকে কুরাইশের এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, “অমুককে চেনো?” আমি বললাম, “হ্যাঁ, চিনি।” তিনি বললেন, “তাকে কেমন মনে হয় তোমার?” আমি বললাম, “সে কিছু চাইলে তাকে দেওয়া উচিত, আর সে আগমন করলে তাকে (বাড়িতে) প্রবেশ করানো উচিত।”

তারপর আহলে সুফফার এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, “অমুককে চেনো?” আমি বললাম, “না, তাকে আমি চিনি না, ইয়া রাসুলুল্লাহ।” তখন তিনি তার আকার-আকৃতি ও গুণাবলি বর্ণনা করতে লাগলে আমি তাকে চিনতে পারলাম এবং বললাম, “জি, এখন চিনতে পেরেছি।”

তখন তিনি বললেন, “তাকে কেমন মনে হয় তোমার?” আমি বললাম, “ও তো আহলে সুফফার এক হতদরিদ্র লোক।” তিনি বললেন, “সে সারা পৃথিবীর প্রথমোক্ত লোকের চেয়ে উত্তম।”

আমি বললাম, “তাকে কি এমন কিছুই দেওয়া হয় না, যা প্রথমজনকে দেওয়া হয়?”

তিনি বললেন, “তাকে কল্যাণকর যা দান করা হয়, সে তার যোগ্য; আর যেসব থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা হয়, তার বিনিময়ে তাকে সাওয়াব দান করা হয়।”^{৮৭৩}

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طَمَرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ
مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ

‘মাথায় উশকোখুশকো চুল ও দেহে ধুলোমলিন দুখানা পুরাতন কাপড় পরিহিত এরূপ অনেক ব্যক্তি রয়েছে, যার প্রতি লোকেরা দৃষ্টিপাত করে না। অথচ সে আল্লাহর নামে শপথ করে ওয়াদা করলে তিনি তা সত্যে পরিণত করেন। বারা বিন মালিক তাদের দলভুক্ত।’^{৮৭৪}

৮৭৩. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৬৮৫।

৮৭৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৫৪।

আখিরাতের ফজিলতের কথা বলে তাদের মনোবল বাড়াতেন

আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেন :

هَلْ تَذُرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؟

“তোমরা কি জানো, আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে কে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে?”

সাহাবিগণ বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।” তিনি বললেন :

أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ، الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ، وَيُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارَةُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُولُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ائْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ وَخَيْرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هَؤُلَاءِ، فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ، وَيُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارَةُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ}

“আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যাদের প্রহরায় সীমান্ত সুরক্ষিত হয় এবং যাদের কল্যাণে বিপদ ও বিপর্যয় থেকে বাঁচা হয়। আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো বুকে নিয়েই তারা মৃত্যুবরণ করে, সেগুলো পূরণ করার সুযোগ তাদের হয়ে ওঠে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বলবেন, “তাদের কাছে যাও—অভিবাদন জানাও।” ফেরেশতারা (এসে) বলবে, “আমরা আপনার আসমানের অধিবাসী, আপনার সর্বোত্তম মাখলুক! আপনি আমাদের এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে,

আমরা তাদের কাছে যাব, তাদের সালাম করব?!” আল্লাহ তাআলা বলবেন, “ওরা আমার এমন বান্দা, যারা আমার ইবাদত করত, আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করত না, তাদের প্রহরায় সীমান্ত সুরক্ষিত হতো, তাদের কল্যাণে বিপদ ও বিপর্যয় থেকে বাঁচা হতো। আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো বুকে নিয়েই তারা মৃত্যুবরণ করে, সেগুলো পূরণ করার সুযোগ তাদের হয়ে ওঠে না।” রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘তারপর ফেরেশতারা তাদের নিকট আসে, প্রত্যেক দরোজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করে (আর বলে :) “তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক—তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ, আখিরাতের প্রতিদান বড়ই সুন্দর।”’^{৮৭৫}

ধনীদের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দিতেন

রাসুল ﷺ-এর আজাদকৃত গোলাম সাওবান ؓ বলেন, ‘আমি একবার রাসুল ﷺ-এর কাছে দাঁড়ানো ছিলাম। এমন অবস্থায় জনৈক ইহুদি পণ্ডিত এসে বলল, “আস-সালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ!”

তখন আমি তাকে এমন এক ধাক্কা মারলাম যে, সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। সে বলল, “তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে কেন?” আমি বললাম, “ইয়া রাসুলুল্লাহ বলতে পারো না?” ইহুদি বলল, “আমরা তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন যে নাম রেখেছে, সে নামেই ডাকি।”

রাসুল ﷺ বললেন, “আমার নাম মুহাম্মদ। আমার পরিবারের লোকেরাই আমার এ নাম রেখেছে।”

এরপর ইহুদি বলল, “আমি আপনাকে (কয়েকটি কথা) জিজ্ঞেস করতে এসেছি।” রাসুল ﷺ বললেন, “তোমার কি কোনো লাভ হবে, যদি আমি তোমাকে কিছু বলি?” সে বলল, “আমি আমার কান পেতে তা শুনব।”

তখন রাসুল ﷺ তাঁর কাছে যে লাঠিটি ছিল, তা দিয়ে মাটিতে আঁকাজোকা করলেন। তারপর বললেন, “জিজ্ঞেস করো।”

ইহুদি বলল, “যেদিন বর্তমান জমিন ও আসমান পাল্টে গিয়ে অন্য জমিন ও আসমানে পরিণত হবে (অর্থাৎ কিয়ামাত হবে) সেদিন লোকজন কোথায় থাকবে?” রাসুল ﷺ বললেন, “তারা পুলসিরাতে^১র কাছে অন্ধকারে থাকবে।”

সে বলল, “কারা সর্বপ্রথম (তা পার হওয়ার) অনুমতি লাভ করবে?” তিনি বললেন, “দরিদ্র মুহাজিরগণ (...)।”^{৮৭৬}

আবু আবদুর রহমান আল-ভুলি রাঃ বর্ণনা করেন, ‘আমি শুনেছি যে, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাঃ-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, “আমরা কি গরিব মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত নই।” আবদুল্লাহ রাঃ তাকে বললেন, “তোমার কি স্ত্রী নেই, যার নিকট তুমি গিয়ে থাকো?” জবাবে সে বলল, “হ্যাঁ আছে।” অতঃপর তিনি বললেন, “বসবাস করার জন্য তোমার কি বাসস্থান নেই?” সে বলল, “হ্যাঁ আছে।” তখন তিনি বললেন, “তবে তো তুমি ধনীদের অন্তর্ভুক্ত।” এরপর সে বলল, “আমার একজন খাদিমও আছে।” এ কথা শুনে তিনি বললেন, “তাহলে তো তুমি বাদশাহ।”

আবু আবদুর রহমান রাঃ বলেন, ‘একদা তিন ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাঃ-এর নিকট আসলো। তখন আমি তাঁর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এসে তারা বলল, “হে আবু মুহাম্মাদ, আমাদের কিছুই নেই—না ব্যয় করার মতো পয়সা আছে, না আছে বাহন, না আছে কোনো আসবাবপত্র।”

তখন তিনি তাদের বললেন, “তোমরা যা চাও, আমি তা-ই করব। তোমাদের মন চাইলে তোমরা আমার নিকট চলে এসো। আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে যা রেখেছেন, আমি তোমাদের তা দান করব। অথবা তোমরা চাইলে সুলতানের নিকট তোমাদের ব্যাপারে আলোচনা করব (তিনি তোমাদের দান করবেন)। অথবা তোমরা চাইলে ধৈর্যও ধরতে পারো (এটাই তোমাদের জন্য ভালো হবে)। কেননা, আমি রাসুল রাঃ-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ،
بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا

“কিয়ামতের দিন গরিব মুহাজিররা ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে পৌঁছে যাবে।”

এ কথা শুনে তারা বলল, “আমরা ধৈর্যধারণ করব, আমরা কিছুই চাই না।”^{৮৭৭}

আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ বলেন, “রাসুল সঃ আমাকে বললেন, “তুমি কি জানো, আমার উম্মতের কোন দল সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে?” আমি বললাম, “আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।” তিনি বললেন :

الْمُهَاجِرُونَ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَيَسْتَفْتِحُونَ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْحَزَنَةُ، أَوْ قَدْ حُوسِبْتُمْ، فَيَقُولُونَ بِأَيِّ شَيْءٍ نَحْسَبُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى مِثْنًا عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيَقِيلُونَ فِيهِ أَرْبَعِينَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسُ

“মুহাজিরগণ। কিয়ামতের দিন তাঁরা জান্নাতের দরোজার নিকট গিয়ে তা খুলতে বলবে। তখন দ্বাররক্ষীরা বলবেন, “তোমাদের হিসাব-নিকাশ কি সম্পন্ন হয়ে গেছে?” তাঁরা বলবে, “আমাদের আবার কীসের হিসাব? আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের তরবারিগুলো আমাদের কাঁধে ঝুলন্ত ছিল এবং এই অবস্থাতেই আমাদের মৃত্যু হয়েছে।” অতঃপর তাঁদের জন্য দরোজা খুলে দেওয়া হবে। ফলে অন্যান্য মানুষ জান্নাতে যাওয়ার চল্লিশ বছর পূর্বেই তাঁরা সেখানে বিশ্রাম নেবে।”^{৮৭৮}

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেন :

يَدْخُلُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ

‘গরিব মুসলমানরা ধনী মুসলমানদের অর্ধদিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ অর্ধদিন পাঁচশ বছরের সমান।’^{৮৭৯}

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ইবনে আমরের হাদিস থেকে বোঝা যায়, চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে; কিন্তু আবু হুরাইরার হাদিস প্রমাণ করে, পাঁচশ বছর পূর্বে প্রবেশ করবে।

কয়েক উপায়ে উভয় হাদিসের মাঝে সমন্বয় সাধন করা যায় :

১. গরিব মুহাজিরগণ ধনী মুহাজিরগণের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সাধারণ গরিব মুসলমানরা অন্যান্য ধনী মুসলমানের পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ জন্য ইবনে হিব্বান رحمہ اللہ আব্দুল্লাহ বিন আমর رضی اللہ عنہ-এর হাদিসের অধ্যায়ের নাম রেখেছেন, ‘নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করার দিক দিয়ে ধনী মুহাজিরগণের ওপর গরিব মুহাজিরগণের ফজিলত’।^{৮৮০}

পক্ষান্তরে আবু হুরাইরা رضی اللہ عنہ-এর হাদিসের অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন, ‘নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করার দিক দিয়ে এই উম্মতের ধনীদের ওপর ধৈর্যশীল গরিবদের ফজিলত’।^{৮৮১}

২. বাইহাকি رحمہ اللہ বলেন, ‘সময় বর্ণনায় রিওয়ায়াতসমূহ পরস্পর বিরোধপূর্ণ। সকল রিওয়ায়াত “মাহফুজ” বা ভুল থেকে সুরক্ষিত ধরা হলে বিরোধের নিরসন হলো, এ তারতম্য ইবাদতের ক্ষেত্রে গরিবদের স্তর অনুযায়ী হবে।’^{৮৮২}

ইবনুল কাইয়িম رحمہ اللہ বলেন, ‘যদি কোনো একটাকেই সুরক্ষিত বর্ণনা ধরা হয়, তবে চল্লিশ বছর পূর্বে প্রবেশ করার রিওয়ায়াতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আর যদি উভয়টিকেই সুরক্ষিত ধরা হয়, তবে এই তারতম্যের ব্যাখ্যা হলো,

৮৭৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৫৪।

৮৮০. সহিহ ইবনি হিব্বান : ২/৪৫২।

৮৮১. সহিহ ইবনি হিব্বান : ২/৪৫১।

৮৮২. আল-বাসু ওয়ান-নুসুর : ৪২৬।

গরিব ও ধনীদেব অবস্থার তারতম্যের কারণে সময়ের তারতম্য হবে। কেউ চল্লিশ বছর পূর্বে প্রবেশ করবে এবং কেউ পাঁচশ বছর পূর্বে প্রবেশ করবে। যেভাবে একত্ববাদে বিশ্বাসী পাপী মুসলমানগণ তাদের অবস্থাভেদে আগে-পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।”^{৮৮৩}

৩. পাঁচশ বছর সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী গরিব ও সর্বশেষ প্রবেশকারী ধনীর হিসেবে বলা হয়েছে।^{৮৮৪}

আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ বলেন, ‘একদিন সূর্যোদয়ের সময় আমি রাসূল সঃ-এর পাশে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন কিছু লোক আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তাদের শরীর থেকে সূর্যের আলোর মতো নুর বিচ্ছুরিত হবে।”

আবু বকর রাঃ বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকব?”

তিনি বললেন, “না, অবশ্য অন্য দিক দিয়ে তোমাদের অনেক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কিন্তু সেই দলটি গরিব ও মুহাজিরদের দল, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাদের একত্র করা হবে।”

তিনি আরও বললেন, “গুরাবাদের জন্য সুসংবাদ, গুরাবাদের জন্য সুসংবাদ, গুরাবাদের জন্য সুসংবাদ।”

বলা হলো, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, গুরাবা কারা?”

তিনি বললেন, “অসংখ্য খারাপ মানুষের ভিড়ে মুষ্টিমেয় ভালো মানুষ—যাদের আনুগত্যকারীর সংখ্যা তাদের অবাধ্য লোকের চেয়ে কম।”^{৮৮৫}

৮৮৩. হাদিউল আরওয়াহ : ৮১।

৮৮৪. আন-নিহায়া ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম : ১/২৭৩।

৮৮৫. মুসনাদু আহমাদ : ৭০৩২।

তাদের বলতেন, জান্নাতিদের মধ্যে গরিবরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ

ইমরান বিন হুসাইন ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন :

اَظْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَأَظْلَعْتُ فِي النَّارِ
فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

‘আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে। তখন দেখলাম যে, তার অধিকাংশ অধিবাসী গরিব শ্রেণির লোক। আর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। তাতে দেখতে পেলাম যে, তার অধিকাংশ অধিবাসী নারী।’^{৮৮৬}

এই হাদিসে দুনিয়া ও ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত গরিবদের জন্য অনেক বড় মানসিক প্রশান্তি রয়েছে।

ইবনে বাত্তাল ؒ বলেন, ‘এই হাদিস ধনীদের ওপর গরিবদের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করে না। বরং হাদিসের অর্থ হলো, পৃথিবীতে ধনীদের চেয়ে গরিবদের সংখ্যাই বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবে জান্নাতেও তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে।

তা ছাড়া তাদের জান্নাতে যাওয়ার কারণ তাদের দারিদ্র্য নয়; বরং দারিদ্র্যে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও নেক আমল করার কারণেই তারা জান্নাতে যাবে। কারণ, গরিব যদি নেক আমল না করে, সে কখনো সৎকর্মশীল ধনীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।’^{৮৮৭}

আর স্বামীর অবাধ্যতা সম্পর্কে ইবনে বাত্তাল বলেন, ‘জাহান্নামে নারীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, “তারা স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। আর এটি তাদের ইমান হ্রাস করে।” এখান থেকে বোঝা যায়, স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করলে নারীদের ইমান বাড়ে। অনুরূপভাবে অন্যান্য নেক আমলের দ্বারাও ইমান বাড়ে। এখান থেকে বোঝা যায়, আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত। ইমান হলো, মৌখিক স্বীকৃতি ও দৈহিক

৮৮৬. সহিহুল বুখারি : ৩২৪১, সহিহ মুসলিম : ২৭৩৭।

৮৮৭. ইবনে বাত্তাল ؒ কৃত শারহ সহিহুল বুখারি : ১০/১৭৩।

আমলের সম্মিলিত রূপ। এই কারণেই নেক আমলের দ্বারা ইমান বৃদ্ধি পায় এবং বদ আমলের কারণে ইমান হ্রাস পায়।^{৮৮৮}

উসামা বিন জাইদ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সঃ ইরশাদ করেন :

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ غَامَّةٌ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ
الْجَدِّ مُحْبُسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ

‘আমি জান্নাতের দরোজায় দাঁড়িলাম। অতঃপর দেখলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাদের অধিকাংশ গরিব-মিসকিন মানুষ। আর ধনবানদের (তখনও হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। আর ওদিকে জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।’^{৮৮৯}

ইবনে হাজার রাঃ বলেন, “‘আটকে রাখা হয়েছে’ অর্থ : পরস্পর সম্পত্তির হিসাব নিষ্পত্তি করার জন্য গরিবদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আছে। সম্ভবত তারা পুলসিরাত অতিক্রম করার পর একটি পুলের ওপর পরস্পর হিসাব নিষ্পত্তি করার জন্য আটকে থাকবে।”^{৮৯০}

মালিক বিন দিনার রাঃ বলেন, ‘একটি সফর থেকে আমি ফিরছিলাম। যখন আমাদের নৌকা পুলের কাছে পৌঁছাল, তখন শুদ্ধ আদায়কারী দাঁড়িয়ে বলল, “কেউ নৌকা থেকে বের হবে না এবং কেউ আপন আসন থেকে উঠবে না।” আমি আমার কাপড়-চোপড় কাঁধের ওপর নিয়ে একটা লাফ দিলাম এবং সোজা জমিনের ওপর পড়লাম।

শুদ্ধ আদায়কারী বলল, “আপনি বেরিয়ে গেলেন কেন?” আমি বললাম, “আমার কাছে কিছুই নেই।” সে বলল, “আচ্ছা, যান তাহলে।” তখন আমি

৮৮৮. ইমান হ্রাস-বৃদ্ধির মাসআলায় ইমামদের মাঝে যে মতানৈক্য রয়েছে, তা মূলত শাফিক মতবিরোধ। এতে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। উভয় দলের মাসআলা বর্ণনার দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হওয়ার কারণে বিষয়টি মতবিরোধের মতো মনে হয়। তাই এটি নিয়ে সাধারণ পাঠক ভাইদের ব্যস্ত হওয়ার কোনো অর্থ হয় না। একান্ত কেউ জানতে চাইলে আলিমদের শরণাপন্ন হতে দোষ নেই। (অনুবাদক)

৮৮৯. সহিহুল বুখারি : ৫১৯৬, সহিহ মুসলিম : ২৭৩৬।

৮৯০. ফাতহুল বারি : ১১/৪২০।

মনে মনে বললাম, “আখিরাতেও ঠিক এমনটাই ঘটবে (অর্থাৎ গরিবরা সহজে পার পেয়ে যাবে)।”^{৮৯১}

তিনি তাদের উপস্থিতি কামনা করতেন

গরিবদের অসিলায় আল্লাহর সাহায্য আসে এবং তাদের দোয়ার কারণে রিজিক আসে।

আবু দারদা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

ابْغُونِي ضُعْفَاءَكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعْفَائِكُمْ

‘তোমরা দুর্বল লোকদের খোঁজ করে আমার কাছে নিয়ে এসো। কেননা, তোমরা তো এই দুর্বলদের বরকতেই রিজিক এবং আল্লাহর সাহায্য পেয়ে থাকো।’^{৮৯২}

‘দুর্বল লোক’—গরিব মুসলমানদের বোঝানো হয়েছে, যাদের জীর্ণতার কারণে মানুষ তাদের দুর্বল মনে করে।

‘তোমরা সাহায্য পেয়ে থাকো’—অর্থাৎ তাদের কারণে অথবা তাদের দোয়ার বরকতে শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করা হয়।

সাদ রাঃ তাঁর অধীনস্থদের ওপর নিজেকে উত্তম মনে করলে রাসুল সঃ বলেন :

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعْفَائِكُمْ

‘দুর্বলদের কারণেই তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং রিজিক দেওয়া হয়।’^{৮৯৩}

অন্য রিওয়াযাতে আছে—

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ

৮৯১. সিকাভুস সাফওয়াহ : ৩/২৭৭।

৮৯২. সুনানু আবি দাউদ : ২৫৯৪, সুনানুত তিরমিজি : ১৭০২৩।

৮৯৩. সহিহুল বুখারি : ২৮৯৬।

‘আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে তাদের দুর্বল শ্রেণির লোকদের দোয়া, নামাজ ও ইখলাসের বরকতে সাহায্য করেন।’^{৮৯৪}

হাদিসের মর্ম হলো, দুর্বল লোকদের দোয়া ও ইবাদতে ইখলাস বেশি থাকে। কারণ, তাদের অন্তরসমূহ দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে মুক্ত থাকে এবং তাদের চিন্তা স্থির থাকে। তাই তাদের আমলসমূহ পবিত্র হয় এবং দোয়া কবুল করা হয়।^{৮৯৫}

তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দিতেন

মানুষের অপছন্দনীয় খাবার তাদের খাওয়াতে নিষেধ করতেন। এ সম্পর্কে আয়িশা রা থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘রাসুল স-এর নিকট একটি গুইসাপ হাদিয়া পাঠানো হলো। তিনি তা খাননি। তখন আয়িশা রা বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, এটা কি মিসকিনদের খেতে দেবো?” রাসুল স বললেন :

لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ

“তোমরা যা খাও না, তা তাদের খেতে দিয়ো না।”^{৮৯৬}

আসলে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার এই আদেশ বাস্তবায়ন করেছেন।

আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না।

৮৯৪. সুনানুন নাসায়ি : ৩১৭৮।

৮৯৫. ফাতহুল বারি : ৬/৮৯, ইবনে বাত্তাল রা কৃত শারহ সহিহিল বুখারি : ৫/৯০, আওনুল মাবুদ : ৭/২৫৬।

৮৯৬. মুসনাদু আহমাদ : ২৪২১৫।

কেননা, তা তোমরা কখনো গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।”^{৮৯৭}

এই আয়াত সম্পর্কে বারা বিন আজিব রাঃ বলেন, ‘আয়াতটি আমাদের আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

আমরা খেজুর বাগানের মালিক ছিলাম। লোকেরা তাদের খেজুরের বাগান থেকে আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে নিয়ে আসত। কোনো ব্যক্তি এক ছড়া বা দুই ছড়া নিয়ে আসত এবং তা মসজিদে ঝুলিয়ে রাখত। সুফফাবাসী সাহাবিদের খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাদের কারও যখন ক্ষুধা লাগত, তখন তারা খেজুর ছড়ার কাছে এসে তার লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করতেন। এতে তা থেকে কাঁচা-পাকা খেজুর ঝরে পড়ত। আর তারা তা খেয়ে নিতেন। কিন্তু যেসব লোকের ভালো কাজের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না, তাদের কেউ এমন খেজুরের ছড়াও নিয়ে আসত, যার মধ্যে খারাপ ও পচা খেজুর থাকত এবং ভেঙে পড়া ছড়াও নিয়ে এসে তা ঝুলিয়ে দিত। তখন আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

“হে ইমানদারগণ, তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনো গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।”

তিনি বলেন, ‘অর্থাৎ তোমরা যা দান করো, এই জাতীয় বস্তু যদি তোমাদের কাউকে হাদিয়া দেওয়া হয়, তবে সে তা চক্ষু বন্ধ করে রেখে বা লজ্জায় পড়ে গ্রহণ করা ছাড়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে না।’

বারা ﷺ বলেন, ‘এরপর আমাদের প্রত্যেকেই তার নিকট যা আছে, তার মধ্যে উত্তমটি নিয়ে আসত।’^{৮৯৮}

জনৈক সালাফের আমল : মুনজির সাওরি ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘রাবি বিন খুসাইম ﷺ এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীকে একপ্রকার মূল্যবান মিষ্টি খাওয়াচ্ছিলেন। তা দেখে এক ব্যক্তি তাকে বলল, “এই লোকটি কি জানে, আপনি তাকে কী মূল্যবান খাবার খাওয়াচ্ছেন?” তিনি বললেন, “আল্লাহ তো জানেন।”^{৮৯৯}

বিয়ে-শাদির দাওয়াতে তাদের উপেক্ষা করতে নিষেধ করতেন

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

‘সর্বনিকৃষ্ট খানা হলো সেই অলিমার খানা, যেখানে ধনবানদের দাওয়াত করা হবে এবং গরিবরা উপেক্ষিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করে।’^{৯০০}

ইমাম নববি ﷺ বলেন, ‘এই হাদিসে রাসুল ﷺ-এর পরের যুগের একটি অবস্থা সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে, বিয়ে-শাদির দাওয়াতে ধনীদের প্রাধান্য দেওয়া এবং উন্নত ও রুচিসম্মত খাবারে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া। যা আজ অধিকাংশ দাওয়াতে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।’^{৯০১}

তাদের ভিক্ষা না করতে উদ্বুদ্ধ করতেন

রাসুল ﷺ-এর কাছে কেউ কোনো কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই দান করতেন। যতবার চাইতেন ততবার দিতেন। তবে অনেক সময় তিনি তাদের বুঝিয়ে

৮৯৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৯৭৮।

৮৯৯. সিয়াকু আলামিন নুবালা : ৭/২৯০।

৯০০. সহিহুল বুখারি : ৫১৭৭, সহিহ মুসলিম : ১৪৩২।

৯০১. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ৯/২৩৭।

দিতেন যে, এভাবে কারও নিকট কোনো কিছু চেয়ে বেড়ানো ভালো কাজ নয়।

কারণ, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে মুমিনের সে সকল গুণের প্রশংসা করেছেন, তন্মধ্যে মানুষের সামনে হাত না পাতা অন্যতম।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

‘খয়রাত ওই সকল গরিব লোকের জন্য, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে—জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা হাত না পাতার কারণে তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতিমিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।’^{৯০২}

‘তারা মানুষের কাছে কাকুতিমিনতি করে ভিক্ষা চায় না’—এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, তাহলে কি তারা কাকুতিমিনতি না করে ভিক্ষা চায়?

এর উত্তরে বলা হয়, তারা একদমই ভিক্ষা করে না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাদের ভিক্ষাবৃত্তি-না-করা লোক বলে অভিহিত করেছেন এবং লক্ষণ দ্বারা তাদের পরিচয় পাওয়ার কথা বলেছেন। যদি তারা কোনোভাবেই ভিক্ষা করত, তবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এমন কথা বলতেন না।

আর কাকুতিমিনতি না করার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি ভিক্ষুকদের এই বদঅভ্যাসটি ওইসব লোকের মধ্যে না থাকার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।^{৯০৩}

৯০২. সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৭৩।

৯০৩. তাফসিরুল তাবারি : ৫/৫৯৩-৬০০। (কিছুটা পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপিত)

রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বলতেন, তারা যেন যথাসম্ভব ভিক্ষা পরিত্যাগ করে।

হাকিম বিন হিজাম ؓ বলেন, ‘আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে চাইলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। অতঃপর আবার চাইলে তিনি আবার দান করলেন। অতঃপর আবার চাইলে তিনি আবার দান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন :

يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ حُلُوءٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“হে হাকিম, এই মাল-সম্পদ তরতাজা মিষ্টি ফলের মতো। সুতরাং কেউ মনের মাঝে উদারতা রেখে তা গ্রহণ করলে (অর্থাৎ কারও কাছে হাত না পেতে মেহনত করে অর্জন করলে) তাতে বরকত দেওয়া হয়। আর যদি কেউ মনের মধ্যে লোভ রেখে তা গ্রহণ করে, তাতে বরকত দেওয়া হয় না। সে ওই ব্যক্তির মতো, যে খায় কিন্তু ভৃগু হতে পারে না। আর ওপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাতের চেয়ে উত্তম।”

হাকিম ؓ বলেন, ‘আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, কসম সেই সত্তার—যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, আপনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কারও সম্পদ কম করব না (অর্থাৎ কারও কাছে হাতপেতে তার সম্পদ কমিয়ে দেবো না)।”

এর পর আবু বকর ؓ তাকে দান করার জন্য ডাকতেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন।

অতঃপর উমর ؓ তাকে দান করার জন্য ডাকলে তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

তখন উমর ؓ বললেন, ‘হে মুসলিম সম্প্রদায়, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে হাকিমের হক তাকে দিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।’

এভাবে হাকিম ﷺ রাসুল ﷺ-এর পর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত কখনো কারও কাছে হাত পাতেননি।^{৯০৪}

হাফিজ ইবনে হাজার ﷺ বলেন, ‘হাকিম ﷺ সরকারি অনুদান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, অথচ তা তার অধিকার ছিল। এর কারণ হলো, তিনি আশঙ্কা করতেন যে, এভাবে অনুদান গ্রহণ করলেও নেওয়াটা অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন তিনি না চাইলেও প্রবৃত্তি তাকে হাতপাতার দিকে নিয়ে যাবে। তাই তিনি যেকোনো অনুদান গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থেকেছেন এবং সংশয়যুক্ত সকল কিছু পরিত্যাগ করেছেন।

উমর ﷺ লোকদের সাক্ষী বানানোর কারণ হলো, কেউ যেন মনে মনে এই ধারণা করতে না পারে যে, উমর ﷺ হাকিমের অধিকার হরণ করেছেন।^{৯০৫}

দান করার সামর্থ্য না থাকলে সুন্দর ভাষায় অপারগতা প্রকাশ করতেন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَّدَقَةٍ يَّتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

‘নম্র কথা বলা এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ওই দানখয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু।’^{৯০৬}

আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘কতিপয় আনসারি লোক রাসুল ﷺ-এর কাছে চাইলে তিনি তাদের দান করলেন। অতঃপর আবার চাইলে তিনি আবার দান করলেন। অতঃপর আবার চাইলে তিনি আবার দান করলেন। এভাবে তাঁর কাছে যা ছিল, সব শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন :

مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

৯০৪. সহিহুল বুখারি : ১৪৭২, সহিহ মুসলিম : ১০৩৫।

৯০৫. ফাতহুল বারি : ৩/৩৩৬।

৯০৬. সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৬৩।

“আমার নিকট যে মাল থাকে, তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে হাতপাতা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবার দান করেন। সবার চাইতে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।”^{৯০৭}

‘তবে যে ব্যক্তি হাতপাতা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন’—অর্থাৎ যে মানুষের কাছে হাতপাতা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাআলা এর বদৌলতে তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন এবং অভাব দূর করে দেন।

‘আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়’—অর্থাৎ যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি মুখাপেক্ষী না হয়, তখন আল্লাহ তাআলা এ পরিমাণ সম্পদ দান করেন যে, তার আর কারও কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।^{৯০৮}

ওই লোকদের ঘটনাও এ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, যারা গাজওয়ায়ে তাবুকে যাওয়ার জন্য রাসুল ﷺ-এর কাছে বাহন চেয়েছিল, যেন তার ওপর সাওয়ার হয়ে জিহাদ করতে পারে। তখন রাসুল ﷺ তাদের প্রতি অপারগতা জ্ঞাপন করলেন যে, তাঁর কাছে তাদের দেওয়ার মতো কোনো বাহন নেই।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ
مَا أُحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا
مَا يُنْفِقُونَ

৯০৭. সহিহুল বুখারি : ১৪৬৯, সহিহ মুসলিম : ১০৫৩।

৯০৮. ফাতহুল বারি : ১১/৩০৪।

‘জিহাদে অংশগ্রহণ না করায় দুর্বলদের বিরুদ্ধে কিংবা পীড়িতদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি আন্তরিক থাকে। সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো কারণ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। তাদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই, যারা তোমাদের কাছে বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে, “আমার কাছে তো তোমাদের দেওয়ার মতো কোনো বাহন নেই।” তখন তারা ব্যয় করার মতো কিছু না পাওয়ার কষ্টে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ফিরে গিয়েছিল।’^{৯০৯}

আবু মুসা আশআরি রাঃ বলেন, ‘আমি আশআরিদের একটি দল নিয়ে রাসুল সঃ-এর নিকট বাহনের জন্য আসলাম। তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের বাহন দিতে পারব না। আর তোমাদের দেওয়ার মতো কোনো বাহনও নেই আমার কাছে।”’

তিনি বলেন, ‘তখন আমরা যতক্ষণ আল্লাহ চেয়েছেন, ততক্ষণ অবস্থান করলাম। অতঃপর তাঁর কাছে কিছু উট আনা হলো। সেখান থেকে সাদা কুঁজওয়ালা তিনটি উট আমাদের দিলেন।

তা নিয়ে আমরা যখন ফিরছিলাম, তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম, “আল্লাহ তাআলা আমাদের বরকত দান করবেন না। কেননা, আমরা রাসুল সঃ-এর নিকট বাহনের জন্য গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের বাহন দেবেন না বলে শপথ করেছিলেন। অথচ তিনি আমাদের বাহন দান করেছেন।” তখন তারা এসে রাসুল সঃ-কে সে ব্যাপারে অবহিত করল। তখন রাসুল সঃ বললেন :

مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ إِن شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

“আমি তোমাদের বাহন দিইনি; আল্লাহই তোমাদের দান করেছেন। আর আল্লাহর কসম, আল্লাহর ইচ্ছায় আমি কোনো বিষয়ের শপথ

করার পর যদি (তা ভঙ্গ করার মধ্যে) কোনো কল্যাণ দেখতে পাই, তখন কসমের কাফফারা দিয়ে তা ভঙ্গ করে ফেলি এবং কল্যাণকর বিষয়টি গ্রহণ করি।”^{৯১০}

নিজের পরিবারের চাহিদার ওপর গরিবদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতেন

আলি বিন আবি তালিব রা থেকে বর্ণিত, ‘জাঁতাকলে আটা পিষতে পিষতে ফাতিমা রা-এর হাতে ফোসকা পড়ে গেল। তখন একজন খাদিম চাওয়ার জন্য রাসুল সা-এর নিকট এলেন। কিন্তু এসে নবিজি সা-কে তিনি পেলেন না। তাই আয়িশা রা-কে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করলেন। নবিজি সা ফিরলে আয়িশা রা তাঁকে ফাতিমা রা-এর আগমনের ব্যাপারে জানালেন।’

আলি রা বলেন, ‘রাসুল সা আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমরা আমাদের বিছানা থেকে উঠতে চাচ্ছিলাম, তখনই তিনি বললেন, “তোমরা তোমাদের জায়গায় থাকো।” এরপর তিনি আমাদের সামনে বসলেন। তখন আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি বললেন :

أَلَا أَعْلَمُكُمْ خَيْرًا مِّمَّا سَأَلْتُمْ، إِذَا أَخَذْتُمْ مَضَاجِعَكُمْ، أَنْ تُكَبِّرَ
اللَّهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ خَادِمٍ

“আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিক্ষা দেবো না, যা তোমরা যা চেয়েছিলে তার চাইতে উত্তম? (তা হলো) যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ এবং ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়বে। এটি তোমাদের জন্য খাদিমের চেয়েও উত্তম।”^{৯১১}

অপর বর্ণনায় আলি রা থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সা বললেন :

৯১০. সহিহুল বুখারি : ৩১৩৩, সহিহ মুসলিম : ১৬৪৯।

৯১১. সহিহুল বুখারি : ৩১১৩, সহিহ মুসলিম : ২৭২৭।

«لَا أُعْطِيكُمْ وَأَدْعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَلَوَى بُطُونُهُمْ مِنَ الْجُوعِ» وَقَالَ:
مَرَّةً: «لَا أَخْدِمُكُمْ وَأَدْعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَطْوَى»

‘আমি আহলে সুফফাকে বাদ দিয়ে তোমাদের দিতে পারব না। ক্ষুধায় তাদের পেট পেঁচিয়ে আছে।’ আরেকবার বললেন, ‘আমি ক্ষুধার জ্বালায় পেট পেঁচিয়ে থাকা আহলে সুফফাকে বাদ দিয়ে তোমাদের খিদমত করতে পারব না।’^{৯১২}

মুহাল্লাব রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ নিজের মেয়েকে জিকির শিক্ষা দিয়েছেন, যা আখিরাতে তার কাজে আসবে। আর আহলে সুফফাকে তার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, তারা তৃপ্তিভরে খানা পাওয়ার শর্তের ওপর নিজেদের ইলম অর্জন ও সুন্নাহ আয়ত্তে আনার কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। সম্পদ কামাই করা ও পরিবার-পরিজনের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তবে তারা খাদ্যের বিনিময়ে নিজেদের আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।’^{৯১৩}

ভিক্ষা করতে নিষেধ করতেন

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلَّ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرًا

‘যে ব্যক্তি (অভাবের তাড়না ছাড়া) নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের কাছে সম্পদ ভিক্ষা করে বেড়ায়, বস্তুত সে আগুনের অঙ্গার ভিক্ষা করে। কাজেই এখন তার ভেবে দেখা উচিত সে বেশি নেবে, না কম নেবে।’^{৯১৪}

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَخْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا، فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

৯১২. মুসনাদু আহমাদ : ৫৯৭।

৯১৩. ফাতহুল বারি : ১১/১২৪।

৯১৪. সহিহ মুসলিম : ১০৪১।

‘সেই সত্তার কসম—যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে কারও রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোনো লোকের কাছে গিয়ে হাতপাতার চাইতে অনেক ভালো, চাই সে দিক বা না দিক।’^{৯১৫}

বিভিন্ন সম্মানজনক পেশা দেখিয়ে দিতেন

• কৃষিকাজ

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

‘যেকোনো মুসলিম কোনো (ফলবান) গাছ রোপণ করে কিংবা কোনো ফসল ফলায় আর তা থেকে পাখি কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায়, তা তার পক্ষ থেকে সাদাকা বলে গণ্য হবে।’^{৯১৬}

ইমাম নববি رحمته الله বলেন, ‘এই হাদিসে গাছ রোপণ করা ও শস্যখেত করার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। আর রোপণকারীর সাওয়াব ততদিন পর্যন্ত জারি থাকবে, যতদিন পর্যন্ত গাছ ও শস্য থাকবে। এ ছাড়াও কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন এই গাছ ও খেতের বীজ থেকে অন্য গাছ ও ফসল উৎপন্ন হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত রোপণকারীর প্রতি সাওয়াব পৌঁছতে থাকবে।’^{৯১৭}

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন :

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ

‘যদি কিয়ামত সংঘটিত হওয়া শুরু করে আর তোমাদের কারও হাতে একটি খেজুরের চারা থাকে। তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার

৯১৫. সহিহুল বুখারি : ১৪৭০, সহিহ মুসলিম : ১০৪২।

৯১৬. সহিহুল বুখারি : ২৩২০, সহিহ মুসলিম : ১৫৫৩।

৯১৭. ইমাম নববি رحمته الله কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১০/২১৩।

পূর্বেই যদি সেটা রোপণ করা সম্ভব হয়, তখন সে যেন তা-ই করে (চারা রোপণ করে)।^{৯১৮}

● কারিগরি

মিকদাম রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সঃ ইরশাদ করেছেন :

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنْ نَبِيٌّ
اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

‘হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জিত জীবিকার খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবি দাউদ সঃ নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।’^{৯১৯}

ইবনে হাজার রাঃ বলেন, ‘দাউদ সঃ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, তিনি জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি হিসেবে একমাত্র হাতের কাজকেই বেছে নিয়েছিলেন, অথচ সেটার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। কারণ, পবিত্র কুরআনের আয়াত অনুযায়ী তিনি জমিনের বুকে আল্লাহর প্রতিনিধি ছিলেন।

তিনি জীবিকা নির্বাহের সর্বোত্তম পদ্ধতিটাই বেছে নিয়েছিলেন। এ জন্য রাসূল সঃ হাতের কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা সর্বোত্তম হওয়ার ব্যাপারে তাঁকেই দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।’^{৯২০}

● ব্যবসা-বাণিজ্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

৯১৮. মুসনাদু আহমাদ : ১২৫৬৯।

৯১৯. সহিহুল বুখারি : ২০৭২।

৯২০. ফাতহুল বারি : ৪/৩০৬।

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস
করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা
করা হয় তা বৈধ।’^{৯২১}

ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উকাজ, মাজান্না ও জুল মাজাজ
জাহিলি যুগের বাজার ছিল। (ইসলামি যুগে) মুসলমানরা হজের মৌসুমে
সেখানে ব্যবসা করাকে গুনাহ মনে করতে লাগল। তখন আল্লাহ তাআলা
আয়াত নাজিল করলেন :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (في مواسم الحج)

‘(হজের মৌসুমে) তোমাদের ওপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ
অন্বেষণ করায় কোনো পাপ নেই।’ (সূরা আল-বাকারাহ : ১৯৭)^{৯২২}

বিশেষ দ্রষ্টব্য : في مواسم الحج (হজের মৌসুমে) অংশটি ইবনে আব্বাস
রাঃ-এর কিরাত। এটি শাজ (বিচ্ছিন্ন) কিরাত। তাই ইমামগণ এটাকে
তাফসিরের হুকুমে রেখেছেন।^{৯২৩}

উরওয়া আল-বারিকি রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল সঃ তাকে একটি দিনার
দিয়ে একটি ছাগল কিনতে পাঠালেন। তিনি তা দিয়ে দুটি ছাগল কিনলেন।
অতঃপর একটি ছাগল এক দিনার দিয়ে বিক্রি করে দিলেন এবং বাকি এক
দিনার ও অপর ছাগলটি নিয়ে রাসুল সঃ-এর কাছে এলেন। তখন রাসুল সঃ
তার জন্য বেচাকেনায় বরকতের দোয়া করলেন—“আল্লাহ তাআলা তোমার
হাতের লেনদেনের মধ্যে বরকত দান করুন।”

এরপর থেকে তিনি মাটি কিনলেও তাতে লাভবান হতেন।’^{৯২৪}

নবিগণ রাঃ বিভিন্ন কাজ-পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তন্মধ্যে
একটি হচ্ছে ছাগল চরানো।

৯২১. সূরা আন-নিসা, ৪ : ২৯।

৯২২. সহিহুল বুখারি : ৪৫১৯।

৯২৩. ফাতহুল বারি : ৩/৫৯৫।

৯২৪. সহিহুল বুখারি : ৩৬৪৩, সুনানুত তিরমিযি : ১২৫৮।

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন :

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ

‘আল্লাহ তাআলা যত নবিই পাঠিয়েছেন, প্রত্যেকে ছাগল চরিয়েছেন।’

সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ‘আপনিও চরিয়েছেন?’ তিনি বললেন :

نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيضَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

‘হ্যাঁ, আমি ছাগলপ্রতি এক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরাতাম।’^{৯২৫}

তন্মধ্যে আরেকটি পেশা হলো কামারের পেশা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ
- أَنْ اْعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

‘আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং হে পক্ষীসকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম। এবং তাঁকে আমি বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি করো, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করো এবং সৎকর্ম সম্পাদন করো। তোমরা যা কিছু করো, আমি তা দেখি।’^{৯২৬}

আরেকটি পেশা হলো ছুতারগিরি বা কাঠমিস্ত্রির কাজ।

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন :

كَانَ زَكْرِيَّا نَجَّارًا

৯২৫. সহিহুল বুখারি : ২২৬২।

৯২৬. সূরা সাবা, ৩৪ : ১০-১১।

‘জাকারিয়া ﷺ কাঠমিস্ত্রি ছিলেন।’^{৯২৭}

► এই হাদিস থেকে যেসব বিষয় প্রতীয়মান হয় :

- কারিগরি পেশাসমূহের বৈধতা।
- ছুতারগিরি মনুষ্যত্বকে নিচু করে না; বরং এটি একটি সম্মানজনক পেশা।
- জাকারিয়া ﷺ-এর ফজিলত। কারণ, তিনি হাতের কাজ করে জীবিকা উপার্জন করতেন।^{৯২৮}

এভাবে নবিগণের ওয়ারিশ আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কিরামও বিভিন্ন কাজ ও পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। ফলে অনেক আলিম নিজ নিজ পেশার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যেমন : বাজ্জাজ (বস্ত্র প্রস্তুতকারী বা বস্ত্র ব্যবসায়ী), জাস্সাস (চুন-কামকারী, প্লাস্টারকারী), খাওয়াস (খেজুরপাতা বিক্রেতা), জাজ্জার (কসাই), জাজ্জাজ (কাচ প্রস্তুতকারী বা কাচ ব্যবসায়ী), হাদাদ (কামার), হাজ্জা’ (জুতো প্রস্তুতকারী, মুচি) ইত্যাদি।

কর্মক্ষম ব্যক্তি কাজ না করে বসে থাকা খুবই নিন্দনীয়। এ জন্য রাসুল ﷺ মুসলমানদের সাদাকা থেকে অলস ও নিষ্কর্মা ব্যক্তিদের জন্য কোনো অংশ রাখেননি। যেন কর্মক্ষম ব্যক্তির কাজ ও বৈধ উপার্জনের প্রতি ধাবিত হয়। তিনি ইরশাদ করেন :

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

‘ধনী, কর্মক্ষম ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য সাদাকা হালাল নয়।’^{৯২৯}

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه বলেন, ‘আমি যখন কোনো ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখিরাতের কাজ থেকে বিরত দেখি, তখন তার প্রতি খুব রাগান্বিত হই।’^{৯৩০}

৯২৭. সহিহ মুসলিম : ২৩৭৯।

৯২৮. ইমাম নববি رحمته الله কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৫/১৩৫।

৯২৯. সুনানুত তিরমিজি : ৬৫২, সুনানু আবি দাউদ : ১৬৩৪।

৯৩০. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৩৪৫৬২।

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, ‘বীরপুরুষদের মতো কাজ করো। অর্থাৎ হালাল উপার্জন করে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করো।’^{৯৩১}

আরবি প্রবাদ আছে, ‘একটি কূপ খনন করো, আরেকটি কূপ ভরো; তবুও কোনো শ্রমিককে বেকার থাকতে দিয়ো না।’^{৯৩২} এর ব্যাখ্যা হলো, কোনো যুবককে কর্মহীন রেখো না। তাদের কাজে অভ্যস্ত করে তোলো। যেন বসে বসে খাবার খাওয়ার কুঅভ্যাস তাদের মাঝে না আসে। এমনকি প্রয়োজনীয় কোনো কাজ না থাকলেও অপ্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে তাদের কর্মস্পৃহা ও সামর্থ্যকে জিইয়ে রাখতে হবে। কারণ, কাজটি অপ্রয়োজনীয় হলেও তাদের কাজ ও মেহনতে লিপ্ত থাকা এবং অকর্মণ্য না হওয়া কিন্তু মোটেই অপ্রয়োজনীয় বিষয় নয়।

কবি বলেন :

أهجر النوم في طلاب العلاء *** وصل الصبح دائباً بالمساء

والتمس بالمسير في كل قطر *** رتبة العارفين والحكماء

إن أمضى الرجال من كان سهماً *** نافذاً في حشاشة الغبراء

إنما الأرض والفضاء كتاب *** فاقراءوه معاشر الأذكاء

‘উচ্চ মর্যাদা যদি অর্জন করতে চাও, তাহলে ঘুম পরিত্যাগ করো।
নিরলস কাজ করতে করতে সকালকে সন্ধ্যার সাথে মিলিয়ে ফেলো।
জ্ঞানী ও দার্শনিকদের স্তরে উন্নীত হতে চাইলে পৃথিবীর সকল প্রান্তে
ঘুরে বেড়াও। যে মানুষ শ্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, সে সবার পেছনে
পড়ে থাকে। এই ভূপৃষ্ঠ ও তার ওপরে শূন্যলোক যেন একটি বই।
তা পাঠ করো হে মেধাবী সম্প্রদায়!’

রাসুল ﷺ তাদের সামনে প্রকৃত মিসকিনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন :

৯৩১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/৩৮১।

৯৩২. মাজমাউল আমসাল : ১/২৩০।

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ،
وَالثَّمْرَةُ وَالثَّمَرَتَانِ

‘সেই ব্যক্তি মিসকিন নয়, যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং এক-দুই লুকমা খাবার কিংবা দু-একটি খেজুর নিয়ে ফিরে যায়।’

তারা বললেন, ‘তাহলে মিসকিন কে, ইয়া রাসুলাল্লাহ?’

তিনি বললেন :

الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطِنُ بِهِ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ
فَيَسْأَلُ النَّاسَ

‘যার কাছে পর্যাপ্ত ধনসম্পদ নেই, যা তাকে অমুখাপেক্ষী রাখবে। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারে না বিধায় তাকে সাদাকা দেয় না। আর সে মানুষের কাছে ভিক্ষাও করে না।’^{৯৩৩}

‘সেই ব্যক্তি মিসকিন নয়, যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়’—এর অর্থ হলো, যেই মিসকিন সাদাকা পাওয়ার সর্বাধিক হকদার, সে ওই ব্যক্তি নয়, যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার বুলি নিয়ে ঘোরে। বরং ওই ব্যক্তিই সাদাকা পাওয়ার প্রকৃত হকদার, যে গরিব কিন্তু মানুষকে তা বুঝতে দেয় না এবং ভিক্ষা করে বেড়ায় না। হাদিসের অর্থ এ নয় যে, ভিক্ষুকরা নিঃস্ব অর্থেও মিসকিন নয়।^{৯৩৪}

ভিক্ষুকদের অল্পকিছু হলেও দান করার নির্দেশ দিতেন

ভিক্ষাবৃত্তি অপছন্দ করলেও ভিক্ষুকদের সামান্য হলেও দান করতে বলতেন। কারণ, মানুষের সম্পদে ভিক্ষুকদের হক রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

৯৩৩. সহিহুল বুখারি : ১৪৭৬, সহিহ মুসলিম : ১০৩৯ (আবু হুরাইরা রা থেকে বর্ণিত)

৯৩৪. ইমাম নববি রা কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৭/১২৯।

‘এবং তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী (ভিক্ষুক) ও বঞ্চিতের হক।’^{৯৩৫}

অন্যত্র বলেন :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ - لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

‘এবং যাদের ধনসম্পদে নির্ধারিত হক আছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের।’^{৯৩৬}

সাদি রহিমুল্লাহ বলেন, ‘এবং তাদের ধনসম্পদে হক রয়েছে’—অর্থাৎ মুসতাহাব ও ওয়াজিব হক রয়েছে ওই সব অভাবীর জন্য, যারা মানুষের কাছে ভিক্ষা করে এবং তাদের হকও রয়েছে, যারা মানুষের কাছে ভিক্ষা করে না।^{৯৩৭}

এ জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। যদিও তা সামান্য পরিমাণ হোক।

আব্দুর রহমান বিন বুজাইদ রাহিমুল্লাহ তার দাদি উম্মে বুজাইদ রাহিমুল্লাহ (তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইআত গ্রহণকারী সৌভাগ্যবতী মহিলাদের অন্যতম) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার দরোজায় মিসকিন আসে, কিন্তু তাকে দেওয়ার মতো আমার কাছে কিছু থাকে না।” তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِيَنَّهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظُلْفًا مُحَرَّقًا، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ

“যদি তাকে দেওয়ার জন্য (পশুর) একটি পোড়া খুরও তোমার কাছে থাকে, তাহলে সেটাই তার হাতে তুলে দিয়ো।”^{৯৩৮}

পোড়া খুরের কথা উল্লেখ করে সামান্য পরিমাণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে না দিয়ে সামান্য পরিমাণ যা আছে, তা-ই দিয়ে বিদায় করা উচিত। তা পোড়া খুরের মতো নিম্নমানের বস্তুই হোক না কেন?^{৯৩৯}

৯৩৫. সূরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ১৯।

৯৩৬. সূরা আল-মারিজ, ৭০ : ২৪-২৫।

৯৩৭. তাফসিরুস সাদি : ১/৮০৮।

৯৩৮. সুনানু আবু দাউদ : ১৬৬৭, সুনানুত তিরমিজি : ৬৬৫।

৯৩৯. তুফফাতুল আহওয়াজি : ৩/২৬৮।

অপর রিওয়াযাতে আমর বিন মুআজ আনসারি   থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘তাদের দরোজায় একজন ভিক্ষুক আসলেন। তখন তার দাদি বললেন, “ওকে খেজুর খাওয়াও।” বাড়ির লোকেরা বলল, “আমাদের কাছে খেজুর নেই।” তিনি বললেন, “তাহলে ছাতু পান করাও।” তারা বললেন, “আশ্চর্য, আমাদের কাছে যা নেই, তা তাকে কী করে খাওয়াব!” দাদি বললেন, “(আমি কিছু না কিছু এ জন্য দিতে বলছি যে,) আমি রাসুল  -কে বলতে শুনেছি—

لَا تَرُدُّوْا السَّائِلَ، وَلَوْ بِظُلْفٍ مُحْرَقٍ

“ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না; অন্তত পোড়া খুর হলেও তাকে দিয়ো।”^{৯৪০}

গরিবদের শাদি করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন

আবু বারজা আসলামি   থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আনসারদের কাছে কোনো বিবাহযোগ্য কন্যা থাকলে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে দিতেন না, যতক্ষণ না তারা জেনে নিতেন যে, তার প্রতি রাসুল  -এর প্রয়োজন আছে কি না।

তো রাসুল   জনৈক আনসারি লোককে বললেন, “তোমার মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দাও।”

তিনি বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, তা তো আমার জন্য খুবই সৌভাগ্য ও সম্মানের বিষয় হবে।”

রাসুল   বললেন, “আমি নিজের জন্য তাকে চাইছি না।”

তিনি বললেন, “তো কার জন্য, ইয়া রাসুল্লাহ?”

রাসুল   বললেন, “আমার দুধ-সন্তানের জন্য।”

তিনি বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, আমাকে একটু মেয়ের মায়ের সাথে পরামর্শ করতে হবে।”

তখন লোকটি মেয়ের মায়ের কাছে গিয়ে বললেন, “রাসুল ﷺ তোমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন।”

মা বললেন, “তা তো খুবই সৌভাগ্যের বিষয়!”

তিনি বললেন, “তিনি নিজের জন্য প্রস্তাব দেননি; বরং তাঁর দুধ-সন্তানের জন্য দিয়েছেন।”

মা বললেন, “তাঁর দুধ-সন্তান তো তাঁর নিজের সন্তান নয়। আল্লাহর কসম, আমি তাকে বিয়ে দেবো না।”

যখন তিনি রাসুল ﷺ-কে মেয়ের মায়ের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য যেতে উদ্যত হলেন, তখন মেয়ে বললেন, “তোমাদের নিকট কে প্রস্তাব পাঠিয়েছে?”

মা তাকে বিস্তারিত ঘটনা শোনালেন। তখন মেয়েটি বললেন, “তোমরা কি রাসুল ﷺ-এর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে চাও? আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে নাও। তিনি আমার ক্ষতি করবেন না।”

এরপর মেয়ের বাবা রাসুল ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। এভাবে রাসুল ﷺ-এর দুধ-সন্তানের সাথে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল।

এরপর রাসুল ﷺ কোনো এক যুদ্ধাভিযানে বের হলেন। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা (বিজয় দান করলেন এবং) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দান করলেন, তখন তিনি বললেন, “তোমরা কি কাউকে হারিয়ে ফেলেছ?”

তারা বললেন, “আমরা অমুক অমুককে হারিয়ে ফেলেছি।”

তিনি বললেন, “ভালো করে দেখো, আরও কাউকে হারিয়ে ফেলেছ কি না।”

তারা বললেন, “না, আর কেউ নেই।”

তিনি বললেন, “কিন্তু আমি তো আমার দুধ-সন্তানকে দেখতে পাচ্ছি না। নিহতদের মধ্যে তাকে খুঁজে দেখো।”

তখন সাহাবায়ে কিরাম তাকে খুঁজতে লাগলেন। একপর্যায়ে তাকে সাতজন নিহত শত্রুসেনার পাশে পাওয়া গেল। তিনি ওই সাতজনকে হত্যা করার পর নিহত হয়েছেন। সাহাবিগণ বললেন, “ইয়া রাসুলান্নাহ, সাতজনকে মেরে তিনি নিহত হয়ে এখানে পড়ে আছেন।”

তখন রাসুল ﷺ তার কাছে আসলেন এবং পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, “সাতজনকে হত্যা করে সে নিহত হয়েছে। সে আমার থেকে আর আমি তার থেকে।” কথাটি দুবার বা তিনবার বললেন।

অতঃপর রাসুল ﷺ তাকে নিজ বাহুর ওপর নিলেন এবং তার জন্য কবর খনন করলেন। রাসুল ﷺ-এর বাহুদ্বয় ছাড়া তাকে কোনো খাটিয়ায় তোলা হয়নি। অতঃপর তাকে কবরে রাখলেন। রাসুল ﷺ তাকে গোসল দিয়েছেন কি না, তা বর্ণনাকারী উল্লেখ করেননি।

ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন আবু তালহা ؓ সাবিত ؓ-কে বললেন, “আপনার কি জানা আছে, ওই মেয়ের জন্য রাসুল ﷺ কী দোয়া করেছিলেন?”

তিনি বললেন, (রাসুল ﷺ দোয়া করেছিলেন :)

اللَّهُمَّ صَبِّ عَلَيْهَا الْخَيْرَ صَبًّا، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَذَا كَذَا

“হে আল্লাহ, এই মেয়ের ওপর কল্যাণ ঢেলে দিন এবং তার জীবনকে কষ্টমুক্ত রাখুন।”

সাবিত ؓ বলেন, ‘এর পর থেকে আনসারিদের মধ্যে তার মতো প্রশস্ত হাতে ব্যয়কারী কোনো মানুষ ছিল না।’^{৯৪১}

আব্দুল মুত্তালিব বিন রাবিআ বিন হারিস বলেন, ‘রাবিআ বিন হারিস (রাসুল ﷺ-এর চাচাতো ভাই) ও আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব পরস্পর বলছিলেন, “আল্লাহর শপথ, যদি আমরা এ দুজনকে (আব্দুল মুত্তালিব বিন রাবিআ ও ফজল বিন আব্বাস) রাসুল ﷺ-এর কাছে পাঠাই। তারা দুজন রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলবে। রাসুল ﷺ তাদের দুজনকে সাদাকা আদায়ের কাজে লাগিয়ে

দেবেন। তারা অন্যদের মতো সাদাকা উত্তোলন করে দেবে। ফলে রাসুল ﷺ তাদেরও তা-ই দেবেন, যা অন্য সাদাকা উত্তোলনকারীদের দিয়ে থাকেন।

তাদের কথা বলার সময় আলি ﷺ এসে উপস্থিত হলেন। তারা দুজন আলিকে বললেন ব্যাপারটা। আলি ﷺ বললেন, “এমনটা করবে না। আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ কখনো এমনটা করবেন না। (তথা সাদাকা উত্তোলনের পারিশ্রমিক দেবেন না।)”

আলির কথায় রাবিআ বিন হারিস রাগান্বিত হয়ে বললেন, “আল্লাহর শপথ, তুমি আমাদের প্রতি হিংসাবশতই এমন বলছ। আল্লাহর কসম, তুমি তো রাসুল ﷺ-এর জামাই হয়েছ—আমরা তো তোমার প্রতি হিংসা পোষণ করি না।”

এরপর আলি ﷺ “ঠিক আছে। তাদের পাঠিয়ে দাও।” বলে নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে সেখানে শুয়ে পড়লেন। বললেন, “আমি সাইয়িদ হাসানের পিতা। আল্লাহর কসম, তোমরা যে উদ্দেশ্যে তোমাদের ছেলেদের পাঠালে তার (বিফলতার) জবাব না আসা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।”

আব্দুল মুত্তালিব বলেন, “রাসুল ﷺ জোহর পড়ে আসার আগেই আমরা তাঁর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি এসে আমাদের দুজনের কান ধরে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, “কী উদ্দেশ্যে এসেছ, না লুকিয়ে বলে ফেলো।”

এরপর রাসুল ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে এলাম ঘরের ভেতর। সেদিন তিনি জাইনাব বিনতে জাহাশের ঘরে ছিলেন। কথা বলার জন্য আমরা একে অন্যকে বলছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের একজন কথাটা তুলল। বলল, “আল্লাহর রাসুল, আপনি মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ অনুগ্রহকারী। সর্বোত্তম আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আমরা বিয়ের উপযুক্ত হয়েছি। তাই আপনার কাছে এসেছি, যদি আপনি আমাদের সাদাকা উত্তোলনের কাজ দেন, তবে আমরা অন্যদের মতো সাদাকা তুলে দেবো, আপনি অন্যদের যে রকম পারিশ্রমিক দেন, আমাদেরও তেমন দেবেন।”

এরপর রাসুল ﷺ অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আমরাই কথা বলার জন্য উদ্যত হচ্ছিলাম এমন সময় জাইনাব রা. পর্দার আড়াল থেকে ইশারা করে আমাদের চুপ থাকতে বললেন।

এরপর রাসুল ﷺ বললেন, “মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের জন্য সাদাকা ভক্ষণ করা সমীচীন নয়। সাদাকা মানুষের (সম্পদের) ময়লা। মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের জন্য এটা হালাল নয়। তোমরা মাহমিয়া বিন জাজ’ ও নাওফাল বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবকে ডেকে আনো।” বনু আসাদের এক লোকের নাম ছিল মাহমিয়া। রাসুল ﷺ তাকে খুমুসের^{৯৪২} কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন।

তারা দুজন এলে মাহমিয়াকে রাসুল ﷺ বলেন, ‘এ ছেলের কাছে তোমার মেয়েকে বিয়ে দাও’—এই বলে তিনি ফজল বিন আব্বাসের দিকে ইশারা করলেন। মাহমিয়া তাকে তার মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দিল।

তারপর আমার (আব্দুল মুত্তালিব) দিকে ইশারা করে নাওফাল বিন হারিসকে বললেন, “এ ছেলের সাথে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও।” নাওফাল তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিলেন।

এরপর তিনি মাহমিয়াকে বললেন, “খুমুসের সম্পদ থেকে এত এত পরিমাণ এদের দুজনকে দাও।”^{৯৪৩}

ইমাম নববি রা. বলেন :

““খুমুসের ভান্ডার থেকে এদের দাও”—হতে পারে রাসুল ﷺ-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে খুমুস থেকে তারা দুজন একটা অংশ পেয়েছিলেন। কারণ, তারা দুজন রাসুল ﷺ-এর নিকটাত্মীয় ছিলেন। আবার এও হতে পারে যে, খুমুসের যে অংশ রাসুলুল্লাহ রা. পেতেন, সেখান থেকেই তাদের দুজনকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।”^{৯৪৪}

৯৪২. জিহাদে মুজাহিদরা যে গনিমত লাভ করে, তার এক-পঞ্চমাংশকে খুমুস বলা হচ্ছে। (অনুবাদক)

৯৪৩. সহিহ মুসলিম : ১০৭২।

৯৪৪. সহিহ মুসলিম : ১০৭২।

এক মহিলা নিজেকে রাসুল ﷺ-এর হাতে সোপর্দ করেছিলেন। রাসুল ﷺ তাকে এমন এক দরিদ্র লোকের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন, যার কাছে মোহরানা দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না।

ঘটনাটি সাহল বিন সাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘একজন মহিলা রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করতে এসেছি।’ এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তার দিকে দেখলেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দৃষ্টি দিলেন। আপাদমস্তক দেখা শেষ করে তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলা দেখতে পেলেন, নবিজি ﷺ তার সম্পর্কে কোনো ফয়সালা দিচ্ছেন না, তখন তিনি বসে পড়লেন। তারপর একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে অনুরোধ করলেন, “হে আল্লাহর রাসুল, যদি আপনার এ মহিলার কোনো প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে তাকে বিয়ে দিয়ে দিন।” তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমার কাছে কোনো সম্পদ আছে কি?” তিনি বললেন, “না, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসুল, আমার কাছে কোনো সম্পদ নেই।” তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তুমি তোমার পরিবারের লোকদের কাছে গিয়ে দেখো, কোনো কিছু পাও কি না?”

অতঃপর তিনি চলে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, “না, হে আল্লাহর রাসুল, আমি কিছুই পেলাম না।” তখন তিনি বললেন, “অন্তত একটি লোহার আংটি হলেও পাও কি না দেখো!” তিনি চলে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, “না, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম, একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই আমার তহবন্দ আছে। [বর্ণনাকারী সাহল ﷺ বলেন, তার কোনো চাদর ছিল না] এর অর্ধেক তাকে দিয়ে দেবো।” রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমার এ তহবন্দ দ্বারা কী হবে? যদি তুমি পরো, তবে তার জন্য কিছুই থাকবে না; আর যদি সে পরে, তাহলে তোমার জন্য কিছুই থাকবে না।” এরপর লোকটি বসে পড়লেন। দীর্ঘক্ষণ পরে তিনি চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখলেন এবং ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কুরআন কতটুকু জানা আছে?” তিনি বললেন, “হাঁ, আমার অমুক, অমুক, অমুক সুরা জানা আছে।” তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তুমি কি এগুলো মুখস্থ পড়তে পারো?” তিনি বললেন,

“হাঁ।” তখন রাসুল ﷺ বললেন, “যাও, যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জানো, এর বিনিময়ে এই মহিলাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দিলাম।”^{৯৪৫}

► হাদিসের ফায়দাসমূহ :

- কোনো মেয়ে নিজেকে রাসুল ﷺ-এর হাতে সঁপে দেওয়া বৈধ (রাসুল ﷺ তাকে বিনা মোহরানায় বিয়ে করতে পারবেন)। তবে এই বৈধতা শুধু রাসুল ﷺ-এর জন্য। অন্য কারও জন্য এটা বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَمْرَأَةٌ مُّؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

‘কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবির কাছে সমর্পণ করে, নবি তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য; অন্য মুমিনদের জন্য নয়।’^{৯৪৬}

- কোনো মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করলে তাকে দেখা ও তাকে নিয়ে চিন্তা করা বৈধ।
- কোনো মেয়ে নিজেকে কোনো ভালো মানুষের কাছে বিয়ে করার জন্য পেশ করতে পারবে।
- কারও কাছে কোনো প্রয়োজন চাওয়া হলো, কিন্তু তার কাছে তা পূরণ করে দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তখন চুপ থাকা মুসতাহাব যেন আবেদনকারী বুঝতে পারে। সরাসরি না করে দিয়ে তাকে লজ্জা দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য আবেদনকারী যদি চুপ থাকা থেকে বুঝতে না পারে, তখন স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায়।
- মোহরানাসহ নিকাহ করা মুসতাহাব। কারণ, এতে ঝগড়া-ফাসাদের রাস্তা বন্ধ হয় এবং মেয়ের উপকার হয়। বিশেষ করে তখন উপকার হয়, যখন

৯৪৫. সহিহুল বুখারি : ৫০৩০, সহিহ মুসলিম : ১৪২৫।

৯৪৬. সূরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৫০।

মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়া হয় এবং নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক তাকে দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। মোহর নির্ধারণ করা না হলে ওই অবস্থায় সে অর্ধেক মোহর পায় না; বরং মুতআ পায়। অবশ্য মোহর ব্যতীত কেউ বিয়ে করলে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে।^{৯৪৭} আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

‘স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগে এবং কোনো মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোনো পাপ নেই।’^{৯৪৮}

- স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে মোহর কম-বেশি হওয়া বৈধ।
- লোহার আংটি পরিধান করা বৈধ।
- কেউ শপথের দাবি না করলেও এবং প্রয়োজন না থাকলেও শপথ করা বৈধ।
- অভাবগ্রস্ত লোকের বিয়ে করা ও তাকে বিয়ে দেওয়া জাযিজ।
- এই হাদিসে কওমের লোকদের প্রতি নেতার চিন্তা-ফিকির ও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে কাজের উপায় বলে দেওয়ার স্বরূপ ফুটে উঠেছে।
- অনুরূপভাবে এই হাদিস থেকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

পরস্পরের আর্থিক বিষয়টি দেখাশোনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন

আবু মুসা আশআরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ

৯৪৭. হানাফি মাজহাব অনুসারে, মোহর নির্ধারণ না করলেও মোহরে মিছিল ওয়াজিব হয়ে যায়।
(অনুবাদক)

৯৪৮. সূরা আল-বাকারা, ২ : ২৩৬।

جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

‘আশআরি গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদিনাতেই তাদের পরিবার-পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায়, তখন তারা তাদের যা কিছু সম্বল থাকে, তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার এবং আমি তাদের।’^{৯৪৯}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- আশআরি গোত্রের ফজিলত।
- পরস্পর সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ফজিলত। সফরের সময় সবার আসবাব-পাথেয় একত্রে রাখার ফজিলত। শহরের মধ্যে টাকা-পয়সা কমে গেলে যার যা আছে, সবগুলো এক জায়গায় জমা করে সমানভাগে ভাগ করে নেওয়ার ফজিলত।^{৯৫০}

বর্তমান সময়ে ‘সাহায্য তহবিল’ নামে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারের লোকেরা এক ধরনের ফান্ড গঠন করে। সেখানে প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা জমা করে। অতঃপর সব টাকা অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করা হয়। এ ধরনের ‘সাহায্য তহবিল’ আশআরিদের কর্মের সাথে পুরোপুরি বা আংশিক মিলে যায়।

একটি সতর্কতা : অধিকাংশ মুসলিম দেশে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের অধীনে ‘সাহায্য তহবিল’ পরিচালিত হয়। এসব তহবিলের টাকা সুদভিত্তিক ব্যাংকে জমা রাখা হয় এবং ব্যাংক থেকে যে সুদ পাওয়া যায়, তা গরিবদের জন্য ব্যয় করা হয়। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। এই গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

৯৪৯. সহিহুল বুখারি : ২৪৮৬, সহিহ মুসলিম : ২৫০০।

৯৫০. ইমাম নববি ৞ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১৬/৬২।

কারণ, এতে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী তাদের ব্যাপারে প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا - الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

‘বলুন, আমি কি তোমাদের সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সেসব লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।’^{৯৫১}

কবির ভাষায় :

بنی مسجدا لله من غير حله *** فصار بحمد الله غير موفق
كمطعمة الأيتام من كد فرجها *** لك الويل لا تزنى ولا تتصدقني

‘হারাম সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করলে আল্লাহর প্রশংসা পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টো তার তুলনা ওই বেশ্যার সাথে হবে, যে ব্যভিচার করে বিনিময় নেয় এবং তা দিয়ে এতিমদের খাওয়ায়। তোমার জন্য ধ্বংস! তোমার ব্যভিচার করারও দরকার নেই, সাদাকা করারও দরকার নেই।’

দারিদ্র্যের মাঝেও সুন্দরভাবে বাঁচার শিক্ষা দিতেন

আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূল সঃ-কে বলতে শুনেছি—

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

“যে ব্যক্তি রিজিকের প্রশস্ততা ও আয়ু বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে, সে যেন আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করে।”^{৯৫২}

৯৫১. সূরা আল-কাহফ, ১৮ : ১০৩-১০৪।

৯৫২. সহিহুল বুখারি : ২০৬৭, ৫৯৮৫; সহিহ মুসলিম : ২৫৫৭।

ফায়দা : শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رحمہ اللہ-কে প্রশ্ন করা হলো, ‘রিজিক হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কি না? আর রিজিক কি শুধু খাদ্যকে বোঝায়, না বান্দার মালিকানাধীন সবকিছুকে বোঝায়?’

তিনি উত্তর দিলেন, ‘রিজিক দুই প্রকার : ১. যা শুধু আল্লাহর ইলমে আছে যে, তিনি বান্দাকে দান করবেন। এ রিজিক পরিবর্তিত হয় না। ২. যা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ফেরেশতাগণকে তা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এই রিজিক উপার্জনের মাধ্যমভেদে কমে কিংবা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যে রিজিক ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার জন্য লিপিবদ্ধ করেন, আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার কারণে সে রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

যেসব মাধ্যম দ্বারা রিজিক অর্জিত হয়, তাও আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দেন এবং লিপিবদ্ধ করে রাখেন। যার জন্য তিনি নির্ধারিত করেন যে, সে চেষ্টা ও কামাইয়ের মাধ্যমে রিজিক অর্জন করবে, তার মাঝে চেষ্টা ও কামাই করার বোধ সৃষ্টি করে দেন। যে পরিমাণ রিজিক কামাই করার শর্তে নির্ধারণ করে রাখেন, তা কামাই করা ব্যতীত অর্জিত হবে না। আর যে পরিমাণ রিজিক কামাইবিহীন নির্ধারণ করেছেন, যেমন : উত্তরাধিকার, তা কামাই করা ব্যতীত অর্জিত হয়।

রিজিক অর্জনের চেষ্টা দুই প্রকার : ১. রিজিক উপার্জনের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের মাধ্যমে চেষ্টা করা। যেমন : কারিগরি, কৃষি ও ব্যবসার মাধ্যমে চেষ্টা করা।

২. দোয়া, তাওয়াক্কুল, মাখলুকের প্রতি অনুগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে চেষ্টা করা। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতা করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার সাহায্য-সহযোগিতা করেন।’^{৯৫৩}

● গুনাহ পরিত্যাগ করা

সাওবান رحمہ اللہ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالدَّنْبِ يُصِيبُهُ

‘গুনাহের কারণে মানুষ রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়।’^{৯৫৪}

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ বলেন, ‘একবার রাসুল সঃ আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, “হে মুহাজিরগণ, তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে মহামারি আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তা ছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে, তখন তাদের ওপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসিবত। আর যখন জাকাত আদায় করে না, তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি ভূপৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকত, তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন।’^{৯৫৫}

ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেন :

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرَّبِّ، إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

‘যে ব্যক্তি সুদের মাধ্যমে সম্পদ বাড়িয়েছে, পরিণামে তার সম্পদ অবশ্যই কমে যাবে।’^{৯৫৬}

● একসাথে হজ ও উমরা করা

রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا: يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي
الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

৯৫৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০২২।

৯৫৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০১৯

৯৫৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৭৯।

‘একসাথে হজ ও উমরা আদায় করো। কারণ, হজ ও উমরা দারিদ্র্য ও গুনাহকে এমনভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।’^{৯৫৭}

● ভিক্ষা পরিত্যাগ করা

আবু কাবশা আনমারি রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সঃ-কে বলতে শুনেছেন—

ثَلَاثَةٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ

‘আমি তিনটি জিনিসের ব্যাপারে শপথ করছি :

১. কোনো বান্দার মাল সাদাকা করলে কমে যায় না।
২. কোনো বান্দার ওপর কোনো প্রকার অত্যাচার করা হলে এবং সে তার ওপর ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ নিশ্চয় তার সম্মান বাড়িয়ে দেন।
৩. কোনো বান্দা যাচনার দুয়ার খুললে আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দরোজা খুলে দেন।’^{৯৫৮}

● রিজিক অন্বেষণে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখা

উমর বিন খাতাব রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সঃ ইরশাদ করেছেন :

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

‘তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভরশীল হতে, তাহলে পাখিদের যেভাবে রিজিক দেওয়া হয়, সেভাবে

৯৫৭. সুনানুন নাসায়ি : ২৬৩০।

৯৫৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৩২৫।

তোমাদেরকেও রিজিক দেওয়া হতো। এরা সকালবেলা খালি পেটে
বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।’^{৯৫৯}

‘তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভরশীল হতে’—অর্থাৎ
যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে যে, আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা এবং তিনি
ব্যতীত দান করার ও বাধা দেওয়ার শক্তি কারও নেই। অতঃপর এই বিশ্বাস
নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে উত্তম উপায়ে রিজিক অন্বেষণ করতে,
তখন...^{৯৬০}

উম্মাহর ব্যাপারে দারিদ্র্যের চেয়ে ধনাঢ্যতাকে বেশি ভয় করতেন

আমর বিন আওফ রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল সঃ আবু উবাইদা বিন জাররাহ
রাঃ-কে জিজিয়া আনার জন্য বাহরাইন পাঠান। রাসুল সঃ বাহরাইনবাসীদের
সাথে সন্ধি করে আলা বিন হাজরামি রাঃ-কে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন।
আবু উবাইদা রাঃ বাহরাইন থেকে মাল নিয়ে এসে পৌঁছালে, আনসারগণ
তার আগমনের সংবাদ জানতে পেরে সকলেই রাসুল সঃ-এর সাথে ফজরের
নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন।

নামাজের পর ফিরে বসলে তারা সকলেই তাঁর সামনে আসলেন। রাসুল সঃ
তাদের দেখে মুচকি হেসে বললেন, “আমার মনে হয়, তোমরা গুনতে পেয়েছ
যে, আবু উবাইদা কিছু মাল নিয়ে এসেছে?” তারা সকলেই বললেন, “হ্যাঁ,
ইয়া রাসুলাল্লাহ!” তিনি বললেন :

فَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسْرُكُكُمْ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي
أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ

“সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তোমাদের আনন্দদায়ক বিষয়ের আশায়
থাকো, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের আশঙ্কা

৯৫৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৪৪, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১৬৪।

৯৬০. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/৭।

করি না। বরং আমি আশঙ্কা করি যে, তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য এসে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে এসেছিল, তখন তোমরা তা লাভ করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে— যেমনভাবে তারা করেছিল। আর এ ধনসম্পদ তাদের যেমনিভাবে ধ্বংস করেছিল, তোমাদেরকেও তেমনিভাবে ধ্বংস করে দেবে।”^{৯৬১}

ইবনে বাত্তাল رحمہ اللہ বলেন, ‘এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, দুনিয়ার চাকচিক্য ও প্রাচুর্য যার অর্জিত হয়েছে, সে যেন তার মন্দ পরিণাম ও ভয়ংকর ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক থাকে। দুনিয়ার চাকচিক্য ও প্রাচুর্য নিয়ে নিশ্চিত ও বেপরোয়া হয়ে না পড়ে এবং তা অর্জনের জন্য অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে।’^{৯৬২}

আবু দারদা رضی اللہ عنہ বলেন, ‘একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা দারিদ্র্য সম্পর্কে আলাপরত ছিলাম এবং আমরা সে বিষয়ে শঙ্কিত ছিলাম। তিনি বললেন :

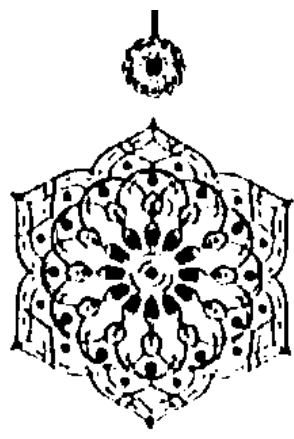
أَلْفَقَرٌ تَخَافُونَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُصَبَّنَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا،
حَتَّى لَا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً إِلَّا هَيْهَ، وَائِمُّ اللَّهِ، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ
عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ

“তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় করছ? সেই সত্তার শপথ—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই তোমাদের ওপর পৃথিবী প্রবল বেগে প্রবাহিত হবে (প্রভাব বিস্তার করবে), এমনকি পৃথিবী তোমাদের অন্তর কেবল তার দিকেই আকৃষ্ট করে ফেলবে। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ছেড়ে গেলাম, যার রাত ও দিন ঔজ্জ্বল্যে পরস্পর সমান।”^{৯৬৩}

৯৬১. সহিহুল বুখারি : ৪০১৫, সহিহুল মুসলিম : ২৯৬১।

৯৬২. ইবনে বাত্তাল رحمہ اللہ কৃত শারহু সহিহিল বুখারি : ১০/১৫৫।

৯৬৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৫।



❖ [চতুর্থ পরিচ্ছেদ] ❖

ধনীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

গত পরিচ্ছেদে আমরা দরিদ্রদের সাথে রাসুল ﷺ-এর আচরণবিধি সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। সেখানে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কখনো কখনো তিনি তাদের খাবার খাওয়াতেন। কখনো তাদের নিজের ঘরে বসাতেন। কখনো তাদের সাদাকা দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। কখনো সাহাবিদের নিকট তাদের মেহমানদারি করার জন্য পেশ করতেন। কখনো তাদের জন্য দোয়া করতেন, যেন আল্লাহ তাআলা তাদের অভাব দূর করে দেন এবং সচ্ছলতা দান করেন। কখনো তাদের সবার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন এবং সান্ত্বনা দিতেন। তাদের বোঝাতেন যে, এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত চিরস্থায়ী। কখনো তাদের ক্ষুধার্ত থাকা ও দারিদ্র্যের ওপর ধৈর্য ধরে থাকার ফজিলত স্মরণ করিয়ে দিতেন। কখনো তাদের কাজ করে টাকা-পয়সা উপার্জনের পন্থা বাতলিয়ে দিতেন।

এ পরিচ্ছেদে ধনীদের সাথে রাসুল ﷺ-এর আচরণবিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ধনী সম্প্রদায় হলো সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়। সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

‘আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিয়ো না। বরং তা থেকে তাদের খাওয়াও, পরাও এবং তাদের সান্ত্বনার বাণী শোনাও।’^{৯৬৪}

অর্থাৎ ধনসম্পদ দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করার মাধ্যমে তাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করো।^{৯৬৫}

আব্রাহাম তাআলা আমাদের ধনসম্পদ দান করার মাধ্যমে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। তিনি বলেন :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

‘হে আদম-সন্তান, আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং পরহেজগারির পোশাক, এটি সর্বোত্তম।’^{৯৬৬}

‘রিশ’ তথা সাজসজ্জার বস্ত্র থেকে সকল আসবাবপত্র ও ধনসম্পদ উদ্দেশ্য।^{৯৬৭}

সুফইয়ান সাওরি রাঃ বলেন, ‘আমার কাছে দশ হাজার দিরহাম থাকা—কিয়ামতের দিন যেগুলোর হিসাব দিতে হবে—(দারিদ্র্যের কারণে) মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়ার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।’^{৯৬৮}

রাসুল সঃ-এর অনুসারীদের মধ্যে গরিব শ্রেণির লোক যেমন ছিলেন, ধনী শ্রেণির লোকও ছিলেন। সাহাবিগণের মধ্যে বিশালসংখ্যক লোক ধনী ছিলেন। যেমন : আবু বকর রাঃ, আব্দুর রহমান বিন আওফ রাঃ, উসমান বিন আফফান রাঃ, সাদ বিন রাবি রাঃ, আবু তালহা রাঃ প্রমুখ।

এই ধনী শ্রেণির লোকদের সাথে রাসুল সঃ-এর আচরণবিধি কেমন ছিল, তা নিম্নে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

৯৬৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ২/২১৪।

৯৬৬. সূরা আল-আরাফ, ৭ : ২৬।

৯৬৭. তাফসিরুত তাবারি : ১২/৩৬৪।

৯৬৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/৩৮১।

দীন ইসলামের সেবায় তাদের ভূমিকার সাক্ষ্য দিয়েছেন

আবু দারদা রাঃ বলেন, ‘আমি নবিজি সঃ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবু বকর রাঃ পরনের কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে আসলেন যে তার দুহাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নবিজি সঃ বললেন, “তোমাদের এ সাথি এই মাত্র কারও সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে।” তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আমার ও উমর বিন খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমিই প্রথমে কটু কথা বলেছি। অতঃপর আমি লজ্জিত হয়ে তার কাছে মাফ চেয়েছি। কিন্তু তিনি মাফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার নিকট হাজির হয়েছি।” নবিজি সঃ বললেন, “আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বকর!” এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর উমর রাঃ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবু বকর রাঃ-এর বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “আবু বকর কি বাড়িতে আছেন?” তারা বলল, “না।” তখন উমর রাঃ নবিজি সঃ-এর নিকট চলে আসলেন। (তাকে দেখে) নবিজি সঃ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আবু বকর রাঃ ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আমিই প্রথমে অন্যায় করেছি।” এ কথাটি তিনি দুবার বললেন। তখন নবিজি সঃ বললেন :

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذِبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَأَسَانِي
بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي

“আল্লাহ যখন আমাকে তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, তখন তোমরা সবাই বলেছ, “তুমি মিথ্যা বলছ” আর আবু বকর বলেছে, “আপনি সত্য বলছেন।” তাঁর জানমাল সবকিছু দিয়ে আমার প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছে। তোমরা কি আমার সম্মানে আমার সাথিকে অব্যাহতি দেবে?”

এ কথাটি তিনি দুবার বললেন। এরপর থেকে আবু বকর রাঃ-কে আর কখনো কষ্ট দেওয়া হয়নি।^{৯৬৯}

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বললেন :

مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ، مَا نَفَعَنِي مَالٌ أَبِي بَكْرٍ

‘আবু বকরের সম্পদ দ্বারা যে উপকার আমার হয়েছে, তা অন্য কোনো সম্পদ দ্বারা হয়নি।’

তা শুনে আবু বকর رضي الله عنه কেঁদে দিলেন এবং বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি ও আমার ধনসম্পদ তো আপনারই।”^{৯৭০}

তিনি বললেন যে, আমার ধনসম্পদ নয়; শুধু বরং আমিও আপনার। অবশ্য তাঁর এ কথায় আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ, নবিজি ﷺ মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ ও হকদার।

এটি আবু বকর رضي الله عنه-এর উন্নত চরিত্রের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন এবং নিজের জানমাল দিয়ে রাসুল ﷺ-এর প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন। এ জন্য রাসুল ﷺ তাঁর সামনেই তাঁর কাজের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং উম্মাহর সামনে দ্বীনের প্রতি তাঁর এ মহান অনুগ্রহের কথা স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন, ‘আবু বকরের সম্পদ দ্বারা যে উপকার আমার হয়েছে, তা অন্য কোনো সম্পদ দ্বারা হয়নি।’

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- রাসুল ﷺ-এর সামনে সাহাবিদের আদব ও বিনয়ের স্বরূপ।
- উপকারীর উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তার জন্য দোয়া করা উন্নত চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।^{৯৭১}

আব্দুর রহমান বিন সামুরা رضي الله عنه বলেন, ‘রাসুল ﷺ যখন গাজওয়ায়ে উসরার জন্য রসদ সংগ্রহ করছিলেন, তখন উসমান বিন আফফান رضي الله عنه তার কাপড়ে ভরে এক হাজার দিনার এনে রাসুল ﷺ-এর কোলে রাখলেন। রাসুল ﷺ সেগুলো হাত দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন এবং বললেন :

৯৭০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৬১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৯৪।

৯৭১. হাশিয়াতুস সিনদি আলা সুনানি ইবনি মাজাহ : ১/৮৫।

مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ

“আজকের পর থেকে আফফানের বেটা যে কাজই করুক, সেটা তার জন্য ক্ষতিকর হবে না।” কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন।”^{৯৭২}

নেক কাজে নিজের বিশেষ সম্পদ থেকে খরচ করতে ভালোবাসতেন

হিজরতের ঘটনায় আয়িশা রাঃ বলেন, ‘এমন দিন খুব কমই গিয়েছে, যেদিন সকালে বা বিকালে রাসুলুল্লাহ সঃ (আমার পিতা) আবু বকর রাঃ-এর ঘরে আসেননি। যখন তাঁকে (মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে) মদিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো, তিনি একদিন দুপুরের সময় আগমন করায় আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আবু বকর রাঃ-কে এ সংবাদ জানানো হলে তিনি বলে উঠলেন, “নবিজি সঃ বিশেষ কোনো ঘটনার কারণেই অসময়ে আগমন করেছেন।” নবিজি সঃ প্রবেশ করে আবু বকর রাঃ-কে বললেন, “যারা তোমার কাছে আছে, তাদের সরিয়ে দাও।”

আবু বকর রাঃ বললেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, এরা তো আমার দুই কন্যা আয়িশা ও আসমা।” তিনি বললেন, “তুমি কি জানো, আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে?” আবু বকর রাঃ বললেন, “আপনার সফরসঙ্গী হওয়া আমার কাম্য ইয়া রাসুলুল্লাহ!” তিনি বললেন, “হাঁ, তুমি আমার সফরসঙ্গী হবে।” আবু বকর রাঃ বললেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমার কাছে দুটি উষ্ণি রয়েছে, যা আমি হিজরতের জন্য প্রস্তুত রেখেছি। এর একটি আপনি গ্রহণ করুন।” তিনি বললেন, “আমি মূল্যের বিনিময়ে তা গ্রহণ করলাম।”^{৯৭৩}

ইবনে হাজার রাঃ বলেন, ‘ইবনে ইসহাক রাঃ-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে : রাসুল সঃ বললেন, “আমি এমন উটে সাওয়াব হব না, যা আমার নয়।” আবু বকর রাঃ বললেন, “তাহলে এটা আপনার।” তিনি বললেন, “এভাবে নয়, বরং তুমি যে মূল্য দিয়ে এটি ক্রয় করেছ, তার বিনিময়ে নেব।”^{৯৭৪}

৯৭২. সুনানুত তিরমিজি : ৩৭০১, মুসনাদু আহমাদ : ২০১০৭।

৯৭৩. সহিহুল বুখারি : ২১৩৮।

৯৭৪. সিরাতু ইবনি হিশাম : ৩/১৩, ফাতহুল বারি : ৭/২৩৫।

তাবারানির বর্ণনায় আসমা বিনতে আবু বকর ؓ-এর হাদিসে এসেছে : তিনি (রাসুল ﷺ) বললেন, ‘তার মূল্যের বিনিময়ে নেব, হে আবু বকর ।’ আবু বকর ؓ বললেন, ‘আপনি যখন চাইছেন, তখন মূল্যের বিনিময়েই নিন ।’^{৯৭৫}

ফায়দা : এক আলিমকে প্রশ্ন করা হলো, ‘রাসুল ﷺ মূল্য পরিশোধ করা ছাড়া উটটি কেন গ্রহণ করেননি, অথচ এর পূর্বে আবু বকর ؓ রাসুল ﷺ-এর জন্য (দ্বীনের জন্য) আরও বড় অঙ্কের টাকা খরচ করেছেন?’

তিনি উত্তর দিলেন : ‘এটি এ জন্য যে, রাসুল ﷺ হিজরত ও জিহাদের পূর্ণাঙ্গ ফজিলত পাওয়ার জন্য নিজের জান ও মাল উভয়টি ব্যয় করার ইচ্ছা করেছেন ।’^{৯৭৬}

ধনীদের সাদাকার উপযুক্ত খাত দেখিয়ে দিতেন

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, ‘আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেজুর বাগান ছিল আবু তালহা ؓ-এর । তার প্রিয় বাগান ছিল ‘বাইরুহা’ । বাগানটি মসজিদের সামনে ছিল । রাসুল ﷺ সেখানে প্রবেশ করতেন এবং সেখান থেকে ভালো পানি পান করতেন ।’

আনাস ؓ বলেন, ‘যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, “কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো ।” (সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৯২), তখন আবু তালহা ؓ রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ বলছেন, “কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো ।” আর বাইরুহা বাগানটি আমার সবচেয়ে প্রিয় । এটি আল্লাহর নামে সাদাকা করে দিলাম, আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়স্বরূপ থাকবে । কাজেই আপনি যাকে দান করা ভালো মনে করেন, তাকে দান করুন ।” তখন রাসুল ﷺ বললেন, “বাহ, এ সম্পদ অনেক লাভজনক, এ সম্পদ অনেক লাভজনক! তুমি যা বলেছ, তা আমি শুনলাম ।

৯৭৫. ফাতহুল বারি : ৭/২৩৫ ।

৯৭৬. আর-রাওজুল উনফ : ৪/১৩১ ।

তবে আমার মতে এ বাগান তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে দেওয়া সবচেয়ে উত্তম হবে।” তখন আবু তালহা   বললেন, “তা-ই করব ইয়া রাসুলাল্লাহ!” অতঃপর আবু তালহা   বাগানটি তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচার বংশধরদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। তাদের মধ্যে হাসসান ও উবাই বিন কাব  -ও ছিলেন।’৯৭৭

এভাবেই রাসুল   সাদাকার উপযুক্ত খাত তাদের দেখিয়ে দিতেন।

► হাদিসের ফায়দাসমূহ :

- প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করা মুসতাহাব।
- সাদাকার খাত ও ইবাদতের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানী ও বুজুর্গদের সাথে পরামর্শ করা।
- অনাত্মীয়দের দান করার চেয়ে আত্মীয়-স্বজনদের দান করা উত্তম, যদি আত্মীয়-স্বজন অভাবগ্রস্ত হয়।
- কয়েক পুরুষ ওপরে গিয়ে বংশ একত্রিত হওয়া আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও আত্মীয়তা-সম্পর্ক রাখতে হয়। কেননা, রাসুল   যখন আবু তালহা  -কে আত্মীয়দের সাদাকা করার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি উবাই বিন কাব ও হাসসান বিন সাবিত  -কেও সাদাকার অংশ দান করলেন। অথচ সাত পুরুষ ওপরে গিয়ে তার বংশ তাদের বংশের সাথে একীভূত হয়।
- বাগান নির্মাণ করা, আলিমদের তাতে প্রবেশ করা, তার ফল খাওয়া এবং সেখানে ঘোরাফেরা করা ইত্যাদি বিষয় অনেক সময় মুসতাহাব হয় এবং এতে সাওয়াব দেওয়া হয়। তবে শর্ত হলো এসবের উদ্দেশ্য হতে হবে ইবাদতের ক্লাস্তি ঘুচিয়ে পরবর্তী ইবাদতের জন্য নিজেকে চাঙা করে নেওয়া।
- বন্ধু বাড়িতে না থাকলেও তার বাড়ি থেকে পানি পান করা জাযিজ, যদি জানা থাকে যে, বন্ধু এতে আপত্তি করবে না।

- আবু তালহা ؓ-এর ফজিলত । কারণ যখনই প্রিয় বস্তু থেকে দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আয়াত নাজিল হলো, তখনই তিনি তার সর্বাধিক প্রিয় বস্তুটি দান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন । রাসূল ﷺ তার এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করলেন, ‘বাহ’ শব্দ উচ্চারণ করে তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন । অতঃপর উপযুক্ত স্থানে তা ব্যয় করার নির্দেশ দিলেন ।
- ইবাদতের জন্য শরীর-মন চাঙা করলে সাওয়াব অর্জিত হয় । কেননা, রাসূল ﷺ দীনদার ধনীদেব বাগানে গিয়ে গাছের ছায়ার পরশ নিতেন, বেড়াতেন এবং ফলমূল খেতেন ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আত্মীয়-স্বজনদের দান করা অন্যদের দান করার চেয়ে তখনই উত্তম, যখন আত্মীয়-স্বজন অভাবগ্রস্ত হয় । অনেক মানুষ জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে আত্মীয়দের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করতে চায় । যেমন : জাকাতদাতার একজন মধ্যবিত্ত আত্মীয় আছে । তার কাছে যা আছে, তা দিয়েই তার মোটামুটি চলে । আরেকজন খুব নিঃস্ব ব্যক্তি আছে, কিন্তু জাকাতদাতার সাথে তার আত্মীয়তা নেই । তখন জাকাতদাতা এই নিঃস্ব লোকটাকে দান না করে ওই আত্মীয়কে দান করে । এটা নাজায়িজ । কারণ এটা স্বজনপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত, যা জাকাতের ক্ষেত্রে জায়িজ নেই ।

তবে হাঁ, যখন আত্মীয় ও অনাত্মীয় উভয়জন অভাবী হয়, তখন আত্মীয় অগ্রাধিকার পাবে । যাতে একসাথে সাদাকা ও আত্মীয়তা রক্ষা করার সাওয়াব অর্জিত হয় ।

সালমান বিন আমির ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন :

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّجَمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

‘মিসকিনকে সাদাকা দিলে সাদাকার (একটি) সাওয়াব হয় ।

আত্মীয়কে সাদাকা দিলে দুটি সাওয়াব হয় : সাদাকা ও আত্মীয়তা রক্ষা করার সাওয়াব ।’^{৯৭৮}

সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সাদাকা করার পরামর্শ দিতেন

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه বলেন, ‘বিদায় হজের বছর আমি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়লে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন। তখন আমি বললাম, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমার রোগ কী পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আর আমি একজন বিত্তবান লোক, কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী হচ্ছে একটিমাত্র কন্যা। তাই আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ কি আল্লাহর রাস্তায় সাদাকা করে দেবো?” তিনি বললেন “না।” আমি বললাম, “তবে কি অর্ধেক?” তিনি বললেন :

لَئَلَّكَ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا أَجَرَكَ اللَّهُ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ

“হে সাদ, এক-তৃতীয়াংশ দান করো। এক-তৃতীয়াংশই অনেক বেশি। সন্তানসন্ততিদের বিত্তবান অবস্থায় রেখে যাওয়া নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম—যে নিঃস্বতার কারণে তারা অন্যের নিকট হাতপেতে ভিক্ষা করবে। তা ছাড়া তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা-ই ব্যয় করো, আল্লাহ তাঁর প্রতিদান দান করেন। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লুকমাটি তুলে দাও, এর প্রতিদানও আল্লাহ তোমাকে দান করেন।’

আমি বললাম, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি কি আমার সঙ্গী-সাথীদের থেকে পেছনে থেকে যাব (অর্থাৎ মক্কায় আমার মৃত্যু হয়ে যাবে)?”^{৯৭৯} তিনি বললেন :

إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ، فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدَتْ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ،

৯৭৯. প্রশ্নটি তিনি এ জন্য করলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম যে মক্কা থেকে আল্লাহর জন্য হিজরত করেছেন, সেখানে মৃত্যুবরণ করা অপছন্দ করতেন। (ইমাম নববি رحمته الله কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১১/৭৮।)

اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنَّ
الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنِ خَوْلَةَ

‘তুমি কখনোই পশ্চাতে থাকবে না (মক্কায় মৃত্যুবরণ করবে না)
ফলে বাকি সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যেসব নেক
আমল করবে, এর বিনিময়ে তোমার সম্মান ও মর্যাদা আরও বেড়ে
যাবে। সম্ভবত, তুমি আরও হায়াত পাবে এবং এর ফলে তোমার
দ্বারা অনেক মানুষ উপকৃত হবে (তুমি যুদ্ধ করে গনিমতপ্রাপ্ত
হবে আর তা দ্বারা মুসলমানরা উপকৃত হবে) এবং অনেক মানুষ
(কাফিররা তোমার হাতে মার খেয়ে) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ,
আমার সাহাবিদের হিজরতকে অক্ষুণ্ণ রাখুন। তাদের পশ্চাৎমুখী করে
ফিরিয়ে নেবেন না (মক্কায় মৃত্যু দান করবেন না)। কিন্তু বেচারী সাদ
বিন খাওলা (তার মৃত্যু মক্কায় হয়ে গিয়েছে)!’

জুহরি رحمته বলেন, ‘শেষের কথাটি বলে রাসূল ﷺ সাদ বিন খাওলা رحمته মক্কায়
মৃত্যুবরণ করার ওপর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।^{৯৮০}

► ফায়দা :

- রোগী দেখতে যাওয়া সমাজের নেতা ও সাধারণ মানুষ সবার জন্য
মুসতাহাব।
- চিকিৎসাসংক্রান্ত পরামর্শের জন্য, দোয়া চাওয়ার জন্য অথবা অসিয়ত
ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে অসুস্থ ব্যক্তি তার কষ্টের কথা
ব্যক্ত করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ
করার জন্য কষ্টের কথা ব্যক্ত করা জায়িজ নেই। এতে রোগের প্রতিদান
নষ্ট হয়ে যায়।
- ওয়ারিশ থাকলে এক-তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা হারাম। এ
সম্পর্কে সকল আলিম একমত।

- এই হাদিসে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করা, আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং ওয়ারিশদের প্রতি মায়া-মমতা রাখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।
- আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করা ও অনুগ্রহ করার ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয় প্রাধান্য পাবে দূরতম আত্মীয়ের ওপর।
- যেকোনো ভালো কাজে সম্পদ ব্যয় করা মুসতাহাব।
- আমলের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।
- কোনো বৈধ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করলে সেটা ইবাদত হয়ে যায় এবং তার ওপর সাওয়াব দেওয়া হয়। যেমন : ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জনের নিয়তে পানাহার করা, প্রশান্ত মনে ইবাদত করতে পারার উদ্দেশ্যে ঘুমানো, নিজেকে ও নিজের দৃষ্টিকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য স্ত্রী-সহবাস করা, অনুরূপভাবে স্ত্রীর হক আদায়ের উদ্দেশ্যে এবং নেককার সন্তান লাভের আশায় স্ত্রী-সহবাস করা ইত্যাদি বিষয় নিয়তের কারণে ইবাদতে পরিণত হয়।
- দীর্ঘজীবী হওয়া সৌভাগ্যের কারণ। কেননা, তার দ্বারা অধিক নেক আমল করার সুযোগ হয়।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করলে সাওয়াব পাওয়া যায়।
- আমল করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করার প্রতি উৎসাহ।^{৯৮১}

সন্তানদের দান করার ব্যাপারে সমতা বিধানের নির্দেশ দিতেন

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের মধ্যে কোনো একজনকে অন্যদের তুলনায় বেশি ভালোবাসে। ফলে কোনোকিছু দান করার সময় সন্তানদের মাঝে তারতম্য করে। কাউকে বেশি দেয়, কাউকে কম দেয়। এটা চরম অবিচার। রাসুল ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

নুমান বিন বশির রাঃ থেকে বর্ণিত। ‘তঁার মা বিনতে রাওয়াহা রাঃ তাঁর পিতার নিকট স্বীয় পুত্রের জন্য তাঁর সম্পদ থেকে কিছু দান করার অনুরোধ করলেন।

এক বছর যাবৎ তিনি বিষয়টি মূলতবি করে রাখেন। পরে ইচ্ছা হলো। বিনতে রাওয়াহা   বললেন, “আমার পুত্রকে যা দান করবেন, তার ওপর রাসুলুল্লাহ  -কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি খুশি হব না।” তখন আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসুলুল্লাহ  -এর নিকট আসলেন। সে সময় আমি বালক ছিলাম।

তিনি বললেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, এর মা বিনতে রাওয়াহার পছন্দ যে, আমি তাঁর পুত্রকে যা দান করেছি, আপনাকে তার সাক্ষী রাখি।” রাসুলুল্লাহ   বললেন, “হে বশির, এ ছাড়া তোমার কি আর কোনো পুত্র আছে?” তিনি বললেন, “হাঁ।” রাসুল   বললেন, “তুমি কি তাদের সকলকে এরূপ দান করেছ?” তিনি বললেন, “না।” তখন রাসুল   বললেন, “তাহলে আমাকে সাক্ষী রেখো না। কেননা, আমি জুলুমের পক্ষে সাক্ষী হই না।”^{৯৮২}

সহিহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে। রাসুল   বললেন, ‘তুমি কি চাও যে, তারা সবাই তোমার সাথে সমানভাবে সদাচরণ করুক?’ তিনি বললেন, ‘জি, অবশ্যই।’ রাসুল   বললেন, ‘তাহলে এ রকম করো না।’

বুখারি ও মুসলিমের আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসুল   বললেন, ‘আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো।’ এরপর আমার পিতা ফিরে এলেন এবং উক্ত দান ফিরিয়ে নিলেন।

আবু দাউদের বর্ণনায় (হাদিস নং ২৫৪২) এসেছে, ‘তোমার ওপর তাদের হক হলো, তুমি তাদের মাঝে ইনসাফ করবে। আর তাদের ওপর তোমার হক হলো, তারা তোমার সাথে সদ্যবহার করবে।’

সুতরাং দান করার ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করা ও সমতা বিধান করা একান্ত অপরিহার্য।

আব্বাহর রাস্তায় খরচ করা সম্পদই আসল সম্পদ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ   থেকে বর্ণিত, রাসুল   বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে কার কাছে নিজের সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদ বেশি প্রিয়?’

সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে তো এমন কেউ নেই, যার নিকট উত্তরাধিকারীদের মালের চেয়ে নিজের মাল প্রিয় নয়।’ রাসুল ﷺ বললেন :

فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ

‘নিজের মাল হলো যা আল্লাহর রাস্তায় পেশ করা হয় আর যা রেখে যাওয়া হয়, তা উত্তরাধিকারীদের মাল।’^{৯৮৩}

‘নিজের মাল হলো যা আল্লাহর রাস্তায় পেশ করা হয়’—অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে বিভিন্ন ভালো কাজে ব্যয় করার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

‘আর যা রেখে যাওয়া হয়, তা উত্তরাধিকারীদের মাল’—অর্থাৎ যে সম্পদ থেকে সাদাকা করা না হয়।

ইবনে বাত্তাল رحمه الله বলেন, ‘এই হাদিসে ইবাদত-বন্দেগি ও ভালো খাতে যথাসাধ্য ব্যয় করে কিছু সম্পদ আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যেন ওই সম্পদ আখিরাতে কাজে আসে। কারণ, ওয়ারিশদের জন্য যা রেখে যাওয়া হয়, তা ওয়ারিশদের মালিকানায় চলে যায়।

সুতরাং তার মাধ্যমে ওয়ারিশ যদি কোনো ভালো কাজ করে, তার সাওয়াব কেবল ওয়ারিশই পাবে।

এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে, এই হাদিস প্রমাণ করে ওয়ারিশদের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার চেয়ে কল্যাণের কাজে ব্যয় করা উত্তম। অথচ রাসুল ﷺ সাদা رحمه الله-কে বলেছেন, “তুমি তোমার সন্তানসন্ততিদের বিত্তবান রেখে যাওয়া এর চাইতে উত্তম যে, তুমি তাদের নিঃস্ব রেখে যাবে আর তারা অন্যের নিকট হাতপেতে ভিক্ষা করবে।” তাই উভয় হাদিস পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে।

এর উত্তরে বলা হয়, হাদিসদ্বয় পরস্পর বিরোধী নয়। রাসুল ﷺ সাদা رحمه الله-কে ওয়ারিশদের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার নির্দেশ এ জন্য দিয়েছেন যে, তিনি

অসুস্থ অবস্থায় তার সমুদয় সম্পত্তি সাদাকা করে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। তাই তাকে এক-তৃতীয়াংশ সাদাকা করে বাকিটুকু ওয়ারিশদের জন্য রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আর ইবনে মাসউদ রাঃ-এর হাদিসে রাসূল সঃ সাহাবীগণকে সুস্থতার অবস্থায় উপদেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি কৃপণদের সতর্ক করেছেন, যারা ওয়ারিশদের জন্য অধিক সম্পদ রেখে যাওয়ার আশায় ভালো কাজে অর্থ ব্যয় করে না। এই হাদিসে সমুদয় সম্পত্তি সাদাকা করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তাই এটাকে সাদ রাঃ-এর হাদিসের বিরোধী বলার কোনোই যৌক্তিকতা নেই।

সাদ রাঃ-এর হাদিস ওই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে অসুস্থতার সময় সমুদয় বা অধিকাংশ সম্পত্তি সাদাকা করে দিতে চায়। আর ইবনে মাসউদ রাঃ-এর হাদিস ওই ব্যক্তির জন্য, যে সুস্থ অবস্থায় সাদাকা করে।^{৯৮৪}

আব্দুল্লাহ বিন শিখখির রাঃ বলেন, ‘আমি রাসূল সঃ-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি সুরা আত-তাকাসুর পাঠ করছিলেন। তিনি বললেন :

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، قَالَ: وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِستَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟

“মানুষ বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ; অথচ হে মানুষ, তোমার সম্পদ তো এ ছাড়া কিছুই নয় : ১. যা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করে দাও, ২. অথবা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলো, ৩. অথবা সাদাকা করে জমা রাখো।”^{৯৮৫}

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে এরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর হাদিসে অতিরিক্ত এসেছে—

وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ

৯৮৪. ইবনে বাত্তাল রাঃ কৃত শারহু সহিহিল বুখারি : ১৯/২১৬।

৯৮৫. সহিহ মুসলিম : ২৯৫৮।

‘এ ছাড়া অবশিষ্ট মাল তার থেকে চলে যাবে এবং তা মানুষের জন্য ছেড়ে যাবে।’^{৯৮৬}

কবি বলেন :

يا كائز الأموال سوف يجوزها *** زوج البنات وزوجة الأبناء

ولسوف تترك في المقابر مفردا *** من غير ما أهل ولا أحماء

فاجعل لنفسك من كنوزك حصة *** في ساحة الأيتام والفقراء

‘ওহে ধনসম্পদ জমাকারী ব্যক্তি, অচিরেই তোমার এই সম্পদ মেয়েদের স্বামী আর ছেলেদের বউদের হাতে চলে যাবে। আর তুমি একা পড়ে থাকবে কবরে। না থাকবে পরিবার, না থাকবে বন্ধুবান্ধব। তাই এতিম-মিসকিনদের দান করে কিছু সম্পদ নিজের জন্য জমা রাখো।’

কেউ সমুদয় সম্পত্তি সাদাকা করতে চাইলে তা কবুল করতেন না

এ জন্য কাব বিন মালিক رضي الله عنه তার তাওবা কবুল হওয়ার পর যখন রাসুল ﷺ-কে বললেন, ‘তাওবা কবুল হওয়ার খুশিতে আমি আমার সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহ ও রাসুলের জন্য সাদাকা করে দিতে চাই’—তখন রাসুল ﷺ বললেন :

أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

“কিছু সম্পদ নিজের কাছে রাখো, এটাই তোমার জন্য ভালো হবে।”^{৯৮৭}

জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه বলেন, ‘আমরা রাসুল ﷺ-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি ডিমসদৃশ একটি সোনার টুকরা নিয়ে রাসুল ﷺ-এর নিকট আসলেন। এসেই তিনি বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটি খনি থেকে পেয়েছি। আপনি এটাকে সাদাকা হিসেবে গ্রহণ করুন। আর এটা ছাড়া আমার কোনো সম্পদ নেই।”

৯৮৬. সহিহ মুসলিম : ২৯৫৯।

৯৮৭. সহিহ বুখারি : ২৭৫৮, সহিহ মুসলিম : ২৭৬৯।

রাসুল ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন লোকটি তাঁর ডান দিক থেকে এসে আগের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসুল ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি তাঁর বাম দিক থেকে এসে কথাটি আবার বললেন। রাসুল ﷺ এবারেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর লোকটি তাঁর পেছন দিক থেকে এসে পূর্বের কথাটি বললেন। তখন রাসুল ﷺ সেটি নিয়ে তার দিকে এমনভাবে ছুড়ে মারলেন যে, যদি সেটি তার গায়ে লাগত, তবে তিনি ব্যথা পেতেন অথবা তার শরীর ফেটে যেত।

অতঃপর রাসুল ﷺ বললেন :

يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ
النَّاسَ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى

“তোমাদের কেউ নিজের যা কিছু আছে, সব নিয়ে এসে বলে, এগুলো সাদাকা; তারপর মানুষের কাছে হাত পাতে! (এটা ঠিক নয়, বরং) উত্তম সাদাকা হলো, যা নিজের ধনাঢ্যতা ধরে রেখে করা হয়।”^{৯৮৮}

অনেকের কাছ থেকে সমুদয় সম্পত্তি গ্রহণ করতেন

অনেক সময় কারও নিকট থেকে তার তাওয়াক্কুল, দারিদ্র্যের ওপর সবার ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার গুণের কারণে সমুদয় সম্পত্তি গ্রহণ করতেন।

জাইদ বিন আসলাম ﷺ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ‘আমি উমর বিন খাতাব ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “রাসুল ﷺ আমাদের সাদাকা করার নির্দেশ দিলেন। তখন আমার যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ ছিল। তাই আমি বললাম, “কোনো দিন যদি (কল্যাণের কাজে) আবু বকর ﷺ-এর চেয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে আজই সেই দিন।” এরপর আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে আসলাম।

রাসুল ﷺ আমাকে বললেন, “পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ?” আমি বললাম, “এগুলোর সমপরিমাণ রেখে এসেছি।”

তারপর আবু বকর ﷺ তাঁর সমুদয় সম্পত্তি নিয়ে হাজির হলেন। রাসুল ﷺ বললেন, “আবু বকর, পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ?” তিনি বললেন, “তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে এসেছি।”

তখন আমি বললাম, “আল্লাহর কসম, আবু বকরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে আর কোনো দিন সম্ভব হবে না।”^{৯৮৯}

আবু বকর ﷺ তাঁর সমুদয় সম্পত্তি দান করে দিলে রাসুল ﷺ নিষেধ করেননি। কেননা, তিনি আবু বকর ﷺ-এর নিয়তের যথার্থতা ও মানসিক শক্তির ব্যাপারে অবগত ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে অন্যদের মতো কোনো ধরনের ফিতনা ও ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল না।^{৯৯০}

তাবারি ﷺ বলেন, ‘কেউ যদি এমন অবস্থায় তার সমুদয় সম্পত্তি সাদাকা করে যে, সে শারীরিক ও মানসিকভাবে পূর্ণ সুস্থ, তার ওপর কোনো কর্জ নেই, তার দারিদ্র্যের কষ্টের ওপর সবর করার শক্তি আছে এবং তার কোনো পরিবার-পরিজন নেই অথবা থাকলেও তারাও তার মতো সবর করার শক্তি রাখে, তখন অধিকাংশ আলিমের মতে তা বৈধ হবে। তবে উল্লিখিত শর্তসমূহ থেকে কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হলে তা মাকরুহ হবে।’^{৯৯১}

তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করার নির্দেশ দিতেন

নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের একটি পদ্ধতি হলো, তা প্রকাশ করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

‘এবং আপনার পালনকর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।’^{৯৯২}

৯৮৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৭৫, সুনানু আবি দাউদ : ১৬৭৮।

৯৯০. শারহু আবি দাউদ লিল আইনি : ৬/৪৩২।

৯৯১. ফাতহুল বারি : ৩/২৫৯।

৯৯২. সুরা আদ-দুহা, ৯৩ : ১১।

এ জন্য রাসুল ﷺ ধনী সাহাবিদের আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

মালিক বিন নাদলা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুল ﷺ আমাকে জীর্ণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, “তোমার কাছে কি মাল-সম্পদ আছে?” আমি বললাম, “জি, আছে।” তিনি বললেন, “কী ধরনের সম্পদ?” আমি বললাম, “আল্লাহ তাআলা আমাকে উট, দাস-দাসী, ঘোড়া, ছাগল... সব ধরনের সম্পদ দান করেছেন।” তিনি বললেন, “আল্লাহ যখন তোমাকে সম্পদ দান করেছেন, তখন তোমার মাঝে উক্ত সম্পদের ছাপ থাকা চাই।”^{৯৯৩}

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ‘তোমার মাঝে আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের ছাপ ফুটিয়ে তোলা উচিত।’

রাসুল ﷺ-এর কথার অর্থ হলো, তুমি নতুন কাপড় পরিধান করো, যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, তুমি একজন ধনবান ব্যক্তি এবং আল্লাহ তাআলা তোমাকে নানা রকম নিয়ামত দান করেছেন।^{৯৯৪}

আমর বিন শুআইব رضي الله عنه তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দার মাঝে তাঁর নিয়ামতের ছাপ দেখতে পছন্দ করেন।’^{৯৯৫}

তাই উত্তম বেশভূষায় থাকা নিয়ামতের শুকরিয়ার বহিঃপ্রকাশ। এটি অপচয় ও মানুষের সামনে অহংকার প্রদর্শনের পর্যায়ভুক্ত নয়।

৯৯৩. সুনানু আবি দাউদ : ৪০৬৩, সুনানুত তিরমিজি : ২০০৬, মুসনাদু আহমাদ : ১৫৪৫৭।

৯৯৪. মিরকাতুল মাফাতিহ : ১৩/৯৯।

৯৯৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৮১৯।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বললেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ

‘যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’

এক ব্যক্তি বললেন, ‘মানুষ তো চায় কাপড়-চোপড় ও জুতা-সেডেল সুন্দর হোক (এটাও কি অহংকারের পর্যায়ে পড়বে?)’

রাসুল ﷺ বললেন :

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।
অহংকার হলো সত্যকে ঢেকে রাখা এবং মানুষকে তাচ্ছিল্য করা।’^{৯৯৬}

কল্যাণকর কাজে তাদের উৎসাহ দিতেন

তাদের কল্যাণমূলক কাজের প্রশংসা করে তাদের সাহস বৃদ্ধি করতেন এবং আরও কল্যাণমূলক কাজ করার উৎসাহ প্রদান করতেন।

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ

‘যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে, তাকে জান্নাতের দরোজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, “হে আল্লাহর বান্দা, এটাই উত্তম।”

অতএব যে নামাজ আদায়কারী, তাকে নামাজের দরোজা থেকে ডাকা হবে; যে মুজাহিদ তাকে জিহাদের দরোজা থেকে ডাকা হবে;

যে রোজা পালনকারী, তাকে রাইয়ান দরোজা থেকে ডাকা হবে;
যে সাদাকা দানকারী, তাকে সাদাকার দরোজা থেকে ডাকা হবে।’

এরপর আবু বকর   বললেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! সকল দরোজা থেকে কাউকে ডাকার কোনো প্রয়োজন তো নেই, তবুও এমন কেউ কি আছে, যাকে সব দরোজা থেকে ডাকা হবে?’

রাসুল   বললেন :

نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

‘হাঁ, আছে। আর আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে হবে।’^{৯৯৭}

আবু হুরাইরা   বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ   বলেছেন, “আজ তোমাদের মধ্যে কে রোজা রেখেছে?” আবু বকর   বললেন, “আমি রেখেছি।” তিনি বললেন, “আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাজার সাথে চলেছে?” আবু বকর   বললেন, “আমি।” তিনি বললেন, “আজ তোমাদের কেউ কি রোগী দেখতে গিয়েছে?” আবু বকর   বললেন, “আমি গিয়েছি।”

তখন রাসুলুল্লাহ   বললেন :

مَا اجْتَمَعَنَ فِي امْرِئٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

“যার মধ্যে এই কাজসমূহের সমাবেশ ঘটবে, সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^{৯৯৮}

আব্দুর রহমান বিন সামুরা   বলেন, ‘রাসুল   যখন গাজওয়ায়ে উসরার জন্য রসদ সংগ্রহ করছিলেন, তখন উসমান বিন আফফান   তাঁর কাপড়ে ভরে এক হাজার দিনার এনে রাসুল  -এর কোলে রাখলেন। রাসুল   সেগুলো হাত দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন এবং বললেন :

৯৯৭. সহিহুল বুখারি : ১৮৯৭, সহিহ মুসলিম : ১০২৭।

৯৯৮. সহিহ মুসলিম : ১০২৮।

مَا ضَرَّ ابْنَ عَقَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ

“আজকের পর থেকে আফফানের বেটা যে কাজই করুক, সেটা তার জন্য ক্ষতিকর হবে না।” কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন।”^{৯৯৯}

আহনাফ বিন কাইস ؓ বলেন, ‘আমরা হজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মদিনায় উপনীত হলাম। হজে গমনের জন্য আমরা আমাদের মনজিলে পৌঁছে আমাদের হাওদা নামাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের নিকট এক আগন্তুকের আবির্ভাব হলো। সে বলল, “লোকজন মসজিদে একত্রিত হয়েছে। তারা ভীত হয়ে পড়েছে।”

আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম, মসজিদের মধ্যখানে একদল লোকের চতুর্দিকে কিছু লোক জড়ো হয়ে আছে। তাদের মধ্যে আলি, জুবাইর, তালহা ও সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ؓ রয়েছেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় উসমান ؓ আগমন করলেন। তাঁর পরনে রয়েছে হলুদ বর্ণের একখানা কাপড়, তা দ্বারা তিনি তাঁর মাথা ঢেকে রেখেছেন। তিনি বললেন, “এখানে কি তালহা আছেন? এখানে কি জুবাইর আছেন? এখানে কি সাদ আছেন?” সকলে বললেন, “হ্যাঁ, তাঁরা আছেন।”

তিনি বললেন, “আমি সেই আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করছি—যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “অমুক গোত্রের উট বাঁধার বা খেজুর শুকাবার স্থানটি যে খরিদ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে রুম্মা করবেন।” এরপর আমি তা বিশ হাজার অথবা পঁচিশ হাজার টাকায় খরিদ করেছি। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এসে তাঁকে তার সংবাদ দিলে তিনি বললেন, “তা আমাদের মসজিদের জন্য দান করো, আর এর সাওয়াব তোমারই থাকবে?” তাঁরা বললেন, “হ্যাঁ।”

তিনি আবার বললেন, “যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই—সেই আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি রুম্মা নামক কূপটি খরিদ করবে, আল্লাহ

তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন।” অতঃপর আমি তা এত এত মূল্যে খরিদ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি বললেন, “তুমি তা মুসলমানদের পানি পানের স্থান করে দাও, তার সাওয়াব তুমি পাবে?” তাঁরা বললেন, “হাঁ, আমাদের তা জানা আছে।”

তিনি আবার বললেন, “তোমাদের সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বললেন, “এ জাইশুল উসরাহ-কে (তাবুকের সেনাবাহিনীকে) যে ব্যক্তি যুদ্ধের সামান দিয়ে সজ্জিত করবে, তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন।” তখন আমি তাদের এমনভাবে সজ্জিত করলাম যে, কেউ উটের একটি রশিও কম পায়নি?” তাঁরা বললেন, “আল্লাহর কসম, আমাদের তা জানা আছে।”

তখন তিনি বললেন, “হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো; হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো; হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো।”^{১০০০}

আল্লাহর সাথে সওদা করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন

আল্লাহর সাথে সওদা করা সবচেয়ে লাভজনক সওদা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ - لِيُؤَفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

‘যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামাজ কায়িম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে—তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সাওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।’^{১০০১}

সাদি রাহিমুল্লাহ বলেন, “‘তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবে না’—এই কথাটির মর্ম হলো, যে ব্যবসা কখনো অলাভজনক ও নষ্ট

১০০০. সুনানুন নাসায়ি : ৩১৮২।

১০০১. সুরা ফাতির, ৩৫ : ২৯-৩০।

হওয়ার নয়। বরং এই ব্যবসা সর্বাধিক উত্তম ও উন্নত ব্যবসা। এই ব্যবসা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, বিশাল সাওয়াব অর্জন এবং তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া।”^{১০০২}

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-কে বললেন, “অমুক ব্যক্তির কাছে একটি খেজুর গাছ আছে। আমি সেটা দিয়ে একটি দেয়াল (ঘর) বানাতে চাইছি। তাই আপনি তাকে খেজুর গাছটি আমাকে দিয়ে দিতে বলুন, যাতে আমি তা দিয়ে দেয়ালটি বানাতে পারি।”

রাসুল ﷺ লোকটিকে বললেন, “জান্নাতে একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে তাকে তোমার খেজুর গাছটি দিয়ে দাও।”

লোকটি অস্বীকৃতি জানালেন।

অতঃপর আবু দাহদাহ رضي الله عنه লোকটির নিকট এসে বললেন, “তোমার খেজুর গাছটি আমাকে আমার বাগানের বিনিময়ে বিক্রি করো।” লোকটি বিক্রি করে দিলেন।

তারপর আবু দাহদাহ رضي الله عنه রাসুল ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আমার বাগানের বিনিময়ে ওই লোকের খেজুর গাছটি কিনে নিয়েছি। এবার আপনি এই লোকটিকে তা দিয়ে দিতে পারেন। আমি তাকে এটি দান করলাম।”

তখন রাসুল ﷺ বললেন, “জান্নাতে আবু দাহদাহের জন্য অনেক শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট একটি খেজুর গাছ ফুটেছে!” কথাটি কয়েকবার বললেন তিনি।’

বর্ণনাকারী বলেন, ‘অতঃপর আবু দাহদাহ رضي الله عنه তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, “ওহে দাহদাহের মা, বাগানটি থেকে বের হয়ে যাও। এটাকে আমি জান্নাতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছি।”

তা শুনে স্ত্রী বললেন, “এটি খুবই লাভজনক সওদা হয়েছে।”^{১০০৩}

১০০২. তাফসিরুস সাদি : ১/৬৮৯।

১০০৩. মুসনাদু আহমাদ : ১২০৭৩।

ধনবান ব্যবসায়ীদের সাদাকা রকতে উদ্বুদ্ধ করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ ধনবান ব্যবসায়ীদের জন্য সুন্দর নাম চয়ন করতেন এবং তাদের সাদাকা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

কাইস বিন আবু গারজাহ ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর সময়ে আমাদের (ব্যবসায়ীদের) ‘সিমসার’ (দালাল, ব্রোকার) নামে ডাকা হতো। একদিন রাসুল ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে গমন করার সময় পূর্বের নামের চেয়ে সুন্দর নামে আমাদের ডাকলেন। বললেন :

يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْخَلْفُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوا
بَيْعَكُمْ بِصَدَقَةٍ

“হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, বেচাকেনার মধ্যে বেহুদা কথা ও শপথ বেশি উচ্চারিত হয়, তাই বেচাকেনাকে সাদাকার সাথে মিলিয়ে নাও (অর্থাৎ বেচাকেনার ফাঁকে ফাঁকে সাদাকা করো, যেন বেহুদা কথা ও শপথের গুনাহ মুছে যায়)।”^{১০০৪}

খাত্তাবি ؓ বলেন, “‘সিমসার’ একটি অনারব শব্দ। সে যুগে আরবের অধিকাংশ ব্যবসায়ী অনারব ছিল। শব্দটি তাদের থেকে এসেছিল। অতঃপর রাসুল ﷺ তার পরিবর্তে আরবি নাম “তাজির” প্রবর্তন করলেন।”^{১০০৫}

‘তাই বেচাকেনাকে সাদাকার সাথে মিলিয়ে নাও’—রাসুল ﷺ তাদের জানিয়ে দিলেন যে, স্বাভাবিকভাবে বেচাকেনার সময় অনর্থক কথাবার্তা ও শপথ বেশি উচ্চারিত হয়। তাই তারা যেন বেচাকেনার সময় দান-সাদাকা করে। এতে তাদের বেহুদা কথা ও শপথের গুনাহ মুছে যাবে। কেননা, দান-সাদাকা আল্লাহর ক্রোধাগ্নিকে নির্বাপিত করে আর পুণ্যকর্ম পাপকর্মের গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।^{১০০৬}

১০০৪. সুনানুত তিরমিজি : ১২০৮, সুনানুন নাসায়ি : ৩৭৯৭।

১০০৫. মাআলিমুস সুনান : ২/১৩১।

১০০৬. মিরকাতুল মাফাতিহ : ৯/২৮১।

তাদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ বাজারে তাদের সাথে মিলিত হতেন এবং তাদের সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতেন।

রিফাআ ﷺ বলেন, ‘আমরা রাসুল ﷺ-এর সাথে বের হলাম। তখন দেখি, সাতসকালেই মানুষ বেচাকেনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাসুল ﷺ তাদের ডাক দিলেন, “হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়!”

যখন তারা (রাসুল ﷺ-এর ডাক শুনে) চোখ ও গর্দান ওপরে তুলল, তখন তিনি বললেন :

إِنَّ الشُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ، وَبَرَّ، وَصَدَقَ

“নিশ্চয় ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন পাপাচারী হিসেবে উত্থিত হবে, তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে, সদাচরণ করে এবং সত্য কথা বলে (তারা পাপাচারী হিসেবে উত্থিত হবে না)।”^{১০০৭}

‘তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে...’—এর অর্থ হলো, যারা বেচাকেনার সময় মানুষের সাথে উত্তম আচার-ব্যবহার করে এবং ছোট-বড় কোনো গুনাহে লিপ্ত হয় না; যেমন : লোকদের সাথে প্রতারণা করে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না ইত্যাদি। অথবা এর অর্থ হলো, ব্যবসার পাশাপাশি তারা আল্লাহর ইবাদত করে।^{১০০৮}

কাজি ﷺ বলেন, ‘সাধারণত ব্যবসায়ীরা লেনদেনের মধ্যে প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নেয় এবং মিথ্যা শপথ করে খারাপ মাল বেচাকেনা করে, তাই তাদের পাপাচারী বলা হয়েছে। কিন্তু যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকে এবং মিথ্যা শপথের আশ্রয় না নিয়ে সততার সাথে বেচাকেনা করে, তাদের পাপাচারী বলা হয়নি।’^{১০০৯}

১০০৭. সুনানুত তিরমিজি : ১২১০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২১৪৬।

১০০৮. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৪/৩৩৬।

১০০৯. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৪/৩৩৬।

বেচাকেনার সময় প্রতারণা করতে নিষেধ করতেন

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল সঃ একটি খাদ্যস্তুপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং আঙুলের মধ্যে ভেজা অনুভব করলেন। তখন তিনি বললেন, “ওহে খাদ্যওয়ালা, এ কী?”

উত্তর দিলেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, এর ওপর বৃষ্টির পানি পড়েছে।”

তিনি বললেন :

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيَّ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“তাহলে ভেজা অংশ ওপরে রাখোনি কেন, যেন মানুষ তা দেখতে পারে? যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।”^{১০১০}

নববি রাঃ বলেন, “আমার দলভুক্ত নয়” মানে এমন কাজ করা আমার শিক্ষা, কাজ ও উন্নত পদ্ধতির সাথে মানানসই নয়।

কিন্তু সুফইয়ান বিন উয়াইনা রাঃ হাদিসাংশটির এভাবে ব্যাখ্যা করতে অপছন্দ করতেন। বরং তিনি তার প্রকাশ্য ও বাহ্যিক অর্থটিই করতেন, যেন প্রতারণার ভয়াবহতা ও তার প্রতি রাসুল সঃ-এর তিরস্কার অন্তরসমূহে ভালোভাবে বদ্ধমূল হয়।^{১০১১}

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন, ‘উট ও ছাগলের দুগ্ধদোহন থেকে বিরত থেকো না (এই উদ্দেশ্যে যে, এর মাধ্যমে উলানে দুধ বেশি জমবে, আর ক্রেতা তা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে চড়া দামে তা ক্রয় করে নেবে)। এরপর যদি কেউ তা ক্রয় করে নেয়, তখন দুধ দোহন করার পর তার কাছে দুটি ইচ্ছাধিকার থাকবে—চাইলে সে তা নিজের কাছে রেখে দিতে পারবে অথবা এক সা’ খেজুর সহকারে তা ফেরত দিতে পারবে।’^{১০১২}

১০১০. সহিহ মুসলিম : ১০২।

১০১১. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১/১০৯।

১০১২. সহিহল বুখারি : ২১৪৮, সহিহ মুসলিম : ১৫১৫।

নববি ﷺ বলেন, “‘তাসরিয়া’ (উল্লিখিত পন্থায় দুধালো জন্তু বিক্রি করা) হারাম। চাই তা উট, গরু, ছাগল, দাসী, ঘোড়া... যে প্রাণীতেই হোক। কারণ, এটা প্রতারণা ও ধোঁকা। কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা বিক্রি করলে বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে—চাইলে রেখে দিতে পারবে কিংবা ফেরত দিতে পারবে।”^{১০১৩}

তাদের কেউ উপকার করলে তার প্রতিদান দিতেন

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘একবার নবিজি ﷺ এমন একসময় (ঘর থেকে) বের হলেন, যে সময় (সাধারণত) তিনি বের হন না এবং এই সময়ে তাঁর সঙ্গে কেউ সাক্ষাৎ করতেও আসে না। তখন আবু বকর ﷺ তাঁর কাছে এলেন। তিনি বললেন, “হে আবু বকর, তোমার আগমনের কারণ কী?”

তিনি বললেন, “রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলাম। তাঁর চেহারা মুবারকের দিকে তাকাব এবং তাঁকে সালাম পেশ করব।”

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই উমর ﷺ এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন, “হে উমর, তোমার আগমনের কারণ কী?” তিনি বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, ক্ষুধার জ্বালায়।” নবিজি ﷺ বললেন, “আমিও কিছুটা ক্ষুধা অনুভব করছি।”

এরপর তাঁরা সকলেই আবুল হাইসাম বিন তাযিয়হান আনসারি ﷺ-এর বাড়ির পানে চললেন। তার কাছে অনেক খেজুর গাছ ও ছাগল ছিল, তবে তার কোনো চাকর-নওকর ছিল না। তাঁরা তাকে বাড়িতে পেলেন না। তার স্ত্রীকে বললেন, “তোমার সঙ্গী কই?”

তার স্ত্রী বললেন, “আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গিয়েছেন তিনি।”

অল্পক্ষণ পরেই আবুল হাইসাম পানিভর্তি মশক বয়ে ফিরে আসলেন। মশকটি রেখেই তিনি নবিজি ﷺ-কে জাপটে ধরলেন এবং বললেন, “আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক!” অতঃপর তাঁদের নিয়ে তার বাগানে গেলেন এবং তাঁদের জন্য একটি বিছানা বিছিয়ে দিলেন। তারপর একটি খেজুর গাছ থেকে এক ছড়া খেজুর পেড়ে তাঁদের সামনে পরিবেশন করলেন।

নবিজি ﷺ বললেন, “(এত বেশি না এনে) আমাদের জন্য শুধু পাকা খেজুরগুলো নিয়ে আসলেই তো পারতে?”

আবুল হাইসাম ﷺ বললেন, “আমি চাই, আপনারা কাঁচা পাকা যা পছন্দ করেন, তা-ই খান।”

এরপর তাঁরা তা আহার করলেন এবং তার আনা মশক থেকে পানি পান করলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “সেই সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এটিও এমন এক নিয়ামত, যা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। এই শীতল ছায়া, সুস্বাদু পাকা টাটকা খেজুর আর ঠান্ডা পানি (কত বিশাল নিয়ামত)!”

তারপর আবুল হাইসাম ﷺ তাঁদের জন্য খানা প্রস্তুত করার জন্য উঠে দাঁড়ালে রাসুল ﷺ বললেন, “কোনো দুধওয়ালা পশু জবাই করো না।”

তিনি তাঁদের জন্য একটি ছাগলের বাচ্চা জবাই করলেন এবং তা রান্না করে নিয়ে এলেন। তারপর সকলে মিলে তা খেলেন। অতঃপর রাসুল ﷺ তাকে বললেন, “তোমার কি কোনো খাদিম আছে?” তিনি বললেন, “জি না, নেই।” নবিজি ﷺ বললেন, “যখন কোনো বন্দী আনা হবে, তখন আমার কাছে এসো।”

এর পরে নবিজি ﷺ-এর কাছে মাত্র দুটি দাস আনা হয়। তাদের সাথে তৃতীয় কোনো দাস ছিল না। তখন আবুল হাইসাম ﷺ তাঁর কাছে আসলেন। নবিজি ﷺ বললেন, “এ দুটি থেকে যেটা তোমার পছন্দ হয়, সেটা নিয়ে যাও।”

আবুল হাইসাম ﷺ বললেন, “হে আল্লাহর নবি, আপনিই আমার জন্য একটিকে পছন্দ করে দিন।”

নবিজি ﷺ বললেন, “পরামর্শদাতাকে আমানতদার হতে হয়। এটাকে নাও। একে আমি নামাজ আদায় করতে দেখেছি। আর তোমাকে তার সাথে সদ্যবহার করতে বিশেষভাবে উপদেশ দিচ্ছি।”

আবুল হাইসাম ؓ তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে রাসূল ﷺ-এর কথাটি বললেন। তখন স্ত্রী বললেন, “একে আজাদ করে দেওয়া ছাড়া রাসূল ﷺ-এর কথা যথাযথ মানা যাবে না।”

তখন তিনি বললেন, “তাহলে এখন থেকে সে স্বাধীন।”

তা জানার পর নবিজি ﷺ বললেন, “আল্লাহ তাআলা যত নবি বা প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন, প্রত্যেকের কাছে দুজন অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা ছিল। একজন তাকে সৎ কাজের আদেশ দিয়েছে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেছে। আরেকজন তার ক্ষতি করতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। আর যাকে মন্দ পরামর্শদাতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তিনিই বেঁচে থাকতে পেরেছেন।”^{১০১৪}

তাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন

আব্দুর রহমান বিন আওফ ؓ-এর সম্পদে বরকতের দোয়া করেছিলেন।

আনাস বিন মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, ‘রাসূল ﷺ আব্দুর রহমান বিন আওফ ؓ-এর শরীরে হলুদ রঙের ছাপ দেখতে পেয়ে বললেন, “কী ব্যাপার?”

তিনি বললেন, “আমি একটি মেয়েকে খেজুর বিচি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে শাদি করেছি।”

রাসূল ﷺ বললেন :

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“আল্লাহ তাআলা তোমাকে বরকত দান করুন। অন্তত একটি ছাগল জবাই করে হলেও অলিমার ব্যবস্থা করো।”^{১০১৫}

নবি ﷺ বলেন, ‘এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, সচ্ছল ব্যক্তির অলিমার খাবার একটি ছাগল থেকে কম না হওয়া মুসতাহাব। আর কাজি ؓ এ কথার ওপর উলামায়ে কিরামের ইজমা (সবার ঐকমত্য) উল্লেখ করেছেন যে,

১০১৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৬৯।

১০১৫. সহিহুল বুখারি : ৫১৫৫, সহিহ মুসলিম : ১৪২৭।

অলিমা আদায় হওয়ার জন্য খাবারের কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। বরং যেকোনো খাবার খাওয়ালে অলিমা আদায় হয়ে যাবে। আর ইমাম মুসলিম রহিমুল্লাহ সাফিয়্যা রাঃ-এর অলিমা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তা গোশতবিহীন ছিল। আর জাইনাব রাঃ-এর অলিমার ব্যাপারে বর্ণনা করেন, “আমরা (সাহাবীগণ) তৃপ্তিভরে রুটি আর গোশত খেয়েছি।”

এসব রিওয়াযাত প্রমাণ করে যে, যেকোনো প্রকার ও যেকোনো পরিমাণ খাবার দ্বারা অলিমা আদায় হয়ে যাবে। তবে মুসতাহাব হলো, বরের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী অলিমার আয়োজন করা।^{১০১৬}

উরওয়া আল-বারিকি রহিমুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসুল সঃ-এর কাছে কিছু আমদানিকৃত মাল পেশ করা হলো। তখন তিনি আমাকে একটি দিনার দিয়ে বললেন, “আমদানিকৃত মাল থেকে আমার জন্য একটি ছাগল কিনে নিয়ে আসো।”

আমি সেখানে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে দরাদরি করে এক দিনার দিয়ে দুটি ছাগল ক্রয় করলাম। তারপর ছাগলদুটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসতে লাগলাম। পথিমধ্যে এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমার সাথে দরাদরি করে এক দিনারের বিনিময়ে একটি ছাগল কিনে নিলেন। তারপর আমি এক দিনার ও একটি ছাগল নিয়ে চলে এসে রাসুল সঃ-কে বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই নিন আপনার দিনার এবং এই নিন আপনার ছাগল।” তারপর পুরো ঘটনা তাকে শোনালাম।

তখন তিনি বললেন :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ

“হে আল্লাহ, এর হাতের লেনদেনে বরকত দান করুন।”

(তাঁর দুআর বরকতে) আমি কুফার আবর্জনা ফেলার জায়গায় দাঁড়িয়ে (বেচাকেনা করে) ঘরে ফেরার পূর্বে চল্লিশ হাজার লাভ করতাম।^{১০১৭}

১০১৬. ইমাম নববি রহিমুল্লাহ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৯/২১৭।

১০১৭. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৮৭৩।

বেচাকেনার ক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শনকারীদের জন্য দোয়া করতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

‘আল্লাহ তাআলা বেচাকেনা ও বিচার-ফয়সালার সময় উদারতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তির ওপর রহম করেন।’^{১০১৮}

► হাদিসের ফায়দাসমূহ :

- এই হাদিসে লেনদেনের সময় উদারতা ও উন্নত চরিত্র প্রদর্শন এবং কৃপণতা পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।
- হক আদায়ের জন্য মানুষের ওপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং পারলে ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, লেনদেনের ক্ষেত্রে যারা উদারতার পরিচয় দেয়, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

এ সম্পর্কে আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمَحَ الْبَيْعِ، سَمَحَ الشَّرَاءِ، سَمَحَ الْقَضَاءِ.

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বেচাকেনা ও বিচার-ফয়সালার সময় উদারতা প্রদর্শনকারীকে ভালোবাসেন।’^{১০১৯}

এ ছাড়াও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এই উদারতা জান্নাতের পথকে সুগম করে। যেমন : উসমান বিন আফফান رضي الله عنه-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا

১০১৮. সহিহুল বুখারি : ২০৭৬।

১০১৯. সুনানুত তিরমিজি : ১৩১৯।

‘আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে বেচাকেনা ও বিচার-ফয়সালার সময় সহজ ও উদার থাকে।’^{১০২০}

সাদাকা ও জাকাত আদায়কারীদের জন্য দোয়া করতেন

আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা رضي الله عنه বলেন, ‘কোনো সম্প্রদায় রাসুল ﷺ-এর নিকট তাদের সাদাকা নিয়ে আসলে তিনি দোয়া করতেন—“হে আল্লাহ, অমুকের বংশধরদের ওপর রহমত নাজিল করুন।” একদিন আমার পিতা তার সাদাকা নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি যথারীতি দোয়া করলেন—‘হে আল্লাহ, আবু আওফার বংশধরদের ওপর রহমত নাজিল করুন।’”^{১০২১}

আসলে আল্লাহর নিম্নোক্ত নির্দেশ পালনার্থে তিনি তাদের জন্য দোয়া করতেন।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করো, যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পারো এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া করো, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত, আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।’^{১০২২}

এই আয়াত প্রমাণ করে, জাকাতগ্রহীতা জাকাত দানকারীর জন্য দোয়া করা মুসতাহাব।^{১০২৩}

অহংকারের ভাব দেখতে পেলে খুব রাগান্বিত হতেন

আব্দুল্লাহ বিন আমর رضي الله عنه বলেন, ‘এক বেদুইন রাসুল ﷺ-এর নিকট আসলো। তার গায়ে সবুজ রঙের একটি আলখাল্লা ছিল, যাতে রেশমের ঝালর অথবা বোতাম লাগানো ছিল।

১০২০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২০১, মুসনাদু আহমাদ : ৪১২।

১০২১. সহিহুল বুখারি : ১৪৯৮, সহিহ মুসলিম : ১০৭৮।

১০২২. সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১০৩।

১০২৩. ফাতহুল বারি : ৩/৩৬২।

সে বলল, “তোমাদের এ বন্ধুটি (রাসুল ﷺ) প্রত্যেক রাখালের ছেলে রাখালকে ওপরে তুলতে চায়; আর প্রত্যেক বীরের ছেলে বীরকে নিচে ফেলতে চায়।”

তখন রাসুল ﷺ রাগান্বিত হয়ে তার দিকে তেড়ে গেলেন এবং তার জামার কলার ধরে তাঁর দিকে টেনে আনলেন আর বললেন, “আমি তোমার শরীরে নির্বোধদের পোশাক দেখতে পাচ্ছি না।”

তারপর তিনি বসে পড়লেন এবং বললেন :

“নুহ ﷺ যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হলেন, তখন তাঁর দুই সন্তানকে ডেকে বললেন, “আমি সংক্ষেপে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। তোমাদের আমি দুটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি এবং দুটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। তোমাদের আমি শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি। এবং “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পাঠের নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, সবকিছুকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”র পাল্লা ভারী হবে। আর যদি আসমান ও জমিনকে বৃত্ত আকারে রাখা হয়, অতঃপর তার ওপর “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-কে রাখা হয়, তখন ওই বৃত্ত ভেঙে যাবে।

আর তোমাদের ‘সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ পাঠের নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, এটি প্রত্যেক বস্তুর দোয়া এবং প্রত্যেক বস্তুকে এটির কারণে রিজিক দেওয়া হয়।”^{১০২৪}

কাব বিন সুর ﷺ-এর আজাদকৃত গোলাম সাইদ বিন আইমান বলেন, ‘একদা রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক দরিদ্র ব্যক্তি আসলেন এবং একজন ধনী ব্যক্তি পাশে বসলেন। তখন ধনী লোকটি গরিব লোকটির দিক থেকে নিজের কাপড় গুটিয়ে নিলেন।

তা দেখে রাসুল ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। বললেন, “হে অমুক, তুমি কি ভয় করো যে, তোমার ধনাঢ্যতা তার কাছে চলে যাবে আর তার দারিদ্র্য তোমার কাছে চলে আসবে?”

ধনী লোকটি বলল, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, ধনাঢ্যতা কি খারাপ কিছু?”

তিনি বললেন, “হাঁ, তোমার ধনাঢ্যতা তোমাকে জাহান্নামের পথে আহ্বান করে আর তার দারিদ্র্য তাকে জান্নাতের পথে আহ্বান করে।”

লোকটি বললেন, “এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?”

তিনি বললেন, “তার প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করো।”

লোকটি বললেন, “আমি তা-ই করব।”

গরিব লোকটি বললেন, “এতে আমার জন্য অতিরিক্ত উপকার কী?”

তিনি বললেন, “তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবে এবং গুনাহ মাফ চাইবে (এতে তোমারও উপকার হবে)?”^{১০২৫}

জাকাত দিতে অস্বীকার করলে তিনি রাগান্বিত হতেন

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সঃ উমর রাঃ-কে জাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করলেন। এরপর তাঁকে বলা হলো, “ইবনে জামিল, খালিদ বিন ওয়ালিদ ও রাসুলুল্লাহ সঃ-এর চাচা আব্বাস রাঃ জাকাত দিতে অস্বীকার করেছেন। তখন রাসুলুল্লাহ সঃ বললেন :

مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا» ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ؟

“ইবনে জামিলের এই অস্বীকার আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা বৈ কিছু নয়—সে তো নিঃস্ব ছিল অতঃপর আল্লাহ তাকে বিত্তশালী করেছেন। আর খালিদের কথা এই যে, তোমরা তার প্রতি জুলুম করছ, কেননা সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে

বিলিয়ে দিয়েছে। আর আব্বাস, তাঁর জাকাত এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আদায় করা আমার দায়িত্বে।” এরপর তিনি বললেন, “হে উমর, তুমি কি জানো, চাচা বাপের সমমর্যাদাসম্পন্ন?”

নববি رحمته বলেন, “তাঁর জাকাত এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আদায় করা আমার দায়িত্বে”—এই কথাটির মর্ম হলো, আমি তাঁর থেকে দুই বছরের জাকাত অগ্রিম নিয়ে নিয়েছি। আর যারা অগ্রিম জাকাত আদায় করাকে বৈধ মনে করেন না, তাদের মতে এর অর্থ হলো, তাঁর জাকাত আমি নিজের পক্ষ থেকে আদায় করব।

আবু উবাইদ رحمته-সহ কতিপয় উলামায়ে কিরাম বলেন, এর অর্থ হলো, রাসুল ﷺ আব্বাস رحمته-কে জাকাত আদায় করার জন্য তার সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দিয়েছেন। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ে জাকাতের সম্পদের প্রতি তার প্রয়োজন ছিল।

তবে হাদিসাংশটির সঠিক অর্থ হলো, আমি তার জাকাত অগ্রিম আদায় করে নিয়েছি। কারণ, অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, “আমি তার থেকে দুই বছরের জাকাত অগ্রিম নিয়ে নিয়েছি।”^{১০২৬}

রাসুল ﷺ ধনাত্মতার ফিতনা থেকে পানাহ চাইতেন

আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল ﷺ দোয়া করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثِمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

“হে আল্লাহ, আমি অলসতা, বার্বক্য, পাপাচার, ঋণ, কবরের ফিতনা, কবরের আজাব ও ধনাঢ্যতার খারাপ ফিতনা থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করছি। আশ্রয় কামনা করছি দারিদ্র্যের ফিতনা ও মাসিহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ, আমার গুনাহসমূহকে বরফ ও শিলার পানি দ্বারা ধৌত করুন এবং আমার অন্তরকে পাপ থেকে এমন স্বচ্ছ করে তুলুন, যেভাবে আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে স্বচ্ছ করে তোলেন। আর পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে যেভাবে দূরত্ব স্থাপন করেছেন, সেভাবে আমার ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে দূরত্ব স্থাপন করে দিন।”^{১০২৭}

নববি রহিমতুল্লাহ বলেন, ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতার ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার কারণ হলো, দারিদ্র্যের সময় অধৈর্য ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের আশঙ্কা রয়েছে এবং অভাবের কারণে হারামে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আর ধনাঢ্যতার সময় দম্ভ, ঔদ্ধত্য, কৃপণতা, অপচয়, অপব্যয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ে পয়সা খরচ করার আশঙ্কা রয়েছে।

খাত্তাবি রহিমতুল্লাহ বলেন, “তিনি যে দারিদ্র্য থেকে পানাহ চেয়েছেন তা মনের দারিদ্র্য; সম্পদের দারিদ্র্য নয়।” আর কাজি রহিমতুল্লাহ বলেন, “অনেক সময় তিনি সম্পদের দারিদ্র্য থেকেও আশ্রয় চেয়েছেন। অর্থাৎ দারিদ্র্যের ওপর সবর করতে না পারা ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি আসার ফিতনা থেকে পানাহ চেয়েছেন।”

ঋণ থেকে পানাহ চাওয়ার কারণ হলো, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন সাধারণত মিথ্যা কথা বলে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। এ ছাড়াও অনেক সময় ঋণ আদায়ে গড়িমসি করে। এভাবে অনেক সময় ঋণ আদায় করার পূর্বেই মৃত্যু এসে যায়, ফলে তা তার জিন্মায় থেকে যায়।^{১০২৮}

১০২৭. সহিহুল বুখারি : ৬৩৬৮, সহিহ মুসলিম : ৫৮৯।

১০২৮. ইমাম নববি রহিমতুল্লাহ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৭/১৪০।

তিনি বলতেন, প্রকৃত ধনাঢ্যতা হলো অন্তরের ধনাঢ্যতা

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنْ النَّفْسِ

‘অধিক সম্পদশালী হওয়া ধনাঢ্যতা নয়; প্রকৃত ধনাঢ্যতা হলো অন্তরের ধনাঢ্যতা।’^{১০২৯}

নববি রাঃ বলেন, ‘হাদিসের অর্থ হলো, প্রশংসনীয় ধনাঢ্যতা হলো অন্তরের ধনাঢ্যতা, অল্পতুষ্ট ও নির্লোভ মানসিকতা। অধিক সম্পদশালী হওয়া—যার সাথে সম্পদ আরও বৃদ্ধি করার লোভ থাকে—আসল ধনাঢ্যতা নয়। কেননা, যে ব্যক্তি সম্পদ বাড়ানোর ধান্দায় থাকে, সে নিজের সম্পদ নিয়ে কখনো তুষ্ট হতে পারে না। তাই এটাকে ধনাঢ্যতা বলার কোনোই যৌক্তিকতা নেই।’^{১০৩০}

ইবনে বাত্তাল রাঃ বলেন, ‘হাদিসের অর্থ হলো, অধিক সম্পদশালী হওয়া প্রকৃত ধনাঢ্যতা নয়। কেননা, অধিকাংশ সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদ নিয়ে তুষ্ট হতে পারে না। সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। বৈধ-অবৈধ যেকোনো উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি করার বুনো চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। অধিক লোভের কারণে তাকে গরিব মানুষ মনে হয়।

প্রকৃত ধনাঢ্যতা হলো অন্তরের ধনাঢ্যতা। অর্থাৎ ওই ব্যক্তি প্রকৃত ধনী, যে নিজের কাছে যা আছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট থাকে। সম্পদ বৃদ্ধি করার লোভ করে না এবং কারও কাছে কাকুতিমিনতি করে টাকা-পয়সা চেয়ে বেড়ায় না। ফলে কাজেকর্মে তাকে ধনবান ব্যক্তি মনে হয়।’^{১০৩১}

আবু জার রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ বললেন, “আবু জার, তুমি কি মনে করো যে, ধনসম্পদের আধিক্যই ধনাঢ্যতা?” আমি বললাম, “হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ!” তিনি বললেন, “তুমি কি মনে করো, ধনসম্পদ কম হওয়াই দারিদ্র্য?” আমি

১০২৯. সহিহুল বুখারি : ৬৪৪৬, সহিহ মুসলিম : ১০৫১।

১০৩০. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ৭/১৪০।

১০৩১. ইবনে বাত্তাল রাঃ কৃত শারহ সহিহুল বুখারি : ১০/১৫৬।

বললাম, “হাঁ, ইয়া রাসুল্লাহ!” তিনি বললেন, “ধনাঢ্যতা হলো হৃদয়ের ধনাঢ্যতা; আর দারিদ্র্য হলো হৃদয়ের দারিদ্র্য।”^{১০৩২}

তাদের বলতেন, ধনাঢ্যতার সাথে অবশ্যই তাকওয়া থাকতে হবে

আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব রাঃ তার চাচার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ‘আমরা একটি মজলিসে ছিলাম, এমন সময় রাসুল সঃ আমাদের মাঝে আগমন করলেন। তাঁর মাথায় পানির চিহ্ন ছিল। আমরা বললাম, “ইয়া রাসুল্লাহ, আজ আপনাকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।”

তিনি বললেন, “হাঁ, আলহামদুলিল্লাহ।”

অতঃপর মজলিসের লোকেরা ধনাঢ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগল। তখন রাসুল সঃ বললেন :

لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، وَالصَّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطَيْبُ
النَّفْسِ مِنَ التَّعِيمِ

“আল্লাহভীরু লোকের ধনাঢ্যতায় কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহভীরু লোকের জন্য ধনাঢ্যতার চেয়ে সুস্থতা উত্তম। আর মনের প্রফুল্লতা আল্লাহর নিয়ামতরাজির অন্তর্ভুক্ত।”^{১০৩৩}

হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো, তাকওয়া ব্যতীত ধনাঢ্যতা ধ্বংস বয়ে আনে। কেননা, তখন বৈধ ও অবৈধ উভয় উপায়ে সম্পদ কামাই করা হয় এবং অনেক অবৈধ খাতে সম্পদ ব্যয়িত হয়। আর যদি ধনবান ব্যক্তির মাঝে আল্লাহভীতি থাকে, তখন এর সম্ভাবনা থাকে না বিধায় ধনাঢ্যতা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে।^{১০৩৪}

‘আল্লাহভীরু লোকের জন্য ধনাঢ্যতার চেয়ে সুস্থতা উত্তম’—কারণ শরীরের সুস্থতা ইবাদত করতে সহায়তা করে আর অসুস্থতা ইবাদতে অক্ষমতা ও

১০৩২. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৬৮৫।

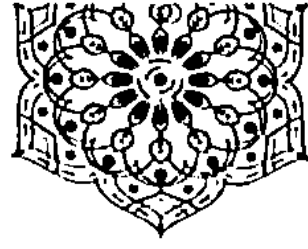
১০৩৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২১৪১।

১০৩৪. হাশিয়াতুস সিনদি : ৪/৩৭০।

প্রতিবন্ধকতা আনে। তাই জীবনে সুস্থতা সেই ধনাঢ্যতার চেয়ে উত্তম, যার সাথে অক্ষমতা আছে।

‘আর মনের প্রফুল্লতা আল্লাহর নিয়ামতরাজির অন্তর্ভুক্ত’—কারণ, অন্তর তখন শোকর ও সবার করার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং তার কাছে ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র্যকে সমান মনে হয়। আর এ সবই নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।^{১০৩৫}





পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সম্রাট ও মর্যাদাবানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

ইতিপূর্বে আমরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি যথা : মুসলমান-কাফির, ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা ইত্যাদির সাথে রাসুল ﷺ-এর উন্নত আচরণের স্বরূপ দেখে এসেছি।

অনুরূপভাবে সমাজের সম্রাট ও মর্যাদাবান শ্রেণির লোকদের সাথে আচরণ এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে রাসুল ﷺ-এর আলাদা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

আসলে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ অধিকার ও প্রাপ্য যথাযথভাবে দান করতেন। সে হিসেবে তিনি মর্যাদাবান ব্যক্তিদের তাদের মর্যাদার আসন থেকে নামাতেন না। বরং তাদের সম্প্রদায়ের নিকট তাদের যে মর্যাদা ও মান রয়েছে, তা বহাল রাখতেন এবং সাহাবিগণকেও তার নির্দেশ দিতেন।

ইমাম মুসলিম رحمہ اللہ হাদিস বর্ণনাকারীদের স্তর সম্পর্কে আলোচনার ফাঁকে বলেন, ‘কোনো উচ্চস্তরের লোককে তার আপন মর্যাদার স্থান থেকে নামানো হয়নি এবং নিম্নস্তরের কোনো লোককে তার স্তর থেকে ওপরে তোলা হয়নি। বরং প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রাপ্য দেওয়া হয়েছে এবং স্ব স্ব আসনে আসীন রাখা হয়েছে। কারণ, আয়িশা رضی اللہ عنہا থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, “আমাকে রাসুল ﷺ প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ স্তরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।”^{১০৩৬}

তাদের মর্যাদা ও সম্মান বহাল রাখতেন

আবু সুফইয়ান رضی اللہ عنہ কুরাইশের অন্যতম সম্রাট ব্যক্তি ছিলেন। কুরাইশের সর্দাররা একে একে চলে যাওয়ার পর তার কাঁধেই কুরাইশের নেতৃত্বভার অর্পিত হয়। উল্লেখ্য তিনিই কুরাইশের নেতা ছিলেন।

মক্কা-বিজয়ের সময় যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন রাসূল ﷺ আলাদাভাবে তার নাম উল্লেখ করে তাকে আলাদা মর্যাদায় ভূষিত করলেন।

ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণিত আছে, ‘মক্কা-বিজয়ের দিন আব্বাস রা আবু সুফইয়ান বিন হারবকে নিয়ে রাসূল স-এর দরবারে এলেন এবং তিনি (আবু সুফইয়ান) ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর আব্বাস রা বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আবু সুফইয়ান মর্যাদাপ্রিয় মানুষ—তাই তাকে আলাদা মর্যাদা দিলে ভালো হয়।”

রাসূল স বললেন :

نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ

“তা তো অবশ্যই, যে আবু সুফইয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। আর যে নিজের ঘরের দরোজা বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ।”^{১০৩৭}

আবু হুরাইরা রা কর্তৃক বর্ণিত মক্কা-বিজয়ের ঘটনায় এসেছে, ‘রাসূল স সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং আনসাররা সাফার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল। তখন আবু সুফইয়ান এসে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, কুরাইশের সজীবতা ধ্বংস হয়ে গেছে। আজকের পর থেকে কুরাইশের মর্যাদা আর থাকবে না।”

তখন রাসূল স বললেন :

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ
أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ

“যে আবু সুফইয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ; যে অস্ত্র সমর্পণ করবে, সে নিরাপদ; আর যে ঘরের দরোজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ।”^{১০৩৮}

১০৩৭. সুনানু আবি দাউদ : ৩০২১।

১০৩৮. সহিহ মুসলিম : ১৭৮০।

নববি ﷺ বলেন, ‘এ কথা বলে তিনি আবু সুফইয়ানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন এবং তার মর্যাদা প্রকাশ করেছেন।’^{১০৩৯}

আয়িজ বিন আমর ﷺ বর্ণনা করেন, ‘আবু সুফইয়ান একদল লোকের সাথে সালমান, সুহাইব ও বিলাল ﷺ-এর নিকট এলেন। [তার এই আসাটা ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির পর। তখন তিনি কাফির ছিলেন।)] তখন তাঁরা বললেন, “আল্লাহর তরবারিসমূহ তাঁর দূশমনের গর্দানে ঠিক সময়ে লক্ষ্যস্থলে আঘাত করতে পারেনি।”

তখন আবু বকর ﷺ বললেন, “তোমরা কি কুরাইশের প্রবীণ নেতা ও সর্দারকে এমন কথা বলছ?”

এরপর তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তখন তিনি (রাসুল ﷺ) বললেন, “হে আবু বকর, তুমি বোধ হয় তাঁদের রাগিয়েছ। যদি তুমি তাঁদের রাগিয়ে থাকো, তাহলে তুমি তাঁদের রবকেই রাগিয়েছ।”

অতঃপর আবু বকর ﷺ তাদের নিকট এসে বললেন, “ভাইয়েরা, আমি কি তোমাদের রাগিয়েছি?”

তাঁরা বললেন, “না, হে আমাদের ভাই, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।”^{১০৪০}

এখানে লক্ষ্য করুন, আবু বকর ﷺ যে কুরাইশ নেতার মর্যাদা রক্ষা করেছেন, এর ওপর রাসুল ﷺ কোনো ধরনের আপত্তি তোলেননি। তাঁর আপত্তি শুধু এই ছিল যে, এভাবে কথা বলার কারণে হয়তো তাঁর সাহাবিগণ কষ্ট পেয়েছেন।

খাজরাজ গোত্রের নেতা সাদ বিন মুআজ ﷺ যখন বনি কুরাইজার ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য তাদের নিকট গেলেন, তখন রাসুল ﷺ তার সম্মানার্থে তাদের দাঁড়িয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

১০৩৯. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১২/১২৭।

১০৪০. সহিহ মুসলিম : ২৫০৪।

এ সম্পর্কে আবু সাইদ খুদরি رضي الله عنه বর্ণনা করেন, ‘বনু কুরাইজা সাদ বিন মুআজ رضي الله عنه-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার কথা জানালে তিনি একটি গাধার ওপর সাওয়াব হয়ে তাদের নিকট আসলেন। মসজিদের কাছাকাছি আসলে রাসুল ﷺ আনসারদের উদ্দেশে বললেন :

قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ إِلَى خَيْرِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ

“তোমাদের নেতার অথবা (বলেছেন,) তোমাদের উত্তম লোকটির সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও এবং তাকে তার মর্যাদার আসনে সমাসীন করো।”

অতঃপর তিনি রাসুল ﷺ-এর পাশে গিয়ে বসলেন।^{১০৪১}

ইবনে হাজার رحمته الله বলেন, ‘এই হাদিসে সম্মানিত লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বিবৃত হয়েছে।’^{১০৪২}

এই ঘটনায় সাহাবিদের কিয়াম বা দাঁড়ানো নিষিদ্ধ কিয়ামের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, কিয়াম তিন প্রকার :

১. কোনো ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে কিয়াম বা দাঁড়ানো। এটা সুন্নাত—যদি আপনি যাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন, সে তার যোগ্য হয়। যেমন : কোনো বড় আলিম বা বুজুর্গ অথবা ধনবান ব্যক্তি আপনার কাছে আসলে সুন্নাত হলো, আপনি দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন। এভাবে দাঁড়ানো উন্নত চরিত্র ও ভদ্রতার পরিচয়ও বটে। এই হাদিসে যে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে, তা এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।
২. কোনো ব্যক্তিকে সম্মান জানানোর জন্য তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা। এটা নিষিদ্ধ। রাসুল ﷺ বসে থাকা অবস্থায় সাহাবিগণ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দরুদ পড়তে চাইলে তিনি নিষেধ করলেন এবং বললেন, ‘তোমরা তো দেখছি, পারসিক ও রোমানদের কাণ্ড শুরু করে দিয়েছ। তাদের বাদশারা

১০৪১. সহিহুল বুখারি : ৩০৪৩, সহিহ মুসলিম : ১৭৬৮।

১০৪২. ফাতহুল বারি : ১১/৪৯।

যখন বসে থাকত, তখন তারা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। তোমরা এমন করো না।^{১০৪৩}

৩. কোনো ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো। এর স্বরূপ হলো, আমাদের নিকট কোনো মানুষ আসলো আর আমরা তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই প্রকারের কিয়াম বা দাঁড়ানোয় কোনো সমস্যা নেই, তবে পরিত্যাগ করা ভালো। কারণ, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল ﷺ তাঁর জন্য সাহাবিদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন। এ জন্য রাসুল ﷺ সাহাবিদের নিকট আসলে তাঁরা দাঁড়াতে না, অথচ রাসুল ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। আর তিনি মজলিসের যেখানে জায়গা পেতেন, সেখানেই বসে যেতেন (লোকদের মাড়িয়ে আগে যাওয়ার চেষ্টা করতেন না)।^{১০৪৪}

সম্ভ্রান্ত লোকদের দ্বীনের পথে আনার খুব চেষ্টা করতেন

সম্ভ্রান্ত লোকদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেন। কারণ, তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের অধীনস্থদের ইসলাম কবুল করার সম্ভাবনা প্রবল ছিল।

ওয়ালিদ বিন মুগিরা কুরাইশের অন্যতম বড় নেতা ছিলেন। তাকে ইসলামে দীক্ষিত করার বাসনায় রাসুল ﷺ তার পেছনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

একদিন রাসুল ﷺ তাকে দাওয়াত দেওয়ায় ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ তাঁর নিকট আসলেন। তখন রাসুল ﷺ ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ-কে এড়িয়ে ওয়ালিদের প্রতি মনোযোগী হলেন।

এ সম্পর্কিত ঘটনাটি আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : (عَبَسَ) “তিনি ক্রুদ্ধিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।”—এই সুরা অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ-এর ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। তিনি রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বলতে শুরু করলেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে সঠিক পথ

১০৪৩. সহিহুল মুসলিম : ৪১৩। জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত।

১০৪৪. লিকাউল বাবিল মাফতুহ লি-ইবনি উসাইমিন (৫৯/২৫) থেকে কিছুটা পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপিত।

দেখান।” তখন রাসুল ﷺ-এর নিকট কুরাইশের নেতাগোছের একজন লোক ছিলেন। রাসুল ﷺ তাকে (ইবনে উম্মে মাকতুম) এড়িয়ে ওই লোকটির প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে বললেন, “আমি যা বলছি, আপনি তাতে খারাপ কিছু দেখছেন কি?” লোকটি বললেন, “না।” এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সুরাটি অবতীর্ণ হয়।^{১০৪৫}

সাধারণভাবে সকল মানুষ এবং বিশেষভাবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হিদায়াতের প্রতি রাসুল ﷺ-এর প্রবল আগ্রহ ছিল। একাধিক ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

উমর রাঃ ও আবু জাহেলের হিদায়াতের প্রতি আগ্রহ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ দোয়া করলেন :

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ يَا جَهْلٍ أَوْ بَعْمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ

‘হে আল্লাহ, আবু জাহেল ও উমর বিন খাত্তাব—এ দুজনের মধ্যে যে আপনার প্রিয়, তার মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।’

বর্ণনাকারী বলেন, ‘তাদের দুজনের মধ্যে আব্দুল্লাহর কাছে প্রিয় ছিলেন উমর বিন খাত্তাব রাঃ।’^{১০৪৬}

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ দোয়া করলেন :

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِبَعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً

‘হে আল্লাহ, বিশেষভাবে উমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।’^{১০৪৭}

১০৪৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৩১।

১০৪৬. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৮১।

১০৪৭. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৬৮৮২।

উভয় হাদিসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আলবানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘দুই হাদিসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা, এমন হওয়া সম্ভব যে, প্রথমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়জনের জন্য দোয়া করেছিলেন। পরে যখন আবু জাহেলের ধৃষ্টতা ও নাফরমানি সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন শুধু উমর রাযিহু-এর জন্য দোয়া করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই দোয়া আল্লাহ কবুল করলেন এবং উমর রাযিহু-এর মাধ্যমে দ্বীনকে শক্তিশালী করলেন—যার প্রমাণ তাঁর জীবনবৃত্তান্ত থেকে পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিহু ইসলামের প্রতি উমর রাযিহু-এর অবদানের সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, ‘উমর রাযিহু-এর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠি।’^{১০৪৮}

তায়িফের সম্ভ্রান্ত লোকদের উদ্দেশে দাওয়াত

চাচার মৃত্যুর পর কুরাইশের নিপীড়ন বেড়ে চললে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়িফ চলে গেলেন। তাঁর আশা ছিল, সম্ভবত তায়িফবাসী তাঁকে আশ্রয় দেবেন, তাঁর কওমের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করবেন এবং সর্বোপরি তাঁকে স্বগোত্রের নির্যাতন থেকে রক্ষা করবেন—ফলে তিনি নির্বিঘ্নে রিসালাতের দাওয়াত দিতে পারবেন।

সেখানে যাওয়ার পর তাদের আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে আশ্রয় দেওয়া ও সাহায্য করা তো দূরের কথা, উল্টো তাঁকে কঠিন রকমের কষ্ট দিল। তাদের থেকে তিনি এত কঠিন কষ্ট পেলেন, যা নিজ কওম থেকে কখনো পাননি। তবুও তিনি সেখানে দশ দিন অবস্থান করলেন এবং তাদের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে কথা বললেন।^{১০৪৯}

এত কষ্ট সহ্য করেও সম্ভ্রান্ত লোকদের সাথে কথা বলার কারণ হলো, যদি তারা তাঁর দাওয়াতে সাড়া প্রদান করত, তাহলে তাদের অধীনস্থ ও অনুসারীরাও তাঁর দাওয়াত কবুল করার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

১০৪৮. সহিহুল বুখারি : ৩৮৬৩, সহিহাহ : ১৩/২৮।

১০৪৯. জাদুল মাআদ : ৩/২৮।

দাওস গোত্রের নেতা তুফাইল বিন আমরকে দাওয়াত

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ﷺ বলেন, ‘তুফাইল বিন আমর আদ-দাওসি ﷺ বর্ণনা করেন, “রাসুল ﷺ মক্কায় থাকাকালে তিনি মক্কায় আসলেন। তখন কুরাইশের কতিপয় লোক তার কাছে আসলো এবং বলল, “হে তুফাইল, আপনি আমাদের দেশে এমন সময়ে এসেছেন, যখন আমাদের বংশেরই এক লোক আমাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে আমাদের একতাকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। তার কথায় রয়েছে জাদুর প্রভাব—যার ফলে পিতা সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ভাই বিচ্ছিন্ন হয় ভাই থেকে এবং স্বামী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার স্ত্রী থেকে। এমন মুহূর্তে আমরা আপনার এবং আপনার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তার কবলে পতিত হওয়ার আশঙ্কা করছি। সুতরাং তার সাথে কথা বলবেন না এবং তার কোনো কথায় কান দেবেন না।”’

তুফাইল ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর কসম, তারা আমাকে এত বোঝাল যে, একপর্যায়ে আমি দৃঢ় সংকল্প করে ফেললাম, আমি তাঁর (রাসুল ﷺ-এর) কোনো কথা শুনব না এবং তাঁর সাথে কখনো কথা বলব না। এমনকি আমি মসজিদে যাওয়ার সময় কানে তুলা দিয়ে যেতাম, যেন তাঁর এমন কোনো কথা আমার কানে ঢুকে না যায়, যা আমি শুনতে চাই না।’

তিনি বলেন, ‘একদিন আমি সকালে মসজিদে গেলাম। দেখলাম, রাসুল ﷺ কাবার পাশে নামাজ পড়ছেন। আমি তাঁর পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর কিছু কথা শুনতে বাধ্য করলেন। আমি তাঁর থেকে একটি অতি সুন্দর কথা শুনতে পেলাম এবং মনে মনে বললাম, “আমার মা আমাকে হারিয়ে ফেলুক! আল্লাহর কসম, আমি একজন ধীমান সাহিত্যিক ও কবি। খারাপ ও ভালো কথার পার্থক্য আমি ভালোই করতে জানি। তাই আজ এই লোকের কথা অবশ্যই শুনে দেখব। সে যদি ভালো কথা বলে, তবে আমি তা কবুল করব; আর যদি খারাপ কথা বলে, তবে তা পরিত্যাগ করব।

আমি আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। তারপর রাসুল ﷺ বাড়ির প্রতি রওনা হলেন। আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। যখন তিনি বাড়িতে প্রবেশ করলেন, তখন আমিও তাঁর সাথে প্রবেশ করলাম।

তারপর বললাম, “হে মুহাম্মাদ, আপনার কওম আমাকে এমন এমন কথা বলেছে। তাই এতদিন পর্যন্ত আপনার কথা না শোনার জন্য কানে তুলা দিয়ে থাকতাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আজ আমাকে আপনার কথা শুনতে বাধ্য করলেন। এতে আপনার মুখ থেকে একটি অতিশয় সুন্দর কথা শুনতে পেলাম। সুতরাং আপনি আমার সামনে আপনার ধর্মের স্বরূপ উপস্থাপন করুন।”

তখন রাসুল ﷺ আমার সামনে ইসলাম তুলে ধরলেন এবং আমাকে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে শোনালেন। আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, এর চেয়ে সুন্দর কথা আমি জীবনেও শুনিনি এবং এমন ইনসারূপ জীবনব্যবস্থা জীবনেও দেখিনি।

কাজেই আমি সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। অতঃপর বললাম, “হে আল্লাহর নবি, আমার কওমের লোকজন আমার কথা মান্য করে, তাই আমি তাদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে চাই। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাকে একটি আলামত (কারামাত) দান করেন, যা দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমার সহায়তা করবে।”

রাসুল ﷺ দোয়া করলেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَهُ آيَةً

“হে আল্লাহ, একে একটি আলামত দান করুন।”

তারপর আমি আমার কওমের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে যখন আমি একটি গিরিপথের নিকট পৌঁছালাম, যা আমাকে পানি নিতে আসা লোকদের কাছে নিয়ে যাবে, তখন আমার দুই চোখের মাঝখানে বাতির মতো একটি নুর উদয় হলো। তখন আমি দোয়া করলাম, “ইয়া আল্লাহ, আমার চেহারা ব্যতীত অন্য জায়গায় (আলামত) দান করুন। কারণ, আমি ভয় পাচ্ছি যে, তারা এটাকে তাদের দীন ছেড়ে দেওয়ার শাস্তিস্বরূপ আমার চেহারায় বিকৃতি এসেছে মনে করবে।”

তখন নুরটি স্থানান্তরিত হয়ে আমার লাঠির মাথায় উদিত হলো। আমি যখন গিরিপথ থেকে নিচে নামছিলাম, তখন পানি নিতে আসা লোকেরা আমার লাঠির মাথায় ঝুলন্ত বাতির মতো নুরটি দেখতে পাচ্ছিল। তারপর আমি তাদের কাছে পৌঁছে গেলাম এবং তাদের মাঝে মিশে গেলাম।

আমি নামার পর আমার পিতা আমার নিকট আসলেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। আমি বললাম, “বাবা, আমার থেকে দূরে সরে যান। আমি আপনার নই, আপনিও আমার নন।”

তিনি বললেন, “বেটা, এমন কথা কেন বলছ তুমি?”

আমি বললাম, “আমি মুসলমান হয়ে গেছি এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীনের অনুসারী হয়ে গিয়েছি।”

তিনি বললেন, “বেটা আমার, তোমার দ্বীনই তো আমার দ্বীন।”

আমি বললাম, “তাহলে আপনি গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করে আসুন। অতঃপর যা আমি শিখে এসেছি, তা আপনাকে শেখাব।”

তারপর তিনি ফিরে গেলেন, গোসল করলেন এবং পবিত্র কাপড় পরিধান করলেন। অতঃপর আমার কাছে আসলেন। তখন আমি তার সামনে ইসলাম পেশ করলাম আর তিনি তা কবুল করে নিলেন।

অতঃপর আমার স্ত্রী আমার নিকট আসলে আমি তাকে বললাম, “আমার থেকে দূরে থাকো! আমি তোমার নই, তুমিও আমার নও।”

সে বলল, “আমার পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আপনি এমন কথা কেন বলছেন?”

আমি বললাম, “ইসলাম তোমার ও আমার মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছে। কারণ, আমি মুহাম্মাদের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছি।”

সে বলল, “আপনার ধর্মই আমার ধর্ম।”

আমি বললাম, “তাহলে পবিত্র হয়ে আসো।”

অতঃপর সে গোসল করে আমার নিকট আসলে আমি তার সামনে ইসলাম পেশ করলাম আর সে মুসলমান হয়ে গেল।

অতঃপর পুরো দাওস গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। কিন্তু তারা আমার কথা মানতে অস্বীকৃতি জানাল।

অতঃপর আমি মক্কায় রাসুল ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললাম, “হে আল্লাহর নবি, দাওসের কাছে আমার ওপর তাদের ব্যভিচার জয়ী হয়েছে। তাই আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করুন।”

রাসুল ﷺ দোয়া করলেন :

اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا

“হে আল্লাহ, দাওসকে হিদায়াত দান করুন।”

অতঃপর তিনি বললেন :

ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَارْفُقْ بِهِمْ

“তোমার কওমের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের নশ্রতার সহিত আল্লাহর পথে দাওয়াত দাও।”

তিনি বলেন, “তারপর থেকে আমি দাওস গোত্রের লোকদের অনবরত ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলাম। রাসুল ﷺ মদিনায় হিজরত করার পর বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত আমি নিজ কওমকে দ্বীনের দাওয়াত দানে ব্যস্ত থাকলাম।

অতঃপর আমি আমার সাথে যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের সাথে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশে রওনা হলাম। তিনি তখন খাইবারে ছিলেন। মদিনায় আমরা সত্তর-আশিটি দাউসের ঘর নির্মাণ করলাম। তারপর খাইবারে গিয়ে রাসুল ﷺ-এর সাথে মিলিত হলাম। তিনি মুসলমানদের পাশাপাশি আমাদেরকেও (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে) অংশ দান করলেন।

এরপর আল্লাহ তাআলা মক্কাতে মুসলমানদের করায়ত্তে নিয়ে আসলে আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করলাম, “আমাকে আমার বিন হিমার দুই হাতবিশিষ্ট মূর্তি পোড়ানোর জন্য প্রেরণ করুন।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘অতঃপর তিনি (অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে) মূর্তির কাছে গেলেন এবং তার ওপর আগুন ধরিয়ে দিয়ে বললেন :

يَا ذَا الْكَفَّيْنِ لَسْتُ مِنْ عَبَادِكَ
مِيْلَادُنَا أَقْدَمُ مِنْ مِيْلَادِكَ
إِنِّي حَشَوْتُ النَّارَ فِي فُؤَادِكَ

“হে দুই হাতওয়ালা মূর্তি, আমি তোমার পূজারি নই। আমাদের জন্ম তোমার জন্মের চেয়েও আগে। আমি তোমার অন্তরের ভেতর আগুন ধরিয়ে দিয়েছি।”

অতঃপর তিনি মদিনায় রাসুল ﷺ-এর নিকট ফিরে আসলেন এবং রাসুল ﷺ-এর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।^{১০৫০}

বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের উদ্দেশে দাওয়াত

তাদের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্য ছিল, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের প্রজা ও অনুসারীরা তাদের অনুগামী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নেবে।

ষষ্ঠ হিজরির শেষের দিকে হুদাইবিয়া সন্ধির পর রাসুল ﷺ বিভিন্ন দেশের রাজাদের উদ্দেশে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি প্রেরণ করা শুরু করেন।

ইবনে হিশাম رحمه الله বলেন, ‘অতঃপর রাসুল ﷺ বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট দূত প্রেরণ করলেন।

দিহইয়াহ কালবি رحمه الله-কে ‘কাইসার’ (রোমান বাদশা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন।

আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা رضي الله عنه-কে ‘কিসরা’ (পারস্যের রাজা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন।

আমর বিন উমাইয়া দামরি رضي الله عنه-কে ‘নাজ্জাশি’ (হাবশার বাদশা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন।

হাতিব বিন আবু বালতাআ رضي الله عنه-কে আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশা মুকাওকিসের নিকট প্রেরণ করলেন।^{১০৫১}

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে আবু সুফইয়ানের সাক্ষাতের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, হিরাক্লিয়াস আবু সুফইয়ানকে বললেন, ‘তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তাহলে তিনি ঠিকই নবি। তিনি আবির্ভূত হবেন তা আমি জানতাম বটে, তবে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন, তা মনে করিনি। যদি আমি তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছাবার সুযোগ পেতাম, তাহলে আমি তাঁর সাক্ষাৎকে অগ্রাধিকার দিতাম। যদি আমি তাঁর নিকট অবস্থান করতাম, তাহলে আমি তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দিতাম। আমার নিচের জমিন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃতি লাভ করবে।’

আবু সুফইয়ান বলেন, ‘তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূল ﷺ-এর পত্রখানি আনতে বললেন। এরপর পাঠ করতে বললেন। চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ،
سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ،
أَسْلِمْتَ تَسْلَمَ، وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ
إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ

“পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হিদায়াতের অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

পরসমাচার এই—আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি।
ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি পাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ
তাআলা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে
নেন, তাহলে সকল প্রজার পাপরাশিও আপনার ওপর নিপতিত
হবে।”^{১০৫২}

তাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে খুব আনন্দিত হতেন

ইবনে শিহাব জুহরি রাঃ বর্ণনা করেন, ‘উম্মে হাকিম বিনতে হারিস বিন হিশাম
রাঃ ইকরামা বিন আবু জাহেলের স্ত্রী ছিলেন। মক্কা-বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম
গ্রহণ করলেন। কিন্তু তার স্বামী ইকরামা বিন আবু জাহেল ইসলাম গ্রহণ না
করে ইয়ামান পালিয়ে গেলেন। তখন উম্মে হাকিম রাঃ স্বামীর খোঁজে ইয়ামান
চলে গেলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ
করলেন এবং মক্কা-বিজয়ের বছরেই রাসূল সঃ-এর নিকট আগমন করলেন।
রাসূল সঃ তাকে দেখামাত্র তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন তাঁর শরীরে কোনো
চাদর ছিল না। অতঃপর তাকে বাইআত করালেন।”^{১০৫৩}

‘রাসূল সঃ তাকে দেখামাত্র তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন তাঁর শরীরে
কোনো চাদর ছিল না।’—এর ব্যাখ্যায় আবু ওয়ালিদ সুলাইমান আল-বাজি
রাঃ বলেন, ‘এটা লোকদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি রাসূল সঃ-এর অতিশয়
আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। বিশেষ করে ইকরামা রাঃ-এর মতো নেতৃস্থানীয়
একজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে আনন্দের আতিশয্যায় তিনি নিজেকে ধরে
রাখতে পারেননি (খালি গায়েই তাকে জড়িয়ে ধরলেন)। কারণ, ইকরামা রাঃ
বনি মাখজুমের অন্যতম বড় নেতা ছিলেন।

অনুরূপভাবে তিনি আদি বিন হাতিম তাই রাঃ-এর ইসলাম গ্রহণ করায়
অত্যধিক আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ, তিনি পিতার মৃত্যুর পর তার গোত্রের
অধিপতি ছিলেন।

১০৫২. সহিহুল বুখারি : ৭, সহিহ মুসলিম : ১৭৭৩।

১০৫৩. মুয়াত্তা মালিক : ১১৫৬, মুসান্নাফু আদ্বির রাজ্জাক : ১২৬৪৬।

আদি বিন হাতিম ؓ বলেন, ‘রাসুল ؐ-এর ব্যাপারে শোনার পর আমি তাঁকে যতটুকু ঘৃণা করেছি, আরবের আর কোনো লোক তাঁকে এতটুকু ঘৃণা করেনি। আমি ছিলাম একজন অভিজাত বংশের লোক এবং ধর্মবিশ্বাসে খ্রিষ্টান। আমার সম্প্রদায়ের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ আমি লাভ করতাম।^{১০৫৪} আমার ধারণা অনুযায়ী আমি সঠিক ধর্মবিশ্বাসের ওপর ছিলাম।

আমার প্রতি আমার সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহারে আমি ছিলাম তাদের রাজাসদৃশ। রাসুল ؐ সম্পর্কে যখন আমি শুনতে পেলাম, তখন তাঁর প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হলো। আমি আমার উটের রাখাল আরবি গোলামকে বললাম, “সতর্ক থেকো! কিছু বেগবান ও হুষ্টপুষ্ট উট সব সময় আমার কাছাকাছি প্রস্তুত রাখবে। আর যখন শুনবে মুহাম্মাদের সৈন্য আমাদের এই অঞ্চলে পদার্পণ করেছে, আমাকে জানাবে।” সে তা-ই করল। এরপর একদিন সকালবেলা সে আমার কাছে এসে বলল, “হে আদি, মুহাম্মাদের সেনাবাহিনী আপনার ওপর হামলা চালালে আপনি যা করতে চেয়েছিলেন, তা করে ফেলুন। কারণ, আমি বহু পতাকা দেখতে পেয়েছি। সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে লোকেরা বলেছে, এটা মুহাম্মাদের সৈন্যশিবির।”

আদি ؓ বলেন, ‘আমি বললাম, “আমার উটগুলো কাছে নিয়ে আসো।” সে তা কাছে নিয়ে আসলো। আমি আমার পরিবারবর্গ ও সন্তানদের সঙ্গে নিলাম এবং বললাম, “আমি শামে আমার স্বধর্মীয় খ্রিষ্টানদের কাছে চলে যাব।” এই বলে আমি জাওশিয়া, ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী হাওশিয়া^{১০৫৫}-এর পথে অগ্রসর হলাম এবং হাতিমের এক কন্যাকে^{১০৫৬} হাদিরে^{১০৫৭} রেখে গেলাম। অবশেষে শামে পৌঁছে সেখানে অবস্থান করতে থাকলাম।”

আদি ؓ বলেন, ‘রাসুল ؐ-এর বাহিনী আমার পশ্চাদ্ধাবন করছিল। তাদের (বনু তাইয়ের) অনেকে বন্দী হলো, যাদের মধ্যে হাতিম-তনয়াও ছিল। বনু তাই-এর বন্দীদের সাথে তাকেও রাসুল ؐ-এর নিকট উপস্থিত করা হলো। আমার শামে পলায়নের কথা তাঁর কানে পৌঁছে গিয়েছিল।

১০৫৪. যেহেতু আমি ছিলাম তাদের গোত্রাধিপতি।

১০৫৫. নজদের একটি পাহাড়ের নাম।

১০৫৬. তার নাম সাফফাহ।

১০৫৭. বনু তাই-এর বসতি।

হাতিম-তনয়াকে মসজিদের সামনে খোঁয়াড়ের মতো একটি স্থানে রাখা হলো। তার মধ্যে বন্দীদের আটকে রাখা হতো। রাসুল ﷺ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাতিম-তনয়া তাঁর মুখোমুখি হলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, স্পষ্টভাষিণী। তিনি বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার পিতা গত হয়েছেন। যিনি আমার দেখাশোনা করতেন, তিনিও আমাকে ফেলে গেছেন। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন। আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতিও সদয় হবেন।”

রাসুল ﷺ বললেন, “কে তোমার দেখাশোনা করত?” তিনি বললেন, “হাতিমের পুত্র আদি।” রাসুল ﷺ বললেন, “ওই ব্যক্তি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুল থেকে পলায়ন করেছে।”

হাতিম-তনয়া বলেন, “এরপর রাসুল ﷺ আমাকে রেখে চলে গেলেন। পরবর্তী দিন তিনি আমার কাছ দিয়ে আবার যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে আগের মতোই বললাম। তিনিও আমাকে গত দিনের মতো জবাব দিলেন। এরপর তিনি তৃতীয় দিন এভাবে আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে আমি তাঁর পক্ষ হতে কোনো অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর পেছনের এক লোক আমাকে ইঙ্গিত করে বলল, “দাঁড়াও, রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলো।” আমি তাঁর সামনে দাঁড়ালাম এবং বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার পিতা গত হয়েছেন। যিনি আমার দেখাশোনা করতেন, তিনিও আমাকে ফেলে গেছেন। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন। আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতিও সদয় হবেন।”

রাসুল ﷺ বললেন, “করেছি তো। কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করো না, যাবৎ না তোমার সম্প্রদায়ের নির্ভরযোগ্য কোনো লোককে পাও, যে তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছে দেবে। এমন কোনো লোককে পাওয়া গেলে আমাকে জানাবে।” যে লোকটি রাসুল ﷺ-এর সাথে কথা বলতে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমি জানতে চাইলাম, “তিনি কে?” বলা হলো, “তিনি আলি বিন আবি তালিব রা।”

আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। অবশেষে বনু বালি অথবা বনু কুজাআ গোত্রের একটি কাফেলার আগমন হলো। আমার ইচ্ছা ছিল শামদেশে আমার

ভাইয়ের নিকট চলে যাব। আমি রাসুল ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললাম, “ইয়া রাসুল্লাহ, আমার সম্প্রদায়ের একটি কাফেলা এসেছে। তাতে এমন লোক আছে, যে নির্ভরযোগ্য এবং আমাকে জায়গামতো পৌঁছে দেবে।” তখন রাসুল ﷺ আমাকে কাপড়-চোপড়, বাহন ও পথখরচ দিলেন। আমি তা নিয়ে কাফেলার সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম এবং শামদেশে চলে আসলাম।”

আদি ﷺ বলেন, “আল্লাহর শপথ, আমি আমার পরিবারবর্গের মাঝে বসা ছিলাম। সহসা দেখলাম, একটি স্ত্রীলোক হাওদার ভেতরে এবং সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি বলে উঠলাম, “এ তো দেখি হাতিম-তনয়া!” ঠিকই দেখা গেল যে সে হাতিমের কন্যাই। সে আমার সম্মুখে এসেই আমাকে তিরস্কার করে বলতে শুরু করল, “সম্পর্কচ্ছেদকারী জালিম! নিজের বউ-ছেলে নিয়ে চলে এসেছ, আর বাবার মেয়েকে ফেলে এসেছ!”

আমি বললাম, “প্রিয় বোনটি আমার, রাগ করো না! আল্লাহর কসম, আমার অপরাধ অমার্জনীয়। ঠিকই তুমি যা বলেছ, আমি তা-ই করেছি।”

আদি ﷺ বলেন, “এরপর সে নেমে আসলো এবং আমার নিকট থাকতে লাগল। সে ছিল ভীষণ বুদ্ধিমতী। আমি একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “এই লোকটির বিষয়ে তুমি কী মনে করো?” সে বলল, “আল্লাহর কসম, আমার মতে তুমি শীঘ্রই তাঁর নিকট চলে যাও। কারণ, তিনি যদি নবি হয়ে থাকেন, তা হলে যারা আগে আগে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তিনি তাদের প্রতি সদয় হবেন। আর যদি তিনি রাজা হন, তবে তাঁর মহত্বপূর্ণ গৌরবে তুমি ছোট হয়ে যাবে না। তুমি তুমিই থাকবে।” আমি বললাম, “হাঁ, এটাই বিজ্ঞজানোচিত রায়।”

আদি ﷺ বলেন, “তখন আমি রওনা হয়ে মদিনায় রাসুল ﷺ-এর নিকট পৌঁছে গেলাম। তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, “কে এই লোক?” বললাম, “আদি বিন হাতিম।” তখন রাসুল ﷺ উঠে আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। আল্লাহর কসম, তিনি যখন আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পশ্চিমধ্যে এক জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধা তাঁকে দাঁড়াতে বললে তিনি

দাঁড়িয়ে গেলেন। বৃদ্ধা দীর্ঘক্ষণ তার প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁর সাথে কথা বললেন। আমি মনে মনে বললাম, “আল্লাহর শপথ, এই লোক কিছুতেই রাজা হতে পারেন না।”

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। গৃহের ভেতর প্রবেশ করে তিনি একটি বালিশ নিয়ে আমার দিকে ছুড়ে দিলেন। তার ওপরে ছিল চামড়া, ভেতরে খেজুরের বাকল। তিনি বললেন, “এর ওপর বসো।” আমি বললাম, “বরং আপনিই এর ওপর বসুন।” তিনি বললেন, “না, তুমিই বসো।” আমি তার ওপর বসে পড়লাম। রাসুল ﷺ বসলেন মাটিতে। আমি মনে মনে বললাম, “আল্লাহর কসম, এটা রাজাদের আচরণ নয়।”

তারপর তিনি আমাকে বললেন, “হে আদি বিন হাতিম, ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপত্তা লাভ করবে।” আমি বললাম, “আমি একটি দ্বীনের অনুসারী।” তিনি বললেন, “তোমার ধর্ম সম্পর্কে আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি।”

আমি বললাম, “কী! আপনি আমার ধর্ম সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানেন!?” তিনি বললেন, “হাঁ।”

অতঃপর তিনি বললেন, “তাহলে বলো তো, হে আদি বিন হাতিম, তুমি কি “রাকুসি”^{১০৫৮} নও?”

আমি বললাম, “তা-ই বটে!” তিনি বললেন, “তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ লাভ করতে না?” আমি বললাম, “হাঁ।” তিনি বললেন, “তোমার ধর্ম অনুযায়ী তো সেটা তোমার জন্য বৈধ ছিল না।” আমি বললাম, “আল্লাহর কসম, আপনি যথার্থই বলেছেন।”

আদি ﷺ বলেন, “এতক্ষণে আমার বুঝতে বাকি থাকল না যে, তিনি একজন প্রেরিত নবি। যা বলা হয় না, তাও তিনি জানেন।

আমি তাঁর পাশেই ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে ক্ষুধার অভিযোগ করল। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে ডাকাতির আক্রমণের অভিযোগ করল।

১০৫৮. খ্রিষ্টান ও সাবিরি ধর্মের মাঝামাঝি একটি ধর্মের অনুসারী সম্প্রদায়বিশেষ।

এরপর রাসুল ﷺ আমাকে বললেন, “হে আদি, এই দ্বীন গ্রহণে হয়তো-বা তোমাকে এই জিনিস বাধা দিয়ে থাকবে যে, তুমি তাদের অভাব-অভিযোগে পীড়িত দেখছ। কিন্তু আল্লাহর কসম, সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন তাদের চারদিক থেকে ধন-দৌলত উপচে পড়বে, নেওয়ার মতো কোনো লোক পাওয়া যাবে না। হয়তো-বা তাদের শত্রুর সংখ্যাধিক্য এবং তাদের নিজেদের সামরিক শক্তির অপ্রতুলতা তোমাকে এ দ্বীন গ্রহণে বাধা দিয়ে থাকবে। কিন্তু আল্লাহর কসম, সেদিন দূরে নয়, যখন তুমি শুনতে পাবে, এক-একজন স্ত্রীলোক সেই সুদূর কাদিসিয়া থেকে উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে এই বাইতুল্লাহ-য় এসে জিয়ারত করবে। রাস্তাঘাটে সে কোনো কিছুর ভয় করবে না।”

আমি মনে মনে বললাম, “তাহলে তাই গোত্রের লম্পটরা তখন কোথায় যাবে, যারা লাম্পটের জন্য নিজেদের দেশের মূল্য লাগাতেও দ্বিধা করে না?”

তিনি আরও বললেন, “হয়তো-বা এই জিনিস তোমাকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিয়ে থাকবে যে, তুমি দেখছ, রাজত্ব ও বাদশাহি অন্যদের মাঝে। কিন্তু আল্লাহর শপথ, সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন শুনতে পাবে, ব্যাবিলনের শ্বেত প্রাসাদগুলো মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়ে গিয়েছে।”

আদি ﷺ বলেন, “এ কথার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমি রাসুল ﷺ-এর চেহারা মুবারকে আনন্দের ঝিলিক দেখতে পেলাম।” অন্য রিওয়াযাতে এসেছে, “তখন তাঁর চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল।”

আদি ﷺ বলেন, “দুটি তো হয়ে গেছে। তবে আল্লাহর কসম, সেটিও অবশ্যই হবে। আমি দেখেছি, ব্যাবিলনের শ্বেত ভবনগুলো বিজিত হয়েছে। দেখেছি, কাদিসিয়া হতে একজন নারী তার উটের ওপর সাওয়ার হয়ে নির্ভয়ে পথ চলতে থাকে এবং বাইতুল্লাহর হজ করে যায়। আর আল্লাহর কসম, তৃতীয়টিও অবশ্যই একদিন ঘটবে। অর্থ-সম্পদের এমন ঢল নামবে যে, তা গ্রহণ করার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না।”^{১০৫৯}

তাদের প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব প্রদর্শন করতেন

মিসওয়্যার বিন মাখরামাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘তার পিতা মাখরামাহ তাকে বললেন, “বৎস, আমার কাছে খবর এসেছে যে, নবিজি সঃ-এর নিকট কিছু কাবা^{১০৬০} জামা এসেছে। তিনি সেগুলো বণ্টন করছেন। চলো আমরা তাঁর কাছে যাই। আমরা গেলাম এবং নবিজি সঃ-কে তাঁর বাসগৃহে পেলাম। আমাকে (আমার পিতা) বললেন, “বৎস, নবিজি সঃ-কে আমার কাছে ডাকো।” আমার নিকট কাজটি অতি কঠিন বলে মনে হলো।

তাই আমি বললাম, “আপনার কাছে রাসুল সঃ-কে ডাকব?” তিনি বললেন, “বৎস, তিনি তো কঠোর স্বভাবের লোক নন (তাঁকে ডাকলে রাগ করবেন না)।”

যাহোক, আমি তাঁকে ডাকলাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁর গায়ে তখন স্বর্ণের বোতাম লাগানো মিহি রেশমি কাপড়ের কাবা পরিহিত ছিল। তিনি বললেন :

يَا مَخْرَمَةُ، هَذَا خَبَأْنَا لَكَ

“হে মাখরামাহ, এটা আমি তোমার জন্য সংরক্ষণ করেছিলাম।”

এরপর তিনি সেটা তাকে দিয়ে দিলেন।^{১০৬১}

‘তাঁর গায়ে তখন স্বর্ণের বোতাম লাগানো মিহি রেশমি কাপড়ের কাবা পরিহিত ছিল’—এখান থেকে বোঝা যায়, রাসুল সঃ রেশমের কাপড় পরিধান করেছেন। এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন, এটা রেশমি কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ হওয়ার আগের ঘটনা। অথবা বলা যায় যে, তিনি কাপড়টি পরিধান করেননি; বরং কাঁধের ওপর রেখেছিলেন, যেন মাখরামাহ তা ভালোভাবে দেখতে পান।

আমি (ইবনে হাজার আসকালানি রাঃ) বলি, ‘নির্দিষ্ট করে কাঁধের ওপরেই ছিল বলার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং হাতের ওপর বিছানো থাকাটাও সম্ভব। আর হাদিসে (তাঁর গায়ের ওপর) বলতে তাঁর গায়ের কোনো এক

১০৬০. আলখাল্লা-জাতীয় পোশাক।

১০৬১. সহিহুল বুখারি : ৩৮৬৫, সহিহ মুসলিম : ১০৫৮।

অঙ্গের ওপর বলা উদ্দেশ্য। হাতিম রাঃ-এর রিওয়াযাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে বর্ণিত হয়েছে, “তিনি একটি কাবা নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং মাখরামাকে তার সৌন্দর্য দেখালেন।”^{১০৬২}

তিনি মাখরামাহকে বললেন, ‘এটা তোমার জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি।’ এই কথা বলে তিনি মাখরামাহর প্রতি হৃদ্যতা প্রকাশ করেছেন।^{১০৬৩}

ইবনে বাত্তাল রাঃ বলেন, ‘আচার-আচরণে ভদ্রতা, কথাবার্তায় নম্রতা এবং কথা বলার সময় কঠোরতা পরিহার করা মুমিনের আখলাক। এর মাধ্যমে আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা তৈরি হয় এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ বিলুপ্ত হয়।’^{১০৬৪}

এই হাদিসে সাহাবিদের সাথে রাসুল সঃ-এর নম্রতা ও সুন্দর ব্যবহারের চিত্র ফুটে উঠেছে।^{১০৬৫}

মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনতেন

মুহাম্মাদ বিন কাব আল-কুরাজি রাঃ বলেন, ‘আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরাইশের অন্যতম নেতা উতবা বিন রাবিআ একদিন কুরাইশের একটি সভায় বলল—তখন রাসুল সঃ মসজিদে একাকী নামাজ পড়ছিলেন—“হে কুরাইশের লোকজন, আমি কি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে তার সাথে কথা বলব এবং তার সামনে কিছু বিষয় পেশ করব, যার কিছু বিষয় সে গ্রহণও করতে পারে, বিনিময়ে আমরা তাকে সে যা চায়, তা-ই দেবো আর সে আমাদের পিছু ছেড়ে দেবে?”

এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল হামজা রাঃ-এর ইসলাম গ্রহণের পরে। মুহাম্মাদ সঃ-এর অনুসারী দিনদিন বৃদ্ধি পেতে দেখে তারা এ সভার আয়োজন করেছিল।

তারা বলল, “হে আবুল ওয়ালিদ, আপনি তা-ই করুন। তার কাছে গিয়ে তার সাথে কথা বলুন।”

১০৬২. ফাতহুল বারি : ১০/২৭০।

১০৬৩. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৭/১৪৮।

১০৬৪. শারহু সহিহিল বুখারি লি-ইবনি বাত্তাল : ৯/৩০৫।

১০৬৫. ফাতহুল বারি : ১০/৩১৫।

তখন উতবা গিয়ে রাসুল ﷺ-এর পাশে বসল। তারপর বলল, “ভাতিজা, তুমি আমাদেরই বংশের লোক। আর তুমি জানো যে, বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের মর্যাদা অনেক ওপরে। কিন্তু তুমি তোমারই কণ্ঠের সামনে এমন এক বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছ, যার মাধ্যমে তুমি তাদের একতাকে বিনষ্ট করে দিচ্ছ, বুদ্ধিমানদের নির্বোধ সাব্যস্ত করছ, তাদের প্রভুদের প্রতি দোষারোপ করছ এবং পূর্বপুরুষদের দ্বীনের ওপর যারা আছে, তাদের কাফির বলছ।

তাই আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি তোমার সামনে কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করছি, সেগুলো নিয়ে তুমি ভেবে দেখো। সম্ভবত কোনো বিষয় তুমি গ্রহণও করতে পারো।”

রাসুল ﷺ বললেন, “বলুন, হে আবুল ওয়ালিদ, আমি শুনব।”

বলল, “ভাতিজা, যে বিষয় নিয়ে তুমি এসেছ, তার মাধ্যমে যদি সম্পদ অর্জন করা তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা তোমাকে এত অধিক সম্পদ দেবো যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে ধনী হয়ে উঠবে।

আর যদি নেতৃত্ব লাভ করা তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমাকে আমরা আমাদের নেতা মেনে নেব। তুমি ছাড়া আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেব না। আর যদি এর মাধ্যমে তুমি রাজত্ব অর্জন করতে চাও, তবে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানাব। আর যদি কোনো অসুস্থতাবশত এমন করে থাকো, যার থেকে তোমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুক্তি লাভ করতে পারছ না, তবে আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তোমার চিকিৎসার পেছনে যত টাকা লাগে খরচ করব, তবু তোমাকে ভালো করে ছাড়ব। কারণ, অনেক সময় অশরীরী প্রেতাত্মা মানুষের ওপর ভর করে থাকে, যতক্ষণ না তার চিকিৎসা করা হয়।”

রাসুল ﷺ উতবার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তার কথা শেষ হলে রাসুল ﷺ বললেন, “আপনার কথা কি শেষ হয়েছে, হে আবুল ওয়ালিদ?”

সে বলল, “হ্যাঁ।” তিনি বললেন, “এবার তাহলে আমার কথা শোনো।” সে বলল, “হ্যাঁ, তা-ই করব।” তখন রাসুল ﷺ তিলাওয়াত করলেন :

حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ

“হা-মীম। এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবি কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শোনে না। তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদের দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। বলুন, আমিও তোমাদের মতোই মানুষ, আমার প্রতি ওহি আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ, অতএব তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।” ১০৬৬

এভাবে রাসুল ﷺ একনাগাড়ে তিলাওয়াত করতে থাকলেন আর উতবা তার হাতদুটো পেছনে রেখে সেগুলোর ওপর ভর দিয়ে তন্ময় হয়ে তা গুনতে লাগল।

পড়তে পড়তে রাসুল ﷺ এই সুরার আয়াতে সিজদা পর্যন্ত পৌঁছালেন, ফলে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

তখন উতবা তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করছিল, “আল্লাহর কসম, আবুল ওয়ালিদ যে আশা নিয়ে গিয়েছিল, সে আশা পূরণ হয়নি।”

যখন তাদের কাছে এসে বসল, তখন তারা বলল, “কী হলো, হে আবুল ওয়ালিদ?”

সে বলল, “হলো এই যে, আল্লাহর কসম, আমি তার কাছে এমন কথা শুনেছি, যার মতো কোনো কথা জীবনেও শুনিনি। আল্লাহর কসম, ওই কথা কোনো কবিতা নয়, না কোনো জাদু, না কোনো মন্ত্র। তাই হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমার কথা মেনে নাও এবং এই লোক ও তার মতবাদের পেছনে পড়া বাদ দাও। আল্লাহর কসম, তার যে কথা আমি শুনেছি, তাতে বড় সংবাদ রয়েছে। সুতরাং আরবরা যদি তাকে পরাজিত করে, তবে তার বিরুদ্ধে ওরাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সে আরবের ওপর বিজয় লাভ করে, তবে তার রাজত্ব মানে তো তোমাদেরই রাজত্ব, তার সম্মান মানে তো তোমাদেরই সম্মান এবং তার মাধ্যমে তোমরা সৌভাগ্যবান লোক হবে।”

তারা বলল, “আল্লাহর কসম, সে কথার জাদু দিয়ে তোমাকে মোহিত করে ফেলেছে, হে আবুল ওয়ালিদ।”

উতবা বলল, “তার ব্যাপারে আমার রায় শুনিয়ে দিলাম। এবার তোমরা তোমাদের মনে যা আসে, তা-ই করো।”^{১০৬৭}

আনাস বিন মালিক ؓ বলেন, ‘একবার আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি উটের ওপর সওয়ার হয়ে সেখানে প্রবেশ করলেন। মসজিদে (প্রাঙ্গণে) তিনি তার উটটি বসিয়ে বেঁধে রাখলেন। এরপর সাহাবিদের লক্ষ্য করে বললেন, “তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে?” রাসূল ﷺ তখন তার সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললাম, “এই হেলান দিয়ে বসা ফরসা রঙের ব্যক্তিই হলেন তিনি।”

তারপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, “হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র!”

নবিজি ﷺ বললেন, “আমি তোমার জবাব দিচ্ছি।”

লোকটি বললেন, “আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি রাগ করবেন না।”

তিনি বললেন, “তোমার যেমন ইচ্ছা প্রশ্ন করো।”

লোকটি বললেন, “আমি আপনাকে আপনার রব ও আপনার পূর্ববর্তীদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহই কি আপনাকে সকল মানুষের রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন?”

তিনি বললেন, “আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।”

লোকটি বললেন, “আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন?”

তিনি বললেন, “আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।”

লোকটি বললেন, “আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমাজান) সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন?”

তিনি বললেন, “আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।”

লোকটি বললেন, “আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে সাদাকা (জাকাত) উসুল করে গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দিতে?”

নবিজি ﷺ বললেন, “আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।”

এরপর লোকটি বললেন, “আমি ইমান আনলাম আপনি যা (যে শরিয়ত) এনেছেন, তার ওপর। আর আমি আমার কওমের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি। আমার নাম দিমাম বিন সা'লাবা। আমি বনু সাদ বিন বকরের একজন সদস্য।”^{১০৬৮}

তাদের অজুহাত মেনে নিতেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের অজুহাত মেনে নিতেন এবং তাদের পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টের ওপর সবার করতেন। এমনকি তাদের দোষ ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতি লোকদের উদ্বুদ্ধ করতেন।

রাসুল ﷺ সম্ভ্রান্ত ও গুণসম্পন্ন মুসলমানদের ভুলভ্রান্তি ও স্থলন ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ, কথিত আছে, ‘দ্রুতগামী ঘোড়াও কখনো মুখ খুবড়ে পড়ে, প্রাজ্ঞ আলিমেরও কখনো ভুল হয়ে যায় এবং অপরাজেয় বীরও কখনো ধরাশয়ী হয়।’ কবি বলেছেন :

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها *** كفى المرء نبلا أن تعد معايبه

‘এমন কোনো মানুষ নেই, যার প্রতিটি স্বভাব ও প্রতিটি কাজ মানুষের পছন্দনীয়। আর মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, মানুষ তার দোষত্রুটি গণনা করা শুরু করবে।’

সারকথা হলো, সম্ভ্রান্ত ও গুণসম্পন্ন মানুষের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া রাসুল ﷺ-এর নির্দেশিত তরিকা। আয়িশা রাদিআল্লাহু আঁহা থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

“সম্ভ্রান্ত ও গুণসম্পন্ন লোকদের ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দাও। তবে হুদুদ (আল্লাহপ্রদত্ত শাস্তিবিধান)-এর ক্ষেত্রে ক্ষমা করা যাবে না।”^{১০৬৯}

‘সম্ভ্রান্ত ও গুণসম্পন্ন মানুষ’—অর্থাৎ উন্নত ব্যক্তিত্ব ও প্রশংসিত গুণসম্পন্ন মানুষ। ইবনে মালিক বলেন, ‘হাইআহ’ বা গুণ হলো, উন্নত চরিত্র—যা মানুষের মাঝে থাকে।

‘ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি’—অর্থাৎ পদস্থলন। ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি মানে এমন অপরাধ, যার কারণে দণ্ড ওয়াজিব হয়। তবে হুদ ওয়াজিব হয় না।

‘তবে হুদুদ ক্ষমা করা যাবে না’—অর্থাৎ যে অপরাধের কারণে হুদ (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) ওয়াজিব, তা ক্ষমা করা যাবে না।

ইবনুল কাইয়িম রহিমেল্লাহু আঁহি বলেন, ‘নেতৃত্ব, পদমর্যাদা ও ভদ্রতার কারণে যারা সম্ভ্রান্ত মানুষ হিসেবে স্বীকৃত, আল্লাহ তাআলা তাদের বিশেষ মর্যাদা দানে ভূষিত

করেছেন। তাই শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়ে তাদের থেকে কোনো লঘু অপরাধ প্রকাশ পেলে তার শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। তবে তারা যদি এমন কোনো গুরুতর অপরাধ করে ফেলে, যার কারণে হৃদ ওয়াজিব হয়, তখন ক্ষমা করা যাবে না। কেননা, হৃদের ক্ষেত্রে সবাই সমান।”^{১০৭০}

হাদিসের সারমর্ম হলো, সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান লোকদের থেকে কোনো লঘু অপরাধ প্রকাশ পেলে তা ক্ষমা করে দেওয়া মুসতাহাব। তবে তারা যদি এমন কোনো অপরাধ করে, যা হৃদ ওয়াজিব করে, আর তা বিচারকের দরবারে উত্থাপিত হয়, তখন তা কার্যকর করা ওয়াজিব।^{১০৭১}

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘সাদ বিন উবাদাহ রাঃ রাসুল সাঃ-কে বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী যে, কোনো মানুষ যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর কোনো পুরুষকে দেখতে পায়, তখন সে কি ওই পুরুষকে হত্যা করে ফেলবে?”

রাসুল সাঃ বললেন, “না।”

সাদ রাঃ বললেন, “সেই সত্তার শপথ—যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে সম্মানিত করেছেন, নিশ্চয় সে তাকে কতল করবে।

তখন রাসুল সাঃ বললেন :

اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ

“তোমাদের সর্দার কী বলছেন, শোনো।”^{১০৭২}

সহিহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, ‘সাদ বিন উবাদাহ রাঃ বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, যদি আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোনো পুরুষকে দেখতে পাই, তবে চারজন সাক্ষী হাজির না করা পর্যন্ত আমি কি তাকে স্পর্শ করব না?”

রাসুল সাঃ বললেন, “হ্যাঁ।”

১০৭০. বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ : ৩/৬৬১।

১০৭১. ফাতাওয়া আল-লাজনা তুত দায়িমাহ : ২২/৫৬।

১০৭২. সহিহুল বুখারি : ১৪/৯৪।

তিনি (সাদ) বললেন, “কখনো নয়, সেই মহান সত্তার কসম—যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, অবশ্যই আমি তার (চারজন সাক্ষী হাজির করার) আগেই দ্রুত তার প্রতি তলোয়ার ব্যবহার করব।’

তখন রাসুল ﷺ বললেন :

اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَعْيَزُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَزُ مِنِّي

“তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো, তোমাদের সরদার কী বলছেন। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় আত্মমর্যাদার অধিকারী। আর আমি তার চাইতেও অধিকতর আত্মমর্যাদাশীল এবং আল্লাহ আমার চাইতেও অধিক আত্মমর্যাদাবান।”

মোল্লা আলি কারি ﷺ বলেন, ‘এই হাদিসে রাসুল ﷺ কর্তৃক সাদ ﷺ-এর অজুহাত কবুল করার কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি যে (আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর কথার ওপর) কথা বলেছেন, তা তার আত্মমর্যাদাবোধের কারণে বলেছেন।’^{১০৭৩}

‘আমি তার আগেই দ্রুত তার প্রতি তলোয়ার ব্যবহার করব’—মাওয়ারদি ﷺ-সহ আরও অনেক আলিম বলেন, ‘এই বাক্য বলে তিনি রাসুল ﷺ-এর কথাকে প্রত্যাখ্যান বা তাঁর বিরোধিতা করেননি। বরং তিনি এমন অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও মাত্রাতিরিক্ত রাগের কথা ব্যক্ত করেছেন। কারণ, মানুষ তখন বৈধ-অবৈধ বাহ্যবিচার না করে তলোয়ার চালিয়ে দেওয়ার মানসিকতায় চলে আসে।’^{১০৭৪}

আবু দারদা ﷺ বলেন, ‘আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ-এর মাঝে কোনো বিষয়ে বাকবিতণ্ডা হলো। আবু বকর ﷺ উমর ﷺ-কে রাগিয়ে দিলেন। তখন উমর ﷺ রাগান্বিত হয়ে তার কাছ থেকে উঠে গেলেন। আবু বকর ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে তার পিছু নিলেন। কিন্তু উমর ﷺ ক্ষমা তো করেননি, উল্টো তার মুখের ওপর দরোজা বন্ধ করে দিলেন।’

১০৭৩. মিরকাতুল মাফাতিহ : ৫/২১৬।

১০৭৪. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১০/১৩১।

আবু দারদা ؓ বলেন, ‘আমি নবিজি ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবু বকর ؓ পরনের কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে আসলেন যে, তার উভয় হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নবিজি ﷺ বললেন, “তোমাদের এ সাথি এই মাত্র কারও সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে।” তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আমার ও উমর বিন খাত্তাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। আমিই প্রথমে কটু কথা বলেছি। অতঃপর আমি লজ্জিত হয়ে তার কাছে মাফ চেয়েছি। কিন্তু তিনি মাফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার নিকট হাজির হয়েছি।” নবিজি ﷺ বললেন :

يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثًا

“আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন, হে আবু বকর!” এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন।’^{১০৭৫}

তাদের সম্মান করতেন এবং সম্মান করার নির্দেশ দিতেন

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ؓ বলেন, ‘জারির বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালি ؓ (তিনি তার কওমের নেতা ছিলেন) রাসুল ﷺ-এর কাছে এলেন। তখন রাসুল ﷺ-এর পাশে তাঁর সাহাবিগণ বসা ছিলেন। তিনি প্রবেশ করার পর উপস্থিত সাহাবিগণ নিজ নিজ আসনে বসে থাকলেন, কেউই তার জন্য বসার জায়গা করে দেননি। তখন রাসুল ﷺ নিজের চাদর খুলে তার দিকে ছুড়ে মারলেন এবং বললেন, “এর ওপর বসো।”

জারির ؓ চাদরটিকে নিজের গলা ও মুখের ওপর বোলালেন, চুম্বন করলেন এবং চোখের ওপর রাখলেন। তারপর বললেন, “আপনি যেভাবে আমাকে সম্মানিত করেছেন, সেভাবে আল্লাহ তাআলা আপনাকে সম্মানিত করুন।” অতঃপর সেটা রাসুল ﷺ-এর পিঠের ওপর রাখলেন।

তখন রাসুল ﷺ বললেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا أَتَاهُ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَلْيُكْرِمْهُ

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের (কিয়ামতের) ওপর ইমান রাখে, সে যেন তার নিকট কোনো কওমের সম্মানিতজন আসলে তার প্রতি সম্মান দেখায়।”^{১০৭৬}

ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ

‘যখন তোমাদের নিকট কোনো সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি আগমন করবে, তখন তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।’^{১০৭৭}

তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করতেন

তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য এবং তাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার অগ্রহে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। এমনকি তারা বন্দী হয়ে তাঁর কাছে আসলেও।

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ‘রাসুল সঃ নজদ অভিযুগে একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করলেন। তারা সেখান থেকে বনু হানিফার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আনলেন। তারা তার পরিচয় জানতে পারেননি, যতক্ষণ না তাকে রাসুল সঃ-এর নিকট আনা হলো। তাকে দেখেই রাসুল সঃ বললেন, “তোমরা কি জানো, কাকে ধরে এনেছ তোমরা? এ হচ্ছে সুমামা বিন উসাল আল-হানাফি। এ ইয়ামামাবাসীদের সর্দার। তার প্রতি ভালো আচরণ করো।” অতঃপর তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হলো। তারপর তিনি নিজ পরিবারবর্গের কাছে চলে গেলেন। তাদের বললেন, “তোমাদের কাছে যা খানাদানা আছে, তা একত্র করো এবং সুমামার কাছে পাঠিয়ে দাও।” সেই সাথে নির্দেশ দিলেন দুধের উটনি যেন সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দুধ দোহনের পর যেন তাকে দেওয়া হয়। এরপর তিনি সব সময় তার খোঁজখবর নিতেন।

১০৭৬. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৭৯১।

১০৭৭. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৭১২।

তারপর রাসুল ﷺ তার নিকট এসে বললেন, “ওহে সুমামা, তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?”

তিনি উত্তর দিলেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, আমার কাছে তো ভালোই মনে হচ্ছে। (কারণ, আপনি মানুষের ওপর কখনো জুলুম করেন না; বরং অনুগ্রহই করে থাকেন)। যদি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে আপনি একজন খুনিকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ দান করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ দান করবেন। আর যদি আপনি মুক্তিপণ চান, তাহলে যে পরিমাণ ইচ্ছা দাবি করুন।”

রাসুল ﷺ তাকে সেই অবস্থার ওপর রেখে দিলেন। পরের দিন রাসুল ﷺ আবার তাকে বললেন, “ওহে সুমামা, তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে?”

তখন তিনি পূর্বের দিনের কথা পুনরাবৃত্তি করলেন। আর রাসুল ﷺ-ও তাকে বিগত দিনের মতো রেখে চলে আসলেন। পরের দিন এসে তিনি একই কথা জানতে চাইলেন এবং সুমামাও অভিন্ন উত্তর দিলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন, “তোমরা সুমামার বন্ধন খুলে দাও।”

এবার (মুক্তি পেয়ে) সুমামা মসজিদে নববির নিকটস্থ একটি খেজুরের বাগানে গেলেন এবং গোসল করলেন। এরপর ফিরে এসে মসজিদে নববিতে প্রবেশ করে বললেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। (তিনি আরও বললেন) ইয়া রাসুল্লাহ, আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে আমার কাছে জমিনের বুকে আপনার চেহারার চাইতে অধিক অপছন্দনীয় আর কোনো চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমার কাছে আপনার দ্বীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য অপর কোনো দ্বীন ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দ্বীনই আমার কাছে অধিক সমাদৃত। আল্লাহর কসম, আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে বেশি খারাপ শহর অন্য কোনোটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়।

আর আপনার অশ্বারোহী সৈন্যরা যখন আমাকে ধরে এনেছে, তখন আমি উমরার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। এখন আমার (উমরা করা না-করা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?”

তখন রাসুল ﷺ তাকে (ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বড় কল্যাণ অর্জন করার এবং সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাওয়ার) সুসংবাদ দিলেন এবং উমরা করার নির্দেশ দিলেন।

অতঃপর তিনি মক্কায় গেলে এক ব্যক্তি তাকে বলল, “তুমি কি ধর্মত্যাগী হয়ে গেছ?” তিনি বললেন, “না, কিন্তু আমি আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে মুসলমান হয়ে গেছি। আর আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ-এর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে ইয়ামামা থেকে গমের একটি দানাও আসবে না।”^{১০৭৮}

► হাদিসের ফায়দাসমূহ :

- ইসলাম গ্রহণ করার আগে গোসল করা।
- উত্তম আচরণ ঘৃণা ও শত্রুতা বিতাড়িত করে ভালোবাসা ও হৃদয়তা প্রতিষ্ঠা করে।
- কোনো কাফির যদি কাফির থাকা অবস্থায় কোনো ভালো কর্মের ইচ্ছা করে থাকে, ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামি শরিয়ত তাকে তা পালন করার নির্দেশ প্রদান করে।
- কাফির বন্দীর সাথে ভালো আচরণ করতে হবে, যদি তাতে ইসলামের কল্যাণ থাকে। বিশেষ করে এমন ব্যক্তির সাথে খুব ভালো আচরণ করতে হবে, যে ইসলাম গ্রহণ করলে তার দেখাদেখি অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে।^{১০৭৯}

ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি একজন উত্তম মুসলমান হয়ে উঠলেন। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে ইসলামের অনেক উপকার করেছেন। রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর পর ইয়ামামাবাসী মুসাইলামার হাত ধরে মুরতাদ হতে শুরু করলে তিনি এর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা দিলেন :

১০৭৮. সহিহুল বুখারি : ৪৩৭২, সহিহ মুসলিম : ১৭৬৪, সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৬৩৮।

১০৭৯. ফাতহুল বারি : ৮/৮৯।

‘হে বনি হানিফা, তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গেল?’ ... এভাবে মুসাইলামার অসারতা তুলে ধরে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য দিলেন।

তার বক্তব্য শুনে তিন হাজার মানুষ তার আনুগত্য করে পুনরায় মুসলমান হয়ে যায়। এর মাধ্যমে মুসাইলামার শক্তি অনেকাংশে কমে আসে।^{১০৮০}

তাদের দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ দিতেন

জারির  বলেন, ‘আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি, তখন থেকে রাসুল  আমাকে তাঁর কাছে প্রবেশ করতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমার চেহারার দিকে তাকাতে, তিনি মুচকি হাসতেন। আমি রাসুল -এর নিকট আমার অসুবিধার কথা জানালাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন তিনি আমার বুকে হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং এ দোয়া করলেন :

اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا

“হে আল্লাহ, তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানান।”^{১০৮১}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- কওমের যিনি সর্দার, তার জন্য আলাদা সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। যেমন : জারির  তার কওমের সর্দার ছিলেন বলে রাসুল  তাকে বিশেষ সম্মান দান করতেন।
- হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা নববি চরিত্র। তা ছাড়া এর মাধ্যমে অহমিকার অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয় এবং পারস্পরিক হৃদয়তা সৃষ্টি হয়।
- ঘোড়সওয়ারি শেখার ফজিলত এবং এটা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকের জানা আবশ্যিক।

১০৮০. আর-রাওজুল আনফ : ৪/৪১৮।

১০৮১. সহিহুল বুখারি : ৩০৩৬, সহিহ মুসলিম : ২৪৭৫।

- আলিম বা ইমাম কোনো মানুষের সাথে কথা বলার সময় বা অন্য যেকোনো সময় তার শরীরে হাত রাখতে পারবে এবং হালকা আঘাত করতে পারবে। এটা নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং অন্তরকে আকর্ষিত করে।
- রাসুল ﷺ-এর দোয়ার বরকত। কারণ, হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তার পর থেকে তিনি কখনো ঘোড়ার পিঠ থেকে পতিত হননি।^{১০৮২}

তাদের উত্তম গুণাবলির প্রশংসা করতেন

জারির রা বলেন, ‘যখন আমি মদিনার কাছাকাছি পৌঁছালাম, তখন বাহনটি বসলাম। অতঃপর সিন্দুক খুলে সেখান থেকে আমার পোশাকের সেটটি পরে নিলাম। অতঃপর রাসুল ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম।

রাসুল রা তখন ওয়াজ করছিলেন। আর লোকজন আমার প্রতি তীক্ষ্ণ নজরে দেখলে লাগল।

আমি আমার পাশে বসা লোককে বললাম, “হে আল্লাহর বান্দা, রাসুল রা কি আমাকে স্মরণ করেছেন?”

তিনি বললেন, “হাঁ, এই তো কিছুক্ষণ পূর্বেই তিনি খুব উত্তম ভাষায় আপনাকে স্মরণ করেছেন।

তিনি বলেছেন, “এই দরোজা দিয়ে অথবা এই দিক দিয়ে তোমাদের নিকট একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি প্রবেশ করবে। তার চেহারায় ফেরেশতাদের সৌন্দর্যের ঝিলিক থাকবে।”

জারির রা বলেন, ‘তখন আমি আমাকে পরীক্ষায় পতিত করার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করলাম।’^{১০৮৩}

ইবনে ইসহাক রা বর্ণনা করেন, ‘রাসুল রা-এর নিকট তাই গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল আগমন করল। তাদের সাথে তাদের সর্দার জাইদ আল-খাইলও

১০৮২. ইবনে বাত্তাল রা কৃত শারহু সহিহিল বুখারি : ৫/১৯৪।

১০৮৩. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৬৯৮।

ছিলেন। রাসুল ﷺ-এর নিকট পৌঁছানোর পর তাদের সাথে তিনি কথা বললেন এবং তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করল এবং খুব ভালো মুসলমান হয়ে গেল।

তারপর রাসুল ﷺ বললেন :

مَا ذُكِرَ لِي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ بِفَضْلٍ، ثُمَّ جَاءَنِي، إِلَّا رَأَيْتُهُ دُونَ مَا يُقَالُ فِيهِ، إِلَّا زَيْدَ الْخَيْلِ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ

“আমার কাছে আরবের যত মানুষের প্রশংসা করা হয়েছে, অতঃপর তারা আমার কাছে আগমন করেছে—তাদের প্রত্যেককে আমি তাদের প্রশংসার তুলনায় নিম্নমানের পেয়েছি। একমাত্র জাইদ আল-খাইলই তার ব্যতিক্রম। তার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তা মোটেই বাড়িয়ে বলা হয়নি।”

অতঃপর তিনি তার নাম পরিবর্তন করে “জাইদ আল-খাইর” রাখলেন এবং “ফারদা”^{১০৮৪} ও তার পশ্চাদবর্তী জমিগুলো তাকে জায়গির প্রদান করলেন এবং এ সম্পর্কে তাকে একটি দলিল লিখে দিলেন।

তারপর তিনি নিজ সম্প্রদায়ের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রাসুল ﷺ-এর নিকট থেকে বের হলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন, “জাইদ যদি মদিনার জ্বর থেকে রেহাই পেত!”

তারপর যখন তিনি “ফারদা” নামক নজদের একটি জলাশয়ের নিকট পৌঁছালেন, তখন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যু ঘনি়ে আসার উপলব্ধি হলে জাইদ বললেন :

أمرتحل قومي المشارق غدوة *** وأترك في بيت بفردة منجد
ألا رب يوم مرضت لعادني *** عوائد من لم يبر منهمن يجهد

“সকালবেলা কি আমার সঙ্গীরা পূর্বদিকে যাত্রা করবে, আর আমি পরিত্যক্ত থাকব নজদের এই ফারদায় একটি ঘরে? কত দিনই তো

আমি অসুস্থ হয়েছি, আর আমাকে দেখতে এসেছে এমন সব নারী,
দূর-দূরান্তের সফর যাদের ক্লান্ত-শ্রান্ত করতে পারত না।”^{১০৮৫}

আব্দুল কাইস গোত্রের নেতা আসাজ আব্দুল কাইসকে রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالْأُتَاةُ

‘তোমার মাঝে আল্লাহর প্রিয় দুটি গুণ আছে : বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরতা।’^{১০৮৬}

নববি ﷺ বলেন, الْحِلْمُ অর্থ বুদ্ধিমত্তা এবং الْأُتَاةُ অর্থ স্থিরতা ও তাড়াহুড়া পরিহার করা।

তার উদ্দেশ্যে রাসুল ﷺ-এর এই কথা বলার কারণ হলো, তাদের কাফেলা যখন মদিনায় এসে পৌঁছল, তখন তারা দ্রুত রাসুল ﷺ-এর কাছে যেতে চাইল। কিন্তু আসাজ তাদের বাহনগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের গতিরোধ করলেন এবং তার উষ্ট্রীকে বেঁধে রাখলেন। অতঃপর সুন্দর জামা-কাপড় পরিধান করে রাসুল ﷺ-এর সামনে গেলেন।

ফলে রাসুল ﷺ তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং নিজের পাশে বসালেন। আর বললেন :

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالْأُتَاةُ

“তোমার মাঝে আল্লাহর প্রিয় দুটি গুণ আছে : বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরতা।”^{১০৮৭}

অনেক সময় তাদের সাহায্য ও আশ্রয় গ্রহণ করতেন

তায়িফবাসী রাসুল ﷺ-এর দাওয়াত কবুল করতে এবং তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি হেরা পর্বতে চলে গেলেন। অতঃপর আখনাস বিন গুরাইকের নিকট আশ্রয় চেয়ে খবর পাঠালেন। সে বলল, ‘আমি (কুরাইশের সাথে) মৈত্রিচুক্তিতে আবদ্ধ। আর মৈত্রিচুক্তিতে আবদ্ধ লোক (মিত্র গোত্রের বিরুদ্ধে) কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না।’

১০৮৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ২/৫৭২।

১০৮৬. সহিহ মুসলিম : ১৭। আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত।

১০৮৭. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১/১৮৯।

তখন সুহাইল বিন আমরের কাছে খবর পাঠালেন। সে জানাল, ‘বনু আমির বনু কাবের বিরুদ্ধে কাউকে আশ্রয় দেয় না।’

তারপর মুতইম বিন আদির নিকট পাঠালেন। তিনি আবেদন গ্রহণ করলেন।

রাসুল ﷺ তার কাছে গেলেন এবং ওই রাত সেখানেই অবস্থান করলেন। সকালে রাসুল ﷺ বের হলেন। তার সাথে মুতইম ও তার ছয় কি সাতজন ছেলেও অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বের হলেন। তারা সবাই মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি রাসুল ﷺ-কে বললেন, ‘এদের তলোয়ারের নিরাপত্তাবেষ্টনীর মাঝে তাওয়াফ করো।’

তখন আবু সুফইয়ান এসে মুতইমকে বললেন, ‘তুমি কি তাকে আশ্রয় দিয়েছ, না তার অনুসারী হয়ে গেছ?’ তিনি বললেন, ‘না, অনুসারী হইনি, তাকে আশ্রয় দিয়েছি মাত্র।’ আবু সুফইয়ান বললেন, ‘তাহলে তুমি আমাদের লজ্জা দাওনি।’

তারপর রাসুল ﷺ-এর তাওয়াফ শেষ হওয়া পর্যন্ত আবু সুফইয়ান তার পাশে বসে থাকলেন। তাওয়াফ শেষে রাসুল ﷺ ফিরে আসলে তারাও তাঁর সাথে আসলেন। আর সুফইয়ান নিজের মজলিসের দিকে রওনা দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, ‘তার কিছুদিন পর রাসুল ﷺ-কে হিজরত করার অনুমতি দেওয়া হলো এবং তিনি মদিনায় হিজরত করলেন। তাঁর হিজরতের অল্প কদিন পর মুতইম বিন আদি ইনতিকাল করলেন। তখন হাসসান বিন সাবিত রাঃ বললেন, “আল্লাহর কসম, আমি তার জন্য শোকগাথা রচনা করব।” তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন :

فَلَوْ كَانَ مَجْدٌ يُخْلِدُ الدَّهْرَ وَاحِدًا
مِنْ النَّاسِ، أَبْقَى مَجْدُهُ الْيَوْمَ مُطْعِمًا
أَجَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا
عَبِيدَكَ مَا لَبَّى مُهْلٌ وَأَحْرَمًا
فَلَوْ سُئِلْتُ عَنْهُ مَعَدٌّ بِأَسْرِهَا

وَقَحْطَانُ أَوْ بَاقِي بَقِيَّةِ جُرْهُمَا

لَقَالُوا هُوَ الْمُؤَفِّي بِخُفْرَةِ جَارِهِ

وَذِمَّتِهِ يَوْمًا إِذَا مَا تَذَمَّمَا

فَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيرَةُ فَوْقَهُمْ

عَلَى مِثْلِهِ فِيهِمْ أَعَزَّ وَأَعْظَمَا

“প্রতিপত্তির যদি ক্ষমতা থাকত, কোনো মানুষকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখার, তা হলে মুতইমকে তার প্রতিপত্তি আজও বাঁচিয়ে রাখত। যদি তার সম্পর্কে বনু মাআদ, বনু কাহতান এবং বনু জুরহুমেব অবশিষ্ট লোকদের জিজ্ঞেস করা হয়, তবে তারা একযোগে বলবে, “তিনি তার আশ্রিতকে দেওয়া অঙ্গীকার পূরণ করতেন এবং আদায় করতেন আপন জিম্মাদারি, যখন তা আদায়ের সময় আসত।” সুতরাং তাদের ওপর তার মতো উজ্জ্বল সূর্য আর উদিত হবে না, যা তার মতো অধিক সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন।”^{১০৮৮}

এ জন্যই রাসুল ﷺ বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে আলোচনা করার সময় বলেছেন :

لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ

‘আজ যদি মুতইম বিন আদি জীবিত থাকতেন এবং এই ঘৃণ্য লোকদের (মুক্তির) ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতেন, তাহলে তার সম্মানার্থে আমি এদের মুক্ত করে দিতাম।’^{১০৮৯}

তাদের খানার দাওয়াত কবুল করতেন

আনাস বিন মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল ﷺ সাদ বিন উবাদা ؓ-এর কাছে গেলেন। তখন তিনি রুটি ও তেল আনলেন আর রাসুল ﷺ তা আহার

১০৮৮. সিরাতু ইবনি হিশাম

১০৮৯. সহিহুল বুখারি : ৩১৩৯।

করলেন। অতঃপর বললেন :

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأُبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

“রোজাদাররা তোমাদের কাছে এসে ইফতার করুক, সৎকর্মশীল লোকেরা তোমাদের খাবার আহার করুক, আর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন।”^{১০৯০}

এটি বাহ্যত ‘জুমলায়ে খাবারিয়াহ’ বা বিবৃতিমূলক বাক্য হলেও আসলে এটি একটি ‘জুমলায়ে দুআয়িয়াহ’ বা প্রার্থনামূলক বাক্য। তাই রোজাদার যখন অন্য কারও নিকট ইফতার করবে, তখন তার জন্য এই দোয়াটি পড়া মুসতাহাব।^{১০৯১}

তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের বাড়িতে খানা খেতেন

কাইস বিন সাদ ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ আমাদের দেখতে আমাদের বাড়িতে আসলেন। এসেই তিনি বললেন, “আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।”

সাদ ؓ নিম্নস্বরে তার জবাব দিলেন (এমনভাবে জবাব দিলেন, যেন রাসুল ﷺ শুনতে না পান)।

কাইস ؓ বলেন, আমি বললাম, “আপনি কি রাসুল ﷺ-কে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন না?”

তিনি বললেন, “দাঁড়াও, তিনি আমাদের আরও সালাম করুক।”

রাসুল ﷺ আবার সালাম দিলেন। এবারেও সাদ ؓ নিম্নস্বরে উত্তর দিলেন। রাসুল ﷺ আরেকবার সালাম দিলেন এবং সাড়া না পেয়ে ফিরে যেতে লাগলেন। তখন সাদ ؓ তাঁর পিছে পিছে গিয়ে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ,

১০৯০. সুনানু আবি দাউদ : ৩৮৫৪।

১০৯১. ফাইজুল কাদির : ২/৫৪।

আমি আপনার সালাম শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু জবাব নিম্নস্বরে দিচ্ছিলাম, যেন আপনি আমাদের অধিকবার সালাম করেন।”

তারপর রাসুল ﷺ তার সাথে আসলেন। সাদ ﷺ তাঁর জন্য সাবানজাতীয় বস্ত্র আনতে বললেন এবং তা দিয়ে রাসুল ﷺ গোসল করলেন। অতঃপর জাফরান বা ওয়ারাস-এর রঙে রঙিন একটি বড় চাদর এনে তাঁকে দিলেন আর তিনি সেটি গায়ে জড়িয়ে নিলেন।

তখন রাসুল ﷺ হাত তুলে দোয়া করলেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ

“হে আল্লাহ, আপনার রহমত ও করুণা সাদ বিন উবাদার পরিবারের প্রতি বর্ষণ করুন।”

অতঃপর খাবার খেলেন। তারপর চলে আসতে উদ্যত হলে সাদ ﷺ মখমলের কাপড় পরিহিত একটি গাধা নিয়ে আসলেন। রাসুল ﷺ তার ওপর সওয়ার হলেন। সাদ ﷺ বললেন, “হে কাইস, রাসুল ﷺ-এর সাথে সওয়ার হও!” রাসুল ﷺ-ও বললেন, “হাঁ, সওয়ার হও!” আমি তাঁর সাথে সওয়ার হতে অস্বীকৃতি জানালাম। অতঃপর রাসুল ﷺ বললেন, “হয় সওয়ার হও, না হয় ফিরে যাও।”

কাইস ﷺ বলেন, ‘তখন আমি সেখান থেকে চলে আসলাম।’^{১০৯২}

তাদের সাথে রসিকতা করতেন

উসাই বিন খুদাইর ﷺ (তিনি বুদ্ধিমান ও রায় প্রদানে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং আকাবার রাতে বাইআত হওয়া বারোজন সাহাবির একজন ছিলেন) থেকে বর্ণিত, ‘একবার তিনি লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন এবং মাঝেমধ্যে রসিকতা করে লোকদের হাসাচ্ছিলেন। তখন নবিজি ﷺ একটি কাঠের টুকরা দিয়ে তার পেটে খোঁচা দিলেন। উসাইদ ﷺ বললেন, “আপনি আমাকে এর

বদলা নিতে দিন।” রাসূল ﷺ বললেন, “আমার থেকে বদলা নাও।” উসাইদ
ﷺ বললেন, “আপনার গায়ে তো জামা আছে, অথচ আমার গায়ে জামা ছিল
না।” নবিজি ﷺ তাঁর গায়ের জামা খুলে দিলেন। তখন উসাইদ ﷺ রাসূল
ﷺ-কে জড়িয়ে ধরে তাঁর এক পাশে চুম্বন করতে লাগলেন, আর বললেন,
“আমার এটাই ইচ্ছা ছিল হে আল্লাহর রাসূল।”^{১০৯৩}

তাদের সম্ভ্রষ্ট রাখার প্রতি গুরুত্ব দিতেন

আয়িশা ﷺ বলেন, ‘আওসের নেতা সাদ বিন মুআজ ﷺ খন্দকের যুদ্ধে
হাব্বান বিন আরকা নামক এক কুরাইশ ব্যক্তির ছোড়া তিরে আঘাতপ্রাপ্ত
হলেন। তখন রাসূল ﷺ তার জন্য মসজিদ অভ্যন্তরে একটি তাঁবু দিয়ে একটি
কক্ষ তৈরি করলেন, যেন তিনি কাছ থেকে তার দেখাশোনা ও সেবা-শুশ্রূষা
করতে পারেন।’^{১০৯৪}

আবু বকর বিন আরবি ﷺ বলেন, ‘এক রোগীকে কয়েকবার দেখতে যাওয়া
সুন্নাত। কারণ, রাসূল ﷺ সাদ বিন মুআজ ﷺ-এর জন্য মসজিদে একটি কক্ষ
তৈরি করে প্রতিদিন তার দেখাশোনা করতেন।’^{১০৯৫}

শুধু তা-ই নয়, তিনি তার চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছিলেন। যেমন জাবির বিন
আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘সাদ বিন মুআজ ﷺ আহজাব যুদ্ধের দিন তিরবিদ্ধ হয়ে
আহত হলেন। তার বাহুর মাঝখানের রগ কেটে গেল। তার ক্ষতস্থানে রাসূল
ﷺ আগুনের সৈঁক দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করলেন। তারপর তার হাত ফুলে
গেল। আগুনের সৈঁক দেওয়া বন্ধ করলে আবার রক্তক্ষরণ হতে শুরু করল।
আবার তিনি তার ক্ষতস্থানে আগুনের সৈঁক দিলেন। তার হাত পুনরায় ফুলে
উঠল। তিনি (সাদ) নিজের এ অবস্থা দেখে বললেন, “হে আল্লাহ, আমার
জীবন কেড়ে নেবেন না, যতক্ষণ না বনু কুরাইজার চরম পরিণতি দেখে
আমার চোখ জুড়াতে পারি।”

১০৯৩. সুনানু আবি দাউদ : ৫২২৪।

১০৯৪. সহিহুল বুখারি : ৪৬৩, সহিহ মুসলিম : ১৭৬৯।

১০৯৫. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৪/৩৮।

তার জখম হতে সাথে সাথে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। এরপর আর একটি ফোঁটাও বের হয়নি।

এরপর বনু কুরাইজা সাদ বিন মুআজ রাঃ-কে সালিশ মানতে রাজি হলো। রাসুল সঃ তার নিকট সমাধান চেয়ে লোক পাঠালেন। তিনি সমাধান দিলেন যে, বনু কুরাইজার পুরুষদের মেরে ফেলা হবে এবং মহিলাদের বাঁচিয়ে রাখা হবে। মুসলমানগণ তাদের দ্বারা বিভিন্ন রকম কাজ আদায় করতে পারবে। রাসুল সঃ বললেন, “তাদের ব্যাপারে তোমার মত আল্লাহ তাআলার মতের অনুরূপ হয়েছে।” তাদের পুরুষের সংখ্যা ছিল চারশ। সাহাবিরা তাদের মেরে ফেলার পর তার ক্ষতস্থান হতে আবার রক্ত পড়া আরম্ভ হলো এবং তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।^{১০৯৬}

খাজরাজের সর্দার সাদ বিন উবাদা রাঃ-এর সাথেও অনুরূপ আচরণ করেছিলেন আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘আমরা রাসুল সঃ-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় জনৈক আনসারি রাসুল সঃ-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলেন। তখন রাসুল সঃ বললেন, “হে আনসারি ভাই, আমার ভাই সাদ বিন উবাদা কেমন আছে?” তিনি উত্তর দিলেন, “ভালো।” রাসুল সঃ বললেন, “তোমাদের কে কে তাকে দেখতে যাবে?” এ বলে তিনি দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়িলাম। সংখ্যায় আমরা দশজনের বেশি ছিলাম। আমাদের কারও পায়ে জুতো, মোজা, মাথায় টুপি এবং গায়ে জামা ছিল না। সে অবস্থায়ই খড়খড়ে রাস্তা দিয়ে চললাম এবং তার কাছে গিয়ে পৌঁছালাম। আমাদের দেখে তার গোত্রের লোকজন তার কাছ থেকে সরে গেলেন এবং রাসুল সঃ ও তাঁর সাহাবিগণ তার পাশে দাঁড়ালেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “এ কি মারা গেছে?” লোকজন জানাল, “না, ইয়া রাসুলান্নাহ।”

তখন তিনি কেঁদে দিলেন, রাসুল সঃ-কে কাঁদতে দেখে উপস্থিত লোকেরাও কাঁদতে শুরু করলেন।

তখন তিনি বললেন :

أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ
يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ
أَهْلِهِ عَلَيْهِ

“শুনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা চোখের পানি ও অন্তরের
ব্যথার কারণে আজাব দেবেন না। তিনি আজাব দেবেন অথবা রহম
করবেন এর কারণে (এই বলে তিনি জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন)।
আর নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির জন্য পরিবার-পরিজনের বিলাপের কারণে
তাকে আজাব দেওয়া হয়।”^{১০৯৭}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- রোগীর অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া।
- রোগীকে দেখতে যাওয়া মুসতাহাব।
- উচ্চস্তরের লোক তার চেয়ে নিম্নস্তরের লোককে রোগশয্যায় দেখতে
যাওয়া।
- ইমাম, কাজি ও আলিম তার অনুসারীদের দেখতে যাওয়া।
- ইমাম ও আলিম তার অনুচরদের নিয়ে রোগীকে দেখতে যাওয়া।
- সাহাবায়ে কিরাম দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। দুনিয়াবি সাজসজ্জা ও অতি উন্নত
পোশাক-আশাক পরিধান করা থেকে তাঁরা বিরত থাকতেন।
- নগ্ন পায়ে হাঁটা বৈধ।

তাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন

বদর যুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ নেতৃস্থানীয় আনসারি সাহাবিদের কাছে
পরামর্শ চেয়েছিলেন।

আনাস বিন মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল ﷺ-এর নিকট যখন আবু সুফইয়ানের প্রত্যাবর্তনের খবর আসলো, তখন তিনি পরামর্শ তলব করলেন। প্রথমে আবু বকর ؓ কথা বললেন, কিন্তু তিনি তার কথার কোনো উত্তর দেননি। অতঃপর উমর ؓ কথা বললেন, তার কথারও কোনো উত্তর দেননি।

পরিশেষে সাদ বিন উবাদা ؓ দাঁড়ালেন এবং বললেন :

إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا
الْبَحْرَ لَأَخْضُنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ
لَفَعَلْنَا

“ইয়া রাসুল্লাহ, আপনি সম্ভবত আমাদের (আনসারদের) মন্তব্য জানতে চাইছেন? সেই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার জীবন, আপনি যদি আমাদের ঘোড়া হাঁকিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, আমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব; আর যদি আমাদের সওয়ারি হাঁকিয়ে “বারকুল গিমাদ”^{১০৯৮} পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ দেন, আমরা অবশ্যই তা-ই করব।”

বর্ণনকারী বলেন, ‘তারপর রাসুল ﷺ লোকদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সবাই রওনা হলেন এবং বদর প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হলেন।’^{১০৯৯}

সাদ ؓ-এর কথা শুনে রাসুল ﷺ যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন এবং তাঁর মাঝে চাঙা ভাব সৃষ্টি হয়েছিল।

উলামায়ে কিরাম বলেন, ‘এর মাধ্যমে রাসুল ﷺ আনসারদের পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কারণ, তারা রাসুল ﷺ-এর কাছে এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তারা তাঁর সাথে কিতালের উদ্দেশ্যে বের হবেন এবং তাঁকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। তাই আবু সুফইয়ানের কাফেলা যখন

১০৯৮. ইয়ামানের একটি অঞ্চলের নাম। অথবা মক্কার পেছনে পাঁচ রাতের দূরত্বে অবস্থিত একটি জায়গা। (আন-নিহায়া : ১/১২১।)

১০৯৯. সহিহ মুসলিম : ১৭৭৯।

ফিরতি যাত্রা শুরু করল, তখন রাসূল ﷺ জানতে চাইলেন, আনসাররা তাদের কৃত অঙ্গীকারের ওপর অটল আছে কি না। অতঃপর তারা খুব সুন্দর ও দৃঢ় ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, তারা এখনও তাদের দেওয়া অঙ্গীকারের ওপর অটল আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

এই হাদিস থেকে বন্ধুবান্ধব ও বিজ্ঞজনদের থেকে পরামর্শ চাওয়ার গুরুত্ব বুঝে আসে।^{১১০০}

অনুরূপভাবে খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ সাদ বিন মুআজ ও সাদ বিন উবাদা রা.রা.স.-এর নিকট পরামর্শ চেয়েছিলেন। যখন কুরাইশরা দশ হাজার বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণ করতে আসলো, তখন গাতফান গোত্রের উয়াইনা বিন হিসন ও তার গোত্রের লোকজনও তাদের সাথে মিলিত হলো। এদিকে হুয়াই বিন আহতাব বনু কুরাইজার লোকদের কাছে গিয়ে তাদের বোঝালে তারা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। এসব কারণে মুসলমানদের বিপদ খুব বড় আকার ধারণ করল।

তখন রাসূল ﷺ উয়াইনা বিন হিসনের সাথে এই মর্মে চুক্তি করতে চাইলেন যে, তাকে ও তার গোত্রের লোকদের মদিনার এক-তৃতীয়াংশ ফল দিয়ে দেওয়া হবে, বিনিময়ে সে তার গাতফান গোত্রের লোকদের নিয়ে যৌথবাহিনীর সঙ্গ ত্যাগ করে ফিরে যাবে।

এ ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়ার জন্য সাদ বিন মুআজ ও সাদ বিন উবাদা রা.রা.স.-এর নিকট রাসূল ﷺ লোক পাঠালেন। আনসারদের অন্য নেতাদের বাদ দিয়ে শুধু তাঁদের দুজনের নিকট পরামর্শ চাওয়ার কারণ হলো, তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ গোত্রের অধিপতি ছিলেন। সাদ বিন মুআজ আওস গোত্রের অধিপতি ছিলেন এবং সাদ বিন উবাদা খাজরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। তাই বিশেষভাবে তাঁদের দুজনের কাছেই পরামর্শ চাইলেন।

ইবনুল কাইয়িম রা.হ. বলেন, ‘খন্দক যুদ্ধের সময় মুসলমানরা যখন দীর্ঘ সময় ধরে অবরুদ্ধ হয়ে থাকল, তখন রাসূল ﷺ গাতফানের দুই নেতা উয়াইনা

বিন হিসন ও হারিস বিন আওফের সাথে এই মর্মে চুক্তি করার ইচ্ছা করলেন যে, মদিনার এক-তৃতীয়াংশ ফল তাদের দেওয়া হবে, বিনিময়ে তারা তাদের কওমের লোকজন নিয়ে চলে যাবে। এ চুক্তির ওপর উভয়পক্ষ থেকে একপ্রকার সম্মতি হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসুল ﷺ দুই সাদের নিকট পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, এটা যদি আপনার নির্দেশ হয়, তাহলে আমরা বিনাবাক্যব্যয়ে তা মেনে নেব। আর যদি আপনি আমাদের করুণ অবস্থার দিকে চেয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে তার প্রয়োজন আমাদের নেই।

আমরা ও তারা উভয় সম্প্রদায় একসময় শিরক ও মূর্তিপূজায় জড়িত ছিলাম। তখনও তারা আমাদের কাছ থেকে মেহমানদারি ও বেচাকেনা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে আমাদের ফল খাওয়ার লোভ করত না। এখন তো আল্লাহ তাআলা আমাদের হিদায়াত দান করেছেন এবং ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, তাই আমাদের সম্পদ তাদের দেওয়ার প্রশ্নই আসতে পারে না। আল্লাহর কসম, তাদের আমরা তলোয়ারের আঘাত ছাড়া আর কিছুই দেবো না।”

রাসুল ﷺ তাঁদের পরামর্শকে যথার্থ মনে করলেন এবং বললেন, “সত্যিই, আমি উক্ত সিদ্ধান্ত তোমাদের করুণ অবস্থার প্রতি লক্ষ করেই নিয়েছিলাম—যখন আমি দেখতে পেলাম যে, গোটা আরব এক ধনুক থেকে তোমাদের প্রতিতির বর্ষণ করতে শুরু করেছে।”^{১১০১}

আমিরুল মুমিনিন উমর রাঃ ও এভাবে পরামর্শ করেছিলেন।

ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণনা করেন, ‘একদা উমর বিন খাত্তাব রাঃ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। অতঃপর যখন তিনি “সার্গ” (সউদিয়া ও সিরিয়ার সীমান্ত) এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সাথে সৈন্যবাহিনীর প্রধানগণ—আবু উবাইদা বিন জাররাহ রাঃ ও তাঁর সাথীগণ—সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে জানান যে, “সিরিয়া এলাকায় (প্লেগ) মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।” ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, ‘তখন উমর রাঃ আমাকে বললেন, “আমার কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা হিজরত করেছিলেন, সেই মুহাজিরদের ডেকে আনো।” আমি তাঁদের

ডেকে আনলাম। উমর ﷺ তাঁদের শাম দেশের মহামারির কথা জানিয়ে তাঁদের কাছে সুপরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। কেউ বললেন, “আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন। তাই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করি না।” আবার কেউ কেউ বললেন, “আপনার সাথে রয়েছেন অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নবিজি ﷺ-এর সাহাবিগণ। কাজেই আমাদের কাছে ভালো মনে হয় না যে, আপনি তাঁদের এই মহামারির মধ্যে ঠেলে দেবেন।” উমর ﷺ বললেন, “আপনারা উঠুন।”

তারপর তিনি বললেন, “আমার নিকট আনসারদের ডেকে আনো।” সুতরাং আমি তাঁদের ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের মতো তাঁরাও পরস্পর মতানৈক্য করলেন। উমর ﷺ বললেন, “আপনারা উঠুন।”

তারপর আমাকে বললেন, “এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশি আছেন—যাঁরা মক্কা-বিজয়ের বছর হিজরত করেছিলেন—তাঁদের ডেকে আনো।” আমি তাঁদের ডেকে আনলাম। তখন তাঁরা পরস্পর কোনো মতবিরোধ করলেন না। তাঁরা একযোগে বললেন, “আমাদের রায় হলো, আপনি লোকজন নিয়ে ফিরে যান এবং তাদের এই মহামারির কবলে ঠেলে দেবেন না।”

তখন উমর ﷺ লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, “আমি ভোরে বাহনের পিঠে (ফিরে যাওয়ার জন্য) আরোহণ করব। অতএব তোমরাও তা-ই করো।”

আবু উবাইদা বিন জাররাহ ﷺ বললেন, “আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন?” উমর ﷺ বললেন, “হে আবু উবাইদা, যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি বলত!” আসলে উমর ﷺ তাঁর বিরোধিতা করাকে অপছন্দ করতেন। উমর ﷺ বললেন, “হাঁ, আমরা আল্লাহর তাকদির থেকে আল্লাহর তাকদিরের দিকেই ফিরে যাচ্ছি। তুমি বলো তো, তুমি কিছু উটকে যদি এমন কোনো উপত্যকায় দিয়ে আসো, যেখানে আছে দুটি প্রান্ত। তন্মধ্যে একটি হলো সবুজ-শ্যামল, আর অন্যটি হলো বৃক্ষহীন। এবার ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ প্রান্তে চরাও,

তাহলে তা আল্লাহর তাকদির অনুযায়ীই চরাবে। আর যদি তুমি বৃক্ষহীন প্রান্তে চরাও, তাহলেও তা আল্লাহর তাকদির অনুযায়ীই চরাবে?”

বর্ণনাকারী (ইবনে আব্বাস রা) বলেন, ‘এমন সময় আব্দুর রহমান বিন আওফ রা এলেন। তিনি এতক্ষণ যাবৎ তাঁর কোনো প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, “এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে। আমি আল্লাহর রাসুল সা-কে বলতে শুনেছি যে—

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا
فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

“তোমরা যখন কোনো এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেয়ো না। আর যদি এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে আর তোমরা সেখানে থাকো, তাহলে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।”

(এ হাদিস শুনে) উমর রা আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং ফিরে গেলেন।^{১১০২}

ফায়দা : সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি নববি পদ্ধতি হলো, আক্রান্ত এলাকার কাউকে বাইরে আসতে দেওয়া হবে না এবং বাইরের কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই পদ্ধতি কোয়ার্যান্টিন (Quarantine) নামে পরিচিত—যা আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক পূর্বে ইসলাম চালু করেছে।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বুঝতে পেরেছেন যে, মহামারি-আক্রান্ত অঞ্চল থেকে কাউকে বের হতে না দিলে তা ওই এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে না। তাই তারা মহামারি-আক্রান্ত লোকদের ওই এলাকা থেকে বের হতে না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এটাকেই কোয়ার্যান্টিন (Quarantine) বলা হয়। কিন্তু ইসলাম চোদ্দো-শ বছর পূর্বেই এই পদ্ধতি চালু করে যায়।^{১১০৩}

১১০২. সহিহুল বুখারি : ৫৭২৯, সহিহ মুসলিম : ২২১৯।

১১০৩. আল-বুহসুল ইসলামিয়াহ-য় (৭১/৩৭১-৩৭২) প্রকাশিত ড. আলি বিন জাবিরের গবেষণা থেকে।

তাদের উপকারের কথা স্মরণ রাখতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন

জুবাইর বিন মুতইম   থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল   বদরের বন্দীদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ الثَّنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ

“আজ যদি মুতইম বিন আদি জীবিত থাকতেন এবং এই ঘৃণ্য লোকদের (মুক্তির) ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতেন, তাহলে তার সম্মানার্থে আমি এদের মুক্ত করে দিতাম।”^{১১০৪}

এই কথা বলে তিনি মুতইম বিন আদির সেই উপকারের কথা স্মরণ করেছেন, যা তায়িফ থেকে ফিরে আসার পর মক্কায় তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে করেছিলেন। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অনুরূপভাবে সাফওয়ান বিন উমাইয়া  -কে তিনি উপকারের প্রতিদান দিয়েছিলেন। রাসুল  -কে তিনি কয়েকটি লৌহবর্ম ধার দিয়েছিলেন। হুনাইন যুদ্ধের পর রাসুল   তার সেই উপকারের প্রতিদান দিলেন এবং তার মন জয় করে নিলেন।

সাফওয়ান বিন উমাইয়া   বর্ণনা করেন, ‘খাইবার যুদ্ধের সময় রাসুল   তার কাছ থেকে কয়েকটি লৌহবর্ম ধার চাইলেন। তিনি বলেন, “হে মুহাম্মাদ, এগুলো কি কেড়ে নিতে চাইছ?” রাসুল   বললেন, “না, বরং এগুলো ধার হিসেবে নিচ্ছি। নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকব।”

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সেখান থেকে কয়েকটি নষ্ট হয়ে গেল। তখন রাসুল   তার ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলে তিনি (সাফওয়ান বিন উমাইয়া) বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আজ আমি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি।”^{১১০৫}

অতঃপর হুনাইন যুদ্ধের পর রাসুল   তার উপকারের বদলা দান করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইবনে শিহাব   থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ‘মক্কা

১১০৪. সহিহুল বুখারি : ৩১৩৯।

১১০৫. সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৬২, মুসনাদু আহমাদ : ১৪৮৭৮।

জয় করার পর রাসুল ﷺ তাঁর সাথে মুসলমানদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর হুনাইনে গিয়ে তাঁরা যুদ্ধ করলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর দীন ও মুসলমানদের বিজয় দান করলেন।

সেদিন রাসুল ﷺ সাফওয়ান বিন উমাইয়া ؓ-কে একশ গবাদি পশু দান করলেন। অতঃপর একশ একশ করে আরও দুইশ পশু দান করলেন।’

ইবনে শিহাব বলেন, ‘আমাকে সাইদ বিন মুসাইয়িব ؓ বর্ণনা করেছেন, সাফওয়ান ؓ বললেন, “আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ আমাকে অনেক বেশি দান করলেন। তিনি আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে এত অধিক হারে দান করতে লাগলেন যে, একসময় তিনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে উঠলেন।””^{১১০৬}

আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলকেও তার উপকারের বদলা দিয়েছিলেন।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ؓ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে কবরে রাখার পর রাসুল ﷺ সেখানে আসলেন। এসেই তাকে কবর থেকে বের করতে বললেন। তারপর তাকে নিজের হাঁটুর ওপর রেখে তার শরীরে পবিত্র লাল ফেললেন এবং নিজের জামাটি তাকে পরিয়ে দিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন, তিনি নিজের জামা তাকে দিয়ে দেওয়ার কারণ হলো, সে আব্বাস ؓ-কে একটি জামা দিয়েছিল।’

সুফইয়ান বিন উয়াইনা ؓ বলেন, ‘আবু হারুন ؓ বলেন, “রাসুল ﷺ-এর শরীরে দুটি জামা ছিল। আব্দুল্লাহর ছেলে তাঁকে বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার পিতাকে আপনার শরীরের চামড়ার সাথে লাগানো জামাটি পরিয়ে দিন।””

সুফইয়ান ؓ বলেন, ‘অতঃপর উপস্থিত লোকজন দেখতে পেল যে, তিনি তাঁর পূর্বের উপকারের বিনিময়স্বরূপ আব্দুল্লাহকে তাঁর জামাটি পরিয়ে দিলেন।’^{১১০৭}

১১০৬. সহিহ মুসলিম : ২৩১৩।

১১০৭. সহিহ বুখারি : ১৩৫০, সহিহ মুসলিম : ২৭৭৩।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের সহযোগিতা করতেন

জারির বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালি ؓ বলেন, ‘রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, “তুমি কি আমাকে জুল খালাসার ব্যাপারে স্বস্তি দেবে না?” জুল খালাসা ছিল খাসআম গোত্রের একটি তীর্থ ঘর, যাকে বলা হতো ইয়ামানি কাবা। এ কথা শুনে আমি আহমাস গোত্র থেকে একশ পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রওনা হলাম। তাঁদের সকলেই অশ্ব পরিচালনায় পারদর্শী ছিল। আর আমি তখন ঘোড়ার পিঠে শক্তভাবে বসতে পারছিলাম না। কাজেই নবিজি ﷺ আমার বুকের ওপর হাত দিয়ে এত শক্তভাবে আঘাত করলেন যে, আমার বুকের ওপর নবিজি ﷺ-এর পবিত্র আঙুলের ছাপ দেখতে পেলাম।

তারপর দোয়া করলেন :

اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًا

“হে আল্লাহ, তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানান।”

তারপর জারির ؓ সেখানে গেলেন এবং ঘরটি ভেঙে দিয়ে তা জ্বালিয়ে ফেললেন। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে দূত পাঠালেন। জারির ؓ-এর দূত রাসূল ﷺ-কে বললেন, “সেই মহান সত্তার শপথ—যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি ঘরটিকে খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত কালো উটের মতো রেখে আপনার কাছে এসেছি।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘তখন রাসূল ﷺ আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করলেন।’^{১১০৮}

এই কাজের জন্য জারির ؓ-কে বেছে নেওয়ার কারণ হলো, ঘরটি তার গোত্রের দেশে অবস্থিত ছিল এবং তিনি তার কওমের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন।^{১১০৯}

১১০৮. সহিহুল বুখারি : ৩০২০, সহিহ মুসলিম : ২৪৭৬।

১১০৯. ফাতহুল বারি : ৮/৭২।

অনুরূপভাবে মুগিরা বিন শুবা ও আবু সুফইয়ান ؓ-কে দেবীমূর্তি ভাঙার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মূর্তিটি তায়িফের একটি তীর্থঘরে লুক্কায়িত ছিল। বাইতুল্লাহর সামনে যেভাবে পশু বলি দেওয়া হতো, সেভাবে তার সামনেও দেওয়া হতো।^{১১১০}

তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করতেন

অনুদান বেশি দিয়ে কিংবা সবার আগে অনুদান দিয়ে তিনি তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করতেন। এ জন্য হুনাইন যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনিমত থেকে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী কুরাইশ নেতাদের অধিক পরিমাণে দান করেছিলেন।

রাফি বিন খাদিজ ؓ বলেন, ‘রাসুল ﷺ আবু সুফইয়ান বিন হারব, সাফওয়ান বিন উমাইয়া, উয়াইনা বিন হিসন, আকরা বিন হাবিস—এদের প্রত্যেককে একশটি করে উট দিলেন। আর আব্বাস বিন মিরদাসকে তাদের চেয়ে কয়েকটি কম দিলেন। তখন আব্বাস বিন মিরদাস বললেন :

أَتَجْعَلُ نَهْيِي وَنَهْبَ الْعَبِيدِ *** بَيْنَ عُيَيْنَةٍ وَالْأَقْرَعِ
فَمَا كَانَ بَذْرُ وَلَا حَابِسٌ *** يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ
وَمَا كُنْتُ دُونَ أَمْرِي مِنْهُمَا *** وَمَنْ تَخْفِضُ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ

“আপনি আমার ও আমার ঘোড়ার অংশকে বণ্টন করেছেন, উয়াইনা ও আকরার মাঝে। অথচ উয়াইনা ও আকরা কোনো সমাবেশে মিরদাস হতে অগ্রগামী হতে পারেনি। আমি তাদের চেয়ে কম বাহাদুর নই। আজকে যাকে নিচে রাখা হবে, তাকে ওপরে ওঠানো হবে না।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘এ কথা শুনে রাসুল ﷺ তাকেও একশ উট পূর্ণ করে দিলেন।’^{১১১১}

১১১০. জাদুল মাআদ : ৩/৫২৩।

১১১১. সহিহ মুসলিম : ১৭৫৭।

নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে রাসুল ﷺ-এর এমন ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক আচরণ তাদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ফলে তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারা অন্তত মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়।

আবু সাইদ খুদরি ؓ বলেন, ‘আলি ؓ ইয়ামানে অবস্থানকালে নবিজি ﷺ-এর কাছে কিছু মাটিমিশ্রিত সোনা পাঠিয়েছিলেন। নবিজি ﷺ বনু মুজাশি গোত্রের আকরা বিন হাবিস হানজালি, উয়াইনা বিন হিসন বিন বদর ফাজারি, আলকামা বিন উলাসা আমিরি, বনু কিলাবের জনৈক ব্যক্তি এবং বনু নাবহান গোত্রের জাইদ আল-খাইল তাই—এই লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেন। এই কারণে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “নবিজি ﷺ নজদবাসী সরদারদের দিচ্ছেন, আর আমাদের বিমুখ করছেন।” তখন রাসুল ﷺ বললেন, “আমি তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছি।”

সেই মুহূর্তে কোঠরাসু চোখ, উঁচু কপাল, অধিক দাড়ি, উচ্চ চোয়াল ও মুগুনো মাথাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি সামনে এসে বলল, “হে মুহাম্মাদ, আল্লাহকে ভয় করুন।”

নবিজি ﷺ বললেন :

فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ، فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَلَا تَأْمَنُونِي

“আমিই যদি আল্লাহর নাফরমানি করি, তবে তাঁর অনুগত আর কে হবে? আর এ জন্যই তিনি আমাকে লোকদের ওপর আমানতদার নির্ধারণ করেছেন। অথচ তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না।”

এমন সময় দলের মধ্য থেকে এক লোক—সম্ভবত খালিদ বিন ওয়ালিদ ؓ—সেই ব্যক্তিটিকে হত্যা করার জন্য নবিজি ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর লোকটি চলে গেলে রাসুল ﷺ বললেন :

إِنَّ مِنْ ضِئْضِي هَذَا، قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ،
يَسْرِقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مَرْوَقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ،

وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لِيُنْ أَدْرِكُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

“এই ব্যক্তির বংশ থেকে এমন কিছু লোক আসবে, যারা কুরআন পড়বে, তবে কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে শিকারের দেহ ভেদ করে তির বের হয়ে যায়। মূর্তিপূজারীদের তারা ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করবে। যদি আমি তাদের পাই, তাহলে আদ জাতিকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সেভাবে পাইকারি হারে তাদের হত্যা করব।”^{১১১২}

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, ‘যখন আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-কে হাওয়াজিন গোত্রের মাল থেকে যা দেওয়ার তা দান করলেন, আর তিনি কুরাইশ গোত্রের লোকদের একশ করে উট দিতে লাগলেন, তখন আনসারদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগলেন, “আল্লাহ রাসুল ﷺ-কে ক্ষমা করুন! তিনি শুধু কুরাইশদের দিচ্ছেন, আমাদের দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তরবারি থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে।”

আনাস رضي الله عنه বলেন, ‘তাদের সেই কথা রাসুল ﷺ-এর কানে পৌঁছাল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং চামড়া দ্বারা নির্মিত একটি তাঁবুতে তাদের একত্র করলেন। সেখানে তাদের ব্যতীত আর কাউকে ডাকলেন না। যখন তারা সকলে একত্রিত হলেন, তখন রাসুল ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, ‘আমার নিকট তোমাদের সম্পর্কে যে কথা পৌঁছেছে, তা কী?’

তাদের মধ্যে সমঝদার লোকেরা তাঁকে বললেন, “ইয়া রাসুল্লাহ, আমাদের মধ্য থেকে মুরব্বিরা কিছুই বলেননি; তবে আমাদের কতিপয় তরুণ বলেছে, “আল্লাহ রাসুল ﷺ-কে ক্ষমা করুন! তিনি শুধু কুরাইশদের দিচ্ছেন, আমাদের দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তরবারি থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে।”

রাসুল ﷺ বললেন :

إِنِّي أُعْطِي رَجَالًا حَدِيثُ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ
النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَوَاللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ

“আমি এমন লোকদের দিচ্ছি, যাদের কুফরির যুগ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব সম্পদ নিয়ে (তাদের গন্তব্যে) ফিরে যাবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসুল ﷺ-কে নিয়ে তোমাদের গন্তব্যে ফিরবে? আল্লাহর কসম, তোমরা যা নিয়ে গন্তব্যে ফিরবে, তা তারা যা নিয়ে ফিরবে, তার চাইতে উত্তম।”

তখন আনসারগণ বললেন, “হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা এতে সন্তুষ্ট।”

তারপর রাসুল ﷺ বললেন :

إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَوْضِ

“আমার পরে তোমরা তোমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করে থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে হাওজে (কাওসারে) মিলিত হবে।”

আনাস রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন, ‘কিন্তু আমরা (আনসারগণ) ধৈর্যধারণ করতে পারিনি।’^{১১১৩}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- ইমাম গনিমত থেকে তার প্রাপ্ত এক-পঞ্চমাংশ থেকে অনুদান দিতে পারবেন এবং এ ক্ষেত্রে লোকদের মাঝে তার ইচ্ছামতো তারতম্য করে বণ্টন করতে পারবেন। অনুরূপভাবে তা মুসলমানদের জন্য মঙ্গলজনক

বিভিন্ন খাতে ব্যয় করতে পারবেন। কোনো কল্যাণের আশা থাকলে তা থেকে ধনীদেও দেওয়া যাবে।

- সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের ইসলামের ওপর অবিচল রাখার জন্য দান করা।
- রাসুল ﷺ-এর বিনয় ও কোমলতা।
- প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দলিল উপস্থাপন করে তাকে লা-জওয়াব করে দেওয়া।
- আনসারদের শিষ্টাচার। কারণ, তারা রাসুল ﷺ-এর সাথে বিতর্ক করেননি এবং গভীর লজ্জাবোধের কারণে জানালেন যে, এমন কথা তাদের প্রবীণরা বলেননি; বরং কিছু অতি উৎসাহী তরুণ এমন মন্তব্য করেছে।
- আনসারদের ফজিলত। কারণ, এখানে রাসুল ﷺ তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।
- বড়রা ছোটদের তাদের গাফিলতি থেকে সতর্ক করবে এবং ছোটদের মনে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক হলে বড়রা তা খোলাসা করে দেবে।
- তিরস্কার করার পদ্ধতি। অর্থাৎ তিরস্কৃত ব্যক্তির কাছ থেকে অপরাধের স্বীকৃতি নিয়ে তার অজুহাত হণ করে নেওয়া এবং কোমল ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তিরস্কার করা।
- নবুওয়াতের একটি আলামত। তিনি বলেছেন, ‘আমার পরে তোমরা তোমাদের ওপর অন্যদের প্রণয় দেখতে পাবে।’ পরবর্তী সময়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।
- কেউ নিজের দুনিয়াবি হক দাঁ করলে, তার জন্য তাকে তিরস্কার করা যাবে না।
- উদ্ধৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে শেষ লোক বা সর্বসাধারণের উদ্দেশে রাষ্ট্রনায়কের ভাষণ প্রদান।
- ভাষণ প্রদানের সময় কিছু শ্রোতাকে বিশেষভাবে সম্বোধন করা বৈধ।

- কেউ দুনিয়াবি কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত হলে আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া।
- হিদায়াত, ভালোবাসা ও অমুখাপেক্ষিতা অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ।
- আখিরাতের স্বার্থকে দুনিয়াবি স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেওয়া এবং পার্থিব কোনো কিছু হারিয়ে গেলে তার ওপর সবর করা। কারণ, এর বিনিময়ে আখিরাতের কল্যাণ রয়েছে। আর আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী জগৎ।^{১১১৪}

নেতৃস্থানীয় লোক অপরাধ করলে অন্যদের তুলনায় কঠোর হতেন

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ বলেন, ‘একদা রাসূল সঃ কাবার পাশে নামাজ পড়ছিলেন এবং কুরাইশের একটি দল সেখানে বৈঠক করছিল। তখন তাদের মধ্য থেকে একজন (আবু জাহেল) বলল, “এই রিয়াকারকে দেখতে পাচ্ছ? তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি অমুক গোত্রের উট জবাই করার স্থান থেকে গোবর, রক্ত ও গর্ভাশয় নিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকবে, তারপর এই ব্যক্তি সিজদায় গেলে সেগুলো তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দেবে?”

তখন এ কাজের জন্য চরম হতভাগ্য ব্যক্তি (উকবা বিন আবু মুআইত) উঠে দাঁড়াল। অতঃপর তা নিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকল। যখন রাসূল সঃ সিজদায় গেলেন, তখন সে তাঁর পিঠের ওপর দুই কাঁধের মাঝখানে তা রাখল।’

ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন, ‘তখন আমার যদি প্রতিরোধ করার শক্তি থাকত, তখন আমি অবশ্যই রাসূল সঃ-এর পিঠ থেকে তা ফেলে দিতাম।

এ দৃশ্য দেখে তারা হাসাহাসি করতে লাগল এবং হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের ওপর লুটিয়ে পড়তে লাগল।

এ অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি ফাতিমা রাঃ-এর কাছে গেলেন। তিনি তখন ছোট বালিকা ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এলেন। রাসূল সঃ তখনও সিজদারত ছিলেন। ফাতিমা রাঃ সেগুলো তাঁর কাঁধের ওপর থেকে ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের লক্ষ্য করে ভৎসনা করতে লাগলেন।

১১১৪. ফাতহুল বারি : ৮/৫১। ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ৭/১৫১।

নামাজ শেষ করার পর রাসুল ﷺ বদদোয়া করলেন :

“আল্লাহ, আপনি কুরাইশকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ, আপনি কুরাইশকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ, আপনি কুরাইশকে ধ্বংস করুন।”

রাসুল ﷺ-এর বদদোয়া শুনে তারা ঘাবড়ে গেল। কারণ, তারা বিশ্বাস করত যে, এই শহরে দোয়া করলে তা কবুল করা হয়।

অতঃপর রাসুল ﷺ তাদের নাম নিয়ে বদদোয়া করলেন :

“হে আল্লাহ, কুরাইশের এই লোকদের ধ্বংস করুন—আবু জাহেল, উতবা বিন রাবিআ, শাইবা বিন রাবিআ, ওয়ালিদ বিন উতবা, উমাইয়া বিন খালাফ, উকবা বিন আবু মুআইত, উমরা বিন ওয়ালিদ—এদের ধ্বংস করুন।”

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ বলেন, ‘সেই সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার জীবন, রাসুল ﷺ যাদের নাম নিয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে আমি বদরের কূপের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। তবে উমাইয়া তাদের মধ্যে ছিল না। কেননা, সে বিশালদেহী ছিল। তাই সাহাবিগণ যখন তাকে ধরে টানলেন, তখন কূপে নিক্ষেপ করার পূর্বেই তার গ্রন্থিগুলো আলাদা হয়ে গেল।’^{১১১৫}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- রাসুল ﷺ-এর সহনশীলতা। তায়ালিসির রিওয়াযাতে আছে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ বলেন, ‘ওই দিন ছাড়া আর কোনোদিন রাসুল ﷺ-কে তাদের জন্য বদদোয়া করতে দেখিনি।’

ইবনে হাজার আসকালানি ؓ বলেন, ‘সেদিন তারা আল্লাহর ইবাদতরত অবস্থায় থাকা রাসুল ﷺ-কে নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করে নিজেদের বদদোয়ার উপযুক্ত করে তুলেছিল।’

- ফাতিমা ؓ ছোটবেলা থেকেই খুবই সাহসী ছিলেন। কারণ, গোত্র ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে তিনি খুবই সম্ভ্রান্ত ছিলেন। এ জন্যই তিনি কুরাইশ নেতাদের উচ্চস্বরে গালি দিলেও তারা কোনো প্রত্যুত্তর করেনি।

- জালিমের জন্য বদদোয়া করা জাযিজ।
- অপরাধকর্মের কলকাঠি নাড়া এবং তাতে সাহায্য করার চেয়ে সরাসরি অপরাধকর্ম করা অধিক মারাত্মক। এ জন্য উকবাকে ‘চরম হতভাগ্য’ বলে অভিহিত করা হয়েছে, অথচ তাদের দলে আবু জাহেল ছিল—যে কুফর এবং রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কট্টর ছিল। তা সত্ত্বেও এই ঘটনায় ‘চরম হতভাগ্য’ বলা হয়েছে উকবাকে। কারণ, অন্যরা এই জঘন্য কর্মে নির্দেশ দিয়ে এবং সম্ভ্রুষ্টি প্রকাশ করে শরিক ছিল, আর উকবা সরাসরি কাজটি আনজাম দিয়েছিল। ফলে সে-ই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হতভাগা হলো। এ জন্যই অন্যরা সবাই যুদ্ধের মাঠে নিহত হলেও সে নিহত হয়েছে বন্দী অবস্থায়।^{১১১৬}

ইবনে বাত্তাল رحمہ اللہ বলেন, ‘রাসুল ﷺ লোকদের ইসলামে দীক্ষিত করাকে পছন্দ করতেন। এ জন্য যাদের ব্যাপারে তিনি আশা করতেন যে, তারা পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের জন্য বদদোয়া করতেন না। বরং তাদের জন্য হিদায়াতের দোয়া করতেন। কিন্তু যাদের ব্যাপারে ইসলাম গ্রহণ করার আশা থাকত না এবং তাদের অনিষ্ট ও ধৃষ্টতার আশঙ্কা করতেন, তাদের জন্য বদদোয়া করতেন। যেমন : তাদের জন্য ইউসুফ عليه السلام-এর যুগের মতো কয়েক বছরের জন্য খরা আসার বদদোয়া করেছিলেন এবং কুরাইশ নেতাদের জন্য তাদের শত্রুতা ও কষ্টদানে অতিষ্ঠ হয়ে বদদোয়া করেছিলেন। তাদের ব্যাপারে তাঁর বদদোয়া কবুল করা হয়, ফলে বদর যুদ্ধে তারা নিহত হয়। যেভাবে তাঁর হিদায়াতের দোয়ার বরকতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করে।’^{১১১৭}

অনেক সময় তাদের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলতেন

উরওয়া رحمہ اللہ বলেন, ‘আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رضی اللہ عنہ-কে বললাম, “কুরাইশ কর্তৃক রাসুল ﷺ-এর সাথে শত্রুতার সর্বোচ্চ প্রকাশ কী দেখতে পেয়েছেন আপনি?”

১১১৬. ফাতহুল বারি : ১/৩৫২।

১১১৭. ইবনে বাত্তাল رحمہ اللہ কৃত শারহু সহিহিল বুখারি : ৯/১৪৯।

তিনি বললেন, “একদিন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হাতিমে কাবার নিকট একত্রিত হলে আমি তাদের ওখানে উপস্থিত হলাম। সেখানে তারা রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে আলোচনা করল। তারা বলল, “এই ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা যে রকম সবার করছি, এমন সবার ইতিপূর্বে কখনো করিনি আমরা। সে আমাদের বিজ্ঞজনদের বোকা সাব্যস্ত করেছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের গালমন্দ করেছে, আমাদের দ্বীনের প্রতি দোষারোপ করেছে, আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করে দিয়েছে, আমাদের উপাস্যদের গালি দিয়েছে—তার এত এত অপরাধ সত্ত্বেও আমরা তার ব্যাপারে ধৈর্য ধরে আছি!”

তারা তাদের আলাপচারিতায় রত ছিল—এমন সময় সেখানে রাসূল ﷺ আগমন করলেন। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে রুকনের নিকট আসলেন, অতঃপর তাদের পাশ দিয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে লাগলেন।

তিনি যখন তাদের পাশ দিয়ে প্রদক্ষিণ করলেন, তখন তারা বিভিন্ন অশালীন কথা বলে তাঁকে কটাক্ষ করল।

আমর বিন আস ﷺ বলেন, “তখন আমি তাঁর চেহারায়ে অসন্তোষভাব লক্ষ্য করলাম। অতঃপর তিনি সামনে চলে গেলেন। তারপর দ্বিতীয় প্রদক্ষিণে তাঁর নিকট হতে অতিক্রম করার সময় তারা পূর্বের মতো কটাক্ষ করল। এবারেরও তাঁর চেহারায়ে অসন্তোষভাব দেখতে পেলাম। তিনি সামনে চলে গেলেন। তৃতীয় প্রদক্ষিণে তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা আবার কটাক্ষ করল। তখন তিনি বললেন :

تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَمَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ
بِالدَّبْحِ

“শুনে নাও হে কুরাইশ, সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি—যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি তোমাদের জবাই করতে এসেছি।”

তাঁর কথা শুনে তারা ঘাবড়ে গেল। তাদের অবস্থা এমন হয়ে গেল, যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। ইতিপূর্বে যে সবার চেয়ে শক্ত কথা বলে কটাক্ষ করছিল, সে নশ্রতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়ে যথাসাধ্য সুন্দর

ভাষায় বলল, “চলে যাও, হে আবুল কাসিম, শান্ত হয়ে চলে যাও! আল্লাহর কসম, তুমি নির্বোধ নও।”

রাসুল ﷺ সেখান থেকে চলে গেলেন।

পরের দিন তারা আবার হাতিমে একত্রিত হলো। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। তারা একে অপরকে বলল, “তোমাদের মনে আছে, তোমরা তাকে কী বলেছিলে, আর সে তোমাদের কী বলেছিল। এমনকি (গতকাল) সে তোমাদেরকে তোমাদের অপ্রিয় কথা শোনাতেও তোমরা তাকে ছেড়ে দিয়েছিলে।”

তারা আলাপরত ছিল—এমন সময় রাসুল ﷺ আগমন করলেন। তখন তারা একযোগে রাসুল ﷺ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে বলতে লাগল, “তুমি কি এমন এমন কথা বলো?” কারণ, তাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি তাদের উপাস্য ও দ্বীনের নিন্দা করেছেন।

রাসুল ﷺ বললেন, “হাঁ, আমিই তা বলেছি।”

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ؓ বলেন, “তখন আমি দেখলাম যে, এক ব্যক্তি তাঁর চাদরের সংযোগস্থল আঁকড়ে ধরল। তখন আবু বকর ؓ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন :

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

“তোমরা কি একজনকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ?”

অতঃপর তারা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেল।

এটাই আমার দেখা কুরাইশ কর্তৃক রাসুল ﷺ-এর ওপর সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ।^{১১১৮}

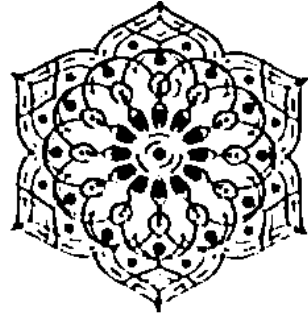
তাদের দয়া-মায়া শিক্ষা দিতেন

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ‘রাসুল সাঃ হাসান বিন আলি রাঃ-কে চুম্বন করলেন। তখন তাঁর পাশে আকরা বিন হাবিস তামিমি বসা ছিলেন। তিনি বললেন, “আমার দশটি সন্তান আছে, তাদের কাউকেই কখনো চুমু খাইনি আমি। তখন রাসুল সাঃ তার দিকে ফিরে বললেন :

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

“যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।”^{১১১৯}





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মেধাবী ও প্রতিভাবানদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ

রাসুল ﷺ-এর সাহাবিদের মধ্যে অনেকেই নির্দিষ্ট বিষয়ে অন্যদের তুলনায় অধিক পারদর্শী ও প্রতিভাবান ছিলেন।

সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাব্যিক প্রতিভায় অন্যদের তুলনায় সেরা ছিলেন। যেমন : হাসসান বিন সাবিত রাঃ।

কেউ কেউ ফিকহ ও জ্ঞান-গরিমায় অধিক পারদর্শী ছিলেন। যেমন : আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ।

অনেকেই বিচারকার্য ও ফয়সালা প্রদানে অন্যদের তুলনায় বেশি পারদর্শী ছিলেন। যেমন : আলি রাঃ ও মুআজ বিন জাবাল রাঃ।

কেউ কেউ শিক্ষকতা ও যোগ্যতা অর্জনে পারদর্শী ছিলেন। যেমন : জাইদ বিন সাবিত রাঃ।

কেউ কেউ স্মরণশক্তির দিক দিয়ে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে ছিলেন। যেমন : আবু হুরাইরা রাঃ।

কেউ কেউ সমরবিদ্যা ও যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে অধিক পারদর্শী ছিলেন। যেমন : খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ।

রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের মধ্যে থাকা এসব আল্লাহ-প্রদত্ত যোগ্যতা ও গুণাবলির মূল্যায়ন করতেন। তিনি প্রত্যেকের প্রতিভা ও শক্তিমত্তা অনুযায়ী তাঁদের সাথে আচরণ করতেন। সুতরাং যে সাহাবি যে কাজে অধিক পারদর্শী, তাকে সে কাজের দায়িত্ব দিতেন।

হাসসান বিন সাবিত ؓ-কে কবিতার মাধ্যমে জবাব দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন

আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বললেন, ‘কুরাইশদের বিরুদ্ধে তোমরা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করো। কেননা, তা তাদের বিরুদ্ধে তির নিক্ষেপের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী।’

এরপর তিনি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহ ؓ-এর কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাকে বললেন, ‘ওদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করো।’ তিনি ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তি করলেন, কিন্তু তিনি তাতে খুশি হলেন না। তখন তিনি কাব বিন মালিক ؓ-কে ডেকে পাঠালেন।

এরপর তিনি হাসসান বিন সাবিত ؓ-এর কাছে লোক পাঠালেন।

রাসুল ﷺ-এর প্রেরিত লোক যখন তার কাছে গেলেন, তখন হাসসান ؓ বললেন, ‘তোমাদের জন্য সঠিক সময় এসেছে যে, তোমরা সেই পশুরাজ সিংহকে ডেকে পাঠিয়েছ, যে তার লেজ দ্বারা ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে।’

এরপর তিনি তার জিহ্বা বের করে নাড়াতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, ‘সেই মহান সত্তার কসম—যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আমার জিহ্বা দ্বারা ওদের ফেঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবো, যেমনিভাবে হিংস্র বাঘ তার থাবা দিয়ে চামড়া খসিয়ে ফেলে।’

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘হে হাসসান, তুমি তড়িঘড়ি করো না। কেননা, আবু বকর ؓ কুরাইশদের বংশতালিকা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন। আর তাদের মধ্যে আমার বংশও রয়েছে। (তাই এখনই ব্যঙ্গ করা শুরু করলে আমার বংশের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ হতে পারে,) সুতরাং আবু বকর এসে আমার বংশ তোমাকে পৃথক করে বাতলে দেবেন।’

এরপর হাসসান ؓ আবু বকর ؓ-এর কাছে গেলেন এবং (বংশতালিকা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে) ফিরে এলেন।

তারপর বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনি আপনার বংশপঞ্জি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছেন। সেই মহান সত্তার কসম—যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনাকে তাদের মধ্য থেকে এমন সুকৌশলে বের করে আনব, যেমনিভাবে আটার মণ্ড থেকে সূক্ষ্ম কেশাগ্র বের করা হয়।’

আয়িশা   বলেন, ‘এরপর আমি রাসূলুল্লাহ  -কে হাসসান   সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, “যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কাফিরদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত “রুহুল কুদস” অর্থাৎ জিবরিল   সারাক্ষণ তোমাকে সাহায্য করতে থাকবেন।’

আয়িশা   বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ  -কে আরও বলতে শুনেছি যে, “হাসসান তাদের নিন্দাবাদ করল। সে মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দিল এবং নিজেও প্রশান্তি লাভ করল।”

হাসসান  -এর কবিতাটি নিম্নরূপ :

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ *** وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيفًا *** رَسُولَ اللَّهِ شِمَّتُهُ الْوَفَاءُ

“তুমি মুহাম্মাদের নিন্দাবাদ করছ আর আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছি এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছেই প্রতিদানের আশা করছি। তুমি মুহাম্মাদকে ব্যঙ্গ করছ! যিনি পুণ্যবান—ভ্রান্তি থেকে বহু দূরে তাঁর অবস্থান। তিনি আল্লাহর রাসূল। ওয়াফাদারি তাঁর চরিত্রের ভূষণ।”

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي *** لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

تَكَلُّتُ بُنْيَتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا *** تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كُنْفِي كَدَاءُ

“আমার পিতা, পিতামহ ও আমার ইজ্জত-আবরু মুহাম্মাদের সম্মান ও মর্যাদার অতন্দ্র প্রহরী। কাদা ঘাঁটির দুই প্রান্তে (মুসলিম বাহিনীর) বিজয়ধূলি উড়ছে—এই দৃশ্য যদি তোমরা না দেখো, তবে আমি জীবন দিয়ে দেবো।”

يُبَارِينَ الْأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ *** عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسْلُ الظَّمَاءُ

تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ *** تُلَظْمُهُنَّ بِالْحُمْرِ النَّسَاءُ

“আমাদের উটগুলো প্রবল শক্তিতে তোমাদের দিকে ছুটতে গিয়ে লাগাম ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করে আর কাঁধে বহন করে রক্তপিপাসু তৃষ্ণাকাতর চকচকে বর্শা। দুর্বীর গতিতে পরস্পরকে ডিঙিয়ে ছুটে চলে আমাদের ঘোড়াগুলো—তাদের মুখগুলো সযত্নে ওড়না দিয়ে মুছে দেয় আমাদের নারীরা।”

فَإِنْ أَعْرَضْتُمْو عَنَّا اغْتَمَرْنَا *** وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ

وَالَا فَاصْبِرُوا لِضَرَابِ يَوْمٍ *** يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ

“তোমরা যদি আমাদের (ইসলাম) থেকে বিমুখ হও, তবে আমরা তোমাদের দিকে অগ্রসর হব। আর বিজয় আমাদেরই পদচুম্বন করবে। সেদিন খুলে যাবে তোমাদের ভ্রাত্তির মুখোশ। কিংবা অপেক্ষা করো সেই লড়াইয়ের, যেদিন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করবেন।”

وَقَالَ اللَّهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا *** يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ

وَقَالَ اللَّهُ: قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا *** هُمْ الْأَنْصَارُ غُرَضَتْهَا اللَّقَاءُ

لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍّ سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ

“আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দাকে প্রেরণ করেছি রাসুল হিসেবে—তিনি আহ্বান করেন সত্যের পথে, যাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, আমি এমন এক বাহিনী প্রস্তুত করেছি, যাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো শত্রুর মোকাবেলা করা। সবকিছুর মোকাবেলায় প্রতিদিন আমরা প্রস্তুত থাকি—আক্রমণ গালি দিয়ে হোক বা লড়াইয়ের মাধ্যমে কিংবা নিন্দাবাদের দ্বারা।”

فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ *** وَيَمْدَحْهُ وَيَنْصُرْهُ سَوَاءُ

وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا *** وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

“তোমরা রাসুলুল্লাহর নিন্দা করো কিংবা প্রশংসা কিংবা সাহায্য করো—সবই তাঁর জন্য এক বরাবর। কারণ, আমাদের মাঝে আছেন আল্লাহর দূত জিবরিল—যিনি রুহুল কুদস, তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।”^{১১২০}

বারা বিন আজিব রাঃ বলেন, ‘রাসুল সাঃ হাসসান রাঃ-কে বললেন—

اهْجُهِمْ، أَوْ هَاجِهِمْ، وَجِبْرِيلُ مَعَكَ

“তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করো, জিবরিল রাঃ তোমার সাথে রয়েছেন।”^{১১২১}

সাইদ বিন মুসাইয়িব রাঃ বলেন, ‘উমর রাঃ মসজিদে গেলেন। তখন সেখানে হাসসান রাঃ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তিনি (হাসসান) বললেন, “আমি এখানে সে সময়েও কবিতা আবৃত্তি করতাম, যখন এখানে আপনার চেয়েও উত্তম ব্যক্তি ছিলেন।” অতঃপর তিনি আবু হুরাইরা রাঃ-এর দিকে ফিরে বললেন, “তুমি কি রাসুল সাঃ-কে এ কথা বলতে শুনেছ—

أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيَّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

“আমার পক্ষ হতে (কাফিরদের জবাব দাও)। হে আল্লাহ, তাকে রুহুল কুদস (জিবরিল)-এর মাধ্যমে শক্তিশালী করুন?”

আবু হুরাইরা রাঃ বললেন, “হ্যাঁ।”^{১১২২}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- বৈধ কবিতা মসজিদের ভেতর আবৃত্তি করা জায়েজ। আর যে কবিতায় ইসলাম ও মুসলমানদের গুণগান বিবৃত হয়েছে, অথবা কাফিরদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে,

১১২০. সহিহ মুসলিম : ২৪৯০।

১১২১. সহিহল বুখারি : ৩২১৩, সহিহ মুসলিম : ২৪৮৬।

১১২২. সহিহল বুখারি : ৩২১২, সহিহ মুসলিম : ২৪৮৫।

ওই কবিতা মসজিদের ভেতর আবৃত্তি করা মুসতাহাব। হাসসান ؓ-এর কবিতা এমন ছিল।

- এ ধরনের কবিতা যারা রচনা করে, তাদের জন্য দোয়া করা মুসতাহাব।

আনাস বিন মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, ‘উমরাতুল কাজা করার জন্য রাসুল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ؓ তাঁর সামনে হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলেন :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ *** الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ
ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ *** وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

“হে কাফিরের বাচ্চারা, তাঁর পথ ছেড়ে দাও। আজ তাঁকে বাধা দিলে কুরআনের নির্দেশে তোমাদের এমন মার দেবো, তোদের মস্তক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আর বন্ধু ভুলে যাবে বন্ধুর কথা।”

উমর ؓ বললেন, “হে ইবনে রাওয়াহা, এই হারাম শরিফে রাসুল ﷺ-এর সামনে কবিতা আবৃত্তি করছ?”

তখন রাসুল ﷺ বললেন :

خَلَّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ السَّبْلِ

“তাকে তার কাজ করতে দাও, হে উমর, তার কবিতা তাদের অন্তরে তিরের চেয়ে দ্রুতগতিতে বিদ্ধ হচ্ছে।”^{১১২৩}

জাইদ বিন সাবিতকে ইহুদিদের ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন

খারিজা বিন জাইদ ؓ থেকে বর্ণিত, ‘তার পিতা জাইদ বিন সাবিত ؓ তাকে বলেছেন, “যখন রাসুল ﷺ মদিনায় আগমন করলেন, তখন আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাকে দেখে তাঁর বেশ পছন্দ হলো। লোকেরা বলল, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, এ হচ্ছে বনু নাজ্জারের এক বালক। সে আপনার ওপর অবতীর্ণ কুরআন থেকে দশটির অধিক সুরা মুখস্থ করেছে।”

তখন রাসুল ﷺ আমাকে কুরআন পড়তে বললেন। আমি সুরা কাফ তিলাওয়াত করলাম। আমার তিলাওয়াত রাসুল ﷺ-এর পছন্দ হলো।

তিনি বললেন, “আমার জন্য ইহুদিদের ভাষা শেখো। কারণ, আমি আমার চিঠিপত্রের ব্যাপারে ইহুদিদের ওপর ভরসা করতে পারি না।”

জাইদ ﷺ বলেন, ‘তারপর মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে আমি তাদের ভাষা দক্ষতার সাথে শিখে ফেলি। এরপর থেকে রাসুল ﷺ কোনো চিঠি লিখতে চাইলে আমি লিখে দিতাম এবং তাঁর নিকট কোনো চিঠি আসলে আমি তা পড়ে শোনাতাম।’^{১১২৪}

এত অল্প সময়ে ইহুদিদের ভাষা শিখে নেওয়া থেকে সহজেই প্রমাণিত হয়, তিনি ছোটবেলা থেকে কতটা মেধাবী ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন!

ইমাম জাহাবি ﷺ তাঁর ব্যাপারে লেখেন, ‘... তাঁর পিতা হিজরতের পূর্বে সংঘটিত বুআসের যুদ্ধে নিহত হন। ফলে জাইদ ﷺ এতিম হয়ে লালিতপালিত হন। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী।’^{১১২৫}

ইবনে কাসির ﷺ বলেন, ‘জাইদ বিন সাবিত ﷺ সীমাহীন মেধাবী ছিলেন। তিনি মাত্র পনেরো দিনে ইহুদিদের ভাষা ও লেখা রপ্ত করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি কিসরার দূত থেকে মাত্র আঠারো দিনে ফারসি ভাষা শিখেছিলেন এবং রাসুল ﷺ-এর বিভিন্ন খাদিমের কাছ থেকে হাবশি ভাষা, রোমানিক ভাষা ও কিবতি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন।’^{১১২৬}

তার তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি ও প্রতিভার কারণেই রাসুল ﷺ তাকে ওহি লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন।

বারা বিন আজিব ﷺ বলেন, ‘যখন (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) “মুমিনদের মধ্যে যারা (জিহাদ না করে) বসে (وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)”

১১২৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৭১৫, সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৪৫।

১১২৫. সিয়াকু আলামিন নুবালা : ২/৪২৭।

১১২৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/৩৩।

থাকে এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, তারা সমান নয়।”—এ আয়াত নাজিল হলো, তখন রাসুল ﷺ বললেন :

ادْعُ لِي زَيْدًا وَلِيَجِيءَ بِاللَّوْجِ وَالذَّوَاةِ وَالْكَتِفِ - أَوِ الْكَتِفِ وَالذَّوَاةِ

“আমার কাছে জাইদকে ডেকে আনো আর তাকে স্লেট, দাওয়াত ও কাঁধের হাড়ি অথবা দোয়াত ও কাঁধের হাড়ি আনতে বলো।”

অতঃপর বললেন, “لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ... লেখো

তখন রাসুল ﷺ-এর পেছনে অন্ধ সাহাবি আমর বিন উম্মে মাকতুম ؓ ছিলেন। তিনি বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি তো অন্ধ মানুষ। আমার কী হবে?”

তখন ওই আয়াতের স্থলে নাজিল হলো :

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

“গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান যাদের কোনো সংগত ওজর নেই এবং ওই মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়।”^{১১২৭-১১২৮}

তার এসব গুণাবলির কারণেই আবু বকর সিদ্দিক ؓ কুরআন সংকলনের দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন।

এ সম্পর্কে জাইদ ؓ বর্ণনা করেন, ‘আবু বকর ؓ (তাঁর খিলাফতের সময়) এক ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠালেন। এ সময় ইয়ামামার যুদ্ধ চলছিল। (আমি এলাম) তখন তাঁর কাছে উমর ؓ বসা ছিলেন। তিনি বললেন, “উমর আমাকে বললেন যে, “ইয়ামামার যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, আমার ভয় হচ্ছে, কুরআন বিশেষজ্ঞ (হাফিজগণ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহিদ হয়ে যান নাকি! যদি আপনারা তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করেন, তবে কুরআনের

১১২৭. সূরা আন-নিসা, ৪ : ৯৫।

১১২৮. সহিহুল বুখারি : ৪৯৯০, সহিহ মুসলিম : ১৮৯৮।

অনেক অংশ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই কুরআনকে একত্র করে সংরক্ষণ করা ভালো মনে করি।” আমি (আবু বকর) তাঁকে বললাম, “আমি এ কাজ কীভাবে করতে পারি, যা রাসূল ﷺ করে যাননি।”

কিন্তু উমর বললেন, “আল্লাহর কসম, এটা কল্যাণকর হবে।” উমর ﷺ তাঁর এ কথার পুনরুক্তি করতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ কাজ করার জন্য আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন। (অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই) এবং শেষ পর্যন্ত (এ ব্যাপারে) আমার অভিমত উমর ﷺ-এর মতোই হয়ে যায়।’

জাইদ বিন সাবিত ﷺ বলেন, ‘উমর ﷺ সেখানে নীরবে বসা ছিলেন, কোনো কথা বলছিলেন না। এরপর আবু বকর ﷺ আমাকে বললেন, “দেখো, তুমি যুবক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। আমরা তোমার প্রতি কোনোরূপ বিরূপ ধারণা পোষণ করি না। কেননা, তুমি রাসূল ﷺ-এর সময়ে ওহি লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করে একত্র করো।”’

জাইদ ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর কসম, তিনি কুরআন একত্র করার যে নির্দেশ আমাকে দিলেন, সেটি আমার কাছে এত ভারী মনে হলো যে, তিনি যদি কোনো একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করতে নির্দেশ দিতেন, তাও আমার কাছে এরূপ ভারী মনে হতো না।’

আমি বললাম, ‘যে কাজ নবিজি ﷺ করে যাননি, সে কাজটি আপনারা কীভাবে করবেন?’

এরপর আবু বকর ﷺ বললেন, ‘আল্লাহর কসম, এ কাজ করাটাই কল্যাণকর হবে।’

আমি আমার কথায় অটল থেকে বারবার জোর দিতে লাগলাম। পরিশেষে আল্লাহ যেটা উপলব্ধি করার জন্য আবু বকর ও উমর ﷺ-এর বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, আমার বক্ষকেও তা উপলব্ধি করার জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন (অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা তাদের ন্যায় আমিও অনুভব করলাম)। এরপর আমি কুরআন সংগ্রহে লেগে গেলাম এবং হাড়, চামড়া, খেজুরের ডাল

ও বাকল এবং মানুষের বক্ষস্থল (অর্থাৎ মানুষের কাছে যা মুখস্থ ছিল, তা) থেকে তা সংগ্রহ করলাম।...^{১১২৯}

আলি বিন আবি তালিব রাঃ বলেন :

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الْمَصَاحِفِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ.

‘কুরআন সংকলনের কারণে সবচেয়ে বেশি সাওয়াব ও প্রতিদান পাবেন আবু বকর রাঃ। আল্লাহ তাআলা আবু বকর রাঃ-এর ওপর রহম করুন। তিনিই সর্বপ্রথম কুরআনকে মলাটবদ্ধ করেছেন।’^{১১৩০}

আলি রাঃ-এর এই উক্তি আবু বকর রাঃ-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা, সম্মানবোধ ও তাঁর খিলাফতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনের প্রমাণ বহন করে। এ ছাড়াও তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে মিথ্যাবাদী রাফিজি সম্প্রদায়ের বাতিল ধারণার অসারতা প্রমাণিত হয়।

মুআজ বিন জাবালকে ইয়ামানের বিচারপতি নিয়োগ করেছিলেন

হালাল-হারাম চেনার ক্ষেত্রে মুআজ বিন জাবাল রাঃ-এর অসাধারণ প্রতিভা ছিল। এ কারণেই রাসুল সঃ তাকে ইয়ামানের বিচারপতি নিয়োগ করেছিলেন।

আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ রাঃ বলেন, ‘ইয়ামানে আমাদের শিক্ষক ও আমির হিসেবে মুআজ বিন জাবাল রাঃ আসলেন। তখন আমরা তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, “এক ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় ওয়ারিশ হিসেবে একটি বোন ও একটি কন্যা-সন্তান রেখে গেছে, তার মিরাসের বণ্টন কীভাবে হবে?” তখন তিনি মৃতের সম্পদের অর্ধেক মেয়েকে এবং বাকি অর্ধেক বোনকে প্রদান করলেন।’^{১১৩১}

১১২৯. সহিহুল বুখারি : ৪৬৭৯।

১১৩০. আবু বকর বিন আবু দাউদ রচিত আল-মাসাহিফ : ১/৪৯। ফাতহুল বারি (৯/১২)-তে ইবনে হাজার রাঃ হাদিসটাকে হাসান বলেছেন।

১১৩১. সহিহুল বুখারি : ৬৭৩৪।

মুআজ বিন জাবাল ؓ-এর হিমসবাসী কতিপয় ছাত্র বর্ণনা করেন, ‘মুআজ ؓ-কে ইয়ামানের প্রশাসক হিসেবে পাঠানোর প্রাক্কালে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার নিকট কোনো মোকদ্দমা পেশ করা হলে তুমি কীভাবে তার ফয়সালা করবে?” তিনি উত্তর দিলেন, “আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করব।” রাসুল ﷺ বললেন, “যদি তুমি আল্লাহর কিতাবে তার স্পষ্ট কোনো সমাধান না পাও?” তিনি বললেন, “তখন আমি রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করব।” রাসুল ﷺ বললেন, “যদি তুমি রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ ও আল্লাহর কিতাবে তার কোনো সমাধান না পাও?” তিনি বললেন, “তখন আমি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ করব এবং এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ শিথিলতা করব না।” এ কথা শুনে রাসুল ﷺ মুআজ বিন জাবাল ؓ-এর বুকে হাত মেরে বললেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

“সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আল্লাহর রাসুলের দূতকে এমন বিষয়ের তাওফিক দিয়েছেন, যার ওপর আল্লাহর রাসুল সন্তুষ্ট।”^{১১৩২}

মুসআব বিন উমাইর ؓ-কে দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে মদিনায় পাঠিয়েছিলেন

রাসুল ﷺ মুসআব বিন উমাইর ؓ-কে তাঁর প্রথম দূত ও শিক্ষক মনোনীত করলেন। যেন তিনি মুসলমানদের দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ, ইসলামের বিধিবিধান ও কুরআন মাজিদ শিক্ষা দিতে পারেন এবং মদিনাবাসীকে আল্লাহর সরল পথে আহ্বান করতে পারেন। এ কারণেই মদিনাবাসী তাকে ‘মুকরি’ (কুরআন পাঠকারী) অভিধায় ভূষিত করেছিলেন।^{১১৩৩}

এ থেকে প্রমাণিত হয়, মদিনা বিজিত হয়েছিল কুরআনের মাধ্যমে, তরবারির জোরে নয়।

১১৩২. সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৯২, সুনানুত তিরমিজি : ১৩২৭; ইবনুল কাইয়িম ؒ হাদিসটাকে সহিহ বলেছেন।

১১৩৩. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪৩৪।

বারা বিন আজিব ؓ বলেন, ‘আমাদের নিকট সর্বপ্রথম আগমন করেছিলেন মুসআব বিন উমাইর ؓ ও আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ؓ। তারা দুজন লোকদের কুরআন শেখাতেন।’...^{১১৩৪}

কঠিন দায়িত্বসমূহ উচ্চ ও অভিজাত বংশীয় লোকদের কাঁধে ন্যস্ত করতেন

হিজরতের রাতে রাসুল ﷺ-তঁার বিছানায় শোয়ার কঠিন সে দায়িত্ব আলি ؓ-কেই দিয়েছিলেন।

যখন কুরাইশরা দারুন নাদওয়ার গোপন বৈঠকে রাসুল ﷺ-কে হত্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, তখন আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে নবিজি ﷺ-কে সে ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন।

তারপর রাসুল ﷺ আলি ؓ-কে সেই রাতে তঁার বিছানায় শয়ন করার নির্দেশ দিলেন। এদিকে শত্রুরা রাসুল ﷺ-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ির চতুর্দিক ঘিরে ফেলল। এমন সংকটময় মুহূর্তে আলি ؓ নবিজি ﷺ-এর বিছানায় গুয়ে পড়লেন। অথচ তিনি পূর্ণরূপে জানতেন যে, আজ রাতে এই বিছানায় শোয়া কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, শত্রুরা বিছানায় রাসুল ﷺ ও আলি ؓ-কে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, তারা রাসুল ﷺ মনে করে তাকে হত্যা করে ফেলবে।^{১১৩৫}

এমন ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক সাহসী ও বাহাদুর পুরুষের। আর রাসুল ﷺ আলি ؓ-এর সাহসিকতা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। এ জন্য এই কঠিন দায়িত্বটি তার কাঁধে ন্যস্ত করলেন।

অনুরূপভাবে খাইবার যুদ্ধে পতাকা বহন করার গুরুদায়িত্ব দেওয়ার জন্য আলি ؓ-কেই মনোনীত করেছিলেন।

আর খন্দকের যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর ভেতর প্রবেশ করে তাদের সংবাদ সংগ্রহ করার কঠিন ও চরম ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন হুজাইফা বিন ইয়ামান ؓ-কে।

১১৩৪. সহিহুল বুখারি : ৩৯২৫।

১১৩৫. সিরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪৮২।

ইবরাহিম তাইমি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘একবার আমরা হুজাইফা ؓ-এর সাথে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, “হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি কি রাসুল ﷺ-কে দেখেছেন এবং তাঁর সাহচর্য গ্রহণে ধন্য হয়েছেন?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, আমার ভাতিজা।”

লোকটি বললেন, “আল্লাহর কসম, আমরা যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে পেতাম, তবে তাঁর সঙ্গে পথ চলার সময় সময় তাঁকে আমাদের কাঁধে তুলে নিতাম। তাঁর সঙ্গে মিলে একত্রে যুদ্ধ করতাম এবং এতে কোনোরূপ পিছপা হতাম না।”

হুজাইফা ؓ বললেন, ‘তুমি তা-ই করতে? কিন্তু আমি তো খন্দক যুদ্ধের রাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। (সে রাতে) প্রচণ্ড বায়ু ও তীব্র শীত আমাদের কাবু করে ফেলেছিল। এমনই সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন :

أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

“ওহে, এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে শত্রুশিবিরের খবর এনে দেবে; আল্লাহর তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন?”

আমরা তখন চুপ করে রইলাম এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

অতঃপর রাসুল ﷺ রাতের একটি অংশ পর্যন্ত নামাজ পড়লেন। তারপর আমাদের নিকট এসে আবার বললেন :

أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

“ওহে, এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে শত্রুশিবিরের খবর এনে দেবে; আল্লাহর তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন?”

এবারও আমরা চুপ রইলাম এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তিনি আবার ঘোষণা করলেন :

أَلَا رَجُلٌ يَأْتِيَنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

“ওহে, এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে শত্রুশিবিরের খবর এনে দেবে; আল্লাহর তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে রাখবেন?”

এবারও আমরা চুপ করে রইলাম এবং আমাদের কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। আসলে আমরা সবাই চরম ঝুঁকি, অসহ্য ক্ষুধাযন্ত্রণা ও প্রচণ্ড শীতের কারণে সাড়া দিচ্ছিলাম না।

এবার তিনি বললেন, “হে হুজাইফা, ওঠো এবং আমাদের নিকট শত্রুপক্ষের খবর নিয়ে এসো।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন এবার আমার নাম ধরেই ডাক দিলেন, তাই ওঠা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

তিনি আরও বললেন :

يَا حُذَيْفَةُ، فَادْهَبْ فَادْخُلْ فِي الْقَوْمِ فَانْظُرْ مَا يَفْعَلُونَ، وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنَا

“হে হুজাইফা, তুমি গিয়ে শত্রুশিবিরের মাঝে ঢুকে পড়বে, তারপর তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবে। কিন্তু খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের কাছে আসা পর্যন্ত নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করো না।”

তারপর আমি যখন তাঁর নিকট থেকে প্রস্থান করলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে চলছি। এভাবে আমি তাদের (শত্রুপক্ষের) নিকট পৌঁছে গেলাম। তারপর আমি তাদের মাঝে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখতে পেলাম, ঘূর্ণিঝড় আর আল্লাহর সৈন্যরা যথেষ্ট কাজ করেছে। কাফিরদের ডেক-পাতিলগুলো এলোমেলো পড়ে আছে (সেগুলোতে কোনো খাবার নেই) আর না তাদের চুলায় আগুন আছে। তাদের তাঁবুগুলোও ঠিক নেই। তখন আবু সুফইয়ান বিন হারব দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, “হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমাদের প্রত্যেকে নিজের পাশের জনকে শনাক্ত করে নাও (যেন

কোনো গুপ্তচর থাকলে ধরা পড়ে যায়)। তখন আমি আমার পাশে থাকা লোকটির হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি কে?” সে বলল, “আমি অমুকের ছেলে অমুক।”

অতঃপর আবু সুফইয়ান বললেন, “হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আল্লাহর কসম, তোমরা অবস্থান করার মতো জায়গায় নেই। আমাদের রসদপাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। ওদিকে বনু কুরাইজা আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। এখন পর্যন্ত তাদের থেকে অসন্তোষজনক খবরই শুনতে পাচ্ছি আমরা। আর তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, আমরা এখন ঘূর্ণিঝড়ের কবলে। আল্লাহর কসম, না আমরা রান্না চড়াতে পারছি, না আগুন ধরাতে পারছি। তার ওপর তাঁরুও স্থাপন করা যাচ্ছে না। তাই তোমরা ফিরে চলো। কারণ আমি ফিরে যাব।”

অতঃপর তিনি তার উটের কাছে দাঁড়ালেন। উটটি বাঁধা ছিল। উটের ওপর বসে তিনি সেটার ওপর আঘাত করলেন। উটটি তিন-চারবার লাফিয়ে উঠল। অতঃপর রশি খুলে দিলে সেটি দাঁড়িয়ে গেল।

তখন আমি একটি তির তুলে ধনুকে সংযোজন করলাম। যেই আবু সুফইয়ানের প্রতি তির ছুড়তে যাব, তখনিই মনে পড়ে গেল, রাসুল ﷺ-এর সাবধানবাণী— “ওখানে নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করো না।” আমি নিশ্চিত, যদি আমি তখন তির নিক্ষেপ করতাম, তবে তির নির্ঘাত লক্ষ্যভেদ করত।’

অতঃপর আমি রাসুল ﷺ-এর নিকট ফিরে আসলাম। আসার সময় মনে হচ্ছিল, যেন আমি উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই পথ চলছি। তারপর যখন ফিরে এসে শত্রুদের খবর তাঁকে দিলাম এবং আমার দায়িত্ব থেকে অবসর হলাম, তখন আবার আমি শীতের তীব্রতা অনুভব করতে শুরু করলাম।

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ অতিরিক্ত একটি কম্বল দ্বারা আমাকে আবৃত করে দিলেন, যা তিনি সালাত আদায়ের সময় গায়ে দিতেন। তারপর আমি ভোর পর্যন্ত একটানা নিদ্রায় আচ্ছন্ন রইলাম। যখন ভোর হলো, তখন তিনি বললেন, “হে ঘুমকাতুরে! এখন উঠে পড়ো।”^{১১৩৬}

১১৩৬. সহিহ মুসলিম : ১৭৮৮, মুসনাদু আহমাদ : ২২৮২৩ (এখানে উভয়ের রিওয়াযাতের সমন্বিত রূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।)

‘তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে চলছি’—অর্থাৎ ওই সময় অন্যান্য মানুষ শীতের যে তীব্রতা অনুভব করছিল, তা তিনি অনুভব করছিলেন না। এ ছাড়াও তখন যে ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হচ্ছিল, তার তীব্র ঠান্ডাও তার অনুভূত হচ্ছিল না। বরং রাসুল ﷺ-এর আদেশ মান্য করার বরকত ও তাঁর দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করছিলেন।

তার প্রতি আল্লাহ তাআলা এই বিশেষ অনুগ্রহ রাসুল ﷺ-এর নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত জারি ছিল। যখন তিনি দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করলেন, তখন আবার তিনি সেই ঠান্ডা অনুভব করতে শুরু করলেন, যা অন্যরা পূর্ব থেকেই অনুভব করছিল। এটি রাসুল ﷺ-এর অন্যতম মুজিজা।^{১১৩৭}

রাসুল ﷺ এমন খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে এমন একটি কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য হুজাইফা রাদী-কেই বেছে নিয়েছেন। এর কারণ হলো, তিনি তার আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তি, বুদ্ধি ও সাহস সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন।

তার মাঝে একজন আত্মত্যাগী ও দুঃসাহসী সৈনিকের সবটুকু গুণ বিদ্যমান ছিল। ঝুঁকি ও শঙ্কার মধ্যে থেকে কীভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন। এ জন্যই তো, গভীর অন্ধকার ও ঠান্ডার তীব্রতা উপেক্ষা করে বিশাল সৈন্যবাহিনীর শিবিরে অকুতোভয় সৈনিকের মতো ঢুকে পড়তে এতটুকু বুক কাঁপেনি তাঁর। এই ঘটনা তার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি তার ইমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তাকেও স্পষ্ট করে তোলে।^{১১৩৮}

সাহাবিদের মাঝে তাঁদের অবস্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট করে দিতেন

আনাস বিন মালিক রাদী থেকে বর্ণিত, ‘উল্হদ যুদ্ধের দিন রাসুল ﷺ একটি তরবারি হাতে নিলেন এবং বললেন, “আমার নিকট থেকে এটি কে গ্রহণ করবে?”

তখন উপস্থিত সবাই “আমি নেব, আমি নেব” বলে হাত প্রসারিত করল।

১১৩৭. ইমাম নববি রহ. কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১২/১৪৬।

১১৩৮. মুহাম্মাদ সাদিক আরজুন কৃত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ : ৪/১৯৭। (কিছুটা পরিবর্তন করে উপস্থাপিত)

রাসুল ﷺ বললেন, “এটির হক আদায় করার শর্তে কে গ্রহণ করবে?”

এ কথা শুনে সবাই দমে গেল। কিন্তু সিমাক বিন খারসা আবু দুজানাহ ﷺ বললেন, “এটার হক আদায় করার শর্তে আমি গ্রহণ করব।”

অতঃপর তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং তার মাধ্যমে মুশরিকদের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন।^{১১৩৯}

তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে তাদের প্রশংসা করতেন

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِي بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفَرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

‘আমার উম্মাহর প্রতি সর্বাধিক দয়ালু ব্যক্তি হলো আবু বকর। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সর্বাধিক কঠোর ব্যক্তি হলো উমর। সর্বাধিক লজ্জাশীল ব্যক্তি উসমান। সবচেয়ে বিচক্ষণ বিচারক আলি বিন আবু তালিব। সর্বোত্তম কুরআন পাঠকারী উবাই বিন কাব। হালাল-হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হলো মুআজ বিন জাবাল। ফারায়িজ-সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি হলো জাইদ বিন সাবিত। আর শুনে রাখো, প্রত্যেক উম্মাহর একজন বিশ্বস্ত মানুষ থাকে, আর এই উম্মাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলো আবু উবাইদা বিন জাররাহ (ﷺ)।^{১১৪০}

অনুরূপভাবে সালামা বিন আকওয়া ﷺ-এর গুণের কারণে তার প্রশংসা করেছিলেন।

১১৩৯. সহিহ মুসলিম : ২৪৭০।

১১৪০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৯১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৫৫।

সালামা বিন আকওয়া   বলেন, ‘আমরা রাসুলুল্লাহ  -এর সাথে হুদাইবিয়ায় পৌঁছালাম। সংখ্যায় আমরা চোদ্দো-শ জন ছিলাম। এ ছাড়াও আমাদের সাথে ছিল পঞ্চাশটি ছাগল—যেগুলোকে পানি পান করাবার জন্য পর্যাপ্ত পানি ছিল না।

তখন রাসুলুল্লাহ   কুয়ার কিনারায় বসলেন এবং দোয়া করলেন অথবা তাতে থুথু দিলেন। তখন সাথে সাথে কুয়ার পানি উথলে উঠল। তখন আমরাও পানি পান করলাম এবং (পশুদেরকেও) পানি পান করলাম।

তারপর রাসুলুল্লাহ   আমাদের বাইআত করানোর জন্য গাছতলায় ডাকলেন। অতঃপর লোকদের মধ্যে আমি সবার আগে বাইআত হলাম। তারপর একে একে অন্যান্য লোকও বাইআত হলো। তিনি যখন অর্ধেক লোক থেকে বাইআত গ্রহণ সম্পন্ন করলেন, তখন বললেন, “হে সালামা, তুমি বাইআত হও।” আমি বললাম, “লোকদের মধ্যে প্রথমেই আমি বাইআত হয়েছি ইয়া রাসুলুল্লাহ!” তিনি বললেন, “আবারও হও না!”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘তখন রাসুলুল্লাহ   আমাকে অস্ত্রহীন অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাই তিনি আমাকে একটি ঢাল দান করলেন।’

‘তিনি সকল মানুষ থেকে বাইআত গ্রহণ সম্পন্ন করার পর আমাকে বললেন, “তুমি কি আমার কাছে বাইআত হবে না, হে সালামা?” আমি বললাম, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি তো লোকদের মধ্যে প্রথমভাগে এবং মধ্যভাগে (দুই-দুবার) আপনার কাছে বাইআত হয়েছি।” তিনি বললেন, “আবারও হও না!”

তখন আমি তৃতীয়বার বাইআত হলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, “হে সালামা, তোমার সেই ঢালটি কোথায়, যা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম?” আমি বললাম, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমার সাথে আমার চাচা আমিরের অস্ত্রবিহীন অবস্থায় দেখা হলে আমি তাকে তা দিয়ে দিয়েছি।” এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ   হেসে দিলেন এবং বললেন :

“তুমি তো দেখছি সেই লোকের মতো, যে বলে, “হে আল্লাহ, আমি এমন একজন বন্ধু চাই, যে আমার প্রাণের চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় হবে।”

এরপর মুশরিকরা আমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল। আমাদের একপক্ষের লোকজন অন্যপক্ষের শিবিরে যাতায়াত করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত আমরা উভয়পক্ষ পরস্পর সন্ধিবদ্ধ হলাম।’

সালামা ﷺ বলেন, ‘তারপর যখন আমরা ও মক্কাবাসীরা সন্ধিতে আবদ্ধ হলাম এবং আমাদের একপক্ষ অপরপক্ষের সাথে মেলামেশা করতে লাগলাম, তখন আমি একটি গাছতলায় গিয়ে তার নিচের কাঁটা প্রভৃতি পরিষ্কার করে তার গোড়ায় বিশ্রাম নিতে লাগলাম। এমন সময় মক্কাবাসী চারজন মুশরিক এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে অপ্রীতিকর কথা বলতে লাগল। তাদের প্রতি আমার খুব ঘৃণা জন্মাল, তাই আমি স্থান পরিবর্তন করে আর একটি গাছের তলায় চলে গেলাম। তারা তাদের অস্ত্র গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে গুয়ে পড়ল। এমন সময় প্রান্তরের নিম্নাঞ্চল থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল, “হে মুহাজিরগণ, সাহায্য! ... ইবনে জুনাইম নিহত হয়েছে।”

আমি তৎক্ষণাৎ আমার তরবারি উঠিয়ে ধরলাম এবং ওই চারজনের ওপর আক্রমণ চালালাম। তখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। আমি তাদের অস্ত্রগুলি হস্তগত করলাম এবং তা আঁটি বেঁধে আমার হাতে নিলাম। অতঃপর আমি বললাম, “যে মহান সত্তা মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্মানিত করেছেন—তঁার কসম, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মাথা তোলে, তবে তার সেই অঙ্গে আঘাত (করে বিচ্ছিন্ন) করব, যেখানে তার দুচোখ রয়েছে (অর্থাৎ ঘাড়ে)।

তারপর তাদের আমি হাঁকিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলাম। ইত্যবসরে আমার চাচা আমিরও “আবালাত” গোত্রের মিকরাজ নামক এক ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন। লোকটি আঘাতনিরোধক বস্ত্রাবৃত একটি ঘোড়ায় আসীন ছিল। তার সাথে সত্তরজন মুশরিক ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, “ওদের ছেড়ে দাও, যাতে অপকর্মের সূচনা ওদের পক্ষ থেকেই হয় এবং পুনরাবৃত্তিও তারাই করে।”

এ কথা বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের ক্ষমা করে দিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন :

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ
بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

“তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন, তাদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা দেখেন।”^{১১৪১}

অতঃপর আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্তনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। পথে এমন একটি মনজিলে আমরা অবতরণ করলাম, যেখানে আমাদের ও লিহয়ান গোত্রের মধ্যে কেবল একটি পাহাড়ের ব্যবধান ছিল। আর তারা ছিল মুশরিক। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, যে ব্যক্তি রাতে নবিজি ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের পক্ষ থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাহাড়ের ওপরে আরোহণ করবে।’

সালামা ﷺ বলেন, ‘সে রাতে আমি দুই কি তিনবার ওই পাহাড়ে আরোহণ করেছিলাম। তারপর আমরা মদিনায় ফিরে এলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর গোলাম রাবাহকে দিয়ে তাঁর উটগুলো পাঠালেন। আর আমিও তালহা ﷺ-এর ঘোড়ায় চেপে তাঁর সাথে সাথে উটগুলো চারণভূমির দিকে নিয়ে গেলাম ঘাস-পানি খাওয়ানোর জন্য।

পরদিন ভোরে আব্দুর রহমান ফাজারি চড়াও হয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত উট ছিনিয়ে নিয়ে গেল এবং তাঁর রাখালকে হত্যা করল। আমি তখন রাবাহকে বললাম, “হে রাবাহ, লও এই ঘোড়া নিয়ে তুমি তালহা বিন উবাইদুল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে আর রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সংবাদ দেবে যে, মুশরিকরা তাঁর চারণভূমির উটগুলো লুটে নিয়ে গেছে।” অতঃপর আমি একটি টিলার ওপর দাঁড়ালাম। তারপর মদিনার দিকে মুখ করে তিনবার হাক দিলাম, “ইয়া সাবাহাহ!” (অর্থাৎ আজ সকালে আক্রমণ হয়েছে।)

তারপর আমি লুটেরাদের পিছু ধাওয়া করলাম এবং তাদের ওপর তির নিষ্ক্ষেপ করতে লাগলাম। তখন আমি আবৃত্তি করছিলাম :

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ *** وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعِ

“আমি আকওয়ার পুত্র। আজ নিকৃষ্ট লোকদের ধ্বংসের দিন।”

তখন আমি তাদের যে কাউকে পেয়েছি, তার ওপর এমনভাবে তির নিক্ষেপ করেছি যে, তিরের অগ্রভাগ তাঁর কাঁধের কোমল হাড় ছেদ করে বেরিয়ে গেছে। আর আমি বলতে লাগলাম :

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ *** وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعِ

“এ আঘাত নাও! আমি আকওয়ার পুত্র, আজ ইতর লোকদের ধ্বংসের দিন।”

আল্লাহর কসম, আমি তির নিক্ষেপ করতে থাকলাম এবং ঘায়েল করতে লাগলাম এবং যখনই কোনো ঘোড়সওয়ার আমার দিকে ফিরত, তখনই আমি গাছের আড়ালে এসে তার গোড়ায় বসে তাঁর প্রতি তির নিক্ষেপ করতাম আর তাকে জখম করে ফেলতাম।

অবশেষে যখন তারা পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে আসলো এবং সে সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করল, আমি তখন পাহাড়ের ওপর উঠে সেখান থেকে (অবিরাম) তাদের ওপর পাথর গড়িয়ে দিতে থাকলাম। এভাবে আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকলাম, যে পর্যন্ত না আল্লাহর সৃষ্ট উটগুলোর প্রতিটি উট, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভারবাহীরূপে ছিল, তা আমার পেছনে রেখে না যায়।

তারা উটগুলো আমার জন্য ছেড়ে চলে গেল। তারপরও আমি তাদের টার্গেট করে, তাদের দিকে তির নিক্ষেপ করতে থাকলাম। এমনকি তারা ত্রিশটির বেশি চাদর এবং ত্রিশটি বল্লম নিজেদের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে ফেলে গেল। তারা যেসব বস্ত্র ফেলে যাচ্ছিল, আমি তার প্রত্যেকটিকে পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে যাচ্ছিলাম, যাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তা চিনতে পারেন।

অবশেষে তারা পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে পৌঁছাল। এমন সময় বদর ফাজারির অমুক পুত্র এসে তাদের সাথে মিলিত হলো। এবার তারা সকলে মিলে সকালের খাবার খেতে বসল। আমি পাহাড়ের একটি শৃঙ্গে বসে

পড়লাম। তখন ফাজারি বলল, “ওই যে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি, সে কে?” তারা বলল, “লোকটির হাতে আমাদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আল্লাহর কসম, সেই রাতের অন্ধকার থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত লোকটা আমাদের পেছন থেকে সরছে না। সে আমাদের প্রতি (অবিরাম) তির নিক্ষেপ করেছে, এমনকি আমাদের সর্বস্ব সে কেড়ে নিয়েছে।” তখন সে বলল, “তোমাদের মধ্য থেকে চারজন গিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হও।” তখন তাদের চার ব্যক্তি পাহাড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

তারপর তারা যখন আমার কথা শোনার মতো নিকটবর্তী স্থানে এসে পৌঁছাল, তখন আমি বললাম, “তোমরা কি আমাকে চেনো?” তারা বলল, “না, তুমি কে?” আমি বললাম, “আমি সালামা বিন আকওয়া। কসম সেই পবিত্র সত্তার—যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্মানিত করেছেন, আমি তোমাদের যাকেই পেতে চাইব, (লক্ষ্য বানাব) তাকে ধরে ফেলব। কিন্তু তোমাদের কেউ চাইলেই আমাকে ধরতে পারবে না।” তখন তাদের একজন বলল, “আমিও তা-ই মনে করি।”

তারপর তারা ফিরে গেল। আর আমি সেই স্থানেই বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর আমি গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অশ্বারোহীদের অগ্রসর হতে দেখলাম। তাদের মধ্যে সবার আগে ছিলেন আখরাম আসাদি, তার পেছনে আবু কাতাদা আনসারি। তার পেছনে মিকদাদ বিন আসওয়াদ কিনদি।

তাঁরা এসে পৌঁছালে আমি আখরামের ঘোড়ার লাগাম ধরলাম। ততক্ষণে শত্রুরাও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেল। আমি বললাম, “হে আখরাম, ওদের থেকে সতর্ক থাকবে। তারা যেন রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ এসে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে।” আখরাম বললেন, “হে সালামা, তুমি যদি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য মনে করো, তবে আমার এবং শাহাদতের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করো না।”

তখন আমি তাঁর পথ ছেড়ে দিলাম। তখন তিনি আবদুর রহমানের সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। আখরাম আবদুর রহমানের ঘোড়াকে আহত করলেন

আর আব্দুর রহমান বর্শার আঘাতে তাকে শহিদ করে দিল এবং আখরামের ঘোড়ার ওপর চড়ে বসল। ইতিমধ্যে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোড়া সাওয়ার আবু কাতাদা ؓ এসে পৌঁছালেন। তিনি আব্দুর রহমানকে বর্শার আঘাতে হত্যা করলেন। সেই পবিত্র সত্তার কসম—যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন, আমি তখন এতই দ্রুতগতিতে তাদের পিছু ধাওয়া করে যাচ্ছিলাম যে, আমার পেছনে (অনেক দূর পর্যন্ত) মুহাম্মাদ ﷺ-এর কোনো সাহাবিকেই দেখতে পাচ্ছিলাম না, এমনকি তাদের ঘোড়ার খুরের ধুলিও আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। এভাবে চলতে চলতে সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তারা এমন একটি গিরিপথে উপনীত হলো, যেখানে জু-কারাদ নামক একটি প্রস্রবণ রয়েছে। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তারা পানি পান করতে অবতরণ করল। তখন তারা আমাকে তাদের পিছু ধাওয়া করে দৌড়ে আসতে দেখতে পেল। আমাকে দেখে তারা পালিয়ে গেল। এভাবে এক জায়গায় পানি পান করার পূর্বেই আমি সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দিলাম। তখন তারা পাহাড়ের একটি ঢালু উপত্যকার দিকে দৌড়াতে লাগল আর আমিও তাদের পিছু ধাওয়া করতে লাগলাম।

আমি তাদের একজনের নিকটবর্তী হলে তাঁর কাঁধের অস্থিতে তির নিক্ষেপ করে বললাম :

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ *** وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرِّضْعِ

“এ আঘাত নাও! আমি আকওয়ার পুত্র, আজ ইতর লোকদের ধ্বংসের দিন।”

সে তখন বলল, “তোমার মা সন্তানহারা হোক! তুমি কি সেই আকওয়া, যে আমাদের ভোর থেকে অতিষ্ঠ করে রেখেছে?” আমি বললাম, “হ্যাঁ, আমার জানের দুশমন, আমি সেই ভোরবেলার আকওয়া-ই।”

অতঃপর তারা দুটি ক্লান্ত ঘোড়া উপত্যকায় ছেড়ে চলে গেল। তখন আমি ঘোড়া দুটিকে হাঁকিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এলাম।

সেখানে আমার একটি অল্প দুধভর্তি পাত্র এবং একটি পানিভর্তি পাত্র নিয়ে আমার সাথে মিলিত হলেন। আমি তখন অজু করলাম এবং দুধ পান করলাম। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি ওই পানির কাছে ছিলেন, যে পানির কাছ থেকে আমি মুশরিকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ওই সমস্ত উট ও মুশরিকদের নিকট থেকে আমার ছিনিয়ে আনা বর্শা ও চাদর প্রভৃতি হস্তগত করলেন। তখন বিলাল রহীম লোকদের কাছ থেকে আমার উদ্ধারকৃত একটি উট জবাই করলেন এবং তার কলিজা ও কুঁজ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ভুনছিলেন।

আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন, যেন আমি আমাদের লোকদের থেকে একশ জনকে বাছাই করে নিয়ে সেই দুশমনদের পিছু ধাওয়া করতে পারি এবং তাদের সকলকে এমনভাবে হত্যা করতে পারি যে, তাদের খবর বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবে না।”

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হাসলেন যে, চুলার আগুনের আভায় তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশ পেল। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “হে সালামা, তুমি কি তা-ই করতে চাও?” আমি বললাম “হ্যাঁ, সেই পবিত্র সত্তার শপথ— যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন।” নবিজি ﷺ তখন বললেন, “এতক্ষণে তো তারা গাতফান পল্লীতে আতিথ্য ভোগ করছে।”

পরে গাতফান গোত্রের একটি লোক এসে জানাল, “অমুক ব্যক্তি তাদের জন্য একটি উট জবাই করেছে। যখন তারা উটের চামড়া ছাড়াচ্ছিল, তখন তারা ধুলোরাশি উড়তে দেখতে পেল। তখন তারা বলে উঠল, “ওরা (আকওয়া ও তার বাহিনী) তোমাদের নিকট এসে পড়েছে।” এই বলে তারা পালিয়ে গেল।”

সকালবেলা রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আমাদের আজকের সেরা অশ্বারোহী সৈন্য হচ্ছে, আবু কাতাদা আর আমাদের সেরা পদাতিক হচ্ছে সালামা।”

তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে অশ্বারোহী ও পদাতিক হিসেবে গনিমতের দুই অংশ দিলেন। আমাকে তিনি একত্রে দুই অংশ দিলেন। তারপর মদিনায় ফিরে আসার সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর সাথে তাঁর উষ্ট্রী “আজবা”-এর পেছনে

বসালেন। তারপর যখন আমরা পথ চলতে লাগলাম—এমন সময় আনসারের এমন এক ব্যক্তি যাকে দৌড়ে কেউ পরাজিত করতে পারত না, সে বলতে লাগল, “কেউ কি আছে, যে মদিনায় সবার পূর্বে পৌঁছার ব্যাপারে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করবে?” এ কথাটি সে বারবার বলছিল। যখন আমি তার এ (চ্যালেঞ্জমূলক) কথাটি শুনলাম, তখন বললাম, “তুমি কি কোনো সম্মানিত লোককে সম্মান দিতে জানো না বা কোনো ভদ্রলোককেই পরোয়া করবে না?” সে বলল, “রাসুলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্য কাউকে আমি পরোয়া করি না।” আমি বললাম, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আপনি আমাকে এই ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দিন।”

তখন তিনি বললেন, “তোমার মন চাইলে করতে পারো।” তখন আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বললাম, “আমি তোমার নিকট আসছি।” এই বলে আমি লাফ দিয়ে দিলাম এক দৌড়। তারপর তাকে ধরতে এক বা দুই টিলা অতিক্রম করার দূরত্ব পর্যন্ত নিজের দম নিয়ন্ত্রণে রেখে তার পিছু পিছু দৌড়ালাম। আরও দুই এক টিলা পর্যন্ত নিজের মতো করে দৌড়ানোর পর গতি বাড়িয়ে দিলাম এবং তার নিকট পৌঁছে গেলাম। অতঃপর তার কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ঘুষি মেরে বললাম, “ওহে, আল্লাহর কসম, তোমাকে আজ হারাবই আমি।” তখন সে বলল, “আমিও তা-ই মনে করছি।”

অতএব আমি তার পূর্বেই মদিনায় পৌঁছে গেলাম। আল্লাহর কসম, এরপর মাত্র তিন দিন মদিনায় অবস্থান করেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা খাইবারের দিকে বেরিয়ে পড়লাম।

তখন আমার চাচা আমির ﷺ প্রেরণামূলক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন :

لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

فَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنَّ لَأَقَيْنَا

وَأَنْزَلْنٰ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

“আল্লাহর কসম, যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমরা হিদায়াত পেতাম না এবং সাদাকা দেওয়া ও নামাজ পড়ার তাওফিক পেতাম না।

আমরা আপনার অনুগ্রহ থেকে কখনো অমুখাপেক্ষী হতে পারি না, তাই আপনি আমাদের কদম দৃঢ় রাখুন, যখন আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হই এবং আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি বর্ষণ করুন।”

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “এ ব্যক্তি কে?” তিনি বললেন, “আমি আমির।” রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমার রব তোমাকে ক্ষমা করুন।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন কারও জন্য বিশেষভাবে মাগফিরাতের দোয়া করতেন, সে শহিদ হতো। তখন নিজ উটের ওপর থেকে উমর বিন খাত্তাব ؓ ডেকে বললেন, “হে আল্লাহর নবি, আমিরকে দিয়ে যদি আমাদের আরও উপকার করতেন!”’

‘তারপর যখন আমরা খাইবারে উপস্থিত হলাম, তখন খাইবার অধিপতি মারহাব তরবারি দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে এল এবং বলল :

“খাইবার জানে যে, আমি মারহাব, পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক বীরপুরুষ। যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন সে টগবগিয়ে ওঠে।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘তখন আমার চাচা আমির ؓ ছন্দে ছন্দে বললেন :

“খাইবার জানে যে, আমি আমির, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত যুদ্ধে অবতীর্ণ এক বীর বাহাদুর ও নির্ভীক ব্যক্তি।”

অতঃপর তাদের দুজনের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়ে গেল। আমির নিচ থেকে যখন তাকে আঘাত করতে চাইলেন, তখন তা ফিরে এসে তাঁর নিজের ওপর লাগল। এতে তার পায়ের গোছার সংযোগ-শিরা কেটে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

তখন আমি বের হলাম। বাইরে শুনতে পেলাম, নবিজি ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবি বলাবলি করছেন, “আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। কারণ, সে আত্মহত্যা করেছে।” তখন আমি কাঁদতে কাঁদতে নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, “ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমিরের আমলগুলি কি বরবাদ হয়ে গেল?” রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “এ কথা কে বলেছে?” আমি বললাম, “আপনারই কয়েকজন সাহাবি।” তিনি বললেন, “যারা এরূপ বলেছে, তারা মিথ্যা বলেছে। সে দুবার প্রতিদান পাবে।”

অতঃপর তিনি আমাকে আলি ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। তখন তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

“আমি এমন এক ব্যক্তিকে (আজ) পতাকা সমর্পণ করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে (অথবা বললেন) এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলও তাকে ভালোবাসে।”

তিনি বলেন, “তারপর আমি আলি ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং তাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখনও তাঁর চোখ ব্যথা করছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে থুথু দিলেন আর তাতেই তার রোগ ভালো হয়ে গেল। অতঃপর রাসুল ﷺ তার (আলির) হাতে পতাকা তুলে দিলেন।

তখন মারহাব বেরিয়ে এল এবং কবিতা আওড়াতে লাগল :

“খাইবার জানে যে, আমি মারহাব, যুদ্ধের অস্ত্রে সজ্জিত এক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বীর বাহাদুর ব্যক্তি—যখন যুদ্ধ তাঁর লেলিহান শিখা নিয়ে অগ্রসর হয়।”

তখন আলি ﷺ বললেন :

“আমি সেই ব্যক্তি যাকে আমার মা ‘হাইদার’ (সিংহ) নাম রেখেছেন, যাকে দেখতে বন্য সিংহের মতো ভয়ংকর লাগে। আমি তাদের (দুশমনদের) প্রতিদান দিই বড় বড় পাত্র দিয়ে (অর্থাৎ তাদের অবলীলায় হত্যা করি)।”

এরপর তিনি মারহাবের মাথায় তলোয়ার মারলেন এবং তাকে হত্যা করলেন ।
তারপর তারই হাতে (খাইবার) বিজয় হলো ।’^{১১৪২}

নববি  বলেন, ‘এই হাদিসে রাসুল -এর চারটি মুজিজা বিবৃত হয়েছে :

১. হুদাইবিয়া কূপের পানি বৃদ্ধি পাওয়া ।
২. আলি -এর চক্ষু ভালো হয়ে যাওয়া ।
৩. ভবিষ্যদ্বাণী করা যে, তার হাতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন ।
৪. এই সংবাদ দেওয়া যে, তারা গাতফান গোত্রের মেহমান হয়েছে—যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে ।’^{১১৪৩}

তারা সুন্দর কিছু উদ্ভাবন করলে তার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করতেন

হানশ বিন মুতামির  থেকে বর্ণিত, ‘আলি  ইয়ামানে থাকা অবস্থায় কিছু লোক সিংহ ধরার জন্য গর্ত খনন করল । অতঃপর সেখানে একটি সিংহ পতিত হলো । লোকজন কৌতূহলী হয়ে সিংহটিকে দেখতে লাগল, তখন সেখানে একজন ব্যক্তি পড়ে গেল । পতিত লোকটি (পড়ে যাওয়ার সময়) এক ব্যক্তিকে টেনে ধরল, সে আরেকজনকে এবং সে আরেকজনকে টেনে ধরলে তারা চারজনই গর্তে পতিত হলো । তখন সিংহটি তাদের আহত করল ।

তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি বর্শা নিয়ে সিংহের মুখোমুখি হলো এবং তাকে মেরে ফেলল । কিন্তু ততক্ষণে সিংহের আঘাতে চার ব্যক্তিই মারা গেল ।’

বর্ণনাকারী বলেন, ‘এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে ঝগড়া বেধে গেল এবং একপর্যায়ে তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিল । সেই মুহূর্তে আলি  তাদের নিকট গিয়ে বললেন, “রাসুল -এর জীবদ্দশাতেই তোমরা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চাও? আমি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিচ্ছি, সেটা তোমাদের মনঃপূত হলে তো ভালো কথা, নতুবা তোমরা লড়াই থেকে বিরত থেকে রাসুল -এর কাছে যাও । তিনিই তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন । এরপরেও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তার কোনো অধিকার নেই ।

১১৪২. সহিহ মুসলিম : ১৮০৭ ।

১১৪৩. ইমাম নববি  কৃত শারহ সহিহ মুসলিম : ১২/১৮৬ ।

(আমার ফয়সালা হলো) যে সকল গোত্রের লোক গর্তটি খনন করেছে, তাদের নিকট থেকে এক দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ, আরেক দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ, আরেক দিয়াতের অর্ধাংশ এবং আরেকটি পূর্ণ দিয়াত একত্র করো। তারপর প্রথমজনকে এক-চতুর্থাংশ, দ্বিতীয়জনকে এক-চতুর্থাংশ, তৃতীয়জনকে অর্ধেক এবং চতুর্থজনকে পূর্ণ দিয়াত দান করো।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘তখন কিছু লোক তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হলো এবং কিছু লোক সন্তুষ্ট হতে পারল না। তারা বিষয়টি রাসুল ﷺ-এর নিকট পেশ করার জন্য তাঁর কাছে গেলেন। তখন রাসুল ﷺ মাকামে ইবরাহিমের পাশে ছিলেন। তারা তাঁকে ঘটনার বিবরণ শোনাল।

রাসুল ﷺ “আমি তোমাদের বিবাদ মিটিয়ে দিচ্ছি” বলে ঠেস দিয়ে বসলেন।

তখন আগন্তুকদের একজন বললেন, “আলি ﷺ আমাদের এই বিবাদের ফয়সালা করেছেন।” এই বলে লোকটি আলি ﷺ-এর ফয়সালায় বিবরণ শোনাল। তখন রাসুল ﷺ আলি ﷺ-এর ফয়সালাকে যথার্থ বলে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।”^{১১৪৪}

আলি ﷺ-এর ফয়সালা যথার্থ হওয়ার কারণ হলো, নিহত চারজনই উপস্থিত লোকদের অনিচ্ছাকৃত ধাক্কাধাক্কির ফলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তাই উপস্থিত সবার ওপর অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত ওয়াজিব হলো। প্রথমজন অনিচ্ছাকৃত ধাক্কাধাক্কির কারণে নিহত, আবার সে টেনে ধরার কারণে বাকি তিনজনের হত্যাকারী। তাই সে নিহত হওয়ার কারণে দিয়াত পাবে, কিন্তু বাকি তিনজনকে হত্যা করার কারণে তিন-চতুর্থাংশ সেখান থেকে বাদ যাবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ পাওয়ার কারণ হলো, বাকি দুই-তৃতীয়াংশ বাকি দুজনকে হত্যা করার কারণে বাদ যাবে।

তৃতীয় ব্যক্তি অর্ধেক পাওয়ার কারণ হলো, বাকি অর্ধেক একজনকে হত্যা করার কারণে বাদ যাবে।

আর চতুর্থ ব্যক্তি পূর্ণ দিয়াত পাবে। কারণ, সে কাউকে হত্যা করেনি।

ইবনুল আরাবি رحمته বলেন, ‘এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম উদ্ভাবনী ফয়সালা।’

রাসুল ﷺ তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه-এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। কারণ, তিনি তার মাঝে এমন কিছু গুণ দেখতে পেয়েছিলেন, যা তার মেধা ও প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, “রাসুল ﷺ আমাকে তাঁর বন্ধের সাথে লাগালেন এবং বললেন :

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ

“হে আল্লাহ, একে হিকমত (দ্বীনি প্রজ্ঞা বা ইলমে ফিকহ) দান করুন।”^{১১৪৫}

অপর বর্ণনায় আছে, ‘রাসুল ﷺ শৌচাগারে প্রবেশ করলেন, তখন আমি তাঁর জন্য অজুর পানি রাখলাম। তিনি বললেন, “পানি কে রেখেছে?” কে রেখেছে তা জানতে পেরে তিনি বললেন :

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের ফিকহ বা প্রজ্ঞা দান করুন।”^{১১৪৬}

অপর বর্ণনায় এসেছে, ‘রাসুল ﷺ মাইমুনা رضي الله عنها-এর গৃহে ছিলেন। তখন রাতে আমি তাঁর জন্য অজুর পানি রাখলাম। তখন মাইমুনা رضي الله عنها বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস আপনার জন্য অজুর পানি রেখেছে।” তখন তিনি বললেন :

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ

“হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের ফিকহ ও প্রজ্ঞা এবং তাফসিরের ইলম দান করুন।”^{১১৪৭}

১১৪৫. সহিহুল বুখারি : ২৩৫৬।

১১৪৬. সহিহুল বুখারি : ১৪৩, সহিহ মুসলিম : ২৪৭৭।

১১৪৭. মুসনাদু আহমাদ : ৩০২৪।

নববি ﷺ বলেন, ‘এই হাদিসে ইলমে ফিকহের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এবং এও বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ কোনো উপকার করলে তার জন্য দোয়া করা মুসতাহাব।’

তার জন্য রাসুল ﷺ যে দোয়া করেছিলেন, তা কবুল হয়েছিল, ফলে তিনি ইলমে ফিকহে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।^{১১৪৮}

ইবনে মুনির ﷺ বলেন, ‘পানি রাখার কারণে দ্বীনের ফিকহ অর্জনের দোয়া করার মাঝে সামঞ্জস্য হলো, এমন অবস্থায় সাধারণত তিন ধরনের কাজ করা সম্ভব ছিল : ১. পানি শৌচাগারে রেখে আসা। ২. দরোজায় পানি রাখা, যেন তিনি সহজে পানি পেয়ে যান। ৩. কিছু না করা। তিনি দ্বিতীয়টা বেছে নিলেন। কারণ, প্রথমটি করলে পানির ব্যাপারে রাসুল ﷺ-কে জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হতো। তৃতীয়টি করলে তাঁর পানি পেতে কষ্ট হতো। তাই তিনি দ্বিতীয়টিই বেছে নিলেন। এতে তার মেধা ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এ জন্য রাসুল ﷺ তার জন্য দ্বীনি ফিকহ অর্জনের দোয়া করেছেন, যাতে তার মাধ্যমে তিনি উপকৃত হতে পারেন। আর ঠিক তা-ই হয়েছে।’^{১১৪৯}

ফলে ইবনে আব্বাস ﷺ হয়ে উঠলেন সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মুফাসসির, অথচ তিনি বয়সে ছোট ছিলেন। হিজরতের মাত্র তিন বছর পূর্বেই তার জন্ম হয়। তবে রাসুল ﷺ ও তাঁর সহধর্মিণী মাইমুনা ﷺ-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার সুবাদে খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি নিয়মিত রাসুল ﷺ-এর সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার ওপর রাসুল ﷺ তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেছেন। এসব কারণে তিনি প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন হয়ে ওঠেন।

রাসুল ﷺ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তখন ইবনে আব্বাস ﷺ-এর বয়স ছিল তেরো বছর।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলতেন, ‘কুরআনের উত্তম ভাষ্যকার হলেন ইবনে আব্বাস ﷺ।’^{১১৫০}

১১৪৮. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১৬/৩৭।

১১৪৯. ফাতহুল বারি : ১/২৩২।

১১৫০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৬২৯১।

ইবনে উমর রা বলেন, ‘মুহাম্মাদ সা-এর ওপর নাজিলকৃত বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি হলেন ইবনে আব্বাস রা।’^{১১৫১}

রাসুল সা তাকে (ইবনে আব্বাস রা) আপন সওয়ারির ওপর নিজের পেছনে বসাতেন

ইবনে আব্বাস রা বলেন, ‘একদিন আমি রাসুল সা-এর পেছনে ছিলাম। তিনি বললেন :

يَا غُلَامُ إِنِّي أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ، أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ
تُجَاهَكَ، [تَعْرِفُ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ] إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ
اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ
يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا
عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ،
رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ [وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ
خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا]

“হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি : আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাজত করো, তিনি তোমার হিফাজত করবেন। আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাজত করো, তাঁকে তোমার পাশে পাবে। [সচ্ছলতার সময় তাঁর সাথে পরিচিত হও, অসচ্ছলতার সময় তিনি তোমাকে চিনবেন।] কিছু চাইতে হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাও এবং সাহায্য কামনা করতে হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করো।

আর জেনে রাখো, সকল মানুষ যদি একত্রিত হয়ে তোমার উপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ তাআলা যা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন, সেটা ছাড়া কোনো উপকার করতে পারবে না; আর যদি

সকল মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তবে আল্লাহ তাআলা যা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন, সেটা ছাড়া কোনো ক্ষতি পারবে না।

(তাকদির লেখার) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। [অপছন্দনীয় বিষয়ের (বিপদাপদের) ওপর ধৈর্যধারণ করলে অনেক কল্যাণ অর্জিত হয়। আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যের মাঝে নিহিত, সচ্ছলতা কষ্ট-মেহনতের মাঝে নিহিত। আর নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।]”^{১১৫২}

আমিরুল মুমিনিন উমর রাঃ-ও তার প্রতিভার মূল্যায়ন করতেন। তাকে নিজের পাশে রাখতেন।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ বলেন, ‘আমাকে উমর রাঃ বড় বড় বদরি সাহাবিদের সাথে বসাতেন। একদিন তাঁদের একজন অস্বস্তি প্রকাশ করে বললেন, “ও আমাদের সাথে বসে কেন, ও তো আমাদের ছেলেদের সমবয়সী?” তখন উমর রাঃ বললেন, “সে কে, তা নিশ্চয় আপনারা জানেন।”

অতঃপর একদিন তাঁদের ডাকলেন এবং আমাকেও তাঁদের সাথে ডাকলেন। আমার ধারণা, আসলে তাঁদেরকে আমার প্রতিভা দেখানোর জন্যই তিনি আমাকে তাঁদের সাথে ডেকেছিলেন। তখন তিনি সুরা আন-নাসর পড়ে বললেন, “এই সুরা সম্পর্কে আপনারা কী বলেন?”

তাঁদের একজন বললেন, “এই সুরায় আমাদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে এবং আমাদের বিজয় দান করা হবে, তখন যেন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।” অপর এক বর্ণনায় আছে, ‘তাঁরা বললেন, “এখানে শহর ও অট্টালিকাসমূহ বিজয় করার ব্যাপারে বলা হয়েছে।”

তখন উমর রাঃ আমাকে বললেন, “হে ইবনে আব্বাস, তুমিও কি তা-ই মনে করো?”

১১৫২. সুনানুত তিরমিজি : ২৫১৬, মুসনাদু আহমাদ : ২৮০০ (তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের অংশ মুসনাদু আহমাদে অতিরিক্ত এসেছে)।

আমি বললাম, “না।” তিনি বললেন, “তাহলে তোমার অভিমত কী?”

আমি বললাম, “এই সুরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এখানে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, “যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে—অর্থাৎ মক্কা-বিজয়। সেটাই হবে আপনার মৃত্যুর পূর্বাভাস। সুতরাং এ সময়ে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী।”

তখন উমর রাঃ বললেন, “এ সুরার ব্যাপারে তোমার যে অভিমত, আমার অভিমতও ঠিক তা-ই।”^{১১৫৩}

এই হাদিসের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস রাঃ-এর ফজিলত প্রমাণিত হয়। আরও প্রমাণিত হয়, রাসুল সঃ যে তার জন্য তাফসির ও ফিকহ জানার দোয়া করেছিলেন, তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে।^{১১৫৪}

নববি রাঃ বলেন, ‘ইবনে আব্বাস রাঃ-এর জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দ্বীনি পাণ্ডিত্য প্রসিদ্ধ ছিল। তদুপরি, রাসুল সঃ-এর বিভিন্ন অবস্থা তিনি যেভাবে অনুসন্ধানি দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন এবং তা সংরক্ষণ করেছেন, সেভাবে অন্য কেউ করেনি। এ ছাড়াও তিনি বড় বড় সাহাবিগণের কাছ থেকে রাসুল সঃ-এর জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন।’^{১১৫৫}

তার ইলম-জ্ঞান এত বিস্তৃত ছিল যে, তিনি ভিন্ন ভিন্ন দিন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আসর করতেন। কোনো দিন শুধু ফিকহ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। কোনো দিন কুরআনের তাফসির করতেন। কোনো দিন জিহাদসমূহের বৃত্তান্ত শোনাতে। কোনো দিন কবিতার আসর বসাতেন। আবার কোনো দিন আরবের উপাখ্যান বর্ণনা করতেন।^{১১৫৬}

১১৫৩. সহিহুল বুখারি : ৪২৯৪।

১১৫৪. ফাতহুল বারি : ৮/৭৩৬।

১১৫৫. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ৪/২৯০।

১১৫৬. আল-আলাম : ৪/৯৫।

ইয়াকুব রাঃ সহিহ সনদে ওয়াইল বিন হুজর রাঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘একদা ইবনে আব্বাস রাঃ সুরা আন-নুর পাঠ করার পর তার তাফসির করতে লাগলেন। তা শুনে এক ব্যক্তি মন্তব্য করল, “এমন তাফসির যদি দাইলাম গোত্রের লোকেরা শুনতে পেত, তবে তারা মুসলমান হয়ে যেত।”^{১১৫৭}

তার স্মৃতিশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ ছিল। একবার ইবনে আবি রাবিআ আশি শ্লোকবিশিষ্ট একটি কবিতা পাঠ করলেন। একবার শুনেই সেটা তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।^{১১৫৮}

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ-এর প্রতিভার মূল্যায়ন করতেন

জাহাবি রাঃ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ প্রাথমিক সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিগণের অন্তর্ভুক্ত এবং উচ্চস্তরের জ্ঞানী ছিলেন।’^{১১৫৯}

আরেক জায়গায় বলেন, ‘তিনি অল্পসংখ্যক তুখোড় মেধাবী আলিমদের মধ্য থেকে একজন ছিলেন।’^{১১৬০}

শাকিক বিন সালামা রাঃ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ আমাদের ওয়াজ করার সময় বললেন :

وَاللّٰهُ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا
وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللّٰهُ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ

“আল্লাহর কসম, আমি রাসুল সঃ-এর মুখ থেকে সত্তরটিরও অধিক সুরা মুখস্থ করেছি। আল্লাহর কসম, রাসুল সঃ-এর সাহাবিগণ জানেন যে, আমি তাঁদের চাইতে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, অথচ আমি তাঁদের চাইতে উত্তম নই।”

১১৫৭. ফাতহুল বারি : ৭/১০০।

১১৫৮. আল-আলাম : ৪/৯৫।

১১৫৯. সিয়রু আলামিন নুবালা : ১/৪৬১।

১১৬০. সিয়রু আলামিন নুবালা : ১/৪৬২।

শাকিক ﷺ বলেন, ‘সাহাবিগণ তাঁর কথা শুনে কী বলেন, তা শোনার জন্য আমি মজলিসে বসে রইলাম। কিন্তু কাউকে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে শুনিনি।’^{১১৬১}

একদা রাসুল ﷺ তার কাছ থেকে কুরআন শুনতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি ‘সুরা আন-নিসা’র শুরু থেকে তিলাওয়াত করেছিলেন।

এ সম্পর্কে তার থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ‘আমাকে নবিজি ﷺ বললেন, “আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও।”

আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনাকে কুরআন পড়ে শোনাব, অথচ কুরআন আপনার ওপরই নাজিল হয়েছে!?”

তিনি বললেন, “হাঁ।”

তখন আমি “সুরা আন-নিসা” পাঠ করা শুরু করলাম। পড়তে পড়তে যখন “فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا” আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের ওপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে?”—এ আয়াত পর্যন্ত আসলাম, তখন তিনি বললেন, “এবার থামো।” তখন আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখতে পেলাম, তাঁর দুচোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।^{১১৬২}

রাসুল ﷺ তার থেকে কুরআন নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন :

خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ قَيْدٍ بِدَأْ بِهٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،
وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حَذِيفَةَ

‘চার ব্যক্তি থেকে কুরআন গ্রহণ করো—উম্মে আবদের ছেলে (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ) থেকে (ইবনে মাসউদের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন), মুআজ বিন জাবাল থেকে, উবাই বিন কাব থেকে এবং আবু হুজাইফার আজাদকৃত গোলাম সালিম থেকে।’^{১১৬৩}

১১৬১. সহিহুল বুখারি : ৫০০০, সহিহ মুসলিম : ২৪৬২।

১১৬২. সহিহুল বুখারি : ৫০৫০, সহিহ মুসলিম : ৮০০।

১১৬৩. সহিহুল বুখারি : ৩৮০৬, সহিহ মুসলিম : ২৪৬৪।

অর্থাৎ তাঁদের থেকে কুরআন শিক্ষা করো। উল্লেখিত চারজনের মধ্যে প্রথমোক্ত দুজন মুহাজির এবং শেষোক্ত দুজন আনসার। আর সালিম হচ্ছেন আবু হুজাইফার আজাদকৃত গোলাম মাকিলের ছেলে।

উলামায়ে কিরাম বলেন, ‘বিশেষভাবে এই চারজন থেকে কুরআন শিক্ষা করার নির্দেশ দেওয়ার কারণ হলো :

১. কুরআনের শব্দ এদের খুব ভালোভাবে মুখস্থ ছিল এবং খুব সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করতে পারতেন। যদিও এ চারজনের বাইরের অনেকে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে এদের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন।
২. অথবা এই চারজন সাহাবি রাসূল ﷺ থেকে সরাসরি কুরআন হাসিল করার জন্য নিজেদের সকল কাজকর্ম ও ব্যস্ততা থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। যেখানে অন্যরা রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে সরাসরি না শুনে একে অপরের মুখ থেকে শোনাকে যথেষ্ট মনে করেছেন।
৩. অথবা এই চারজন লোক কুরআন শেখানোর জন্য অন্য সকল ব্যস্ততা থেকে মুক্ত ছিলেন।
৪. অথবা রাসূল ﷺ সংবাদ দিতে চেয়েছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর কুরআন বিষয়ে এই চারজনই সবার চেয়ে পারদর্শী হবেন এবং কুরআন প্রচারের ক্ষেত্রে এরাই সর্বাধিক ভূমিকা রাখবেন। তাই তাঁদের থেকে কুরআন শিক্ষা করা উচিত।”^{১১৬৪}

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘আবু বকর ও উমর রাঃ তাকে সুসংবাদ দেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন :

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

“যে ব্যক্তি কুরআন মাজিদ উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে চায়, যেভাবে তা নাজিল হয়েছে, সে যেন ইবনে উম্মে আবদ (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ)-এর পাঠ মোতাবেক তিলাওয়াত করে।”^{১১৬৫}

১১৬৪. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১৬/১৮।

১১৬৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৩৮।

অলৌকিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী আবু হুরাইরা

আবু হুরাইরা   বলেন, ‘তোমরা বলে থাকো, আল্লাহর রাসুল   হতে আবু হুরাইরা বেশি বেশি হাদিস বর্ণনা করে থাকে এবং আরও বলে থাকো, মুহাজির ও আনসারদের কী হলো যে, তাঁরা আবু হুরাইরার মতো হাদিস বর্ণনা করে না? এর কারণ হলো, আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকতেন আর আমি কোনো প্রকারে আমার পেটের চাহিদা মিটিয়ে আল্লাহর রাসুল  -এর দরবারে পড়ে থাকতাম। তাঁরা যখন অনুপস্থিত থাকতেন, আমি তখন উপস্থিত থাকতাম। তাঁরা যা ভুলে যেতেন, আমি তা মুখস্থ করতাম। আর আমার আনসার ভাইয়েরা নিজেদের খেত-খামারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আমি ছিলাম একজন সুফফাবাসী মিসকিন। তাঁরা যা ভুলে যেতেন, আমি তা মুখস্থ রাখতাম।

আল্লাহর রাসুল   একদিন কথা বলার সময় বললেন :

إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ،
إِلَّا وَغَى مَا أَقُولُ

“আমার এ কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে কেউ তার কাপড় বিছিয়ে দেবে এবং পরে নিজের শরীরের সাথে তা জড়িয়ে নেবে, তাহলে আমি যা বলছি, সে তা স্মরণ রাখতে পারবে।”

আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম। যখন রাসুল   তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন তা আমার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। ফলে আমি আল্লাহর রাসুল  -এর সেই কথার কিছুই ভুলে যাইনি।^{১১৬৬}

জাহাবি   বলেন, ‘আবু হুরাইরা  -এর স্মরণশক্তি অলৌকিক ও রাসুল  -এর অন্যতম মুজিজা ছিল।’^{১১৬৭}

আবু হুরাইরা   বলেন, ‘আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার নিকট থেকে শোনা অনেক হাদিস আমি ভুলে যাই।” তখন তিনি বললেন, “তোমার

১১৬৬. সহিহুল বুখারি : ২০৪৭, সহিহ মুসলিম : ২৪৯২।

১১৬৭. সিয়াকু আলামিন নুবালা : ২/২৯৪।

চাদর মেলে ধরো।” আমি মেলে ধরলাম। তারপর তিনি তা থেকে অঞ্জলি ভরে কিছু নিলেন। অতঃপর বললেন, “জড়িয়ে নাও।” আমি জড়িয়ে নিলাম। এর পর থেকে কোনো কিছুই আমি ভুলে যাইনি।”^{১১৬৮}

ইবনে হাজার رحمته বলেন, ‘অঞ্জলি ভরে কী নিয়েছেন, সেটা হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত, তিনি কেবল অঞ্জলি ভরে নেওয়ার মতো ইশারা করেছিলেন।’^{১১৬৯}

ইবনে হাজার رحمته বলেন, ‘এ দুই হাদিসে আবু হুরাইরা رضي الله عنه-এর ফজিলত এবং নবুওয়াতের একটি মুজিজা বর্ণিত হয়েছে। মুজিজা হওয়ার কারণ হলো, ভুলে যাওয়া মানুষের সহজাত একটি অভ্যাস। আবু হুরাইরা رضي الله عنه-ও স্বীকার করেছেন যে, যথারীতি তিনিও অনেক বিষয় ভুলে যেতেন। পরে রাসুল ﷺ-এর দোয়ার বরকতে তিনি ভুলে যাওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করেন।’^{১১৭০}

রাসুল ﷺ তার ইলম অর্জনের আত্মহকে আরও উৎসাহিত করতেন।

আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, ‘আমি বললাম, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভে কারা ধন্য হবে?” তিনি বললেন :

لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ
مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ

“আমি জানতাম, হে আবু হুরাইরা, তুমি ছাড়া এ প্রশ্ন আর কেউ করবে না। কেননা, হাদিস অর্জনের প্রতি তোমার প্রবল আত্মহের ব্যাপারে আমি জানি। কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে ওই ব্যক্তি ধন্য হবে, যে অন্তর থেকে একনিষ্ঠতার সাথে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই)” বলে।”^{১১৭১}

১১৬৮. সহিহুল বুখারি : ১১৯।

১১৬৯. ফাতহুল বারি : ১/২১৫।

১১৭০. ফাতহুল বারি : ১/২১৫।

১১৭১. সহিহুল বুখারি : ৯৯।

আরেক প্রতিভাবান সাহাবি উবাই বিন কাব

রাসুল ﷺ যে চারজন থেকে কুরআনের শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁদের একজন হলেন উবাই বিন কাব ﷺ।

উমর ﷺ তাঁর ব্যাপারে বলেন, ‘আলি হচ্ছেন আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বিচক্ষণ বিচারক; আর উবাই হচ্ছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ কারি।’^{১১৭২}

নামাজের কिरাতে রাসুল ﷺ-এর কোনো ভুল হলে তাকে লুকমা দেওয়ার জন্য বলতেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘একদা নামাজে কिरাত পড়ার সময় রাসুল ﷺ সাদৃশ্যপূর্ণ আয়াতে আটকে গেলেন। যখন নামাজ শেষ হলো, তখন উবাই বিন কাব ﷺ-কে বললেন, “তুমি কি আমাদের সাথে নামাজ পড়েছ?” তিনি বললেন, “জি, হ্যাঁ।” রাসুল ﷺ বললেন :

فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ؟

“তাহলে লুকমা দাওনি কেন?”^{১১৭৩}

এই হাদিসে ইমামকে লুকমা দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সুতরাং জাহরি নামাজে ইমাম সাহেব কোনো আয়াত ভুলে গেলে মুক্তাদি ওই আয়াত পড়ে তা স্মরণ করিয়ে দেবে। আর যদি নামাজের কোনো রোকন আদায় করতে ভুলে যায়, তখন পুরুষরা সুবহানাল্লাহ বলে এবং মেয়েরা হাতের শব্দ করে ইমামকে স্মরণ করিয়ে দেবে।^{১১৭৪}

উমর ﷺ উবাই বিন কাবকে তারাবির ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন

আব্দুর রহমান বিন আব্দ আল-কারি ﷺ বলেন, ‘রমাজান মাসে এক রাতে উমর ﷺ-এর সাথে আমি মসজিদে গেলাম। গিয়ে দেখতে পেলাম, মানুষ

১১৭২. মুসনাদু আহমাদ : ২০৫৮১।

১১৭৩. সুনানু আবু দাউদ : ৯০৭।

১১৭৪. নাইলুল আওতার : ২/৩৮০।

বিক্ষিপ্ত জামাআতে বিভক্ত। কেউ একাকী নামাজ পড়ছে; আবার কারও পেছনে কতিপয় লোক ইকতিদা করছে।

তখন উমর রাঃ বললেন :

إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ

“আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন কারির পেছনে একত্র করে দিই, তবে তা উত্তম হবে।”

অতঃপর তিনি এর ওপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন এবং লোকদের উবাই বিন কাব রাঃ-এর পেছনে একত্র করে দিলেন। অতঃপর আরেক রাতে আমি তাঁর সাথে মসজিদে গেলাম। তখন লোকজন তাদের কারির পেছনে নামাজ পড়ছিল। তা দেখে উমর রাঃ বললেন :

نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ

“কতই না সুন্দর এই বিদআত তথা নতুন ব্যবস্থা! কিন্তু তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাকো, তা রাতের ওই অংশ অপেক্ষা উত্তম, যাতে তোমরা নামাজ পড়ো।”

এর দ্বারা তিনি রাতের শেষ ভাগ বুঝিয়েছেন। কারণ, মানুষ রাতের প্রথমভাগে নামাজ পড়ত।^{১১৭৫}

সতর্কতা : কিছু মানুষ বিদআতকে দুই ভাগে বিভক্ত করে—উত্তম বিদআত ও খারাপ বিদআত। তারা দলিল হিসেবে উমর রাঃ-এর ‘কতই না সুন্দর এই বিদআত’ কথাটি উপস্থাপন করে।

তাদের কথার জবাব হলো, এখানে উমর রাঃ বিদআত বলে বিদআতের শাব্দিক অর্থ ‘নতুন ব্যবস্থা’ বুঝিয়েছেন। বিদআত ফিদ-দ্বীন বা বিদআতের পারিভাষিক অর্থ তিনি বোঝাননি। কেননা, বিদআত ফিদ-দ্বীনের সবটুকুই গোমরাহি। যেমন রাসুল সঃ ইরশাদ করেছেন :

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

‘প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি, আর প্রত্যেক গোমরাহি জাহান্নামে।’^{১১৭৬}

সমরবিশারদ খালিদ বিন ওয়ালিদ

খালিদ বিন ওয়ালিদের ব্যাপারে জাহাবি رحمته বলেন, ‘তিনি হলেন, আল্লাহর তরবারি, ইসলামের ঘোড়সওয়ার, ময়দানের সিংহ, সর্দার, নেতা, মহান সেনাপতি, মুজাহিদদের কমান্ডার...

তাকে “সাইফুল্লাহ” তথা আল্লাহর তরবারি খেতাব স্বয়ং রাসুল ﷺ-ই দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন :

خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ سَيْفٌ مِنْ سَيُوفِ اللَّهِ تَعَالَى، سَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى
الْمُشْرِكِينَ

“খালিদ বিন ওয়ালিদ হলো আল্লাহর তরবারিসমূহের মধ্য থেকে একটি তরবারি, যা তিনি মুশরিকদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন।”^{১১৭৭}

রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় মক্কা-বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন। ডর-ভয় উপেক্ষা করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

মুরতাদদের বিরুদ্ধে এবং মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ইরাকের জিহাদে শরিক হয়েছেন এবং শামের সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর শরীরের প্রতিটি অংশে শহিদানের রক্ত-স্বাক্ষর ছিল।

তাঁর ফজিলত অনেক বিস্তৃত। আবু বকর رضي الله عنه তাঁকে ইসলামি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তাঁর ও আবু উবাইদা رضي الله عنه-এর নেতৃত্বে দামেস্ক অবরোধ করে তা বিজয় করা হয়।

১১৭৬. সহিহ মুসলিম : ৮৬৭, সুনানুন নাসায়ি : ১৫৭৮।

১১৭৭. ইবনু আসাকির : ১৬/২৪১।

ষাট বছর বয়স পেয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি হত্যা করেছেন অনেক অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ বীর-বাহাদুরকে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয়েছে ঘরের বিছানায়। এই আক্ষেপে তিনি অঝোর ধারায় ক্রন্দন করেছেন। হিমস শহরে ২১ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।^{১১৭৮}

রাসুল ﷺ-এর বিশিষ্ট অশ্বারোহী আবু কাতাদা রাযী বুলেন, ‘রাসুল ﷺ একাধিক আমিরসম্বলিত একটি সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। আর বললেন :

“জাইদ বিন হারিসা তোমাদের নেতৃত্ব দেবে। যদি জাইদ নিহত হয়, তখন জাফর তোমাদের নেতা হবে। যদি জাফরেরও কিছু হয়ে যায়, তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা তোমাদের নেতৃত্ব দেবে।”

তখন জাফর রাযী আপত্তি তুলে বললেন, “হে আল্লাহর নবি, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান! আমি আশা করিনি যে, জাইদকে আমার ওপর নেতৃত্ব দান করবেন।”

তিনি বললেন, “যা সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার ওপরই বহাল থাকো। কারণ, তোমরা জানো না, কোথায় কল্যাণ নিহিত রয়েছে?”

অতঃপর সৈন্যদল রওনা হলো। কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন রাসুল ﷺ মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং সবাইকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর রাসুল ﷺ বললেন :

“উত্তম সংবাদ এসেছে। আমি কি সদ্য প্রেরিত সৈন্যদলের ব্যাপারে তোমাদের সংবাদ দেবো না? তারা রওনা হয়ে শত্রুদলের মুখোমুখি হয়েছে। অতঃপর জাইদ শাহাদাত বরণ করেছে। তাই তোমরা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো।”

তখন লোকেরা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করল।

অতঃপর তিনি বললেন, “এরপর জাফর বিন আবু তালিব পতাকা হাতে তুলে নিয়েছে। তারপর শত্রুদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করে একসময় শহিদ

হয়ে গেছে। আমি তার শাহাদাতের সাক্ষ্য দিচ্ছি। সুতরাং তোমরা তার জন্য ইসতিগফার করো।

অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পতাকা হাতে নিয়েছে। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছে। একপর্যায়ে সেও শহিদ হয়েছে। সুতরাং তোমরা তার মাগফিরাত কামনা করো।

অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালিদ পতাকা তুলে নিয়েছে। (তিনজন সেনাপতির মৃত্যুর পর) লশকরের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আর কেউ ছিল না, তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ নিজেই নেতৃত্ব হাতে নিয়ে নিয়েছে।”

তারপর রাসুল ﷺ আঙুল উঁচিয়ে বললেন :

اللَّهُمَّ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ فَانْصُرْهُ

“হে আল্লাহ, সে (খালিদ) আপনার তরবারিসমূহ থেকে একটি তরবারি। তাকে সাহায্য করুন।”

অতঃপর রাসুল ﷺ বললেন :

انْفِرُوا فَأَمِدُّوا إِخْوَانَكُمْ، وَلَا يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدٌ

“তোমাদের ভাইদের সাহায্য করার জন্য বেরিয়ে পড়ো। কেউ যেন পেছনে থেকে না যায়।”

তখন প্রখর রোদ উপেক্ষা করে লোকজন কেউ সওয়ার হয়ে এবং কেউ পদব্রজে বেরিয়ে পড়ল।^{১১৭৯}

চরম বাহাদুর ও অকুতোভয় বীর মুআজ বিন আমর বিন জামুহ ও মুআজ বিন আফরা

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ বর্ণনা করেন, ‘বদর যুদ্ধের দিন আমি (মুজাহিদদের) সারিতে দাঁড়িয়ে আছি। ডানে ও বামে তাকিয়ে দেখি, আমার

দুপাশে সদ্য যৌবনে পা রাখা দুজন আনসারি কিশোর। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি এদের চেয়ে শক্তিশালীদের মাঝে অবস্থান করি। তাদের একজন আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলে :

- চাচা, আপনি আবু জাহেলকে চেনেন?
- হ্যাঁ, চিনি! কিন্তু ভাতিজা তুমি আবু জাহেলকে খুঁজছ কেন?
- শুনেছি, সে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে গালি দেয়। ওই সত্তার শপথ—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাকে যদি আমি দেখি, তবে অতক্ষণ পর্যন্ত তাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত, তার মৃত্যু না হয়ে যায়।

তার এমন সংকল্প দেখে আমি বিস্মিত হই। তারপর অপর কিশোর আমাকে ইশারা করে ঠিক একই কথা বলে। আমি আবু জাহেলকে খুঁজতে থাকি। পরক্ষণেই দেখতে পাই, সে সৈন্যদলের মাঝে চক্রর দিচ্ছে। আমি তাদের বলি, “ওই দেখো সেই ব্যক্তি, যার কথা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছ।” মুহূর্তেই তারা আবু জাহেলের দিকে ছুটে যায় এবং তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে। তারপর তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে আবু জাহেলের নিহত হওয়ার সংবাদ দেয়। তিনি জানতে চান, “তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে?” উভয়েই বলে, “আমি হত্যা করেছি।” তিনি জিজ্ঞেস করেন, (هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا) “তোমরা কি তরবারি মুছে ফেলেছ?”

তারা বলে, “নাহ, মুছিনি।” তিনি উভয়ের তরবারি দেখে বলেন, (كَلَّا كَمَا قَتَلَهُ) “তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। অবশ্য তার কাছ থেকে প্রাপ্ত মালামাল মুআজ বিন আমর বিন জামুহই পাবে।” তাঁরা দুজন হলেন মুআজ বিন আফরা ও মুআজ বিন আমর বিন জামুহ ﷺ।^{১১৮০}

ইবনে হাজার رحمه الله বলেন, ‘আবু জাহেলের ওপর দুজন একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়লেও সর্বপ্রথম তার ওপর মরণঘাতী আক্রমণটি করেছেন আমর বিন জামুহ ﷺ। তাই সালাব (নিহত কাফিরের শরীর থেকে পাওয়া গনিমত) তাকেই দেওয়া হয়। আর রাসুল ﷺ যে বলেছেন, “তোমরা উভয়েই তাকে

হত্যা করেছে”—এটা দ্বিতীয় জনের (মুআজ বিন আফরা) মন রক্ষা করার জন্য বলেছেন, যেহেতু দুজনই হত্যাকর্মে জড়িত ছিলেন। নাহলে মূল আক্রমণ যার পরে শত্রু আত্মরক্ষা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তা মুআজ বিন আমর বিন জামুহ ؓ-ই করেছেন। এ জন্য “সালব” তাকেই দেওয়া হয়।

রাসুল ﷺ দুজনের তরবারি কোষমুক্ত করে পরখ করে দেখেছেন, যেন তরাবারিদ্বয়ে লেগে থাকা রক্ত দেখে অনুমান করা যায়, কার তরবারি কতটুকু শত্রুর দেহে বিদ্ধ হয়েছে এবং যার তরবারি অধিক বিদ্ধ হয়েছে, তাকে “সালাব” দান করা যায়।

এ জন্য রাসুল ﷺ সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করেছেন, “তোমরা তোমাদের তলোয়ার মুছে ফেলেছ নাকি?” যদি তারা তলোয়ার মুছে ফেলতেন, তখন এ বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যেত।

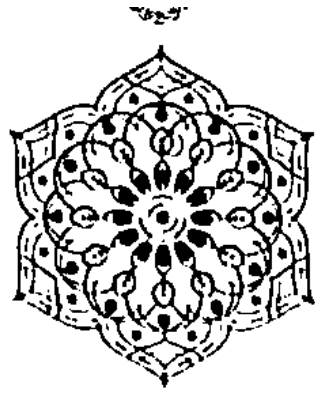
তবে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ হাদিসে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, “আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ তার ওপর চূড়ান্ত আঘাত করে তাকে শেষ করেছেন এবং তার মস্তক কেটেছেন।”^{১১৮১}

নববি ؓ বলেন, ‘এটা সম্ভব যে, আবু জাহেলের হত্যায় তিনজনই শরিক ছিলেন। তার ওপর মরণঘাতী আক্রমণ মুআজ বিন আমর বিন জামুহ ؓ করেছেন। তারপর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ আসলেন। তখন তার শরীরে প্রাণের স্পন্দন কিছুটা বাকি ছিল। তিনি গর্দান কেটে দিয়ে তা চিরতরে বন্ধ করে দিলেন।

এই হাদিসে লক্ষণীয় অনেক বিষয় রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, কোনো কাজে কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যাবে না। কারণ, অনেক সময় ছোটরা এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আনজাম দিতে পারে, যা বড়রা পারে না। যেমনটি উল্লেখিত দুই বালক সাহাবি করেছেন।^{১১৮২}

১১৮১. ফাতহুল বারি : ৬/২৪৮।

১১৮২. ইমাম নববি ؓ কৃত শারহু সহিহি মুসলিম : ১২/৬৩।



❦ [সপ্তম পরিচ্ছেদ] ❦

বিবাদকারীদের মাঝে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালার পদ্ধতি

একটি সমাজের সদস্যরা যতই ভালো মানুষ হোক, কল্যাণমূলক কাজের প্রতি যতই তাদের আগ্রহ থাকুক, তাদের পরস্পরের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই ঝগড়া-বিবাদ পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য বা নিজের অধিকার আদায়ের জন্য কিংবা শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়ে যেমন হতে পারে, তেমনই অন্য আরও অনেক কারণেও হতে পারে। যার অনেকগুলো মীমাংসা করার জন্য মামলা-মোকদমা ও বিচার-ফয়সালার প্রয়োজন পড়ে। অন্যান্য সমাজের মতো মুসলিম সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও পরস্পরের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়।

রাসুল ﷺ দুই ঝগড়াকারীর মাঝে এমনভাবে ফয়সালা করতেন, যাতে হকদার তার হক বুঝে পায়। তিনি বাদী-বিবাদীর মাঝে মীমাংসা করে দিতেন। তাদের মনে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে দিতেন। অপর ভাইয়ের অধিকার লঙ্ঘন করা এবং বাতিল দাবির ওপর অটল থাকার ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের সতর্ক করতেন।

এ ছাড়াও তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা দিতেন এবং তাদের অন্তরে জাহিলি যুগের অনৈতিক দাবি-দাওয়া ও নোংরা স্বজনপ্রীতির প্রতি ঘৃণাবোধ জাগ্রত করতেন। ফলে মুসলিম সমাজ ক্রমান্বয়ে একটি কল্যাণমূলক সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

রাসুল ﷺ বিবাদকারী উভয়পক্ষের সাথে ইনসাফ ও ন্যায্যভিত্তিক আচরণ করতেন। ইনসাফের সাথে তাদের বিরোধের মীমাংসা করতেন।

আপস করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন

বিবাদমান একপক্ষকে তাদের দাবি ছেড়ে দিয়ে আপস করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

কাব বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘তিনি মসজিদের ভেতর ইবনে আবি হাদরাদ رضي الله عنه থেকে তার পাওনা ঋণ দাবি করলেন। তখন তাদের উভয়ের আওয়াজ বড় হয়ে উঠলে রাসুল ﷺ শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর ঘরেই ছিলেন। তিনি তাদের দিকে দ্রুত ছুটে আসলেন, যার ফলে তাঁর ঘরের পর্দা উন্মুক্ত হয়ে গেল। এসেই তিনি ডাক দিলেন, “হে কাব!” তিনি বললেন, “আমি হাজির, ইয়া রাসুলাল্লাহ!”

তিনি বললেন, “তোমার পাওনা ঋণ থেকে এ পরিমাণ—ইশারা করে অর্ধেক দেখালেন—ক্ষমা করে দাও।”

কাব رضي الله عنه বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি ইতিপূর্বে তা করেছি।”

তখন রাসুল ﷺ বললেন, “তাহলে বাকিগুলো দাবি করো।”^{১১৮৩}

ইবনুল জাওজি رحمته الله বলেন, ‘রাসুল ﷺ কাব رضي الله عنه-কে (অর্ধেক ঋণ ক্ষমা করে দেওয়ার) যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা পরামর্শ হিসেবে দিয়েছেন। এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, বিচারকের জন্য উভয়পক্ষের মাঝে ফয়সালা করে দেওয়া যেমন কর্তব্য, তেমনই উভয়পক্ষের মাঝে আপস-মীমাংসা করে দেওয়াও তার দায়িত্ব।’^{১১৮৪}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- ইশারায় বুঝে গেলে তার ওপরই ক্ষান্ত করা।
- পাওনাদারের নিকট (ঋণ কমিয়ে দেওয়ার) সুপারিশ করা।
- বিবাদকারী দুপক্ষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

১১৮৩. সহিহুল বুখারি : ৪৫৭, সহিহ মুসলিম : ১৫৫৮।

১১৮৪. কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সহিহাইন : ১/৩৮৭।

- গুনাহের কাজ ব্যতীত অন্য কাজের জন্য সুপারিশ করা ।
- দরোজায় পর্দা ঝোলানো বৈধ ।
- মসজিদের ভেতর পাওনা ঋণ তলব করা বৈধ ।^{১১৮৫}

ঋণ ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করতেন

আয়িশা রাঃ বলেন, ‘রাসূল সঃ দরোজার পাশে দুই ঝগড়াকারীর উঁচু আওয়াজ শুনতে পেলেন । তাদের একজন অপরজনের কাছে ঋণ মাফ করে দেওয়ার আবেদন করছিলেন এবং তার প্রতি নম্রতা অবলম্বনের অনুরোধ করছিলেন । আর অপরজন বলছিলেন, “আল্লাহর কসম, আমি তা করব না ।”

তখন রাসূল সঃ তাদের নিকট গিয়ে বললেন :

أَيُّنَ الْمَتَّالِي عَلَى اللَّهِ، لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ

“কে সেই ব্যক্তি, যে নেক আমল করবে না বলে আল্লাহর নামে কসম খেয়েছে?”

তখন লোকটি উত্তর দিলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমিই (সেই হতভাগা) । তবে এখন তার জন্য তা-ই হবে, যা সে পছন্দ করে (অর্থাৎ তার অনুরোধ আমি মেনে নিলাম) ।”^{১১৮৬}

► হাদিস থেকে শিক্ষা

- ঋণগ্রস্তের প্রতি নম্রতা অবলম্বন এবং ঋণ কমিয়ে দিয়ে বা ক্ষমা করে দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করার প্রতি উৎসাহ ।
- ভালো কাজ না করার ওপর শপথ করা অনুচিত । কেউ শপথ করে ফেললে, মুসতাহাব হলো সে ওই কসম ভঙ্গ করবে এবং কাফফারা আদায় করবে ।

১১৮৫. ফাতহুল বারি : ১/৫৫২, ইমাম নববি রঃ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১০/২২০ ।

১১৮৬. সহিহুল বুখারি : ২৭০৫, সহিহ মুসলিম : ১৫৫৭ ।

- পাওনাদারের নিকট পাওনা ক্ষমা করে দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা যায়।
- ভালো কর্মের সুপারিশ করলে তা গ্রহণ করা ভালো।^{১১৮৭}

সাহল বিন সাদ রাঃ থেকে বর্ণিত যে, ‘কুবাবাসী পরম্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল, এমনকি তারা একে অপরের দিকে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। তখন রাসুল সঃ বললেন, “আমাকে ওখানে নিয়ে চলো, যেন তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিতে পারি।”^{১১৮৮}

মীমাংসা করা সম্ভব না হলে ফয়সালা করে দিতেন

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাঃ বলেন, ‘জনৈক আনসারি নবিজি সঃ-এর সামনে জুবাইর রাঃ-এর সঙ্গে হাররার নালার পানির ব্যাপারে ঝগড়া করল, যে পানি দ্বারা তারা খেজুর বাগানে পানি সেচ দিত।

অতঃপর তারা উভয়জন নবিজি সঃ-এর নিকট এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে আল্লাহর রাসুল সঃ জুবাইর রাঃ-কে বললেন :

أَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ

“হে জুবাইর, প্রথমে তোমার জমি সিঞ্চন করে নাও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও।”

এতে আনসারি ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “সে আপনার ফুফাতো ভাই বলে এমন ফয়সালা করলেন।”

এতে আল্লাহর রাসুল সঃ-এর চেহারা অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন :

أَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ اخْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذْرِ

১১৮৭. ফাতহুল বারি : ৫/৩০৭। ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১০/২২০।

১১৮৮. সহিহুল বুখারি : ২৬৯৩, সহিহ মুসলিম : ৪২১।

“হে জুবাইর, তুমি নিজের জমি সিঞ্চন করো। এরপর পানি আটকিয়ে রাখো, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।”

জুবাইর রাঃ বলেন, “আল্লাহর কসম, আমার মনে হয়, এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

“তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদের বিচারভার আপনার ওপর অর্পণ করবে না।”^{১১৮৯-১১৯০}

ইবনে আব্দুল বার রাঃ বলেন, ‘হাদিসের মর্ম হলো, রাসূল সঃ প্রথমে জুবাইর রাঃ-কে আনসারি ব্যক্তির জন্য নিজের হক থেকে ছাড় দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আনসারির পক্ষ থেকে রুঢ় আচরণ প্রকাশ পেল, তখন তিনি জুবাইর রাঃ-কে তার হক পুরোপুরি গ্রহণ করার ফয়সালা করলেন।’^{১১৯১}

নববি রাঃ বলেন, ‘জুবাইর রাঃ-এর জমি প্রথমে ছিল। তাই রাসূল সঃ জুবাইর রাঃ-কে বললেন, “প্রথমে তোমার পুরা জমিন সিঞ্চন করার অধিকার তোমার থাকলেও, তুমি তা না করে প্রয়োজন অনুপাতে সিঞ্চন করে প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও।” কারণ তিনি জানতেন যে, জুবাইর রাঃ তাঁর এ ফয়সালা মেনে নেবেন এবং প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করতে সম্মত হবেন। কিন্তু যখন প্রতিবেশীই এমন ফয়সালা মানতে অস্বীকৃতি জানালেন, তখন রাসূল সঃ জুবাইর রাঃ-কে নিজের হক পুরোপুরি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন।’^{১১৯২}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- বিবাদের সময় প্রথমে একপক্ষ থেকে ছাড় দিয়ে মীমাংসা করার প্রতি ইশারা।

১১৮৯. সূরা আন-নিসা, ৪ : ৬৫।

১১৯০. সহিহুল বুখারি : ২৩৬০, সহিহ মুসলিম : ২৩৫৭।

১১৯১. আত-তামহিদ : ১৭/৪০৯।

১১৯২. ইমাম নববি রাঃ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১৫/১০৮।

- বিবাদমান পক্ষদ্বয় পরস্পর মীমাংসায় রাজি না হলে বিচারক প্রত্যেকের হক যথাযথভাবে দান করবেন।
- ইমাম ও বিচারকের রায় মেনে না নিলে ভর্তসনা করা ও শাস্তি দেওয়ার অধিকার আছে।^{১১৯৩}

মিথ্যা শপথ করার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করতেন

ওয়াইল বিন হুজর রাঃ বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সঃ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে দুব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি ভূমি সম্পর্কে বিচার প্রার্থনা করলেন। তন্মধ্যে একজন বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, জাহিলিয়াতের যুগে এ ব্যক্তি আমার ভূমি জবরদখল করে নিয়েছিল।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘বিচার প্রার্থনাকারী ছিল ইমরুল কাইস বিন আবিস আল-কিনদি, আর তার বিবাদী ছিল রাবিআ বিন আবদান।’

‘রাসুলুল্লাহ সঃ বললেন, “তোমার সাক্ষী পেশ করো।” লোকটি বললেন, “আমার কোনো সাক্ষী নেই।” রাসুলুল্লাহ সঃ বললেন, “তাহলে বিবাদী থেকে কসম নেওয়া হবে।” লোকটি বললেন, “তবে তো সে মিথ্যা কসম করে সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলবে।” রাসুলুল্লাহ সঃ বললেন, “তার কাছ থেকে তোমার এতটুকুই প্রাপ্য।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘এরপর বাদী যখন শপথ করার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সঃ বললেন :

مَنْ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

“যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পত্তি গ্রাস করবে, সে আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন।”^{১১৯৪}

রজা বিন হাইওয়াহ রাঃ এবং উরস বিন আমিরা তার পিতা আদি রাঃ থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘কিন্দা এলাকার ইমরুল কাইস বিন আবিস নামক এক ব্যক্তি

১১৯৩. ইবনে বাত্তাল রাঃ কৃত শারহু সহিহিল বুখারি : ৬/৫০১-৫০২।

১১৯৪. সহিহ মুসলিম : ১৩৯।

এবং হাজরামাওত এলাকার এক ব্যক্তি একটি জমির ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর নিকট বিচার প্রার্থনা করলেন। তখন রাসুল ﷺ হাজরামাওতের লোকটির কাছে সাক্ষী তলব করলেন। কিন্তু তার কাছে সাক্ষী ছিল না। তখন তিনি কিন্দার লোকটিকে কসম করতে বললেন। এতে হাজরামাওতের লোকটি বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, তাকে শপথ করার সুযোগ দেওয়া হলে সে মিথ্যা শপথ করে আমার জমি নিয়ে নেবে।”

তখন রাসুল ﷺ বললেন :

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য মিথ্যা শপথ করবে, সে আল্লাহ তাআলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন।”

রজা ﷺ বলেন, ‘তারপর রাসুল ﷺ তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুত, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।”^{১১৯৫}

ইমরুল কাইস বললেন, “যে ব্যক্তি এই জমির দাবি ছেড়ে দেবে, সে কী পুরস্কার পাবে?”

তিনি বললেন, “জান্নাত।”

তখন ইমরুল কাইস বললেন, “তাহলে সাক্ষী থাকুন, আমি এই জমির পুরোটা তার জন্য ছেড়ে দিয়েছি।”^{১১৯৬}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- মিথ্যা শপথ করে মুসলমানের হক গ্রাস করলে কঠোর শাস্তি রয়েছে।
- বিচারপ্রার্থী থেকে মিথ্যা শপথ করার আশঙ্কা থাকলে বিচারক তাকে মিথ্যা শপথ করার ভয়াবহতা জানিয়ে উপদেশ প্রদান করবেন।^{১১৯৭}

প্রকাশ্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ফয়সালা করতেন

রাসুল ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা ؓ থেকে বর্ণিত, ‘রাসুল ﷺ তাঁর ঘরের দরোজার সামনে একটি ঝগড়া গুনতে পেলেন। তখন তিনি তাদের নিকট এসে বললেন :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِيَنِیَ الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

“আমি একজন মানুষ। আর আমার কাছে মানুষ বিচার প্রার্থনা করতে আসে। তখন এমনও হওয়া সম্ভব যে, তাদের মধ্যে একপক্ষ খুব সুন্দর ও গোছালোভাবে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে; ফলে আমি তাকে সত্য মনে করে তার পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিই। এখন আমি যদি তার জন্য কোনো মুসলমানের হকের ফয়সালা করে থাকি, সেটা তার জন্য জাহান্নামের অংশ। এবার তা গ্রহণ করা, না করা তার ইচ্ছাধীন।”^{১১৯৮}

১১৯৬. মুসনাদু আহমাদ : ১৭২৬৩।

১১৯৭. ফাতহুল বারি : ১১/ ৫৬৩।

১১৯৮. সহিহুল বুখারি : ২৪৫৮, সহিহ মুসলিম : ১৭১৩।

নববি ﷺ বলেন, ‘এই হাদিসে রাসুল ﷺ নিজেকে মানুষ বলে তাঁর ভেতরে মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকার কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের কাছে অদৃশ্য ও গোপন বিষয়ের জ্ঞান নেই। অদৃশ্যের জ্ঞান থেকে যে পরিমাণ আল্লাহ তাদের জানিয়ে দেন, তারা কেবল তা-ই জানতে পারে। তিনি এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ থেকে যে রকম ভুল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তেমনই তাঁর থেকেও ভুল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, তিনি বাহ্যিক ও প্রকাশ্য দলিল-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা করেন এবং গোপনীয়তা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেন।

সুতরাং তিনি নিয়ম অনুযায়ী সাক্ষী-প্রমাণ ও শপথের ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা দিয়ে দেন। এ ফয়সালা বাস্তবতাবিরোধী হলেও, এতে তাঁর কোনো দোষ নেই। কেননা, তিনি শুধু বাহ্যিক দলিল-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা করতে আদিষ্ট। গোপনীয়তা অনুসন্ধান করা তাঁর দায়িত্ব নয়।’^{১১৯৯}

বাহ্যিক দলিলের কারণে কারও হক কারও জন্য হালাল হয় না

উম্মে সালামা রা. বলেন, ‘আমি রাসুল ﷺ-এর পাশে বসা ছিলাম, ইত্যবসরে দুজন ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর কাছে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিছু অনাবাদি জমির ব্যাপারে বিচার প্রার্থনা করতে আসলেন। তখন রাসুল ﷺ বললেন :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

“আমি একজন মানুষ। আর তোমরা আমার কাছে বিচার প্রার্থনা করতে আসো। তখন এমনও হওয়া সম্ভব যে, তোমাদের একজন তার দলিল-প্রমাণকে অন্যের তুলনায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে, ফলে আমি শোনার ওপর ভিত্তি করে তার পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিই। সুতরাং আমি যদি কারও পক্ষে তার ভাইয়ের হকের ফয়সালা

করে থাকি, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, তখন আমি আসলে তার জন্য জাহান্নামেরই একটি অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছি।”

তা শুনে তারা উভয়ে কেঁদে দিলেন এবং একযোগে বললেন, “যে হক আমি তলব করছি, তা আমার এই বন্ধুর।”

তখন রাসূল ﷺ তাদের বললেন :

أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا، وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ تَحَالَا

“তোমরা দুজন যা করার তা করেছে, এখন তোমরা উভয়ের মধ্যে তা সমানভাবে বণ্টন করে নাও। বণ্টন করার ক্ষেত্রে হকপন্থা অবলম্বন করবে এবং লটারির মাধ্যমে অংশ বেছে নেবে। অতঃপর তোমরা একে অপরকে নিজের প্রাপ্ত অংশ থেকে ক্ষমা করে দেবে।”^{১২০০}

খাত্তাবি রাঃ বলেন, ‘এই হাদিস থেকে কয়েকটি ফিকহি মাসআলা বের হয়: প্রকাশ্য দলিল-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা ওয়াজিব। বিচারকের রায় কোনো হারামকে হালাল করে না এবং কোনো হালালকে হারাম করে না। বিচারক কোনো ভুল ফয়সালা করলে সেটা কেবল বাহ্যিকভাবেই কার্যকর হবে। অভ্যন্তরীণভাবে ও আখিরাতের বিবেচনায় তা কার্যকর হবে না।’^{১২০১}

নববি রাঃ বলেন, ‘এই হাদিসটি ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ি, ইমাম আহমাদ রাঃ-সহ সাহাবা ও তাবিয়িনের অধিকাংশ উলামা ও ফুকাহার মতের সপক্ষে দলিল। কারণ, তাদের মত হলো, “বিচারকের ফয়সালা অভ্যন্তরীণভাবে বিধানকে কার্যকর করে না এবং কোনো হারামকে হালাল করে না। সুতরাং দুজন ব্যক্তি যদি কারও পক্ষে কোনো সম্পদের ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় আর বিচারক তাদের সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে তার পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দেন, তখন তার জন্য সে সম্পদ হালাল হবে না।

অনুরূপভাবে দুজন ব্যক্তি যদি কারও বিপক্ষে কাউকে হত্যা করার ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তখন নিহতের অভিভাবক যদি তাদের মিথ্যা সাক্ষ্যের

১২০০. মুসনাদু আহমাদ : ২৬৭৬০, সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৮৩।

১২০১. আওনুল মারুদ : ৯/৩৬২।

ব্যাপারে জানে, তাহলে সে তার থেকে কিসাস ও দিয়াত—কোনোটিই নিতে পারবে না।

আর যদি দুজন ব্যক্তি কোনো মহিলার ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে, আর তাদের কথার ওপর ভিত্তি করে বিচারক তালাকের ফয়সালা দিয়ে দেন—তখন যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যাপারে জানে, তার জন্য ওই মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ হবে না।^{১২০২}

স্বীকারোক্তি বা প্রমাণ ব্যতীত বিবাদীর বিরুদ্ধে ফয়সালা করতেন না

ওয়াইল বিন হুজর বলেন, ‘আমি একদা নবিজি ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে চামড়ার রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এল এবং বলল, “হে আল্লাহর রাসুল, এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে।” তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তুমি কি তাকে হত্যা করেছ?” তখন লোকটি (বাদী) বলল, “যদি সে তা স্বীকার না করে, তবে আমি তার বিপক্ষে সাক্ষী দাঁড় করাব।” আর বিবাদী বলল, “হ্যাঁ, আমি তাকে হত্যা করেছি।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি তাকে কীভাবে হত্যা করেছ?” হত্যাকারী লোকটি বলল, “আমি এবং সে গাছের পাতা সংগ্রহ করছিলাম। এমন সময় সে আমাকে গালি দিলে আমার রাগ চড়ে গেল। তখন আমি কুঠার দ্বারা তার মাথায় আঘাত করলাম। এভাবে আমি তাকে হত্যা করেছি।”

তখন নবিজি ﷺ তাকে বললেন, “তোমার কি এমন কোনো সম্পদ আছে, যার দ্বারা দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করতে পারবে?” তিনি বললেন, “আমার কাছে একটি কম্বল ও কুঠার ব্যতীত আর কিছুই নেই।” তখন তিনি বললেন, “তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি তোমাকে ক্রয় করবে (মুক্ত করিয়ে নেবে)?” সে উত্তর দিল, “আমার সম্প্রদায়ের কাছে আমার এতখানি মর্যাদা নেই।”

তখন তিনি তার বন্ধনের দড়ি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন এবং বললেন, “তোমার বিবাদীর ব্যাপারে তুমিই বুঝে নাও।” সে তাকে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো। যখন সে ফিরে যেতে লাগল, তখন

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “যদি সে তাকে হত্যা করে, তবে সেও তার সমকক্ষ হয়ে যাবে।”

এ কথা শুনে সে ফিরে আসলো এবং বলল, “হে আল্লাহর রাসুল, আমি শুনতে পেয়েছি যে, আপনি বলেছেন, “যদি সে তাকে হত্যা করে, তবে সে তার সমকক্ষ হয়ে যাবে।” আমি তো তাকে আপনার নির্দেশেই ধরেছি।”

তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তুমি কি চাও না যে, সে তোমার এবং তোমার ভাইয়ের পাপের বোঝা গ্রহণ করুক।” তিনি বললেন, “জি, হ্যাঁ। অবশ্যই।”

রাসুল ﷺ বললেন, “তাহলে এমনই হবে।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘তখন সে হত্যাকারীর বন্ধনের দড়ি ছুড়ে ফেলল এবং তাকে মুক্ত করে দিল।’^{১২০৩}

শরিয়তবিরোধী ফয়সালা বাতিল করে দিতেন

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, ‘দুব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর নিকট বিচার প্রার্থনা করতে আসলেন। তাদের একজন বললেন, “আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করুন।” দ্বিতীয়জন বললেন—যিনি প্রথমজনের তুলনায় অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন—“জি, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করুন আর অনুমতি দিন, যেন আমরা কথা শুরু করতে পারি।”

রাসুল ﷺ বললেন, “‘হ্যাঁ, কথা শুরু করো।”

তিনি বললেন, “আমার ছেলে এ লোকের বাড়িতে মজুর ছিল। অতঃপর তার স্ত্রীর সঙ্গে সে ব্যভিচার করে। লোকেরা আমাকে বলল, “তোমার ছেলের ওপর রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) ওয়াজিব হয়েছে।” তখন আমার ছেলেকে একশ ছাগল এবং একটি বাঁদির বিনিময়ে এর নিকট হতে মুক্ত করে এনেছি।

পরে আমি আলিমদের নিকট জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, “তোমার ছেলের ওপর একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব হয়েছে। আর ওই নারীকে রজম (প্রস্তারাঘাতে হত্যা) করতে হবে।”

সব শুনে রাসুল ﷺ বললেন :

أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ
وَالْغَنَمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيْبُ عَامٍ

“সেই সত্তার কসম—যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। বাঁদি ও বকরিসমূহ তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ বেত্রাঘাতসহ এক বছরের নির্বাসন দেওয়া হবে।”

আর অপরজনের ব্যাপারে বললেন :

وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ
اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا

“আর তুমি হে উনাইস (আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে), তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর নিকট যাবে, সে যদি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে, তাহলে তাকে রজম (প্রস্তারাঘাতে হত্যা) করবে।”

বর্ণনাকারী বললেন, ‘পরদিন সকালে উনাইস মহিলাটির কাছে গেলেন এবং মহিলাটি ব্যভিচার করার কথা স্বীকার করলেন। তখন রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাকে রজম (প্রস্তারাঘাতে হত্যা) করা হলো।’^{১২০৪}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- শরয়ি বিধানের বিপরীত মনগড়া মীমাংসা করলে তা বাতিলযোগ্য এবং এতে যে মাল-সম্পদ দেওয়া হয়েছে, তা ফেরত নেওয়া হবে।

- ইবনে দাকিকুল ইদ رحمہ اللہ বলেন, ‘এখান থেকে কিছু ফকিহ কর্তৃক বর্ণিত একটি মাসআলার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। তারা বলেছেন, “ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর রাজি থাকলে এবং পণ্যে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দিলে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও পণ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার সাব্যস্ত হবে।” অথচ সঠিক মাসআলা হলো, পণ্যে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ক্রয়-বিক্রয় সহিহ হওয়া শর্ত।’^{১২০৫}

মিথ্যা মামলা দায়ের করার ব্যাপারে সতর্ক করতেন

আব্দুল্লাহ বিন উমর رضی اللہ عنہ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَذْغَةَ الْخُبَالِ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে সুপারিশ করে, সে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যে ব্যক্তি জেনেও কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে, সে মামলা প্রত্যাহার করা পর্যন্ত আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে থাকে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের ওপর এমন অপবাদ আরোপ করে, যা থেকে সে পবিত্র, যতক্ষণ না সে তা থেকে তাওবা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে দোজখের কাদার মধ্যে আবদ্ধ রাখবেন।’^{১২০৬}

ইবনে রজব رحمہ اللہ বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি যদি মামলা-মোকদমা সম্পর্কে পারদর্শী হয়—চাই দ্বীনি বিষয়ে হোক, বা দুনিয়াবি বিষয়ে—সে যদি যেকোনো উপায়ে বাতিল পক্ষকে বিজয়ী করে নেয় অর্থাৎ দলিল-প্রমাণ সুন্দর ও গোছালোভাবে উপস্থাপন করে বিচারককে বিভ্রান্ত করে বাতিলের পক্ষে ফয়সালা আদায় করে নেয়, তার এই কাজ চরম পর্যায়ে হারাম এবং তা মুনাফিকদের অন্যতম খারাপ চরিত্র।’^{১২০৭}

১২০৫. ফাতহুল বারি : ১২/১৪২।

১২০৬. সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৯৭।

১২০৭. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ২/৪৮৬।

বিবাদ নিরসনে নিজের পক্ষ থেকে অর্থ ব্যয় করতেন

সাহল বিন আবু হাসমা ؓ থেকে বর্ণিত, ‘মুহাইয়িসা বিন মাসউদ ও আব্দুল্লাহ বিন সাহল অনটনগ্রস্ত হয়ে খাইবারের দিকে গমন করলেন। অতঃপর খাইবারের খেজুর বাগানের নিকট এসে তারা পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন। সে সুযোগে আব্দুল্লাহ বিন সাহলের ওপর দুষ্কৃতকারীরা আক্রমণ করে বসল। তখন তার ঘাড় মটকে গিয়ে তিনি মারা গেলেন। অতঃপর তাকে একটি কূপে ফেলে দেওয়া হয়।

এদিকে তার সঙ্গীরা তাকে খুঁজে না পেয়ে তাকে খুঁজতে বের হলেন। তখন তারা তাকে একটি কূপের মধ্যে খুঁজে পেলেন এবং সেখান থেকে বের করে এনে তাকে দাফন করলেন।

অতঃপর তার ভাই আব্দুর রহমান এবং দুই চাচাতো ভাই হুয়াইয়িসা ও মুহাইয়িসা রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলেন। তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান বয়সে সবার ছোট ছিলেন এবং তিনিই রক্তপণের হকদার ছিলেন। তাই তিনি ভাইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ বললেন, “বয়সে যে বড়, সেই প্রথমে কথা বলো।”

তখন আব্দুর রহমান পেছনে চলে আসলেন এবং হুয়াইয়িসা কথা বললেন। তার কথা শেষ হলে মুহাইয়িসা কথা বললেন। অতঃপর তাদের সঙ্গীর ব্যাপারে আব্দুর রহমান কথা বললেন।

তারা সবাই বললেন, “ইয়া রাসুলান্নাহ, খাইবারের একটি কূপে আমরা আব্দুল্লাহ বিন সাহলকে নিহত অবস্থায় পেয়েছি। আর খাইবারের ইহুদিরা ছাড়া আমাদের আর কোনো শত্রু নেই।”

রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কাকে সন্দেহ করছ?” তারা জানালেন, “আমাদের সন্দেহ, ইহুদিরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।”

তখন রাসুল ﷺ এ ব্যাপারে পত্র মারফত ইহুদিদের নিকট জানতে চাইলে তারা প্রত্যুত্তর দিল, “আমরা তাকে হত্যা করিনি।”

তখন রাসুল ﷺ বললেন, “তাহলে তোমরা পঞ্চাশবার শপথ করে বলো যে, তাকে ইহুদিরাই হত্যা করেছে।”

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, ‘তাদের কোনো একজনকে অভিযুক্ত করে তোমাদের পঞ্চাশজন লোক কসম করো, তাহলে তার দিয়াত দেওয়া হবে।’

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় (হাদিস : ১৫৬৬৪) এসেছে, ‘তোমরা হত্যাকারীর নাম বলো, অতঃপর তার বিরুদ্ধে পঞ্চাশবার শপথ করো, তখন আমি ওই ব্যক্তিকে তোমাদের সোপর্দ করে দেবো।’

বাইহাকির বর্ণনায় (হাদিস : ১৬৮৬৮) এসেছে, ‘তোমরা কি পঞ্চাশবার শপথ করে হত্যাকারীকে কিসাসের যোগ্য করতে পারবে?’

‘তারা বললেন, “আমরা যা দেখিনি, তার ওপর কী করে শপথ করব? যা সম্পর্কে আমরা দৃঢ়ভাবে জানি না, সে সম্পর্কে শপথ করতে পারব না। কেননা, আমরা জানি না, তাকে কে হত্যা করেছে? তবে ইহুদিরা যেহেতু আমাদের শত্রু আর হত্যা তাদের এলাকাতেই হয়েছে (তাই তাদেরকেই আমরা সন্দেহ করি)।”

রাসুল ﷺ বললেন, “তাহলে ইহুদিরা এ কথার ওপর পঞ্চাশবার শপথ করুক যে, তাকে তারা হত্যা করেনি। ফলে তারা তোমাদের সঙ্গীর রক্তপণ থেকে মুক্তি পাবে।”

তারা বললেন, “আমরা ইহুদিদের শপথ বিশ্বাস করব না। কেননা, যেখানে তারা কুফরের মতো সবচেয়ে মারাত্মক পাপে লিপ্ত, সেখানে অপরাধ না করার ওপর তারা মিথ্যা শপথ করবে না, এর নিশ্চয়তা কী?”

তখন রাসুল ﷺ তার রক্ত বৃথা যাওয়াকে অপছন্দ করলেন। ফলে নিজের পক্ষ থেকে একশটি উট দিয়াত হিসেবে তাদের দান করলেন।

সাহল ﷺ বলেন, “আল্লাহর কসম, সেগুলোর মধ্য থেকে একটি লাল উষ্ট্রীর কথা আমি এখনো ভুলতে পারিনি, যে আমাকে উটগুলো একত্র করার সময় লাগি মেরেছিল।”^{১২০৮}

নববি ﷺ বলেন, ‘রাসুল ﷺ বিবাদ নিরসন করার জন্য এবং দুপক্ষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্যই নিজের পক্ষ থেকে দিয়াত আদায় করলেন। কারণ, নিহতের স্বজনরা কিসাস বা দিয়াতের অধিকার তখনই লাভ করে, যখন তারা শপথ করে অথবা বিবাদীদের শপথ করতে বলে (আর তারা শপথ করতে অস্বীকার করে)। কিন্তু এখানে কোনোটাই সম্ভব হয়নি। এতে সঙ্গীর দিয়াত না পেয়ে তাদের মন ভেঙে গেল। তাই রাসুল ﷺ নিজের পক্ষ থেকে দিয়াত প্রদান করে তাদের ক্ষতে প্রলেপ দিলেন এবং উভয়পক্ষের মাঝে মীমাংসা করে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার ইচ্ছা করলেন।

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাষ্ট্রনায়কের জন্য সর্বস্তরের লোকদের উপকারিতার দিকে লক্ষ রাখা এবং তাদের পারস্পরিক বিবাদের মিটিয়ে দেওয়া জরুরি।’^{১২০৯}

ফয়সালা হকের পক্ষে দিলেও পাশাপাশি অন্য সবার মনও রক্ষা করতেন

হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তের মধ্যে ছিল, ‘রাসুল ﷺ পরবর্তী বছর তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করবেন। সে হিসেবে পরের বছর রাসুল ﷺ উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করলেন।

তিন দিনের মেয়াদ শেষ হলে মক্কাবাসীরা আলি ﷺ-এর নিকট এসে বলল, “মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, এখন তোমার সঙ্গীকে বের হয়ে যেতে বলো।”

রাসুল ﷺ বের হলেন। তখন হামজা ﷺ-এর মেয়ে “চাচাজান, চাচাজান!” বলে ডাকতে ডাকতে রাসুল ﷺ-এর পিছু নিল।^{১২১০}

তখন আলি ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন এবং ফাতিমা ﷺ-কে বললেন, “তোমার চাচাতো বোনের দেখাশোনা করার দায়িত্ব তোমার।” আলি ﷺ বলেন, “যখন আমরা মদিনায় পৌঁছালাম, তখন মেয়েটির দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমি, জাফর ও জাইদ বিন হারিসা ﷺ বিবাদে জড়িয়ে পড়লাম। জাফর

১২০৯. ইমাম নববি ﷺ কৃত শারহু সহিহ মুসলিম : ১১/১৪৭।

১২১০. হামজা ﷺ রাসুল ﷺ-এর চাচা হলেও দুধসম্পর্কে তিনি রাসুল ﷺ-এর ভাই ছিলেন। সে হিসেবে তাঁর মেয়ে রাসুল ﷺ-কে চাচাজান বলে ডাকলেন। (ফাতহুল বারি : ৭/৫০৫)

বললেন, “সে আমার চাচার মেয়ে, আর আমার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস হলো তার খালা।” জাইদ রাঃ বললেন, “সে আমার ভাইয়ের মেয়ে।”

আমি বললাম, “আমিই তাকে নিয়ে এসেছি। তার ওপর সে আমার চাচাতো বোন। আর আমার কাছে রাসুল সঃ-এর মেয়ে থাকে। এই মেয়ের দেখাশোনা করার ব্যাপারে সে-ই অধিক হকদার।”

অতঃপর রাসুল তার ব্যাপারে ফয়সালা করলেন, তার দেখাশোনার দায়িত্ব তার খালার। আর বললেন, “খালা হচ্ছে মায়ের মতো।”

তিনি আরও বললেন :

أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ، فَأَشْبَهْتَ خُلُقِي وَخُلُقِي، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيٌّ، فَمِثِّي
وَأَنَا مِنْكَ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ، فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا

“আর হে জাফর, তুমি আচার-আচরণ ও আকার-আকৃতিতে আমার সাথে সাদৃশ্য রাখো। আর হে আলি, তুমি আমার এবং আমি তোমার। আর হে জাইদ, তুমি আমার ভাই ও বন্ধু।”^{১২১১}

► হাদিসে লক্ষণীয় বিষয় :

- আত্মীয়তা ও সম্পর্কের মাহাত্ম্য। কারণ, তা রক্ষা করার জন্য বড় বড় সাহাবিগণ পরস্পর বিবাদে জড়িয়েছেন।
- বিচারক তার ফয়সালার হেতু ও দলিল বিচারপ্রার্থীদের সামনে স্পষ্ট করে দেবেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক দাবিদার নিজ নিজ দাবির সমর্থনে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করবে।
- কোনো মেয়ের লালনপালনের অধিকারপ্রাপ্ত নারী যদি ওই মেয়ের কোনো আত্মীয়কে বিয়ে করে, তাহলে তার লালনপালনের অধিকার বাতিল হবে না। এটাই ইমাম আহমাদ রাঃ-এর মত।

- নেক আমলের ওপর সাহাবায়ে কিরামের প্রতিযোগিতা। কারণ, তাদের প্রত্যেকে একটি এতিম বাচ্চার লালনপালন করে সাওয়াব অর্জন করতে পরস্পর বিবাদে জড়িয়েছেন।

এই ঘটনায় রাসুল ﷺ জাফর ﷺ-এর পক্ষে ফয়সালা করলেও অন্যদের একদম নিরাশ করেননি; বরং তাদের উত্তম কথা বলে খুশি করেছেন।

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, ‘এই ঘটনায় রাসুল ﷺ জাফর ﷺ-এর পক্ষে ফয়সালা দিলেও সুন্দর ভাষার মাধ্যমে অন্য সবার হৃদয়গুলোও জয় করে নিয়েছেন। এর কারণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।’^{১২১২}

ইবনে দাকিকুল ইদ ﷺ বলেন, ‘এই তিনজনকে রাসুল ﷺ যা বলেছেন, তা রাসুল ﷺ-এর উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ বহন করে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, আলি ﷺ ও জাইদ ﷺ-এর চাহিদা যেহেতু পূরণ হয়নি, তাই তাদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর সান্ত্বনাবাণী বলা যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু জাফর ﷺ-এর চাওয়া তো পূরণ হয়েছে, তবুও তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার যৌক্তিকতা কী?

এর উত্তর হলো, এখানে মেয়েটিকে আসলে দেওয়া হয়েছে তার খালাকে। জাফর ﷺ যে তাকে পেয়েছেন, তা মেয়েটির খালার বদৌলতেই পেয়েছেন, নিজের কারণে তাকে পাননি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে মেয়েটির ফয়সালা তার পক্ষেও দেওয়া হয়নি। এ কারণে তাকে সান্ত্বনা দেওয়াও যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়।’^{১২১৩}

বিচারপ্রার্থী থেকে অদ্ভুত কিছু শুনলে মুচকি হাসতেন

ইকরামা ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘রিফাআ তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন। অতঃপর আব্দুর রহমান বিন জুবাইর আল-কুরাজি তাকে বিয়ে করলেন।’

আয়িশা ﷺ বর্ণনা করেন, ‘তখন তিনি (রিফাআর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী) সবুজ রঙের একটি ওড়না পরে তাঁর (আয়িশা ﷺ) নিকট আসলেন। অতঃপর

১২১২. ফাতহুল বারি : ৭/৫০৭।

১২১৩. ইহকামুল আহকাম : ১/২১৬।

তাঁর কাছে স্বামীর অত্যাচারের অভিযোগ করলেন এবং তাঁকে নিজের গায়ের চামড়ার ওপর (প্রহারের) সবুজ দাগ দেখালেন।

মহিলারা সাধারণত একে অন্যের সহযোগিতা করে থাকে। তাই রাসুল ﷺ যখন আসলেন, তখন আয়িশা ﷺ বললেন, “কোনো মুমিন মহিলাকে এমনভাবে প্রহার করতে আমি দেখিনি। প্রহারের চোটে তার শরীর তার কাপড়ের চেয়ে সবুজ হয়ে গেছে!”

আয়িশা ﷺ বলেন, ‘অতঃপর রিফাআর স্ত্রী রাসুল ﷺ-এর নিকট আসলেন। আমি ও আবু বকর ﷺ তখন তাঁর পাশে বসা ছিলাম।

মহিলাটি বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি রিফাআর স্ত্রী ছিলাম। তারপর সে আমাকে তালাক দিয়েছে। তালাকের ইদত শেষ হওয়ার পর আমি আব্দুর রহমান বিন জুবাইরকে বিয়ে করেছি। কিন্তু ইয়া রাসুলাল্লাহ, তার সাথে যা আছে, (তার পুরুষাঙ্গ) সেটা ঠিক কাপড়ের এই অংশের মতো (অর্থাৎ তার পুরুষাঙ্গ এই কাপড়ের মতো নির্জীব)।” এই বলে তিনি তার জিলবাবের একটি অংশ ধরে দেখালেন।

সে সময় খালিদ বিন সাইদ বিন আস ﷺ দরোজার পাশে অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন, “হে আবু বকর, এই মেয়ে রাসুল ﷺ-এর সামনে বড় গলায় কী সব বাজে কথা বলছে, তা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?”

কিন্তু আল্লাহর কসম, তার কথায় রাসুল ﷺ শুধু মুচকি মুচকি হাসছিলেন (রাগ করছিলেন না)।

তখন রাসুল ﷺ বললেন, “সম্ভবত, তুমি রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও? কিন্তু তা তো ততক্ষণ সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না সে (আব্দুর রহমান) তোমার সুধা পান করবে এবং তুমি তার সুধা পান করবে (অর্থাৎ যতক্ষণ তোমরা সহবাস করবে না, ততক্ষণ তুমি প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না)।”

বর্ণনাকারী বলেন, ‘রাসুল ﷺ-এর কাছে স্ত্রীর আগমনের খবর পেয়ে তার স্বামী অন্য স্ত্রী থেকে তার দুই সন্তানকে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে মিথ্যা বলেছে। আমার নিকট পরিপূর্ণ

যৌনশক্তি রয়েছে। কিন্তু দুশ্চরিত্রা নারী, সে এখনও রিফাআকে চায়।”

রাসুল ﷺ বললেন, “এরা কি তোমারই সন্তান?”

তিনি বললেন, “হ্যাঁ।”

তখন রাসুল ﷺ বললেন, “তাহলে এ-ই ব্যাপার, যার কারণে মেয়েটি এরূপ করছে! আর আল্লাহর কসম, কাকের সাথে কাকের সন্তানের যেমন সাদৃশ্য থাকে, ওর (আব্দুর রহমানের) সাথে এদের তার চেয়ে বেশি সাদৃশ্য রয়েছে।”^{১২১৪}

উভয়পক্ষের কথা মন দিয়ে শুনতেন, যদিও একপক্ষ কাফির হোক

আবু হুরাইরা রা. ব বলেন, ‘একদা এক ইহুদি বিক্রির জন্য কিছু পণ্য উপস্থাপন করল। তার বিনিময়ে তাকে যে মূল্য দেওয়া হলো, তা তার পছন্দ হয়নি অথবা এর ওপর সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তখন সে বলল, “না, সেই সত্তার শপথ—যিনি মুসা ﷺ-কে লোকদের জন্য মনোনীত করেছেন।’

তার এই কথা এক আনসারি (মুসলমান) শুনতে পেয়ে তার মুখের ওপর একটি থাপ্পড় মারলেন এবং বললেন, “তুই বলছিস, সেই সত্তার শপথ—যিনি মুসা ﷺ-কে লোকদের জন্য মনোনীত করেছেন; অথচ রাসুল ﷺ আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছেন।”

তখন ইহুদি লোকটি রাসুল ﷺ-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করল, “হে আবুল কাসিম, আমি জিম্মি এবং ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে নিরাপত্তার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ। অমুক ব্যক্তি আমার মুখের ওপর থাপ্পড় মেরেছে।”

রাসুল ﷺ বললেন, “তুমি তাকে থাপ্পড় মেরেছ কেন?”

তিনি বললেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে বলেছে, সেই সত্তার শপথ—যিনি মুসা ﷺ-কে লোকদের জন্য মনোনীত করেছেন; অথচ আপনি আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছেন।”

তখন রাসুল ﷺ রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁর চেহারা রাগের ছাপ ফুটে উঠল। অতঃপর বললেন :

لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَذْرِي أَحْسِبُ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَوْ بُعِثَ قَبْلِي، وَلَا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ

“নবিদের মধ্যে একজনের ওপর আরেকজনকে মর্যাদা দিয়ো না। কেননা, কিয়ামতের দিন যখন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ যাদের চাইবেন, তারা ছাড়া ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয়বার যখন ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন আমিই প্রথম পুনরুত্থিত হব। উত্থিত হওয়ার পরেই আমি দেখতে পাব, মুসা ﷺ আরশ আঁকড়ে ধরে আছেন। আমার জানা থাকবে না, তুর পাহাড়ে বেহুঁশ হওয়ার কারণে তাঁকে এবারে বেহুঁশ হওয়া থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, নাকি আমার আগেই তাঁকে হুঁশ দান করা হয়েছে? আর আমি এ কথাও বলি না যে, কোনো নবি ইউনুস বিন মাত্তা ﷺ-এর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান।”^{১২১৫}

রাসুল ﷺ-এর কতিপয় ফয়সালা

রাসুল ﷺ-এর অনেক ফয়সালা হাদিসের কিতাবসমূহে সংরক্ষিত আছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

- তিনি ফয়সালা করেছেন, রিকাজ (গুপ্তধন)-এর এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দিতে হবে।^{১২১৬}

১২১৫. সহিহুল বুখারি : ২৪১১, সহিহ মুসলিম : ২৩৭৩।

১২১৬. সহিহুল বুখারি : ১৪৯৯, সহিহ মুসলিম : ১৭১০। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত।

- তিনি ফয়সালা করেছেন, পরাগায়ণের পর খেজুর গাছ বিক্রি করলে খেজুর পরাগায়ণকারী পাবে, কিন্তু যদি ক্রয় করার সময় ক্রেতা ফলসহ কেনার শর্ত দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।^{১২১৭}
- তিনি ফয়সালা করেছেন, কৃতদাসের সম্পদের মালিক বিক্রেতা, তবে ক্রয়ের সময় ক্রেতা শর্তারোপ করলে তার মালিক ক্রেতা হবে।^{১২১৮}
- তিনি ফয়সালা করেছেন, স্ত্রী থেকে ভূমিষ্ট সন্তানের আইনগত পিতৃত্ব স্বামীর, ব্যভিচারকারীর নয়।^{১২১৯}
- তিনি ফয়সালা করেছেন, যৌথ-মালিকানার সম্পদ ভাগ করার পূর্বে কেউ নিজের অংশ বিক্রি করলে, তাতে সকল শরিকদার শূফার অধিকারপ্রাপ্ত হবে।^{১২২০}
- তিনি হামল বিন মালিকের জন্য তার স্ত্রী থেকে মিরাস পাওয়ার ফয়সালা করেছেন, যাকে তার আরেক স্ত্রী হত্যা করেছিল।^{১২২১}
- তিনি ফয়সালা করেছেন, মায়ের পেটের ভেতর সন্তান হত্যা করলে, তার জরিমানাস্বরূপ একটি পূর্ণ দাস অথবা একটি পূর্ণ দাসী দিতে হবে।^{১২২২}
- কারও জমির মাঝখানে রাস্তা পড়লে এবং সেখানে ঘর বাঁধার ইচ্ছা না থাকলে রাস্তার জন্য সাত হাত জমি ছেড়ে দেওয়ার ফয়সালা করেছেন।^{১২২৩}
- তিনি ফয়সালা করেছেন, মৃতের দাদি ও নানি দুজনই মিরাস থেকে অংশ পেলে মিরাসের এক-ষষ্ঠাংশ উভয়ের মাঝে সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে।^{১২২৪}

১২১৭. সহিহুল বুখারি : ২৩৭৯, সহিহ মুসলিম : ১৫৪২। ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত।

১২১৮. সহিহুল বুখারি : ২৩৭৯, সহিহ মুসলিম : ১৫৪২। ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত।

১২১৯. সহিহুল বুখারি : ২০৫৩, সহিহ মুসলিম : ১৪৫৭। আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত।

১২২০. সহিহুল বুখারি : ২২১৪, সহিহ মুসলিম : ১৬০৮। আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত।

১২২১. সহিহুল বুখারি : ৬৭৪০, সহিহ মুসলিম : ১৬৮১। আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত।

১২২২. সহিহুল বুখারি : ৬৭৪০, সহিহ মুসলিম : ১৬৮১। আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত।

১২২৩. সহিহুল বুখারি : ২৪৭৩, সহিহ মুসলিম : ১৬১৩। আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত।

১২২৪. আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ কৃত মুসনাদু আহমাদের বর্ধিত সংস্করণ : ২২২৭২।

- তিনি ফয়সালা করেছেন, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর বাড়ি থেকে কোনো কিছু দান করবে না।^{১২২৫}
- তিনি ফয়সালা করেছেন, যদি কোনো জালিম জোরপূর্বক অপরের মালিকানাধীন জমিতে গাছ লাগায় বা ঘর ইত্যাদি নির্মাণ করে, সেটাতে তার অধিকার সাব্যস্ত হবে না। বরং তা উপড়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হবে।^{১২২৬}



১২২৫. সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৬৫, সুনানুত তিরমিজি : ৬৭০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৯৫। আবু উমামা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

১২২৬. সুনানু আবি দাউদ : ৩০৭৩, সুনানুত তিরমিজি : ১৩৭৮। সাইদ বিন জাইদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।



**R U H A M A
P U B L I C A T I O N**

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সিরাত মানবজীবনের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা—অনুকরণীয় জীবনাদর্শ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছেন সুমহান চরিত্রে। অনুপম শিষ্টাচারে সাজিয়েছেন তাঁর পবিত্র জীবনকে। তাঁর দেখানো পথেই রয়েছে জীবনের পরম সফলতা। যারা আল্লাহকে পেতে চায় আর সাফল্যের প্রত্যাশা রাখে অনন্ত জীবনে, তিনিই তাদের অদ্বিতীয় পথপ্রদর্শক—আসমানি রাহবার। তাই বিস্তৃত পরিসরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তাঁর আচরণবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন আমাদের জন্য আবশ্যিক; যাতে সঠিকভাবে আমরা তাঁর অনুসরণ করতে পারি। প্রিয় পাঠক, কেমন ছিল বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণবিধি—জানতে পড়ুন অনন্যসাধারণ এই গ্রন্থটি...